প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

প্রচ্ছদ অলংকরণ : খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক দিলীপ বসু
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪।৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট । কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক সিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৭০০ ০০৬

আকাশবাণীর শ্রোতা এবং শিল্পীদের উদ্দেশে

নিবেদন

অনেকগুলি বছর অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে কাজ করেছি। সুদীর্ঘ তিন দশক। শুধু একটি কেন্দ্রে নয়। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, পুবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে— আসমুদ্র-হিমাচল। বিশাল এই ভারত-তীর্থ পরিক্রমায় কত বিচিত্র জনপদ, বিচিত্র জন এবং সংস্কৃতিধারার সঙ্গে ঘটেছে নিবিড় পরিচয়। আন্দামানের নূতন মানব-বসতির মধ্যে শুনেছি নব-জীবনের জয়গান। শীতে সুন্দরী খাসি পাহাড়ের জীবনের বৈচিত্র্য আমার প্রাণে জাগিয়েছে শিহরণ। দণ্ডক-শবরীর সহজ সরল চলার ছন্দ আমার মনকে দিয়েছে দোলা। অতীতের মুণ্ড-শিকারীর দেশ নাগাভূমে আমি ভীত শঙ্কিতচিত্তে কাটিয়েছি রাত। মণিপুরবালার নূপুর-নিক্কন আমার হৃদয়ে তুলেছে হিন্দোল। পাশ কেটে সরে দাঁড়িয়েছি আধুনিকা মিজোকন্যার দৃপ্ত ভ্রূভঙ্গী দেখে। হিমালয়ের পাদদেশে দেখেছি তিব্বতী-ভুটানী-সিকিমী জীবনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আর, রেডিয়োর বহির্বিভাগটাও যেন ছোটো-খাটো এক বিশ্ব। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেরই ক'জন মানুষকে তো দেখেছি অতি কাছ থেকে!

মানুষকে নিয়েই তো রেডিয়োর কাজ। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতির কথা তুলে ধরাই রেডিয়োর প্রাথমিক দায়িত্ব। কত জ্ঞানী-গুণী সুধীজন আসছেন প্রতিদিন তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে। আসছেন অসামান্য সব শিল্পী কলাকুশলী। কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে সরকারি দপ্তরের প্রাত্যহিকতার জীর্ণতা থেকে মুক্ত এক সাধনার জগৎ।

স্টুডিয়োর অভ্যন্তরে চলছে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব। গ্রাহক-যন্ত্রে যা শুনতে পাওয়া গেল তার নেপথ্যে রয়েছে কত কল্পনা, ভাবনা, অধ্যয়ন, অনুশীলন। দেয়ালের ঘড়িটির সতর্ক শাসানীর নীচে চলছে ক্লান্তিহীন দীর্ঘ মহলা। প্রতি সেকেণ্ডেরই যে হিসাব চাই। কাঁটায় কাঁটায় সময় মিলিয়ে অনুষ্ঠান যাবে আকাশে সূর্য ওঠার ধ্রুব নিয়মে। 'বন্ধ্' নেই, উৎসবে নববর্ষে ছুটি নেই; ঝড়, জল, দাঙ্গার কালেও রেডিয়ো থেমে নেই। থামার উপায়ই নেই, রেডিয়ো যে 'ভয়েস্ অব দি নেশন্'। শিল্পী, যন্ত্রী, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযোজক, ঘোষক, পরিচালক এবং আরো কত কর্মীর সুষ্ঠু সমন্বয়ে চলছে বিরাট এক কর্মযজ্ঞ।

কিন্তু গ্রাহকযন্ত্রে দৃশ্যমান তো কিছুই নয়। রেডিয়োর সমস্ত অনুষ্ঠানই যে শোনার জন্য শুধু। রেডিয়োতে বলাকওয়া গাওয়ার ধরনটাই যে তাই সম্পূর্ণ আলাদা। এই বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা আমি করেছি। বাংলা বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় তেমন কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

রেডিয়োতে থাকাকালীন গান শুনেছি প্রাণভরে। তন্ময় হয়ে শুনেছি শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সংগীত। জীবনের এটা এক পরম পাওয়া। কেন ভালো লেগেছে সে গান সেকথা না বললে তো কর্তব্যের ত্রুটি।

লেখাটা যখন চলছিল তখন প্রায়ই এসে শুনতেন অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর রিজিয়োন্যাল ইঞ্জিনিয়ার জে. এন. রায় এবং কলকাতা কেন্দ্রের ডিরেক্টর দিলীপকুমার বিশ্বাস ও বর্তমানে আগরতলা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার। তাঁদের মন্তব্যে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। সুরসিক শিল্পী অনুজপ্রতিম পূর্ণেন্দু রায় প্রতি সন্ধ্যায় এসে শুনেছে। তার অসীম ধৈর্য। তার সূক্ষ্ম সমালোচনায় উপকৃত হয়েছি। আমার আবাল্য সুহৃদ সংগীতজ্ঞ অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরীর কাছ থেকেও নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীমান রণবীর চক্রবর্তীর কাছ থেকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছি।

আর মাঝে মাঝে এসে লেখাটার কোনো কোনো অংশের পাঠ শুনে যেত পরম স্নেহভাজন দিলীপ বসু, মনীষা প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার। লেখাটা প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে দিলীপ আমায় দোরে দোরে ঘোরার গ্লানি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

নামকরণে H. M. V.-এর অনিমেষ বসু এবং পূর্ণেন্দুর অবদান কম নয়। সোদরপ্রতিম অনুপম রায় খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পাদনা এবং প্রুফ-সংশোধনের কাজ করেছে।

এঁরা এত অন্তরঙ্গ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথাই ওঠে না।

১৮।৩৩ ডোভার লেন
কলিকাতা ৭০০ ০২৯

পরিমল চৌধুরী

আকাশবাণীর দিনগুলি

১

কত যে গান, ভালো গান, শুনেছি ছেলেবেলায়। আমাদের বাড়িতে প্রায় প্রতি শনিবার রাত্তিরে গানের জলসা বসত। গাইতেন শচীন দেববর্মণ, জ্ঞান দত্ত, খসরু মিঞা সাহেব, সমরেন্দ্র পাল, আর টুকু গাঙ্গুলি— আজকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গিটার-বাজিয়ে সুনীল গাঙ্গুলির কাকা। এই ছোটোবেলা থেকে গান শুনে শুনে গানের নেশায় পেয়ে গিয়েছিল। আর এমনটা হবেই বা না কেন? আমাদের এই ছোটো শহরের আকাশে বাতাসে গান। রাত্রিশেষে ঘুম ভেঙেছে রামদাস বৈষ্ণবের দেশী রাগের গানে—

> 'কে গো তোরা ফুলচোরা মনোহরা যুবতী
> বলে কালা ব্রজবালা প্রতি।'

বেলা হলে বৈষ্ণব তার মুষ্টিভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেত মাধুকরীতে। খুব ভোরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে নির্জন নদীতীরে ভোলা চন্দের বাঁশিতে উষার রাগিণী শুনে শিহরণ জেগেছে মনে। একটু এগিয়ে স্টেশনের পথে ভেসে এল নারায়ণ চৌধুরীর কণ্ঠে যাযাবরের সেই বিখ্যাত গান, 'উষার উদয়ক্ষণে তুমি আসিলে মৃদুল পায়ে।' কোনোদিন বা সূর্যোদয়ের মুহূর্তে দিঘির চার পারে ঘুরতে ঘুরতে শুনতে পেয়েছি গীতা নাহার কণ্ঠে ভৈরোঁ রাগের রিয়াজ। এ শহরে আধুনিক গান লিখেছেন অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ; সুর দিয়েছেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, আর সেই গানে প্রাণ ঢেলে গেয়েছেন শচীন দেববর্মণ, জ্ঞান দত্ত, শৈল দেবী, মায়া দেবী, নারায়ণ চৌধুরী। শুধু কি গান! মণি বর্ধনের নূপুরধ্বনি কেষ্ট দাসের

তবলাসংগতে মিশে দক্ষিণা বাতাসে ছন্দের হিন্দোল তুলত। রাজা রায়ের সেতারে বেহাগের করুণ বেদন মাধবী রাতকে দিত উতলা করে। এমন শহরে ছেলেবেলা, কৈশোর কাটালে গানের নেশায় না পেয়ে যায় না। আর এ নেশারই টানে রেডিয়োতে এলাম।

রেডিয়োর আকর্ষণ ছিল প্রচণ্ড। দিল্লীতে একটা শিডিউল্‌ড্‌ ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের পদ ছেড়ে দিয়ে রেডিয়োর চাকরিতে যোগ দিলাম। টাকার তদারকি করার দায়িত্বটা ভালো লাগছিল না। রেডিয়োতে আসার আকাঙ্ক্ষাই ছিল মনে। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলাম, ইন্টারভিউ হল। পুলিস ভেরিফিকেশন হয়ে গেল।

কলকাতা কেন্দ্রে কাজে লেগে গেলাম ১৯৪৬ সনের ৩০শে জুলাই। সেদিন থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশে কাজের শুরু। এ আলাদা জগৎ। টেবিলে বসে যত না কাজ তার দ্বিগুণ করতে হয় স্টুডিয়োতে। প্রায় প্রতিটি আর্ট-ফর্মকে রেডিয়ো গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিজের মতো করে। রেডিয়োতে সংগীত আছে— অনুষ্ঠান-সূচীর সিংহভাগ ; আছে নাটক, কথকতা, আবৃত্তি। প্রয়োগকৌশল অবশ্যই আলাদা। কারণটা খুবই সরল। রেডিয়োর গ্রাহক-যন্ত্রে শুধু শুনতে পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায় না কিছুই। তাই মঞ্চের জন্য লেখা নাটকের সংলাপ রেডিয়োতে চলবে না। সংবাদপত্রের জন্য লেখা প্রবন্ধের পাঠ রেডিয়োর শ্রোতার কাছে দুর্বোধ্য হবে। পরিমিতিবোধ না থাকলে গান শ্রোতার কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করবে না। মাইক্রোফোনকে না জানলে রেডিয়োতে কাজ করা অসম্ভব।

আরম্ভ হয়ে গেল হাতে-কলমে শিক্ষা প্রথম দিন থেকেই, গান-বাজনা নাটক কথকতা সম্পর্কে আমার পুরনো ধ্যান-ধারণাকে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে। দীর্ঘ সাধনায় বুঝতে চেষ্টা করেছি রেডিয়োর বৈশিষ্ট্যকে, তার নিজস্ব প্রয়োগনৈপুণ্যকে। রেডিয়ো-নাটকের

আবেদন যে মঞ্চ-নাটকের চাইতে কম নয়, রেডিয়োর কথিকা যে মনুমেন্টের নীচের বাগ্মিতার চেয়ে কম হৃদয়গ্রাহী নয়, রেডিয়োর গান যে আসরের গানের চেয়ে কম মর্মস্পর্শী নয়, সে-কথা কে জানে কেউ. কোনোদিন ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে কিনা! সে বলা এখনো হয় নি, আমার দেশেই শুধু নয়, এমন-কি, পশ্চিম দেশেও হয় নি ভালো-ভাবে। তাই দুঃখ করে লাইওনেল ফিলডেন্ বলেছিলেন যে রেডিয়ো আজ অবধি তার গুণগান করার ত্রুবাদুরকে (troubadour) খুঁজে পায় নি। সে গান যদি কখনো গাওয়া হয় তা হবে অনির্বচনীয়।

কলকাতা ময়দানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ইডেন উদ্যানের পুব এবং উত্তর দিকের কোণে যে সুবৃহৎ গৃহটি এখন কলকাতার বেতার-কেন্দ্র সেখানে কিন্তু আমার কাজ শুরু হয় নি। কলকাতা বেতারের জন্মদিন ২৬শে আগস্ট ১৯২৭। আর জন্ম হয় সেই সুবিখ্যাত এক নম্বর গারস্টিন প্লেসে। এক নম্বর গারস্টিন প্লেস একদা কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ একটা জায়গা দখল করে নিয়েছিল। জ্ঞানী, গুণী, সুধীজন, শিল্পী, সাহিত্যিক, পত্র-পত্রিকার প্রধান ব্যক্তিরা সবাই এসেছেন, মুগ্ধ করেছেন শ্রোতাদের বচনে-বাচনে, সংগীতে, কথকতায়। নূতন এই মাধ্যমটির বিরাট সম্ভাবনাকে সবাই স্বাগত জানিয়েছেন। কলকাতা রেডিয়োর প্রগতির পথে এঁদের অবদান অসামান্য। এক নম্বর গারস্টিন প্লেসেই ছিল কলকাতা বেতার-কেন্দ্র পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই বাড়িতেই এমন কিছু অনুষ্ঠান পরিকল্পিত ও রূপায়িত হয়েছে যা এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেও বদলানো সম্ভব হয় নি অন্যতর নূতন ভাবনায়। মনে পড়ছে এই কয়েক বছর আগে 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটিকে ঢেলে সাজাবার ব্যর্থ প্রয়াসের কথা। শ্রোতার অনুমোদন তো পায়ই নি, পরিকল্পনা এবং প্রযোজনায় নিষ্ঠারও অভাব ছিল বলে বিরূপ সমালোচনার ঐকতান শোনা গিয়েছিল। এক নম্বর গারস্টিন প্লেসে

অনেক অনুষ্ঠানের সার্থক নামকরণ হয়েছিল যা আজও চলে আসছে।

ছেচল্লিশের আগস্ট মাসটা একটা দারুণ দুর্দিন এবং দুর্যোগের কাল। অশুভক্ষণে এই মাসটার চলা শুরু হয়েছিল। কলকাতা রেডিয়োর পক্ষে আরো বেশি অমঙ্গলের সূচনা হল। প্রথম সপ্তাহটা যেতে না যেতেই রেডিয়োর বাড়িতে একটি অঘটন। এমনটা আগে হয় নি এবং পরেও দেখি নি। বিদেশী শাসকের হাতে রেডিয়ো একটা মস্ত বড়ো জনসংযোগ এবং সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যম। সেজন্যই বোধ হয় সেদিন ক'টি তরুণ-তরুণী একেবারে স্টুডিয়োর সিঁড়িতে বসে পিকেটিং শুরু করে দিল। স্টুডিয়োতে যাবার পথ বন্ধ। একতলা থেকে দোতলায় ওঠাও মুশকিল। কিন্তু প্রোগ্রাম বন্ধ থাকতে পারে না। সেই কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে দু-একজন অফিসার স্টুডিয়োর দিকে যেতে বাধ্য হলেন। যে মেয়েরা পিকেটিং করছিল তারা প্রতিবাদে ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠল। এরা ধ্বনি তুলল যে তাদের গায়ে হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী নই। পরের দিন অফিসে এসে জানতে পারলাম, কিন্তু এমন কোনো কানাঘুষাও শুনলাম না যে পিকেটিংকারী মেয়েদের প্রতি অভদ্র আচরণ করা হয়েছে। আমি তখন একেবারেই নতুন। প্রায় সবাই অপরিচিত। অফিসের কারো সঙ্গেই সেরকম প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কিন্তু সুভদ্র আচরণের জন্য সবাইকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছি। মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করবে কেউ সেটা মেনে নিতে পারলাম না। ব্যাপারটা কতদূর যে গড়াতে পারে অফিসে বসে কিন্তু সেটা আঁচ করতে পারি নি। গুরুত্ব বুঝতে পারলাম পরদিন।

দশটার খানিক আগে অফিসের গেটে এসে দেখতে পেলাম লম্বা কয়েকটি বেঞ্চের উপর বসে আছে কিছু নারী-পুরুষ। কেউ ভেতরে যেতে পারবে না, যেতে দেওয়া হবে না। মাত্র সাত-আট

দিন আগে নতুন সরকারি কাজে যোগ দিয়েছি। বুক দুরু দুরু করছে যে অফিসে না যেতে পারলে চাকরির ক্ষতি হবে। বেঞ্চের উপর বসে সিগারেট পানরত একজনের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে নিজের সমস্যাটা নিবেদন করলাম। উত্তর পেলাম যে শিল্পীরা স্ট্রাইক করেছেন। আমার যুক্তি— আমি শিল্পী নই, কর্মচারী; স্ট্রাইক করার অধিকার আমার নেই। কার কথা কে শোনে! ভিতর থেকে গেটের কাছে দৌড়ে এসে রামহরক পিওন বলল যে ছোটো সাহেব অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টর নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন ধর্মঘটকারীদের সঙ্গে কোনো বিতর্কে না যাই। বুঝতে পারলাম ভিতরে অনেকে রয়েছেন। কিন্তু কখন এলেন এঁরা এবং ঢুকলেনই বা কি করে। স্ট্রাইক শুরু হয়েছে শুনলাম ভোর ছ'টাতে। আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে এই ধর্মঘট, পিকেটিংকারী মেয়েদের উপর রুচিহীন ব্যবহারের প্রতিবাদে। কাছেই প্রেস ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়ার অফিস থেকে রেডিয়োতে ফোন করলাম। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টর ফোন ধরে বললেন যে ধর্মঘট হবে এ কথা আগের দিন রাত্রে জানতে পেরে ওঁরা ক'জন রাত্রি থেকেই স্টুডিয়োতে রয়ে গিয়েছেন। জানালেন যে প্রোগ্রাম চালিয়ে যাবার মতো সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে, যেন চিন্তা না করি এবং স্ট্রাইক উঠিয়ে নেবার আগে যেন অফিসে আসার চেষ্টা না করি; এতে পরিস্থিতি আরো জটিল হতে পারে। মনটা খারাপ হয়ে গেল দুঃসময়ে কোনো কাজেই লাগলাম না এই কথা ভেবে।

সেদিনের স্টুডিয়োর নিরাপত্তা ব্যবস্থার তুলনা করা যেতে পারে আজকের দিনের সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মাত্র শেষ হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসের কথা চলছে। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা। সেই সময়েও কিন্তু সশস্ত্র পুলিসের উপর নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল না। ছিল না বলেই পিকেটিংকারীরা সেদিন

গেট পার হয়ে একেবারে স্টুডিয়োর দরজার সামনে গিয়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল। আজ কিন্তু অবস্থাটা পুরোপুরি উল্টো। গেটের সামনে সশস্ত্র পুলিস, স্টুডিয়োর মুখেও রাইফেলধারী পাহারায়। রিসেপ্‌শনিস্টের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে তবে স্টুডিয়োতে বা অফিসে যেতে পারা যায়। এ ব্যবস্থা দেশের প্রতিটি কেন্দ্রে। দেশ স্বাধীন হয়েছে!

একেবারে সম্পূর্ণ ধর্মঘট বলতে যা বোঝায় তাই হয়েছিল। পুরো তিন দিন। একটি প্রাণীও ভিতরে যেতে পারে নি। না পেরেছে কেউ ভিতর থেকে বাইরে আসতে। ভিতরের ক্যান্টিনে খাবার শেষ। বাইরে থেকে কিছু আনিয়ে নেবার উপায় নেই। এ যেন ভিতরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলার প্রতিজ্ঞা। দিনরাত্রি প্রহরায় রত ধর্মঘটী শিল্পীরা। গানের এবং নাটকের নেতৃস্থানীয় শিল্পীরাও যোগ দিয়েছিলেন। দেখেছি পঙ্কজ-কুমার মল্লিক, মুস্তাক আলী খাঁ, জহর গাঙ্গুলিকে। তিন দিন তিন রাত্রির পর ধর্মঘটের অবসান। সরকারের পক্ষে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল এন. এ. এস. লক্ষ্মণম্ শিল্পীদের দাবি মেনে নিলেন। দাবি অবশ্য সামান্যই। রাতারাতি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টর প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং প্রোগাম এগ্‌জিকিউটিভ সুনীল বোসকে ট্রান্স্‌ফার করা হল। এটাই ছিল দাবি। আমি নূতন লোক এই ডিপার্টমেণ্টে। সরকারের বিচারটা একতরফা মনে হল। ঐ মেয়েদের উপর সত্যিই কোনো অশোভন ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কোনো অনুসন্ধানই হল না। মেয়েরা কেন স্টুডিয়োর দরজায় এসে বসে যাবে সে সম্পর্কেও শিল্পীসঙ্ঘের সঙ্গে কোনো আলোচনা হল না। এটা যে 'ট্রেসপাস' এ নিয়েও কোনো প্রশ্ন উঠল না। এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা সরকার কেন যে গ্রহণ করল তা বুঝতে পারলাম না। ধর্মঘট তুলে নেবার পর প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও সুনীল বোসকে আর

অফিসে দেখা গেল না। এমন-কি, এই দুজন অফিসারকে বিদায় জানাবার সুযোগও মেলে নি। আমাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দানা বাঁধতে মাত্র শুরু করেছিল। কিন্তু প্রকাশের সুযোগ পেল না। রুদ্রের মূর্তিতে ঝড়ের বেগে কলকাতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ১৬ই আগস্ট।

শিল্পীসঙ্ঘের অভিযোগ ছিল প্রধানত দুটি মাত্র অফিসারের বিরুদ্ধে। কেমন অফিসার ছিলেন এই প্রভাতবাবু, সুনীলবাবু? দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে দিলে সে সময় প্রভাতবাবুর মতো সুদর্শন যুবাকে কলকাতার রাস্তায় দেখা যেত না। আর ইতিমধ্যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়ও করলেন 'স্বামি-স্ত্রী' ছবিতে। সত্যিকারের আর্টিস্ট। সুনীল বোস সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর প্রথম সারির শিষ্য। 'গা-নি' নামে রেডিয়োতে গাইতেন। খেয়াল, ঠুংরি দুটোতেই ভালো। ইমাজিনেশন ছিল সুন্দর। পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা। রেডিয়োর মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুবই যোগ্য ব্যক্তি। সুনীলবাবু অবসর নিয়েছেন স্টেশন ডিরেক্টর হিসেবে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে রেডিয়োর চাকরি ছেড়ে দিয়ে সিনেমার লাইনে চলে গিয়েছেন। ওঁর লেখা দুই-একখানা উপন্যাসও পড়েছি। প্রভাতবাবু রেডিয়োর সুযোগ্য অফিসার ছিলেন।

যে উন্মত্ত ধ্বংসের লীলা, নিষ্ঠুর নৃশংসতা চলল কলকাতার বুকে ১৬ই আগস্টের 'ডিরেক্ট অ্যাকশন'-এর দিনটি থেকে, তার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করতে হল রেডিয়োর কর্মীদের। প্রতি রাত্রিতে দুজন করে প্রোগ্রাম অফিসারকে স্টুডিয়োতে থাকতে হল। থাকতে হল ইঞ্জিনিয়ার এবং ঘোষকদেরও। সপ্তাহে দুবার রাত্রিবাস স্টুডিয়োতে। সকাল দশটায় অফিসে আসা, রাত্রিটা স্টুডিয়োতে কাটিয়ে পরদিন প্রোগ্রাম মিটিং-এর শেষে বাড়ি ফেরা প্রায় এগারোটার পর। নিজ দায়িত্বাধীন প্রোগ্রামগুলি যদি ঠিকভাবে তৈরি না থাকত তবে

কোনো কোনোদিন বিকেল চারটের আগে বাড়ি ফেরা সম্ভব হত না। এইভাবে চলতে থাকল দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। অসম্ভব মানসিক এবং দৈহিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কেটেছে পুরো একটি বছর। রাত্রে স্টুডিয়োতে থাকাটা খুব কষ্টের মনে হত।

স্টুডিয়োতে একটি রাত্রির নিদারুণ বিভীষিকার অভিজ্ঞতা চির-দিনের স্মৃতি হয়ে রয়েছে। সেদিন আকাশের রঙ ঘন কালো সন্ধে থেকেই। মাঝে মাঝে সারা আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার দাপাদাপি। রাতের অধিবেশন শেষ হবার পর সহকর্মীদের সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করে এক নম্বর স্টুডিয়োর মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহটিকে বিছানায় এলিয়ে দিতেই চোখ জুড়ে এল গভীর ঘুম। স্বাস্থ্য ভালো, বয়স কম, অনিদ্রার ব্যাধিতে কখনো ভুগি নি। গাঢ় নিদ্রা কিন্তু হঠাৎ ভেঙে গেল। মনে হল খুব মৃদু নিশ্বাস যেন গায়ে লাগছে। সন্তর্পণে কেউ বিছানার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করছি। এখন আমি সম্পূর্ণ জেগে। অতি ক্ষীণস্বরে বলছে কেউ 'Touch me and give me life'। একটি হিমশীতল হাতের স্পর্শ। পড়িমরি করে উঠে স্টুডিয়োর বাতি যেই জ্বালিয়েছি দেখতে পেলাম আধবোজা দরজা দিয়ে অপস্রিয়মান কৃশতনু এক মেম-সাহেবের মূর্তি। কয়েক সেকেণ্ড, তার পর বুকফাটা এক আর্তনাদ কণ্ঠ থেকে বের হল, 'বাঁচাও, বাঁচাও।' ছুটে এল সবাই। রাত্রি-শেষের গভীর ঘুম ভেঙে গেল আমার এই অমানুষিক চিৎকারে। তখনো বোধ হয় ভয়ে কাঁপছিলাম। বয়সে বড়ো এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু মাথাটি কোলে নিয়ে বিছানায় বসলেন। আমার রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছেন?' ভয় পেয়েছিলাম, নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিলাম। সলজ্জ কণ্ঠে বললাম, 'স্বপ্ন দেখে নয়, জেগে থেকে দেখেই ভয় পেয়ে-

ছিলাম।' সকলের সঙ্গে কণ্ট্রোল রুমে চলে এলাম। আমার মুখে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে একজন বললেন যে প্রভাতবাবু সাহেবের প্রেতমূর্তি দেখে তিনতলার ঘর থেকে প্রাণপণে দৌড়ে নামতে গিয়ে সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিলেন বছর দুই আগে। কিন্তু ওটা ছিল সাহেব ভূত। মেমসাহেব ভূতের অস্তিত্ব এর আগে কেউ শোনে নি। কণ্ট্রোল রুমে চা তৈরি হল। চা খেতে খেতে এবং নানাজনের ভূতের অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে শুনতে রাত্রি প্রভাত হল। বাইরে একটু একটু ফর্সা হতে শুরু করেছে। ভূত দেখা আমার এই প্রথম এবং বোধ করি শেষ। মানুষের ভিড়ে ভূতদের শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে, নিজেদের ঠাঁই থেকে বেদখলও হচ্ছে। এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের লাগোয়া দক্ষিণে সেণ্টজন চার্চ। আদিতে কবরখানাই ছিল। চার্চ তৈরি হয়েছে পরে। 'হন্টেড্ হাউস' বলে এই বাড়িটির সামান্য প্রসিদ্ধিও ছিল বৈকি। যে কারণেই হোক সেদিন কিন্তু কলকাতা বেতারের প্রথম অধিবেশন হল না। সমস্ত যন্ত্র বিকল। শত চেষ্টাতেও কিছু আর ঠিক করা গেল না।

শিল্পী-ধর্মঘটের জের শেষ হল স্টেশন ডিরেক্টর সোমনাথ চিব্-এর বদলিতে— প্রভাতবাবু এবং সুনীলবাবুর বদলির মাসাধিক কাল পর। এই অফিসারটিকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল অল্প ক'দিন একটা খুব অশান্ত সময়ে। স্ট্রাইকের দরুন ওঁর মনটা যেন সর্বদা বিষণ্ণ দেখেছি। কোনো কাজ নিয়ে যখন অফিসে ওঁর ঘরে গিয়েছি খুবই ভদ্র ব্যবহার পেয়েছি। স্টিফেন হাউসের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। গিয়েছি সেখানেও, বোধ হয় চা-এর নিমন্ত্রণে। একজন 'জেন্‌টল্‌ম্যান' যা তখনো বিরল ছিল যেমন আজও। কিছু হার্দিক বিশালতাও নজরে পড়েছে এই পঞ্চনদের দেশের লোকটির মধ্যে। আগস্টের দাঙ্গার কালে আমার সহকর্মী বিমল চক্রবর্তীর মৃত শিশু-পুত্রের শেষকৃত্য সহজ হত না সিকিউরিটি গার্ডসহ রেডিয়োর গাড়িটি

এ কাজে ব্যবহার করতে অনুমতি না দিলে। মিস্টার চিব্ লাহোর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন রেডিয়োর চাকরিতে যোগ দেবার আগে। তিনি বগুড়ার মহম্মদ আলী সাহেবের কাছে ডিউটি রুমে আমার সামনেই দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে সরকার শিল্পীসঙ্ঘের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে আপস করলেন। মহম্মদ আলী তখন ছিলেন বাংলার অর্থদপ্তরের মন্ত্রী। দাঙ্গার সময় মন্ত্রীমহোদয়গণ মাঝে মাঝে বেতার মারফত শান্তিরক্ষার আবেদন করতেন। মহম্মদ আলী পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। সোমনাথ চিব্-এর মনে একটা দুঃখ থেকেই গিয়েছিল এবং সে-কারণেই যে মুহূর্তে সুযোগ পেলেন রেডিয়ো ছেড়ে দিলেন। সোমনাথ চিব্-এর জায়গায় এলেন কিন্তু একজন নয়, দুজন স্টেশন ডিরেক্টর।

আগুনে জুন মাসের এক সন্ধ্যায় দিল্লীর লোদী রোড থেকে হেঁটে নিজামুদ্দিনে বাড়ি ফিরছি। বাতাসে নিদারুণ লু'র হলকা। সঙ্গে আমার স্ত্রী। মোটরের হর্ন শুনে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে চললাম। বিরাট একটা গাড়ি পার হয়ে গেল। স্ত্রীকে বললাম, 'আহা, এই গাড়িটা যদি আমাদের একটা লিফ্‌ট দিত।' বলতে না বলতে ব্রেক কষার আওয়াজ। শুধু থামলই না গাড়িটা, ব্যাক্ করে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। পেছনের সীট থেকে জানলায় মুখ বাড়িয়ে ঢাকার ছেলে নজরুল ইসলাম গাড়িতে উঠে আসতে আহ্বান করলেন আমাদের দুজনকে। পাকিস্তান হাইকমিশনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিরাট ক্যাডিল্যাক গাড়ি। নজরুল ইসলাম তিন নম্বর সেক্রেটারি। এই বিরাট গাড়িতে বসে ইসলামকে বলেছিলাম যে এত বড়ো গাড়ির দুজন চালক হলে গতি হত দ্রুততর, চলা হত আরো সুষ্ঠু।

এমন একটা মনোভাব নিয়েই বোধ হয় বিচক্ষণ ভারত সরকার একজনের জায়গায় দুজন স্টেশন ডিরেক্টর আনালেন কলকাতা

কেন্দ্রের জন্য—মিস্টার গোপালন এবং মিস্টার অশোক সেন। মিস্টারই, শ্রী তখনো চালু হয় নি। কিন্তু বেশি দিন লাগল না, সাধারণত এমন ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তেমনি ঘটতে লাগল। মিস্টার গোপালন সিনিয়র, সেই হেতু স্টেশনের চার্জে তিনি! সব ব্যাপারে গোপালন সাহেবের কথাই শেষ কথা। অশোক সেন মশায়ও ঢাকা কেন্দ্রে ইতিমধ্যে স্টেশন ডিরেক্টর হিসেবে বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ক'দিনের মধ্যেই রেষারেষিটা আমাদের চোখে ধরা পড়ল। প্রশাসনিক ব্যাপারে গোপালন সাহেব বেশ পাকা লোক হলেও স্বভাবে মধুরতার অভাব ছিল। গলার আওয়াজ ছিল জোরালো কিন্তু কিঞ্চিৎ বেসুরো। ভালো কথাও রুক্ষ শোনাত, তার উপর বাংলা ভাষাটাও জানতেন না। অন্য দিকে অশোক সেন মশায় অতি মিষ্টভাষী বঙ্গসন্তান। চলনে বলনে একটি সর্বতোভদ্র রূপ। স্ত্রী বিদুষী এবং খুবই মিশুকে। স্টাফ এবং সংশ্লিষ্ট লোকের পক্ষপাতিত্ব সেন মশায়ের প্রতি। বাঙালির কুট বুদ্ধি এবং প্রয়োগ-কৌশলের সুচারু দক্ষতার ফলে গোপালন সাহেবকে কলকাতা ছাড়তে হল অল্পসময়ের মধ্যেই।

যে ক'দিন ধর্মঘট চলছিল শিল্পীরা নিজেরাই এলেন না রেডিয়োতে। দুমাস আগে সই করা চুক্তিপত্র বেতার-কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে একতরফা নাকচ করে দিলেন। ঐ দিনগুলোতে যাঁদের প্রোগ্রাম ছিল তাঁরা প্রোগ্রামের ফি পেলেন না। অসুবিধার মধ্যে পড়লেন শিল্পীরা। একেবারে উপরের অল্প কয়েকজনকে বাদ দিলে রেডিয়োর শিল্পীরা তখন মাত্র দশ, পনেরো বা কুড়ি টাকা ফি পেতেন এবং প্রোগ্রাম সাধারণত পেতেন তিন-চার মাস পর পর। একটা প্রোগ্রাম করতে না পারার অর্থ হল পরেরটার জন্য আবার তিন-চার মাস অপেক্ষা করা। অনেকে এসে একটু আড়ালে আমাদের বললেন যে স্ট্রাইক করার আগে তাঁদের জানানোই হয় নি। কয়েকজন এমনও

দেখেছি যাঁরা ধর্মঘটের সময় রেডিয়োর নিন্দায় অতিশয় সোচ্চার ছিলেন কিন্তু ধর্মঘট শেষ হতে-না-হতেই একটি প্রোগ্রাম পাবার জন্য যুক্তকরে বিনীত বিনয়ভূষণ।

ধর্মঘটের তিক্ততা খুব তাড়াতাড়িই দূর হয়ে গেল। শিল্পীমনে বিদ্বেষ বেশিদিন ঠাঁই পায় না। রেডিয়োরও শিল্পী ছাড়া চলে না। কিন্তু ধর্মঘট শেষ হবার পরেই বিধ্বংসী দাঙ্গায় নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল। নগ্ন প্রমত্ততা সপ্তাহ খানিক পর থেমে গেলেও গলি-ঘুপসির মারামারি লেগেই রইল। শিল্পীদের প্রাইভেট টিউশনি কমে গেল, রেডিয়োর প্রোগ্রাম হল না। বেশ অসুবিধা হল শিল্পীদের।

আমার পূর্ব-পরিচিত বিমলাদা একদিন দুপুরে এসে স্টুডিয়োতে উপস্থিত। বোধ হয় আগস্টের ২০।২২ তারিখ হবে। সেদিন রাত্রিতে ওঁর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতের দুটো সিটিং। খুবই রিস্‌ক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। রাস্তায় বের হওয়া তখনো নিরাপদ নয়। এদিকে আমাদের নিজস্ব যন্ত্রীরা কেউ অফিসে আসেন নি। সংগীত বিভাগ থেকে প্রোগ্রাম হবে না বলে দিয়েছে। বিমর্ষ বদনে বিমলাদা আমার ঘরে এসে বসলেন। বেশ কিছুকাল পর ওঁকে দেখে আমার খুব ভালো লাগল।

বিমলাদার সঙ্গে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন ঐ সংগীত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বিমল চক্রবর্তী হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে ঢুকে বিমলাদাকে দেখতে পেয়ে বললেন যে তিনি সারাটা বাড়ির উপর-নীচ করছেন বিমলাদার জন্য। সহৃদয়তার সঙ্গে বিমলাদাকে বললেন, 'ভালোই হল যে চলে যাস্‌ নি। তোর প্রোগ্রামটা রেকর্ড করে নেবার একটা চেষ্টা করছি। এত অসুবিধার মধ্যে এসে পড়েছিস্‌, রেকর্ড করা যাবে না বলে দিয়ে আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। তবে তানপুরা নিজেই বাজাবি; তবলা পাওয়া যাবে না, বাজাবার লোক নেই।'

আমার দিকে তাকিয়ে বিমলাদা বললেন, 'কেন, এ তবলা বাজিয়ে দেবে।'

আমার তখন বিপন্ন অবস্থা। বিমলাদার সঙ্গে তবলা বাজাবার এলেম নেই আমার। তবু বিমলদার মুখের দিকে তাকিয়ে রাজী হয়ে গেলাম।

রেকর্ড হবে এই আশ্বাস পাবার পর বিমলাদার মুখের হাসিটি বড়ো স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। রেকর্ডিং-এর পর চেক হাতে পেয়ে চুপি চুপি আমায় বলেছিলেন, 'ভাই, এই টাকাটার বড়ো প্রয়োজন ছিল। এ মাসে এখনো ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কিছুই পাই নি।'

বিমলাদার সঙ্গে তানপুরা বাজাবার আর-একজনের ব্যবস্থা হয়েছিল; নিজের হাতে তো তানপুরা ছিলই। উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান বলেই এত কম যন্ত্রের সহযোগিতায় এই রেকর্ডিং সম্ভব হল। কিন্তু লঘু সংগীতের ক্ষেত্রে তার উপায় ছিল না। মাঝে-মধ্যে লঘু সংগীতের শিল্পীরাও এসে পড়তেন। রেডিয়োর নিজস্ব শিল্পীরা অর্থাৎ স্টাফ আর্টিস্ট যন্ত্রীরা না আসতে পারায় প্রায় দুতিন সপ্তাহ লঘু সংগীতের কোনো অনুষ্ঠানই প্রচার করা সম্ভব হল না।

এই সময়ে একটি করুণ মৃত্যু আমাদের মনকে দারুণ শোকাচ্ছন্ন করে দিল। মৃত্যু ছিনিয়ে নিল ইন্দু সাহাকে আমাদের মধ্য থেকে। চব্বিশ পঁচিশ বছরের স্বাস্থ্যবান দীর্ঘদেহী তরুণ। আমাদের ঘোষক। ঢাকার ছেলে, এই কিছুদিন আগেই কলকাতা রেডিয়োতে যোগ দিয়েছেন। দক্ষ অভিনেতা। ঢাকার রঙ্গমঞ্চে রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর পাশেই ইন্দু জায়গা করে নিয়েছিলেন। আর রেডিয়ো-নাটকেও কলকাতায় খুব নাম হয়েছে। আওয়াজ বলিষ্ঠ, গম্ভীর, সুরেলা। মৃত্যু যে এত কাছে এসে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল এক মুহূর্ত আগেও জানতে পারেন নি ইন্দু।

সন্ধ্যার ঘোষণার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। রাত্রের শিফটে

যাঁদের ডিউটি সেই ঘোষকেরা এসে গেছেন স্টুডিয়োতে। রাত পৌনে ন'টা নাগাদ এক স্টাফ আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফেরার জন্য স্টুডিয়োর গেট থেকে বের হয়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন ইন্দু। মিনিট পনেরো বাদে ইন্দুর সেই বন্ধু প্রাণপণে দৌড়তে দৌড়তে স্টুডিয়োর গেটের সামনে এসে পড়ে গেলেন। সকলে মিলে ওঁকে ধরে তুলে বসালো। ইন্দুর বন্ধু হাঁফাচ্ছেন আর বলছেন 'ইন্দুকে মেরে ফেলেছে'। তাঁর অসংলগ্ন কথা থেকে অতি কষ্টে উদ্ধার করা গেল যে লাট-ভবনের কাছে ড্রাইভার এবং তার সঙ্গের লোকটি ইন্দুকে আর তাঁকে অতর্কিতে ছুরি বের করে আক্রমণ করে। রাস্তা একেবারে জনশূন্য। লোক-চলাচল গাড়ি-ঘোড়ার আসা যাওয়া প্রায় সন্ধের পরই বন্ধ হয়ে যেত সেই সময়টায়। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে প্রাণভয়ে দুজনই দরজা খুলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েন। ইন্দু ডান দিকে রাস্তার ওপর পড়ে যান আর তৎক্ষণাৎ পেছন থেকে দ্রুতগামী একটি গাড়ি ইন্দুর দেহের উপর দিয়ে চলে যায়। তাঁর কোনো আঘাত লাগে নি। ইন্দুকে ওঠাবার চেষ্টা করে কোনো সাড়া না পেয়ে দৌড়ে এসেছেন স্টুডিয়োতে খবর দিতে।

রাইফেলধারী দুটি গার্ড সহ স্টুডিয়োর একটি গাড়িতে ইন্দুর বন্ধুকে নিয়ে কয়েকজন তক্ষুণি বেরিয়ে গেল। স্পন্দনহীন দেহটিকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। পরীক্ষা করে ডাক্তাররা ওঁকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন।

'ডিরেক্ট অ্যাকশন'-এর ডিরেক্ট না হলেও ইনডিরেক্ট একটি বলি। ইন্দুর এই আকস্মিক নিষ্ঠুর মৃত্যুতে দুঃখে বেদনায় অভিভূত হয়ে গেলাম। সমস্ত অফিসে একটা বিষাদের কালো ছায়া। শোকার্ত শুধু আমরা নই, ওঁরাও। সত্যি বলতে কি ওঁদের মুখেও বিষণ্ণ বেদনার যে ছবি দেখেছি সেটা কৃত্রিম মনে হয় নি। অফিসে, স্টুডিয়োতে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর মতো কাজ করতে করতে

'আমরা' আর 'ওঁরা' এমন একটা বিভেদের মানসিকতা কখনো প্রকাশ পায় নি। এর কারণ বোধ হয় রেডিয়োর কাজেরই বৈশিষ্ট্য। ধর্ম বা ভাষার পার্থক্য চারুকলা-শিল্প-ক্রীড়া-সংগঠনে সাধারণত বিদ্বেষ সৃষ্টিতে সক্রিয় হয় না। তিলমাত্র বিদ্বেষ ছড়ায় নি অফিসে যদিও হাওয়ায় ছিল 'লড়কে লেঙ্গে'-র হুমকি।

ইন্দুর মৃত্যুতে রেডিয়ো হারালো একজন ভালো ঘোষক এবং নাটকের শিল্পীকে। পুলিস কি করবে? কলকাতায় তখন চার দিকে এত মৃত্যু প্রতিদিন যে পুলিসের পক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ইন্দুর মৃত্যু আমাদের প্রত্যেকের মনে একটা ভীতিরও সৃষ্টি করল। আমরা আসতে শুরু করলাম বেশ তাড়াতাড়ি, সকলে সাড়ে আটটার মধ্যেই, আর দিনের কাজ শেষ করে সন্ধের আগেই বাড়ি ফেরবার চেষ্টা করতাম। কোনো প্রোগ্রামের কাজ যদি শেষ না হত, তা হলে রাত্রে অফিসে থাকবেন যে দুই সহকর্মী তাঁদের ওপর অসমাপ্ত কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে বেলাবেলি বাড়ি চলে যেতাম। নিজেদের মধ্যে এই বোঝাবুঝি ছিল। তবে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে লাগল।

ফি কম হলেও সে-সময় শিল্পীদের প্রোগ্রামের জন্য নির্দিষ্ট দিনে দুবেলা আসতে হত। তখন ছিল 'লাইভ' প্রোগ্রাম, আগে থেকে রেকর্ডিং করে নেবার ব্যবস্থা ছিল না। শিল্পীরা কেউ আসতেন শ্যামবাজার থেকে, কেউ হাওড়া, বালি, কেউ বা টালা, টালিগঞ্জ থেকে। একবার সকালে আবার সন্ধেয়। এই যে এত সামান্য ফি সেটা বাড়াবার জন্য শিল্পীদের কোনো আন্দোলন কখনো দেখি নি। গত পঞ্চাশ বছরে তিনবার ফি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কোনোবারই শিল্পীদের প্রয়াসের ফলে নয়। কলকাতার শিল্পীদের মতো এমন অসহায় অবস্থা আমি দেশের অন্য কোনো অঞ্চলে দেখি নি। জীবনের কাছে এই যে মার খাওয়া এর বিরুদ্ধে কোনো একতাবদ্ধ জোরদার

সংগঠন এঁরা কখনো গড়ে তুলতে পারেন নি একাধিক প্রয়াসের পরও। যে সংস্থা হঠাৎ সক্রিয় ভূমিকা নিল ছেচল্লিশের আগস্টে সেটা রিকেট্স্-এ আক্রান্ত হয়ে গেল একতার পুষ্টিলাভ না করে। সংগঠন না থাকলে সমাজের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যায় না।

ছেলের জন্মদিন, একটু গানের আয়োজন তো হওয়া চাই। পাড়ার এক উঠতি শিল্পীকে বলে পাঠালেন ছেলের বাপ, সন্ধের পর যেন গান শুনিয়ে যায়। মিত্রবাবুর স্বুবর্ণ-বিবাহবার্ষিকীতে ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূ নাতি-নাতনীরা সামান্য আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করেছে। সেখানেও গান চাই। পুত্রবধূর ন'মাসীর পরিচিত এক শিল্পীকে ডাকা হল। জন্মদিনে, বিবাহবার্ষিকীতে, গৃহপ্রবেশের শুভদিনে যে উৎসব হয় তার জন্য ডেকরেটরকে টাকা দিতে হয়, ফুল ও মালা কিনতে টাকা চাই, আর মাধবচন্দ্র দাশের দোকান থেকে দুর্মূল্য দই, মিষ্টিও কিনতে হচ্ছে। শিল্পী যে বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে নিয়ে এলেন তার রিক্সা ভাড়াটাও পেলেন না। গানের জন্য টাকার কথা তো দূরের কথা। সন্ধ্যা-আরতি-হেমন্ত মুখোপাধ্যায়দের কথা আলাদা। এই-সব উৎসবে এঁরা আসেন না, এলেও উপযুক্ত দক্ষিণার বিনিময়ে, যেটা একটা মোটা অঙ্কের টাকা। কিন্তু উঠতি সাধারণ শিল্পী কেন এই-সব উৎসবে গাইবার জন্য টাকা চাইবেন? সংগীত, শিল্প-সাধনার প্রয়াসকে আর্থিক উৎসাহ দেবার যাদের সামর্থ্য আছে তাদের প্রায় সবারই এই মনোভাব। আমি জানি অবস্থাটা মধ্য-চল্লিশে যতটা খারাপ ছিল আজ তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কতটুকু? সাধারণ ডাক্তারকে ফি দিতে হয়, উকিলের কাছে গেলেও টাকা দিতে হয়। তা হলে শিল্পী কেন গান পরিবেশনের বিনিময়ে মূল্য দাবি করতে পারবেন না?

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকের কথা। মেজর রঞ্জিত সেন এক সন্ধ্যায় নিজামুদ্দিনে আমার বাড়িতে এলেন। খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাব।

বললেন বসবার সময় নেই। এক বাঙালি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি থেকে তিনি আসছেন এবং মন্ত্রীমহোদয়ের গাড়িতেই। আমাকে এখনই যেতে হবে মন্ত্রীমহাশয়ের বাড়ি। আমার তো আর আনন্দের সীমা নেই। মইয়ের নীচের ধাপে রয়েছি কর্মক্ষেত্রে। মন্ত্রী—ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্মরণ করেছেন, আমি প্রায় আত্মহারা। জিজ্ঞাসা করলাম আমার মতো অধমকে মন্ত্রীবাহাদুরের স্মরণ করার হঠাৎ কী কারণ উপস্থিত হল। আমি তো ওঁর ডিপার্টমেন্টে কাজ করি না। রঞ্জিত সেন জানালেন যে মন্ত্রীমশায়ের গৃহে একটা অনুষ্ঠান হবে। প্রধানমন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন। সেই উপলক্ষে একটু গান-বাজনার আয়োজন করার ইচ্ছে। তাই আমাকে দিয়ে কয়েকজন শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানাবেন।

বললাম, 'অতি সাধু প্রস্তাব। আমি অলক গাঙ্গুলি, কে. এল. অগ্নিহোত্রী আর শান্তি মাথুরকে কাল অফিসে গিয়ে বলে দেব। এক-একজনকে একশো টাকা করে দিলেই হবে। দেখব এর বেশি যেন না চান ওঁরা। জানেনই তো যে এঁরা খুব জনপ্রিয় শিল্পী দিল্লীতে।'

রঞ্জিত সেন জিবে কামড় দিয়ে বললেন, 'কি পাগলের মতো কথা বলছ ভাই? তিনি টাকার কথা ভাবতেই পারবেন না।'

আমার উত্তর, 'টাকা দেবেন না, দেবেন না। কিন্তু ভাবতেও পারবেন না এমনই কঠিন বিষয়? তিনি কি শিল্পীদের ভালোবাসেন? এঁদের ভালো-মন্দ নিয়ে মন্ত্রীমশায়ের কি কখনো ভাবনা হয়? তিনি পশ্চিম দেশে গিয়েছেন। সে দেশের রীতিনীতি দেখা এবং জানা আছে ওঁর। ফ্রি সার্ভিস কেন আশা করবেন তিনি?'

আমার বক্তব্যটা রঞ্জিত সেন মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে নিবেদন করেছিলেন। পরে শুনেছি গানের আইটেমটা বাতিল করা হয়েছিল।

এবার কালটা ১৯৭০। স্থান কলকাতা বেতার-কেন্দ্র। স্টেশন ডিরেক্টর পি. ভি. কৃষ্ণমূর্তির তলবে ওঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম তিন-চারজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বসে আছেন। পরিচয় করিয়ে দিয়ে স্টেশন ডিরেক্টর বললেন এঁরা এসেছেন একটি বিশেষ অনুরোধ নিয়ে এক হাসপাতালের তরফ থেকে। হাসপাতালেরই ডাক্তার ওঁরা। এঁরা একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এবং সেজন্য আরতি মুখোপাধ্যায়কে চাইছেন। কিন্তু কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবেন না। জানতে চাইলাম এই সরকারি হাসপাতালের কোনো যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য কিংবা বেড্-সংখ্যা বাড়াবার প্রয়োজনে অর্থ-সাহায্যের প্রয়াস কিনা। ন্না, তা নয়। তেমন প্রয়োজনে সরকারই টাকার ব্যবস্থা করে থাকেন। শুনলাম প্রতিষ্ঠা-দিবস জাতীয় কিছু একটা হচ্ছে। তার জন্য মোটা টাকার বাজেট করা হয়েছে। শামিয়ানা, ডেকরেশন, আমন্ত্রণলিপি ছাপানো, অতিথি আপ্যায়ন সব কিছুর জন্যই ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কিন্তু আর্টিস্ট চাই বিনি পয়সায়। আর এমন আর্টিস্ট -- যিনি দেশের সেরা। আমার এই খুঁটিনাটি জানতে চাওয়ায় ওঁরা একটু বিব্রত বোধ করলেন। কৃষ্ণমূর্তি সাহেব খোলাখুলিই বললেন যে আরতি মুখোপাধ্যায়কে ফ্রি গাইতে আমরা অনুরোধ করতে পারি না। শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে এবং সেটা স্বাভাবিক। রেডিয়োতে শিল্পীরা ফ্রি গান না। কৃষ্ণমূর্তি জানালেন যে এই হাসপাতালে শিল্পীদেব চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো বিশেষ সুবিধা যদি দেওয়া হয় তবে আরতি মুখোপাধ্যায়কে আমরা ফ্রি গাইতে রাজী করাবার চেষ্টা করব। এই প্রস্তাবটি ডাক্তারবাবুরা গ্রহণ করলেন না। দেখা যাচ্ছে শিল্পীকে ন্যায্য পারিশ্রমিক না দেবার মনোভাবটি এই সেদিনও ছিল।

কলকাতার শিল্পীদের ফি এত কম ছিল যে তা নিয়ে একবার বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল আমায়। দিল্লীর এক্স্টার্নল্

সার্ভিসে কাজ করি তখন। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে দিল্লীতে প্রোগ্রাম দেবার একটি প্রস্তাব আমি যথানিয়মে উপরের অফিসারদের কাছে পাঠালাম। প্রস্তাবে আরো কয়েকজন শিল্পীর নাম ছিল বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রের। প্রত্যেক শিল্পীর পাশে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং ফি উল্লেখ করা ছিল। মেজ অফিসারের কাছ থেকে স-মন্তব্য ফাইল ফিরে এল। এত কম টাকার শিল্পী সতীনাথের নাম প্রস্তাব করাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে মেজকর্তা অন্য আর-একজন শিল্পীর নাম দিতে বললেন। এতে আমারও আত্মসম্মানে একটু লাগল বৈকি! মেজকর্তার সঙ্গে এই প্রথম কাজ করছি। সতীনাথের নাম রেখেই ফাইলটি আবার পাঠিয়ে দিলাম মেজকর্তার কাছে বিনীত নিবেদন সহ যে ফি যাই হোক সতীনাথ একজন অসামান্য শিল্পী এবং অনুরোধ করলাম যে আমার প্রস্তাবটি যেন সর্বোচ্চ কর্তার কাছে পাঠানো হয়, কারণ তিনি এই শিল্পীর নাম শুনেও থাকতে পাবেন। প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে ফাইল ফিরে এল আমার কাছে। দেখলাম নতুন কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে মেজকর্তার আগের নোটের ওপর এবং মেজকর্তা যেন আমার প্রস্তাবই গ্রহণ করে ওপরে পাঠিয়েছিলেন এমনটাই দৃশ্যত প্রতীয়মান। কিন্তু মাঝে কিছু ব্যাপার ঘটেছিল। দ্বিতীয় দফা আমার নোট পেয়ে মেজকর্তা চটে গিয়েছিলেন এবং আমার নোটের ওপর তীব্র কোনো মন্তব্য লিখে নিজেই ফাইল নিয়ে খোদ কর্তার কাছে গিয়েছিলেন। খোদ কর্তার কাছে কাজ করেছি শিলং-এ। তিনি আমার মতামতের ওপর আস্থা রাখেন। মেজকর্তাকে কিছু না বলে তক্ষুণি কলকাতা স্টেশনে ট্রাঙ্ককল করলেন। লাইন পাওয়া গেলে মেজকর্তাই কথা বললেন। এর পর আগের লেখা নোটের ওপর নতুন কাগজ লাগিয়ে আমার প্রস্তাবই অনুমোদন করতে বাধ্য হলেন মেজকর্তা। ওঁর দোষ নেই। সুদূর দিল্লীতে বসে কি করে

জানবেন যে সতীনাথের বিখ্যাত সেই-সব গান— 'এ জীবনে যেন আর কিছু ভালো লাগে না', 'বালুকা বেলায়'— বেশ কিছুকাল আগেই গ্রামোফোন রেকর্ডে বের হয়ে শ্রোতার মন কেড়ে নিয়েছে। এর পরেও আছে। দিল্লীতে যাওয়া-আসার প্রথম শ্রেণীর ট্রেনের ভাড়া অনুমোদন করিয়ে নিতেও বেশ কয়েকবার ডি. জি.-র অফিসে মন্ত্রকে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল। এত সামান্য ফি-এর আর্টিস্টের জন্য প্রথম শ্রেণীর ভাড়া মঞ্জুর করিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল না। কিন্তু কেন ছিল এত কম ফি? একটা সুসংহত সঙ্ঘ গড়ে তুলতে পারলে সেই প্রতিষ্ঠানই সে-জিজ্ঞাসা রাখতে পারত। সতীনাথের ফি পরবর্তীকালে বেড়েছিল। কোনো শিল্পীসংস্থার প্রয়াসে অবশ্যই নয়। এমন একটি সংগঠন নিত্যকালের জন্য শিল্পীদের কল্যাণসাধন করতে পারত। ছেচল্লিশের আগস্টের পর ১৯৩৩ সনেও আবার শিল্পীরা সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু সে ইতিহাস পরে।

প্রথম যেদিন কলকাতা স্টেশনে কাজের ভার গ্রহণ করি সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে এখনো। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ট্রাম থেকে নেমে অফিসে আসতে আসতে কিছুটা ভিজে গিয়েছি। শার্ট এবং প্যান্টের ইস্ত্রি খানিকটা নষ্ট হয়েছে। প্যান্টের নীচে পায়ের কাছে কাদার ছিটাও কিঞ্চিৎ লেগেছে। অফিস বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে করিডর। এগিয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির পাশে প্রায় গলা-সমান উঁচু ছোটো একটি কাউন্টার। পেছনে মস্ত উঁচু চেয়ারে বসে আছে সুবেশ সুদর্শন এক যুবা। দেখেই মনে হল বাঙালি নয়, ভিন্ প্রদেশের। খুবই গুরুদায়িত্ব-ভার তার ওপর, হাবভাবটা সেরকম। তার চেয়ারের পেছনে ছোটো একটি বোর্ডের ওপর লেখা Studio Commissionaire। ভাবলাম লোকটির যেমন উচ্চাসন তেমনি পদটাও উচ্চকোটিরই হবে। অথচ শব্দটি আমার অপরিচিত। ঐ আসনে আরোহণ করাটাও একটা কসরত। শব্দটার বানান

করাটাও একটা সেরিব্র্যাল এক্সারসাইজ। মনে হল রেডিয়োর কর্মজীবনের প্রবেশপথেই প্রথম হোঁচট খাওয়া। কিন্তু দোতলায় উঠবার ছাড়পত্র ঐ লোকটির কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। আস্তে আস্তে কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গেলাম। মুখ তুলে সেই যুবা নিখুঁত উচ্চারণে বলল, 'Yes, what can I do for you?' জানালাম যে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ইতিমধ্যে আমার বৃষ্টি-ভেজা ভাঁজ-নষ্ট পোশাকের ওপর লোকটির ঘন ঘন নজর পড়ছিল। তার গম্ভীর উত্তর পেলাম প্রভাতবাবু এখন মিটিং-এ ব্যস্ত। করিডরে রাখা চেয়ার দেখিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। চার-পাঁচ মিনিট পর ওর কাছে আবার গিয়ে বললাম যে স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গেই দেখা করতে চাই। একটি স্লিপে আমার নাম লিখে দেখা করার উদ্দেশ্য জানতে চাইল। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি মেলে ধরলাম। Commissionaire-এর বিব্রত ভাবটা উপভোগ করার লোভ হলেও স্বাভাবিক কারণেই সংবরণ করতে হল। তাড়াতাড়ি উচ্চাসন থেকে নেমে অভিবাদন জানিয়ে সিঁড়ির ওপরে ওঠার রাস্তা দেখিয়ে আমার পেছনে আসতে লাগল।

এই পোস্ট উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নামটা ছিল খুবই গালভরা। ভদ্রঘরের যুবক আকৃষ্ট হত এই নামটারই মোহে। বাঙালি উচ্চারণে জিলার মাজেস্টরেরও উপরের পদ। আমার জানা এক বিদুষী কন্যার বিশিষ্ট পিতা এই নামটার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। আর-একটা পোস্ট স্টুডিয়ো এগ্‌জিকিউটিভ, খুবই ধ্বনি-সমৃদ্ধ নাম। স্টুডিয়োর প্রোগ্রাম বা ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত নয়। উপরের দিকে আর-একটা পোস্ট প্রোগ্রাম সুপারভাইজার। কিন্তু প্রোগ্রামের পরিকল্পনা, পরিচালনা বা প্রযোজনার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না।

রেডিয়োতে এসে প্রথমে সংগীতবিভাগে যুক্ত ছিলাম। একটা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছিল অডিশন নেওয়া। রেডিয়োতে গাইবার আবেদনপত্র আসত অসংখ্য। সেই সময়েও সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন অডিশন নেওয়া হত। অডিশনের জন্য তখন কোনো ফি লাগত না আজকের মতো। অফিসারদের মধ্যে যাঁদের সংগীতে পাণ্ডিত্য ছিল তাঁদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হত। বাইরে থেকে কাউকে এই কমিটির সভ্য হিসেবে আনা হত না। এই কমিটির যোগ্যতা এবং বিচারের নিরপেক্ষতা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন কখনো উঠেছে বলে মনে পড়ে না। ভালো যাঁরা গাইতেন তাঁরা পাস করে যেতেন। ভালো নয় এমন শিল্পী, যাঁদের কণ্ঠ বেতারের অনুষ্ঠানে আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাঁরা নির্বাচিত হতেন না। পক্ষপাতিত্ব কেন হবে? কোনো অফিসারের ছাত্র-ছাত্রী ছিল না তো। টিউশনি করার সময় কোথায়? আর সে অনুমতি ছিল না কোনো সরকারি কর্মচারীর। সেকালের যাঁরা নামী শিল্পী সবাই এই অফিসিয়াল অডিশন কমিটি দ্বারাই অনুমোদিত হয়েছিলেন। শিল্পী নির্বাচনে বেশ কড়াকড়িই ছিল। সম্পূর্ণরূপে রেডিয়োর জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হলে কাউকে অডিশন পাস করানো হত না। কিন্তু গান গেয়ে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন যিনি রেডিয়োর শিল্পী নন? তবে কড়াকড়ি ছিল।

লম্বায় ছ'ফিটের ওপর এক তরুণ এসে প্রণাম করলেন একদিন। খুশি উপচে পড়ছে সারা মুখে। জানালেন যে তিনি অডিশন পাস করার চিঠি পেয়ে গেছেন। আমার সংগীতবিভাগে আসার আগে নাকি কয়েকবারই অডিশনে ফেল করেছিলেন। বুঝতে পারলাম না কৃতজ্ঞতা কেন আমার প্রাপ্য। অডিশন কমিটি একমত হয়েই শিল্পী নির্বাচন করেছেন। আমার বড়ো প্রিয় এই শিল্পী আজকের

প্রখ্যাত দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। দ্বিজেনের কাছ থেকে কর্মজীবনে খুবই সহযোগিতা পেয়েছি।

রেডিয়োতে প্রতিদিন রুটিন-মাফিক মিটিং হয় একটা, নাম প্রোগ্রাম মিটিং। গতকালের অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা এবং আগামী-কালের অনুষ্ঠান যথাযথ প্রস্তুত আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয় এই মিটিং-এ। যে অনুষ্ঠানগুলি প্রচার হয়ে গেল গতদিন তার মূল্যায়ন এবং অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে তার সমালোচনা করা হয়। প্রযোজনার দুর্বলতার জন্য কৈফিয়ত চেয়ে পাঠান স্টেশন ডিরেক্টর। পাশ কাটিয়ে যাওয়া খুবই মুশকিল। কি করলে একটি অনুষ্ঠান আরো ভালো হতে পারত তারও আলোচনা হয়। বিভাগীয় প্রোগ্রাম অফিসারকে এক দক্ষ সমালোচক-মণ্ডলীর মুখোমুখি রোজ দাঁড়াতে হয়। দশ মিনিটের কথিকা যদি আধ মিনিটও কম-বেশি সময় নেয় তা হলেও ভালো রিহার্সাল হয় নি বলে অভিযোগ ওঠে। দশ মিনিটের কথিকায় কতগুলি শব্দ থাকবে পড়ার গতি পরীক্ষা করে ঠিক করতে হবে। শব্দ-সংখ্যা গুনে বক্তাকে দিয়ে বার বার পড়িয়ে নিতে হবে। যে সময়ের কথা বলছি তখন কোনো অনুষ্ঠান সাধারণত আগে রেকর্ড করে নেওয়া হত না। 'লাইভ ব্রডকাস্ট'— পড়বার সময় গতি কমে গেলে কার্ডবোর্ডে লেখা একটি অনুরোধ বক্তার চোখের সামনে তুলে ধরা হত আরো একটু তাড়াতাড়ি পড়ার জন্য। গতি কমাবার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হত। ঠিক মতো পড়া শেষ হলে তবে নিশ্চিন্ত। প্রায়ই কথিকা বেতারস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বাড়ি যেতে পারতাম না। আমার তিন বছরের মেয়ে বলত 'টক্' (talk) মানে দেরি করে বাড়ি ফেরা। অর্থাৎ বাড়ি ফিরতে দেরি দেখলে আমার মেয়ের প্রশ্নের জবাবে স্ত্রীর উত্তর ছিল আজ 'টক্' আছে।

রেডিয়োতে যাঁরা বলতেন তাঁদের অনেকেই একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বলা শেষ করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের কাছে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া গেছে। রিহার্সালে আসতে কখনো কেউ আপত্তি করতেন না। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, এই-সব বাঘা বাঘা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই আসতেন রিহার্সালে। কিন্তু একটি কথিকার জন্য দক্ষিণা কত কম ছিল তখন। প্রয়োজন-মত স্ক্রিপ্‌টে সামান্য পরিবর্তন করে নিতেও কেউ আপত্তি করেন নি। ব্রিটিশ আমল। বাধানিষেধ কড়াকড়ি একটু তো ছিলই তখন। নিজের বেতারভাষণ যাতে নিখুঁত হয় প্রত্যেকে সেজন্য বিশেষ যত্ন নিতেন।

মনে পড়ে পরিমল গোস্বামী ছিলেন এ-ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে। এই শব্দটি পরিবর্তন করছেন, ঐ বাক্যটিও একটু অন্যভাবে লিখলেন, তার পর অনেকবার পড়ে নিলেন। প্রচারের সময় পাড়াটা হল অনবদ্য। কোনোদিন সময়ের এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় নি। কথিকাটি পড়বার সময় একজনকে বক্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্য করতে হত। একটি পাতা পড়া শেষ হয়ে গেলে পিসবোর্ডে পিন-আঁটা দ্বিতীয় পাতাটি বক্তার হাতে এগিয়ে দিতে হত। পরিমল গোস্বামীর বেলায় এ কাজটা খুব সহজ ছিল না যেদিন তিনি কৌতুকময় কিছু বলতেন। কি অসাধারণ হাসির কথাও তিনি কত অনায়াসে বলে যেতে পারতেন। ওঁর চোখ মুখ সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। কিন্তু পাশে দাঁড়ানো মানুষটিকে মুখে রুমাল গুঁজে অতিকষ্টে হাসি চেপে রাখতে হত।

নতুন বক্তাকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে বিপদেও পড়তে হয়েছে। ইউনিভার্সিটির এক নামী অধ্যাপক বলবেন নিজেরই সাবজেক্টে। অনেকবার পড়িয়ে নেওয়া হল স্ক্রিপ্‌ট্। রিহার্সালে ঠিক সময়

মেপেই শেষ করলেন পড়া। কিন্তু স্টুডিয়োর লালবাতিটি যেই জ্বলে উঠল নিঃশব্দে দৌড়ে স্টুডিয়োর দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। 'লাইভ' স্টুডিয়ো। বক্তার পাশে দাঁড়ানো সাহায্যকারী অফিসারটির কোনো কথা বলবার উপায় নেই। সময়ও পাওয়া গেল না কিছু বলার বা বাধা দেবার, এত দ্রুতগতি স্টুডিয়ো থেকে বের হয়ে গেলেন বক্তা। কাঁচের জানলা দিয়ে পাশের স্টুডিয়ো থেকে ঘোষক ব্যাপারটা দেখতে পেলেন। অনিবার্য কারণবশত অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হল না বলে ঘোষক গ্রামোফোন রেকর্ড বাজালেন। কিন্তু ভদ্রলোক গেলেন কোথায়? ডিউটি-অফিসার এসেও অনুসন্ধানে যোগ দিলেন। কিন্তু কি হল ভদ্রলোকের! সাত-আট মিনিট পর দেখা গেল তিনি টয়লেট থেকে বের হয়ে আসছেন।

গানের শিল্পীর ক্ষেত্রেও দু-একবার অঘটন ঘটেছে। আমার গানের গুরু একটি নার্ভাস লোক। স্টুডিয়োর ভিতরে কখনো সহজ বোধ করতেন না। একবার স্টুডিয়োর লালবাতি জ্বলে উঠবার পর গান শুরু করতে-না-করতেই লক্‌-জ (lock jaw) হয়ে গেল। অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন তো ঘটলই, ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যেতে হল মাস্টারমশায়কে। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য সেতারীর কথাও বলতে হয়। মিঠে হাত এবং পরিচ্ছন্ন বাজনার জন্য খুবই জনপ্রিয়। স্বভাব-শিল্পী, খুব তালিমের বাজনা মনে হয় নি। কিন্তু আঙুলের গতি স্বচ্ছন্দ সাবলীল এবং অপেক্ষাকৃত ছোটো সেতারে সুস্পষ্ট ধ্বনির মায়াজাল বুনতে পারতেন। একদিন স্টুডিয়োতে বসে প্রোগ্রামের আগে তবলিয়ার সঙ্গে রিহার্সাল করে কিছু সময় তখনো বাকি রয়েছে দেখে ক্যান্টিনে গেলেন। চা-এর সঙ্গে একটা বড়ি মুখে দিয়ে চোখ বুজে বসে রইলেন। প্রচারের সময় পার হয়ে গেল। হাতে ঘড়ি ছিল। কিন্তু লক্ষ্মণবাবুর চোখ তো বন্ধ। এদিকে তখন স্টুডিয়োতে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেছে। পাওয়া গেল না শিল্পীকে। ডিউটি-অফিসার

বা ঘোষক কি করে জানবেন যে লক্ষ্মণবাবু ক্যান্টিনে আরাম করছেন চোখ বুজে! খানিকক্ষণ বাদে বেজারমুখে সেতারটি হাতে নিয়ে উপরে আমার ঘরে এসে শিল্পী বলে গেলেন যে পরের বার এমনটা আর হবে না। অভাবগ্রস্ত শিল্পীর ফি-এর টাকা তো মারা গেলই উপরন্তু অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতির জন্য তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হল। কৈফিয়তের মুসাবিদা অবশ্য আমাকেই লিখে দিতে হল। বিনা নোটিসে অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে শিল্পীর কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হত সে সময়, এমন-কি, মেডিকেল সার্টিফিকেটও।

দারুণ প্রতিশ্রুতি ছিল এমন আর-একজন শিল্পী একদিন ট্যাক্সি করে অনুষ্ঠানের বেশ আগে পৌঁছেও সময়মত স্টুডিয়োতে গিয়ে সেতার বাজাতে পারলেন না। কম-বয়সীদের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে ভালো বাজাতেন ভোম্বলবাবু (অমিয়রঞ্জন ভট্টাচার্য)। সেতারটি স্টুডিয়োতে রেখে বাইরের দোকান থেকে একটি পান কিনে মুখে দিয়ে লালদিঘির পারে বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে যখন এলেন সময় পার হয়ে গিয়েছে। এমন সম্ভাবনাময় শিল্পী সেযুগে বেশি ছিল না। যৌবনেই একটি প্রতিভা বিদায় নিল।

বিনা রিহার্সালে কোনো অনুষ্ঠানই আকাশে যাবে না এই ছিল কড়া নির্দেশ। গানের বেলায় প্রতিটি অনুষ্ঠানের সুপারভাইজার ছিল। শুধু যে যন্ত্রের সঙ্গে ভালো করে অনুশীলন হত তা নয়, প্রতি গানের মুখ শুনে নিয়ে সুপারভাইজার মিউজিক কম্পোজ করে দিতেন। বর্তমানের মিউজিক কম্পোজারের পদটি এই কাজের জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল, অফিসে বসে কাজ করার জন্য নয়। অধুনা-বিখ্যাত শিল্পী অলকনাথ দের পিতৃদেব তারকনাথ দে, সুরেন পাল, বঙ্কিম পাল, গৌর গোস্বামী, অমিয় অধিকারী, সুধীর মুখোপাধ্যায় এঁরা তখন মিউজিক কম্পোজার হিসেবে নীচে স্টুডিয়োতে সংগীতশিল্পীর জন্য সুন্দর সুন্দর যন্ত্রসংগীতের ধুয়া রচনা করতেন। অবশ্য লাইট

মিউজিকের জন্য। প্রোগ্রাম চালু অবস্থায় পাশের ছোটো স্টুডিয়োর জানলায় দাঁড়িয়ে ইশারায় বা অঙ্গুলিনির্দেশে সুপারভাইজার যন্ত্রীদের বাজনা নিয়ন্ত্রিত করতেন। বাজনা বাড়ানো কমানোর জন্য বিশেষ বিশেষ মুদ্রা ব্যবহার করতেন সুপারভাইজারগণ।

একবার কারুর অনুপস্থিতিতে বাইরের একজন উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ-শিল্পীকে সাময়িকভাবে সুপারভাইজার পদে নিয়োগ করা হল। এইরকম যন্ত্রীদের উদ্দেশে মুদ্রা দেখাতে গিয়ে সেই অস্থায়ী সুপার-ভাইজার এক ঝামেলা সৃষ্টি করলেন। গান গাইছেন সেদিনের বিখ্যাত এক মহিলা শিল্পী। সমস্ত ভারত-জোড়া তাঁর খ্যাতি। গ্রামোফোন রেকর্ড ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। একটি দুটি সিনেমাতেও পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন। অনভিজ্ঞ সুপার-ভাইজার ঘন ঘন দুহাত মুঠো করে নানা মুদ্রায় যন্ত্রীদের বাজনা মৃদুতর করবার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। শিল্পী সেই-সব মুদ্রায় কি ইশারা দেখলেন? রাত তখন প্রায়ে সাড়ে আটটা। তিনতলায় আমার ঘরে বসে কাজ করছিলাম। হঠাৎ সিঁড়িতে চার পায়ে কোনো প্রাণীর বেয়ে উঠবার শব্দ পেলাম। এই ব্যাক্-গ্রাউণ্ডে 'দাদা আছেন নাকি, দাদা আছেন নাকি' এই ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি বের হয়ে দেখি সেই সুবিখ্যাত শিল্পী উপরে উঠছেন প্রায় হামা দিয়ে। তখন তিনি একটু মোটাই হয়ে গিয়েছিলেন। দুই চোখের জল এসে নাকের জলের সঙ্গে মিশেছে। কান্না-ভরা গলায় বলতে লাগলেন, 'দাদা, আমি আজও পর্যন্ত সতী রয়ে গেছি। ঐ ইতর লোকটি আমাকে এমন কুৎসিত ইঙ্গিত করল। আমি বিচার চাই দাদা।' ব্যাপারটা তখনো কিছুই জানি না। ওঁকে আশ্বস্ত করে চেয়ারে বসালাম। বললাম, 'আপনি এত বড়ো মানী শিল্পী, আমাদের গৌরব। কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে রেডিয়োর পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি।' এত সহজ সরল মানুষ। গানের সময়

শাহজাদী, অন্য সময় একটি শিশুর মতো। কান্না থামল। গানের এবং অভিনয়ের অনেক কাহিনী শুনিয়ে হাসিমুখে নীচে নামলেন। পরে যন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা মালুম হল।

অনুষ্ঠান প্রচারে বাধাবিঘ্ন বা কোনো অসুবিধার কারণ ঘটলে, তা যান্ত্রিকই হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক, পরের দিনের প্রোগ্রাম মিটিং-এ তার খুঁটিনাটি আলোচনা হবে। নিজের কোনো ভুলভ্রান্তি হলে পরের দিন মিটিং-এ পিঠে ছালা বেঁধে দুরু দুরু বক্ষে বলির পাঁঠার মতো যাওয়া। একদিন শেষরাত্রে আমার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম দারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে কেউ এসেছে। দরজা খুলে দেখি এক সহকর্মী প্রোগ্রাম অফিসার দাঁড়িয়ে। চুল উস্‌কো-খুসকো, অবিন্যস্ত পোশাক। মুখের পাইপ থেকে ঘন ঘন ধোঁয়া উঠছে। খুব উৎকণ্ঠা চোখে। ডেকে এনে বসালাম। সঙ্গে সঙ্গেই এই অসময়ে আসার কারণটা বুঝতে পারলাম। হেসে বললাম, 'দুশ্চিন্তার কারণ নেই, প্রোগ্রাম ঠিকই চলে গেছে। তবে কিছুটা দৌড়ছুট করতে হয়েছিল, এই যা।'

ব্যাপারটা এই— ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি কথিকার প্রচারের সময় নির্ধারিত ছিল গত সন্ধ্যায়। স্ক্রিপ্‌ট্ রাখা আছে প্রোগ্রাম ফাইলে। নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পনেরো আগে ডিউটি-অফিসার ঘোষকের হাতে স্ক্রিপ্‌ট্ দিয়ে কার্ডবোর্ডে পিন দিয়ে আটকে দিতে অনুরোধ করলেন যাতে পড়বার সময় কাগজ উল্টোবার শব্দ না হয়। পাঁচ-সাত মিনিট আগেও যখন ডক্টর চট্টোপাধ্যায় এলেন না তখন ডিউটি-অফিসার আমায় জানালেন। সে রাত্রে আমাকেও থাকতে হবে ডিউটিতে রাত এগারোটা অবধি। ডিউটি-অফিসারের সঙ্গে তখন সিনিয়র আর-একজনকে থাকতে হত। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় আসেন নি শুনেই আমার মনে হল আগেই হয়তো রেকর্ড করা হয়ে

গেছে এবং কথিকা-বিভাগের কর্তা ভুলে রেকর্ডিং রেখে যান নি। দৌড়ে সেই সহকর্মীর ঘরে ঢুকলাম। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। ওঁর টেবিলেই ট্রের উপর ডিস্‌কটি পাওয়া গেল। শুরু এবং সমাপ্তির ঘোষণাও একটি স্লিপে লিখে কভারের উপর পিন দিয়ে গেঁথে গেছেন আমার সহকর্মী। আর-এক দৌড়ে যখন স্টুডিয়োতে ঢুকলাম তখন মাত্র এক মিনিট বাকি।

সব শুনে সহকর্মী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নিদারুণ একটা উৎকণ্ঠার পর চরম প্রশান্তি। মৌজ করে চা খেতে খেতে বললেন, 'এমন আর কখনো ভুলে যাই নি। সিনেমার টিকিট কাটা ছিল আগেই। ফোনে স্ত্রী তাড়া দিলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সময় নেই। কি কাজে অফিসের গাড়ি যাচ্ছে ঐদিকেই যে পাড়ায় সিনেমা হল। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসলাম আর বেমালুম ভুলে গেলাম রেকর্ডিং-এর কথা। সস্ত্রীক সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরে সিনেমার গল্পটির কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে আচমকা মনে পড়ল রেকর্ডিং দিয়ে আসি নি। কি যে মনের অবস্থা ভাই, বুঝতেই পার। জানতাম তুমি ছিলে ডিউটিতে। মনের এই অবস্থায় ভোর হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে পারলাম না। ছুটে এলাম তোমার কাছে। খুব দুঃখিত যে এই অসময়ে তোমায় বিরক্ত করতে হল।'

সহকর্মীর হাতে হাত মিলিয়ে বললাম, 'এমন অবস্থায় আমি কখনো পড়ব না কি করে বলতে পারি? তখন আমায় উদ্ধার করবেন আপনি।' নিশ্চিন্ত মনেই প্রোগ্রাম মিটিং-এ গেলেন সেদিন আমার সহকর্মী।

এক-একটি অনুষ্ঠান নিয়ে কত ভাবনা, কত পরিশ্রম! কিন্তু একঘেয়েমি লাগে নি। ভালোভাবে উতরে গেলে তো খুব আনন্দ। তা ছাড়া এ কাজে অসামান্য সব মানুষের সান্নিধ্যে আসা হচ্ছে

সব সময়। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতো মহাপণ্ডিত আসছেন। গান নিয়ে আলোচনা করেছি পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ছবি বিশ্বাস এলেন ড্রামা রিহার্সালে। সারাটি দিন গুণীজনের সঙ্গলাভ। তাই এত কাজেও ক্লান্তি আসে নি কোনোদিন।

প্রত্যেক বেতার-কেন্দ্রে বাইরে থেকে অনেক লেখা আসে বিবেচনার জন্য। সাধারণত হাজারে একটিও উপযুক্ত মনে হয় না। এগুলিকে বলা হয় **un-solicited script**— অনাহূত লেখা। সংগীতবিভাগে খুব বেশি আসে গানের লিরিক। কাব্যগুণ যদি থাকে আর সুর করে গাইবার উপযুক্ত হয় তবে নিয়ে নেওয়া হয়। গীতিকারের সঙ্গে এক চুক্তিপত্রের বলে এই-সব গান রেডিয়োতে গাওয়া হতে পারে। প্রতিটি গানের জন্য গীতিকারকে দক্ষিণা দেওয়া হয়। চুক্তিবদ্ধ নয় এমন কোনো গীতিকারের গান রেডিয়োতে গাইতে দেওয়া হয় না। যাঁর গান গাওয়া হয় তাঁর নামটাও রেডিয়োতে বলা হয়। সব শ্রোতা শুনছে শিল্পীর নামের সঙ্গে গীতিকারের নামটাও। তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রতিদিন নতুন গীতিকারের গান আসে অনুমোদনের জন্য। এমন একজন গীতিকারের লেখা গান অমনোনীত হয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে দুবার। একদিন নিজেই এলেন সেই গীতিকার। ওঁকে সবিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হল কি কি গুণ থাকলে গীতিকবিতা নির্বাচিত হয় রেডিয়োর জন্য। জানি, বুঝলেন না তিনি। এই আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন এক স্টাফ আর্টিস্ট বন্ধু। অত্যন্ত রসিক মানুষ। কৌতুকরস পরিবেশনে বন্ধুজনকে আপ্লুত করে রাখেন। গীতিকার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠে গেলেন।

তৃতীয় ব্যক্তির কাছে শোনা ঘটনা: স্টাফ আর্টিস্ট বন্ধু ঐ গীতিকারকে নিয়ে ক্যান্টিনে ঢুকলেন। একটি কোণে বসে অনেকক্ষণ

দুজনকে নিচু স্বরে আলোচনা করতে দেখা গেল। কয়েকবার চা এল এবং সঙ্গে টা-ও। পরে ভদ্রলোক খুব প্রসন্নবদনে বিদায় নিলেন।

পরের দিন সেই স্টাফ আর্টিস্ট এসে আমাকে খুব গম্ভীর স্বরে বললেন, 'স্যার, কত লোক আসবে আপনাদের কাছে নানা অনুরোধ-উপরোধ নিয়ে। সব সময় যুক্তির কথা এঁরা মেনে নেবেন না, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললেও এঁরা বুঝতে চাইবেন না। ভাববেন অবিচার করছেন। এ-সব ক্ষেত্রে একটু বুদ্ধি করে ম্যানেজ করতে হয়। এই-যে গতকাল গীতিকার ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তিনি কি আপনার কথাটা মেনে নিলেন? আমি পরে ভদ্রলোককে ডেকে অনেকক্ষণ কথা বললাম ওঁর সঙ্গে এবং ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম।'

আমার প্রশ্ন, 'তিনি বুঝে গেছেন সব?'

উত্তর, 'নিশ্চয়, আমার কথায় খুব খুশিমনেই বাড়ি গেছেন।'

'কি বলে বোঝালেন ওঁকে।'

'ওঁকে বললাম, "আরে মশায়, আধুনিক গান লিখলে আর সে গান পাস হবে না। রাম, শ্যাম, যদু, মধু, সবাই তো লিখছে আধুনিক গান। কিন্তু যুগ পাল্টে গেছে। এখন রবীন্দ্র-সংগীতের যুগ, আধুনিকের নয়। আপনি ভাই রবীন্দ্র-সংগীত লিখে আনুন। দেখবেন চট করে পাস হয়ে গেছে।" আমার কথা শুনে ভদ্রলোক খুশি হয়ে আমায় চা এবং মিষ্টি খাওয়ালেন।'

মনে পড়ে অনেকক্ষণ হা করে তাকিয়ে ছিলাম সেই বন্ধুর দিকে। অবশ্য ঐ গীতিকার আমাদের কাছে রবীন্দ্র-সংগীত লিখে পাঠান নি। নিশ্চয় কোনো সুবোধ বন্ধু ছিল ওঁর।

রেডিয়োর এক দীর্ঘদিনের পরম আত্মীয়ের সঙ্গেও এই সময়টায় বিচ্ছেদ ঘটে গেল। বলছি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি গল্পদাদুর আসর পরিচালনা করতেন। কিশোর কিশোরীদের জন্য

অনুষ্ঠানের যোগ্যতর পরিচালকের কথা ভাবা যায় না। রসিক, সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। গলার আওয়াজ এমন মোলায়েম মধুর যা অতি সহজে কিশোর শ্রোতাকে তন্ময় বিভোর করে দেয়। আর গল্প বলারই কি অসাধারণ মেজাজ! নৃপেনবাবুর মতো পরিচালক আমার কালে কলকাতায় বা অন্য কেন্দ্রে দেখি নি। কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ যেন একটা সমস্যা হয়ে পড়লেন। নিয়ম ছিল আসরে যা কিছু বলবেন সবটাই লিখে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। ভাইসরয়, গভর্নরকে বাদ দিয়ে আর সবারই উপর এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। স্বাধীনতার পরও রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধান-মন্ত্রী, রাজ্যপালকে বাদ দিয়ে আর সবারই স্ক্রিপ্‌ট্ আগে থেকে আনানোর নিয়ম। পূর্বোক্তরাও আগেভাগেই স্ক্রিপ্‌ট্ পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন, কারণ স্ক্রিপ্‌ট্ হাতে পেলে রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ শব্দগুলি গুনে প্রচারের সময়টা কতটুকু লাগবে বুঝে নিতে পারেন। তা ছাড়া স্থানীয় ভাষায় রূপান্তরের কাজটাও সহজ হয়ে যায়। আগে থেকেই অনুবাদ হয়ে যায়। কপি সংবাদবিভাগেও চলে যায়। এমন-কি, মন্ত্রীরাও স্ক্রিপ্‌ট্ আগেই পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন। দেশের শাসনভার যাঁদের হাতে অসঙ্গত কিছু তাঁদের লেখায় থাকবে সেরকম ভয় থাকে না রেডিয়ো কর্তৃপক্ষের। তবে স্ক্রিপ্‌ট্-এর ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া হয়। পড়বার সুবিধার জন্য কঠিন উচ্চারণের কোনো শব্দ বা অতি-দীর্ঘ কোনো বাক্য পরিবর্তনে কোনো মন্ত্রীই বা আপত্তি করবেন কেন? এমন পরিবর্তনে বলাটাই যে অনেক ভালো হবে। কেউ কখনো আপত্তি করেন নি। সাধারণত কোনো পরিবর্তনের কথা বলাও হয় না। কিন্তু আর একটা ব্যাপার আছে। রেডিয়োর একটা কোড্ আছে। সে নির্দেশ মেনে চলতেই হবে। সে বাধানিষেধও খুবই সামান্য। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ থাকবে না। কোনো ধর্মমতের বিরুদ্ধেও না, আর রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধেও কোনো কথা নয়। এইটুকু বাধানিষেধ কোনো বক্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না। অনবধানতা-বশত লেখাটায় এমন কোনো ভুল চুপিসারে ঢুকে গেছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া হয়। ক্বচিত এমন ভুল থেকে গেলে মন্ত্রীমশায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং তিনি খুশিমনেই পরিবর্তন করে দেন।

একবার পশ্চিমবঙ্গের এক মন্ত্রীমহোদয় এমন পরিবর্তনে কোনো-মতেই রাজী হলেন না। অথচ রেডিয়োর কোড্ অনুযায়ী এই পরিবর্তন অবশ্যই করণীয়। হাতজোড় করে প্রথমে কথিকা-বিভাগের প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ এবং পরে স্বয়ং স্টেশন ডিরেক্টর মন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করলেন সামান্য একটু পরিবর্তন করে নিতে স্ক্রিপ্‌টে। রাজী হলেন না মন্ত্রীমহোদয়। অগত্যা বাধ্য হয়েই মন্ত্রীমশায়ের কথিকাটি বাতিল করে দিলেন স্টেশন ডিরেক্টর। স্বাভাবিক কারণেই ব্যাপারটা নিয়ে হৈচৈ হয়েছিল। কিন্তু দিল্লীর কর্তৃপক্ষ কলকাতা স্টেশনের কাজটাই সমর্থন করল।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কালে, ব্রিটিশ আমলে, আগে থেকেই স্ক্রিপ্‌ট্ অনুমোদনের নিয়মটায় বেশ কড়াকড়ি ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর স্ক্রিপ্‌ট্ আগে পাঠাতেন না। অনেক অনুরোধের পরও না। প্রচার সময়ের ঠিক কিছুক্ষণ আগে লেখাটি হাতে নিয়ে উপস্থিত হতেন। কোনো কোনো দিন স্টুডিয়োতে পৌঁছতেও দেরি হয়ে যেত। লেখাটি ভেট্ (vet) করবারও সময় পাওয়া যেত না। আবার স্ক্রিপ্‌টে নেই এমন সব কথাও বলে যেতেন প্রচারের সময়। অন্যমনস্কভাবে হয়তো স্ক্রিপ্‌ট্ উল্টো করে ধরে অনর্গল বলে যাচ্ছেন। ইংরেজ আমলে এমনটা চলতে পারে না। তাই কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে আর গল্পদাদুর আসর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে না। নৃপেন্দ্রবাবুও রেডিয়োর অসহায় অবস্থাটি বুঝতে

পেরেছিলেন নিশ্চয়ই। তখনকার পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে কোনো বিরূপ সমালোচনা হয় নি, যেমনটা দেখেছি এই ক'বছর আগে পঙ্কজকুমার মল্লিকের সংগীত-শিক্ষার আসর থেকে বিদায় উপলক্ষে। এটা ঠিক যে তখনকার দিনে পত্র-পত্রিকা অতটা সোচ্চার ছিল না। আর পঙ্কজকুমার মল্লিকের মনে একটা দুঃখ থেকেই গিয়েছিল যেটা তিনি অনেকের কাছে প্রকাশও করেছিলেন হয়তো। শুনেছি উনি দুঃখ করে বলেছেন যে রেডিয়োর কোনো কর্তাব্যক্তি এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে কোনো আলোচনাই করেন নি, পিওন মারফত ওঁর হাতে একটি চিঠি পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, যাতে লেখা ছিল এর পর আর কোনো কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া হবে না। বিদায়-পর্বটা একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হলে পঙ্কজবাবু খুশি হতেন নিশ্চয়। এর কোনোটাই হয় নি। তাতেই তিনি ক্ষুণ্ণ।

প্রায় সারাটা জীবন শিল্পীদের সঙ্গে কাটিয়ে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে এঁরা বড়ো ভালোবাসার কাঙাল। সত্যিকারের ভালোবাসা, আন্তরিক প্রীতির বিনিময়ে নিজেদের বিলিয়ে দিতেও রাজী। শিল্পী একটা কল্পনা রাজ্যের নিবাসী। স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। সাধারণ মানুষ, রেলের কর্মচারী, জীবনবীমা, ব্যাঙ্ক কিংবা আরো অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি কর্মীদের পর্যায়ে ঠিক ওঁদের ফেলা যায় না। মানসিক একটা ভিন্ জগতের লোক হিসেবে শিল্পীকে বুঝতে না পারলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বুঝে নিতে পারলে কত সহজেই না ওঁদের সঙ্গে চলা যায়। আর শিল্পী তো সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদাই। কথা আছে না যে শিল্পীর যদি জন্ম না হয় তবে মেরে-পিটে শিল্পী গড়া যায় না। যেমন আজকাল শিল্পী তৈরির মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় নামে কত-না কারখানা হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের শিল্পী বের হয়ে এল ক'জন? একটা বিশেষ আশীর্বাদ নিয়েই শিল্পী জন্মায়। সেটা ভালো ভাবেই জানা উচিত

রেডিয়োর কর্মীদের। একটু প্রীতির পরশে শিল্পী কেমন দিলদরিয়া হয়ে যায়।

জানুআরির এক শীতের রাত দিল্লীতে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প আড্ডা করে ঘুমিয়েছি অনেক রাতে। গভীর ঘুম ভেঙে গেল দরজায় ঠক্ ঠক্ আঘাতে। টেবিলের উপর ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখলাম রাত পৌনে একটা। দরজা খুলে বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে দেখতে পেলাম প্রথম ব্যক্তিটি যোশীদা— ধ্রুবতারা যোশী, আর পেছনের মানুষটি কাকে দেখলাম! এত বড়ো সৌভাগ্য আমার! অতি তুচ্ছ এক সরকারি কর্মচারীর গৃহের দরজায় এত বড়ো শিল্পী। এ যে কল্পনার অতীত অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আর এমন শিল্পী— রেডিয়ো থেকে যিনি শতযোজন দূরে থাকেন, রেডিয়োতে যাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডও বাজাতে পারা যায় না। শিল্পীর সঙ্গে পরিচয়ও নেই আমার। আনন্দের আতিশয্যে ভাষাই হারিয়ে ফেললাম।

বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে যোশীদা বললেন, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? খাঁ সাহেবকে ঘরে নিয়ে বসাও।'

ঘরে এসে বসার পর যোশীদাকে জিজ্ঞাসা করলাম খাঁ সাহেবকে নিয়ে শীতের এই নিশুতি রাতে আসার কারণ।

যোশীদা বললেন, 'মজার গল্প বলছি শোন। আজ খুব ভোরে উঠেই খাঁ সাহেবের ইচ্ছে হল দিল্লী গেলে কেমন হয়! যেমন ভাবা তেমনি কাজ। আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে সাড়ে ছ'টা নাগাদ স্টিয়ারিং ধরে বসলেন। মার্সিডিজ গাড়ি পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়ে গেল। মাঝে দুপুরের সামান্য খাওয়া এক ছোটো শহরের সাধারণ এক হোটেলে। খাঁ সাহেবকে চিনতে পেরে মালিক দামটা নিলেন না। তার পর নন্-স্টপ গাড়ি চালিয়ে রাত সাড়ে আটটায় আমার ওখানে এসে পৌঁছলেন। বিশ্রাম করলেন, গা-হাত-পা ধুলেন। কিন্তু খাবার কি করে দিই! দুদিন ধরে আমার কাজের লোকটি নেই।

তোমার বউদিও নেই এখানে জানই তো। আমি নিজেই কনট প্লেসে কোনো হোটেলে খেয়ে নিচ্ছি। তা সারাদিনের ড্রাইভিং-এর পর খাঁ সাহেব একটু বেশিক্ষণই বিশ্রাম করলেন। কনট প্লেসে খাঁ সাহেবকে নিয়ে যখন পৌঁছলাম রাত বারোটা বেজে গেছে। দোকানগুলি আমাদের জন্য আর খোলা নেই। রবিবার তো আজ। শনিবার অবশ্য দেড়টা দুটো অবধি খোলা থাকে। আমাদের খাওয়ার বারোটা বেজে গেছে দেখে ভাবলাম বেরিয়েছি যখন তোমার ওখানে একটু আড্ডা মেরে যাই।'

চিরকুমার যোশীদা রসিক লোক, তাই বউদির কথাটা বলে একটু রগড় করার ইচ্ছা। আমার স্ত্রী সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। রবিবার সন্ধেয় আড্ডার পর বন্ধুরা খেয়ে গিয়েছেন। রবিবার রাত্রে বন্ধুভাগ্যে রান্না একটু বেশিই হয়। আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি খাবার রেডি করে টেবিলে রেখে যোশীদা আর খাঁ সাহেবকে ডাকলেন।

আয়োজন অতি সামান্য। আমার মতো দীনজনের গৃহে এত বড়ো শিল্পীর আপ্যায়ন কি করে সম্ভব? যোশীদা নেহাতই আপন জন। আর খাঁ সাহেব, অপ্রতিম প্রতিভার অধিকারী, আমাদের আন্তরিকতাটুকু নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন। অসময়ে আহারের পর কফি পান করতে করতে যোশীদা আমার স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি বড়ো বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

এই প্রথম খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু কি বিশাল হৃদয়ের মালিক বুঝতে পারলাম যখন আমার স্ত্রীকে বললেন তিনি, 'বউদি, বড়ো ভালো লাগল। কোনো খবর না দিয়ে আসা এই মানুষটিকে আপনি এত রাত্রে খাইয়ে তৃপ্ত করলেন। আপনার একটা পাওনা আছে আমার কাছে। কাল আমার বাজনা দিয়ে আপনাকে খুশি করে দেব।' উর্দু মেশানো বাংলায় বলারই কি অসাধারণ কায়দা। এখন ভাবুন আমার স্ত্রীর কি সৌভাগ্য!

রাজকন্যেরও ঈর্ষার পাত্রী। ঘটনাটা পঞ্চান্ন সনের জানুআরির। উস্তাদ বিলায়েত খাঁর বাজনার দক্ষিণা সমস্ত ভারতে তখন সব চেয়ে বেশি।

শিল্পীর প্রতি এই প্রীতি-ভালোবাসাই শুধু পুঁজি নিয়ে কত গুণীর সংগীত শুনে ধন্য হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি জীবনে। টাকার বিনিময়ে এত শোনার তো সুযোগ হত না। আমার সে-সম্পদ কখনো ছিল না। আর টাকার বিনিময়ে শিল্পীকে এমন একান্ত নিবিড়ভাবে কি পেতাম? শিল্পী সত্যিই ভালোবাসার কাঙাল। তাই বলছিলাম পঙ্কজবাবুর ব্যাপারে সরকারি বাঁধা-ধরা নিয়মের একটু ব্যতিক্রম করলেই সব দিক থেকে সুন্দর হত। মৃত্যুর পর ওঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে গিয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের খ্যাতিমান শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'পঙ্কজকুমার মল্লিক একটা নাম, একটা প্রতিষ্ঠান।' অতি সত্য কথা। রেডিয়োর দীর্ঘদিনের সুহৃদ এই বিরাট শিল্পীর বিদায়-লগ্নটাকে একটু শোভন, একটু মধুর করা যেত কিছুটা প্রীতি ও সহৃদয়তার ছোঁয়ায়।

কলকাতা রেডিয়োর যে অনুষ্ঠান স্ব-মহিমায় চির-ভাস্বর, যে অনুষ্ঠানের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রোতা সারাটি বছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন, যার প্রচার-সময় আজ অবধি দীর্ঘতম— নব্বুই মিনিট —সেটি হল মহালয়ার উষালগ্নে দেবীবন্দনা। নাম মহিষাসুরমর্দিনী। এই দীর্ঘ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্বে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং প্রতিদিন স্টুডিয়োর রিহার্সালে উপস্থিত থেকে বুঝতে পেরেছি কত বিভিন্ন মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা এবং শিল্পীদের আন্তরিক সহযোগিতা রয়েছে এর পেছনে। অনুষ্ঠানটির জন্ম ১৯৩২ সনে। রচনা বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য)। গ্রন্থনা ও স্তোত্রপাঠ করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, গানে সুর দিয়েছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। এতে বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমাবেশ। এর রিহার্সাল প্রায় চার সপ্তাহ

ধরে চলে। নারী-পুরুষের প্রায় বিশটি কণ্ঠ গানে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রী আরো বেশি, এক মহাযজ্ঞ। এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি স্টুডিয়ো থেকে প্রচার করা হত। রেকর্ডিং নয়। ভোর চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি প্রচারের সময়। সংশ্লিষ্ট সব কর্মীরাই রাত্রে স্টুডিয়োতে থেকে যেতেন। প্রোগ্রাম স্টাফ, ইঞ্জিনিয়ার সবাই। কারো যে চোখে ঘুম আসত মনে হয় না। আলাপ-আলোচনা গল্পে-গুজবে স্টুডিয়োতে একটি আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশ। রাত দেড়টা বাজতে-না-বাজতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে গাড়ি বের হয়ে গেল শিল্পীদের আনতে। শুধু কণ্ঠ-শিল্পীদের নয়। বাইরের যে ক'জন যন্ত্রীকে বিশেষভাবে শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্যই প্রয়োজন তাঁদেরও আনাবার ব্যবস্থা হল। রাত তিনটে থেকে এক-একটি করে গাড়ি ফিরে এল শিল্পীদের নিয়ে। সোয়া তিনটেয় স্টুডিয়োতে প্রবেশ। সব যন্ত্রে সুর বেঁধে নেওয়া হল। সংগীত-পরিচালক কয়েকটি গান আবার গাইয়ে নিলেন। ইঞ্জিনিয়াররা মাইক টেস্ট করে ব্যালেন্সিং দেখে নিলেন। নির্দিষ্ট দূরত্বে পর পর তিনটি মাইক। একটি গানের, একটি অর্কেস্ট্রার জন্য, অপরটি গ্রন্থিকের। ঘোষক প্রস্তুত, ইঞ্জিনিয়ার প্রস্তুত, তৈরি শিল্পী-গণ, গ্রন্থিক এবং শব্দ-সংযোজক। চারটে বাজবার সময়-সংকেত। স্টুডিয়োর লাল আলো জ্বলে উঠল। শুরু হল অনুষ্ঠান। নব্বই মিনিটের সরাসরি প্রচার। ভালোভাবে উতরে গেল। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থক হল। প্রসন্নমনে বাড়ি ফিরলেন সবাই।

একবার কিন্তু উৎকণ্ঠার কারণ ঘটেছিল। শিল্পীদের আনতে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাবার পরই বৃষ্টি পড়তে লাগল অঝোরে। রাস্তাঘাট জলে ডুবে যাবার ভয়। গাড়ি আটকে যেতে পারে। একে একে তিনটি গাড়ি ফিরে এল আর্টিস্টদের নিয়ে। কিন্তু আর-একটি, দক্ষিণে গেছে যে গাড়ি, সেটি তো এখনো এল না। আসার

সময় পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কি উদ্‌বেগ! শ্বাসরোধ-করা উদ্‌বেগ। নিশ্চয়ই গাড়ি ব্রেক-ডাউন। পর পর দুটি গাড়ি আবার ছুটে বেরিয়ে গেল দক্ষিণে। রাস্তায় পাওয়া গেল শিল্পীদের। অচল গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টি মাথায় যথাসাধ্য দ্রুত ছুটছিলেন স্টুডিয়োর পানে ছেলেরা আর মেয়েরা। এঁদের নিয়ে যখন গাড়ি এসে পৌঁছল তখন চারটে বাজতে মাত্র দু-এক মিনিট বাকি।

এই এলাহী ব্যাপারের পেছনে রয়েছে রেডিয়োর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সুপরিকল্পিত সমন্বয়। প্রথমে শিল্পীর নির্বাচন সম্পন্ন হল প্রযোজক এবং সুরকারের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা এবং বিভিন্ন শিল্পীর বর্তমান মান বিশ্লেষণের পর। এইবার ঠিক করতে হবে গানে কত সময় এবং স্তোত্রপাঠে ও গ্রন্থনায় কত সময় লাগবে। এই নিয়ে দুই প্রধানের মনকষাকষি এমন-কি, সাময়িক বাক্যালাপ বন্ধ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের দাবি দেবীবন্দনায় স্তোত্রপাঠই আসল এবং সেজন্য এটাই সময় নেবে বেশি। আবার পঙ্কজবাবু বললেন যে গানের বৈচিত্র্য অনুষ্ঠানকে করবে সমৃদ্ধ। তাই সময় একটু বাড়িয়ে দিতে হবে এবার। আর ইতিমধ্যে বাণীকুমার দুটি গান লিখেও ফেলেছেন। বাণীকুমারকে নিয়ে একটু মুশকিল হত মাঝে মাঝে। ছোটো কথা তিনি কানে তুলতেন না। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং পঙ্কজকুমারের তর্কের মধ্যে কোনো কিছু না শুনেই এমন একটি মন্তব্য গুঁজে দিলেন যাতে ওঁরা উভয়েই রাগ করে চলে গেলেন। রাগ পড়ে যাবার জন্য তিন-চার দিন সময় দিয়ে আবার তোয়াজ করে ডেকে আলোচনায় বসানো হল। এবারে ইনিও একটু ছাড়লেন, উনিও ছাড়লেন একটু, গান এবং স্তোত্রপাঠের সময়বিভাগ নির্ধারিত হল। তার পর শিল্পীদের জানানো হল রিহার্সালের দিনক্ষণ। কোনো শিল্পীই, যতই ব্যস্ত হোন না তিনি, প্রত্যাখ্যান করতেন না। কারণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা একটা মর্যাদার বিষয়। আমি

জানি এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আকাঙ্ক্ষা অনেকের এবং কিছুটা ক্যানভাসিংও যে হয় না তা নয়। গান শেখানো চলল একনাগাড়ে প্রায় পনেরো দিন। এর পরের পর্যায়ে যন্ত্রের সঙ্গে অনুশীলন চলল গানের। তাও এক সপ্তাহ নিল। এর পর গ্রন্থনা এবং স্তোত্রপাঠের সঙ্গে যন্ত্রের অনুশীলন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র গ্রন্থনা সুরে পাঠ করেন, স্তোত্রপাঠ তো বটেই। আগের এবং পরের গানের সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বীরেনবাবু গ্রন্থনার ভিন্ন ভিন্ন অংশের সুর রচনা করেন এবং স্কেল ঠিক রেখেই। বেশ কঠিন সাধনায়ত্ত দক্ষতা। একক গানে কোন কোন যন্ত্র লাগবে এবং কোন তবলিয়া কার সঙ্গে বাজাবেন তাও ঠিক করে নেওয়া হল। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঢোল এবং অন্যান্য শব্দ ও ধ্বনি কোথায় কোথায় প্রয়োজন হবে শব্দসংযোজক ভালো করে বুঝে নিলেন। এবার ডাক পড়ল ইঞ্জিনিয়ারদের। কি প্রকারের মাইকের প্রয়োজন হবে একক গানের জন্য, বৃন্দ গানের জন্য, জানানো হল ইঞ্জিনিয়ারকে। শিল্পীরা দাঁড়িয়ে গাইবেন, যন্ত্রীরা বসে বাজাবেন। যথাস্থানে উপযুক্ত মাইক বসিয়ে ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রযোজক প্রতিটি গানের ব্যালেন্সিং-এর টেস্ট নিলেন। টেস্ট নেওয়া হল স্তোত্রপাঠ এবং গ্রন্থনার। এক-একটি গানে কত মিনিট লাগছে, স্তোত্র এবং গ্রন্থনা-অংশের সময়ের যোগফল নেওয়া হল। মোট গিয়ে দাঁড়াল পঁচাশি মিনিট। পাঁচ মিনিট আদি অন্তের ঘোষণার জন্য। ঘোষণাও বাণীকুমারেরই লেখা। নেহাত ছোটো নয়। তার পর দীর্ঘ তালিকা শিল্পীদের, যন্ত্রীদের, প্রযোজক, গ্রন্থিক, সুরকার, শব্দ-সংযোজক এবং সম্পাদকের। রেডিয়োর একটা সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠন রয়েছে বলেই দৈনন্দিন কাজ এবং অন্য অনুষ্ঠানের কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না করে এমন একটা বিশাল প্রয়াস সুসম্পন্ন হল। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে এই অনুষ্ঠানের একটি গান 'অখিল বিমানে তব জয় গানে', দেশী রাগের উপর,

বালি সাহেবের সুর করা। পুরনো দিনের অনেকের কাছে এ কথা আমি শুনেছি। আর সুরের কাঠামোতেও এই গানটির দলছাড়া বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। তবে একটি গান তো সিন্ধুতে বিন্দুর মতো।

যে অনুষ্ঠানের রূপায়ণে নিয়োজিত হয়েছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সুশৃঙ্খল আয়োজন, বিভিন্ন জন এবং কলাকুশলীর আন্তরিক সহযোগিতা, ক্লান্তিহীন শ্রম এবং গভীর নিষ্ঠা তার একটা নিছক শৈল্পিক মূল্যায়নের দাবি আছে। এটা ঠিক যে দুর্গাপূজা বাঙালির সব চেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব। শুধু কি দেবীর আবাহন হিসেবেই এই অনুষ্ঠানটির এত জনপ্রিয়তা? ধর্মীয় ভাবালুতাই কি কেবল পাঁচ-দশকের শ্রোতার হৃদয় দখল করে রয়েছে? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যাবে ছিয়াত্তরে (১৯৫৭) কলকাতা রেডিয়োর এই অনুষ্ঠানকে নূতন করে সাজাবার প্রয়াসে। স্ক্রিপ্‌ট্‌ লিখলেন এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, গীত রচনা করলেন শ্যামল গুপ্ত। হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুরে গান গাইলেন কলকাতার নামী শিল্পীবৃন্দ ছাড়াও ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ভগিনীদ্বয় লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভোঁশলে। তার ওপরও গ্রন্থনা করলেন মহানায়ক উত্তমকুমার এবং সুধাকণ্ঠ বসন্ত চৌধুরী। এটিও নব্ব্‌ই মিনিটেরই অনুষ্ঠান। শিরোনাম, 'দেবীং দুর্গতি-হারিণীম্'। দ্বিতীয়ার একবচন কেন বুঝতে পারি নি! সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি শুনলাম। কিন্তু শ্রবণ, মন খুশি হল না। অথচ প্রভাতী বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে পড়লাম এই অনুষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। সংবাদপত্রের এই অসাধারণ তৎপরতায় বিস্ময় বোধ করলাম। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, যে-অনুষ্ঠান শেষ হল সাড়ে পাঁচটায় তারই প্রশস্তি ছেপে বের হল ভোর পাঁচটায়, সেদিনই। অর্থাৎ অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেই। সংবাদপত্রের এই অসামান্য তৎপরতার পেছনে বেতার কর্তৃপক্ষের অবদান কিছু ছিল কিনা জানি না। দুঃখের বিষয় কলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ আত্মতৃপ্তি শুধু

একটি মাত্র দিনের জন্যই উপভোগ করলেন। পরের দিন থেকেই অগণিত অতৃপ্ত শ্রোতার কাছ থেকে পত্র মারফত আসতে শুরু করল ইট পাটকেল। পত্র-পত্রিকায়ও ছাপা হতে লাগল অসংখ্য চিঠি এই অনুষ্ঠানের বিরূপ সমালোচনায়। বাধ্য হয়ে ডিরেক্টর জেনারেল নির্দেশ দিলেন যে বাণীকুমার-রচিত, পঙ্কজকুমার সুরারোপিত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গ্রন্থনা এবং স্তোত্রপাঠ -সমৃদ্ধ পুরনো অনুষ্ঠানই আবার চলবে। ১৯৫৭-এ কলকাতা বেতার-কেন্দ্র শ্রীশ্রীচণ্ডী নামে আরো একটি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করল। রচনা করলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় গানে সুর দিলেন। মহাষ্টমী রাত্রে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা অবধি প্রচার করা হল। এটিও শ্রোতার হৃদয় জয় করতে সক্ষম হল না বোধ হয়। কারণ মহালয়ার উষার সেই পুরনো অনুষ্ঠানই তো চলে আসছে।

সুদীর্ঘ ঐতিহ্যময় বাণীকুমার-রচিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' রেডিয়োর নিজস্ব অনুষ্ঠান কিন্তু আর রইল না। গ্রামোফোন কোম্পানি (H.M.V.) কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে টেপ্ সংগ্রহ করে সমগ্র অনুষ্ঠানটি কমার্সিয়াল ডিস্কে বের করেছে। রেডিয়োর একান্ত নিজস্ব একটি অনুষ্ঠান এখন বাজারের পণ্যসামগ্রীর শামিল হল। বহু সাধনার ধন একটি অতি সুন্দর শিল্পকীর্তি যা চার যুগ ধরে লক্ষ প্রাণে দেবীর আগমনী বার্তা পৌঁছে দিয়ে হৃদয় মনকে করেছে সংগীতে ভক্তিরসে আপ্লুত, ধর্মীয় প্রথানুযায়ী যার প্রচার শুধু বছরের একটি পুণ্য তিথিতে নির্দিষ্ট মহালগ্নেই সম্ভব, আমার প্রিয় এই অনুষ্ঠানটি শোনবার জন্য মহালয়ার উষালগ্নের প্রতীক্ষায় আর থাকতে হবে না। রেডিয়োর অন্তঃপুরিকা বাজারে বের হল। আর বাজারেই যাকে পাওয়া যায় তাকে ঘটা করে প্রচারেরই বা কোন্ সার্থকতা? শুধু কি কলকাতা থেকেই এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়? আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, বোম্বাই, এমন-কি, সুদূর আন্দামানের রেডিয়ো

থেকেও এই অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। বাজারের পণ্য করে বিকিয়ে দিয়ে কতটুকু লাভ হল? এমনও হতে পারে যে রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ ভেবেছেন যে পঙ্কজকুমার মল্লিকের মৃত্যুতে এবং প্রবীণ বয়সে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ দুর্বল হয়ে যাওয়ায় নূতন করে আর এ অনুষ্ঠান তৈরি করা সম্ভব নয়।.তাই গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিলে ক্ষতির কোনো কারণ তো নেইই, বরঞ্চ এই কোম্পানির কাছ থেকে রয়ালটি হিসেবে কিছু আয় হবে। রেডিয়োর এই বণিকবৃত্তি অনেকে মেনে নেবেন না, যেমন আমি পারি নি। এটা সাধারণ একটা অনুষ্ঠান তো নয়, এর একটা আলাদা স্যাংটিটি আছে, পবিত্রতা আছে। বি. বি. সি. তার ট্রান্স্‌ক্রিপশন সার্ভিস রেকর্ডিং বাজারে ছাড়ে নি। কিনে নিয়ে শুধু একটি রেডিয়ো স্টেশনই বাজাতে পারে সে রেকর্ডিং।

অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে আমি যখন কাজে যোগ দিই তখন ক'টি কেন্দ্র ছিল? গুনে দেখি। দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পেশোয়ার, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, ঢাকা এবং ত্রিচিনপল্লী। মাত্র ন'টি কেন্দ্র। এমন-কি, সব রাজ্যে বেতার-কেন্দ্রই ছিল না। ছিল না রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে, বিহারে। উড়িষ্যা এবং আসামেও ছিল না। কিন্তু বঙ্গদেশেই ছিল দুটি কেন্দ্র। এ ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলির কয়েকটিতে অল্পশক্তির রেডিয়ো স্টেশন ছিল। এগুলি হল মহীশূর, বরোদা, হায়দ্রাবাদ, আওরঙ্গাবাদ এবং ত্রিবেন্দ্রাম। দেশীয় রাজ্যের এই কেন্দ্রগুলি অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কলকাতা কেন্দ্রের একটা অধিকতর দায়িত্ব ছিল। ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষায় প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে প্রোগ্রাম এই দুই রাজ্যের শ্রোতাদের জন্য প্রচার করা হত কলকাতা থেকে। এই আধ ঘণ্টার মধ্যে কথিকা, নাটক, গান ইত্যাদি নানা প্রকারের অনুষ্ঠানই ছিল। শিল্পী পেতে খুব একটা যে অসুবিধা হত মনে হয় না। মহানগরী

কলকাতা আজকের মতো তখনো ছিল উদার। ভারতের সব রাজ্যের বহু মানুষেরই কলকাতা ছিল মাতৃভূমি। প্রতিবেশী উড়িষ্যা এবং আসামেরও বহু লোক ছিলেন কলকাতার স্থায়ী নাগরিক। তা ছাড়া উড়িষ্যা এবং আসামে তখন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ না থাকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু ছাত্র-ছাত্রী কলকাতায় পড়তে আসতেন। তাঁদের অনেকেই রেডিয়োর অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। আর গ্রামোফোন কোম্পানিগুলি যে প্রফেশন্যাল শিল্পীদের ডেকে আনত তাঁদেরও রেডিয়োর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হত। কলকাতায় থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে এঁদের সঙ্গে মেলামেশা করে ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার সঙ্গে পরিচয় হল। জানলাম দুই প্রতিবেশী রাজ্যের সংগীতের ধারাকে। অসমীয়া প্রোগ্রামের দায়িত্বে ছিলেন ইউ. এল. বরুয়া। বর্তমানে তিনি আকাশবাণীর ডিরেক্টর জেনারেল। কটকে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হল ১৯৪৮ সনের ফেব্রুআরিতে। শিলং এবং গৌহাটি কেন্দ্র খোলা হল ঐ বছরেরই জুলাই মাসে। এর পরই ওড়িয়া এবং অসমীয়াতে প্রচার বন্ধ হয়ে গেল কলকাতা কেন্দ্র থেকে।

ছেচল্লিশ সনটা পার করে পা বাড়ালাম সাতচল্লিশে। ভারতের ইতিহাসে বোধ হয় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর। বিশেষ করে রেডিয়োতে থাকার দরুন একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করলাম। একটি মাস যেতেই বোঝা গেল যে ব্রিটিশরাজ ভারত থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেবে। ফেব্রুআরির ১৮ তারিখে 'হাউস অব কমন্স'-এ একটি প্রস্তাব বহু ভোটের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়ে গেল। ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারত ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল উইনস্টন চার্চিলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও। এই সিদ্ধান্তে পুলকিত হয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। এট্‌লি সরকার লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের

ভাইসরয় করে দিল্লীতে পাঠাল। ২৪শে মার্চ কার্যভার গ্রহণ করেই তিনি নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনায় বসে গেলেন। ক্রমে বুঝতে পারলাম যে এই স্বাধীনতা ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করবে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান না হলে মহম্মদ আলী জিন্না আপসে রাজী নন। ওঁর সঙ্গে আলোচনার পর লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের মনে হয়েছিল যে জিন্না সাহেব একটি 'psychopathic case, hell bent on this Pakistan'। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতারাও দেশবিভাগের শর্তে স্বাধীনতা নিতে রাজী হলেন। যে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা ওঁর মৃতদেহের উপরই শুধু সম্ভব; বলেছিলেন, 'So long as I am alive, I will never agree to the partition of India', তিনিও চুপ করেই থাকলেন। নিরুপায় হয়ে চোখের সামনে দেখলেন নেহরু, প্যাটেল এবং অন্যান্য নেতারা দূরে সরে যাচ্ছেন। দুঃখ করে একজনকে বলেছিলেন গান্ধীজি, 'They call me a Mahatma, but I tell you I am not even treated by them as a sweeper।' কত বেদনায় তিনি এ কথা বলেছিলেন! বুঝতে বাকি রইল না যে স্বাধীনতা আসছে একটি অভিশাপ সঙ্গে নিয়ে। এমন-কি, দেশবিভাগটা লর্ড মাউন্টব্যাটেনেরও অভিপ্রেত ছিল না সে কথা পরে জেনেছি। এট্‌লি সরকারের কাছে একটি মন্তব্যে লিখেছিলেন ভারতবিভাগটা 'sheer madness' এবং 'no one would ever induce me to agree to it were it not for the fantastic communal madness that has seized everybody and leaves no other course open'। জুন মাসের তিন তারিখে দেশবিভাগের প্রস্তাব মেনে নিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ সম্প্রদায়। সেই দিন রাত্রেই রেডিয়োর দিল্লী কেন্দ্র থেকে এ বিষয়ে ভাষণ দিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন,

জহরলাল নেহরু, সর্দার বলদেব সিং এবং মহম্মদ আলী জিন্না। মনে পড়ে জিন্না সাহেব ভাষণ শেষ করলেন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে। এর পরেই সাংবাদিক বৈঠকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন যে পনেরোই আগস্ট ব্রিটিশরাজ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। হঠাৎ ঐ দিনটাই ঠিক করলেন কেন কারো সঙ্গে আলোচনা না করেই ? বোধ হয় ঐ তারিখটা ওঁর স্মৃতিতে একটি উজ্জ্বল দিন। ঐ দিনেই ১৯৪৫ সনে জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু গোলমাল বাঁধালো জ্যোতিষীরা। ১৫ই আগস্ট দিনটি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী অত্যন্ত অশুভ। আগের দিনটি অশুভ নয়। তাই ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত ঠিক বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত স্বাধীন হবে এই সাব্যস্ত হল। ইংরেজি মতে রাত বারোটা বেজে গেলেই পনেরো আগস্ট।

ধর্মের ভিত্তিতেই দেশ ভাগ হয়ে যাবে। তাই আমাদের কাছ থেকে লিখিত 'অপশন' চাওয়া হল— ভারতে থাকতে চাই, না পাকিস্তানে। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর হুমকি, কলকাতায় 'ডিরেক্ট অ্যাকশন্', নোয়াখালিতে হিন্দুসংহার এবং বিহারের বদলা— এই-সব মিলে মানুষের মনে এমন একটা ভীতি এবং অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল যে হিন্দুমাত্রেই ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। অপর দিকে মুসলমান কর্মীগণও পাকিস্তানই চাইলেন। ছ'মাসের মধ্যে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার শর্ত রইল। আমাদের দুই মুসলমান সহকর্মী সামসুল হুদা এবং ইউ. এল. বরুয়া ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। হুদার বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। বরুয়া আসামের ছেলে। এঁদের এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিক স্বাগত জানালাম। হুদার ব্যবহার আচরণ অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ। মার্জিতরুচির ঠাট্টা কৌতুক গল্পে খুব মজলিসী মানুষ। কিন্তু রইলেন না। বেশ নীরবেই চলে গেলেন। জুলাই মাসের শেষের দিকেই ঢাকায় চলে গেলেন।

শুনেছি পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান রেডিয়োর সর্বোচ্চ অধিকর্তা হয়েছিলেন। সে যোগ্যতা অবশ্যই ছিল। ইউ. এল. বরুয়া মত পরিবর্তন করলেন না। আজ তিনি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়োর ডিরেক্টর জেনারেল। এই প্রথম অফিসার পদের একেবারে নীচের ধাপ থেকে মইয়ের সব চেয়ে উঁচু ধাপে বেয়ে উঠলেন একজন। এমন নজির আর নেই রেডিয়োতে। যোগ্যতা না থাকলে কি করে সম্ভব? এরকম পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ রেডিয়োতে আর দেখি নি। এদিকে ঢাকায় হিন্দু যে ক'জন ছিলেন তাঁরা সবাই চলে এলেন কলকাতায়। ফলে কলকাতায় অফিসারদের ভিড় হল। স্বাধীনতার পর নূতন নূতন কেন্দ্র যখন খোলা হতে শুরু করল তখন আমার মতো অনেককেই কলকাতা ছেড়ে যেতে হল। যেতে আপত্তি করব কেন? এটা চাকরির শর্ত। আর দেশ দেখার আনন্দ আছে না?

দেশ স্বাধীন হবে, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে, দিকে দিকে, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল এই বার্তা। পথে ঘাটে প্রতিটি মানুষের মুখ বিরাট প্রত্যাশায় উজ্জ্বল। কবে কোন সুদূর অতীতে কত শতাব্দী পেছনে হারিয়ে যাওয়া সেই মহান গৌরবের দিন আবার ফিরে আসবে। তাই তো খুশির জোয়ার এসেছে মানুষের হৃদয়ে। কিন্তু এই আনন্দের আমি অংশীদার হতে পারছি না কেন! স্বাধীন ভারতে কাজ করব বলে আমার মত জানিয়ে দিয়েছি কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু ভাই-বোন, আত্মীয়, প্রিয়-পরিজন সবাইকে ফেলে এসে আমি যে একা। মনে শান্তি কোথায়! এ কেমন স্বাধীনতা! আমার জন্ম-মাটি, সেই ছোট্ট শহর— যার আকাশ মধুর, বাতাস মধুর, আর মধুর গানের সুর— সেই সব-কিছু থেকে চির বিদায় নিতে হবে আমায়। বাল্যের, কৈশোরের, যৌবনের ভালো লাগা কত কিছুই না আমায় পিছু টানছে। সেই ধর্মসাগর, রানীর দিঘি, গোমতী নদীর শান্ত নির্জন

তীর, অবারিত মাঠ আর কোথাও কি পাব! তবে কি আমার 'অপশন' বদলে নেব? মা-বাবা বেঁচে নেই। বড়ো ভাইরা তো রয়েছেন। লিখলাম ভাইদের কাছে। উত্তরে ওঁরা জানালেন যে ওখানে থাকতে যদি না পারেন তবে সবাই চলে আসবেন এ-বাংলায়। আমি যেন না ভাবি ওঁদের জন্য। কিন্তু আমার ভাবনা ঘুচল কোথায়? বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অফিসে আসি। রুটিনমতো কাজ করি, তার পর বাড়ি চলে যাই। উৎসাহ নেই, কাজে প্রাণ নেই।

একদিন এক সহকর্মী বন্ধু ডাকলেন, 'আসুন তো ভাই, চা খাই আর গল্প করি।'

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইতিহাস পড়েছেন?'

মাথা নেড়ে জানালাম আমি ইতিহাসের ছাত্র নই।

'শুনুন তা হলে। ইতিহাস পড়েন নি, তাই নিজের অতীত, দেশ ও জাতির অতীতটাও জানা নেই। অখণ্ড এক ভারতের চিন্তাই কি এদেশের মানুষের ছিল? সনাতন হিন্দু ধর্ম সমগ্র দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষগুলিকে এক করতে পেরেছিল কবে? দুর্ভাগা এই দেশে একজাতীয়তা বোধটা ছিল কি কোনোদিন? বিবিধের মাঝে মিলন মহান শুধু কবির কল্পনা। বাস্তবে ছিল না। তাই বিদেশী ভিন্নধর্মী বিজয়কেতন উড়িয়ে যখন পশ্চিম থেকে পুব প্রান্তে এল তার বিরুদ্ধে কোনো একতাবদ্ধ বাধার প্রাচীর রুখে দাঁড়ালো না। মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে কী করে ইখতিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি নবদ্বীপ আক্রমণ ও জয় করলেন তার কোনো সদুত্তর আছে কি? তিন পুরুষের বীর সেনাপতি বিচক্ষণ রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রস্তুতি ছিল না কেন সেই প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ পরাজয়ের ফল ভোগ করতে হল প্রায় সাড়ে সাতশো বছর। আরো কত লজ্জা, গ্লানি, লাঞ্ছনার শিকার হল এই মেরুদণ্ড-

হীন জাতি। অন্তত চার জন হাব্‌সি সুলতানও এই দুর্বল জাতিটার উপর নিষ্ঠুর শাসন চালাল। সুতরাং আজ এই খণ্ডিত স্বাধীনতাকেও মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। আর যতটুকু পেলাম সেই বিশাল দেশটার মধ্যে এক জাতি এক প্রাণের চৈতন্যও কম বড়ো পাওয়া নয়। ধর্মকে যাঁরা স্বদেশ থেকেও বড়ো মনে করেন তাঁদের থেকে একটু দূরে থাকাই তো ভালো।'

একটু থেমে বন্ধুটি আবার বললেন, 'লম্বা একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললাম। কতদিন আগে স্বাধীনতা হারিয়েছি তার কি হিসেব আছে? যাঁরা দাবি করেন যে ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন পলাশীর মাঠের ম্লান সন্ধ্যায় ভারতের গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হল, আমি তাঁদের দলে নেই।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বন্ধুটি বললেন, 'ভাই, ক'দিন যাবৎ আপনাকে বেশ বিমর্ষ দেখছি। জানেন তো আপনার মতো আমিও পুব বাংলারই লোক। কিন্তু আমি মনটাকে তৈরি করে নিয়েছি; বাস্তবটাকে মেনে নিতেই হবে। বহুর জন্য স্বল্প সংখ্যার আত্মবলি এটা। ভেবে দেখুন সমস্ত বাংলারই পাকিস্তানে চলে যাবার ভয়। পশ্চিমে একটা বাংলা থাকলে পুবে গোলমাল হবার সম্ভাবনাও কম। পাঞ্জাবেরও একই দশা। তাই মন্দের ভালো, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। সে রকম মনে করেই এই স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাই আসুন।'

বন্ধুর যুক্তিটা ভেবে দেখার মতো। গ্রহণ না করেও উপায় নেই; সব হারানোর দীর্ঘশ্বাস বের হতে দিলাম না, দুঃখটাকে চেপে রাখলাম মনের অতলে। ফেলে আসা ধনসম্পদের বিনিময়ে কিছুই চাই নি স্বাধীন ভারতের কাছে। রেফ্যুজি কিংবা displaced person-এর সার্টিফিকেট কখনো ভিক্ষা চাই নি ভারত সরকারের কাছে। মন থেকে দুঃখের ভাবটাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা লাভের দিনটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সমস্ত দেশে, নগরের অলিতে গলিতে, গ্রামে গঞ্জে সেই মহা উৎসব উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলতে লাগল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল রেডিয়োতেও। নতুন নতুন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হল শ্রোতাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা মনে রেখে। দেশভক্তির গান— অতীতে যেগুলি মুক্তির মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল জনমনকে— সেগুলির সুষ্ঠু পরিবেশনার জন্য কোরাল গ্রুপ তৈরি করা হল। জাগরণী গান লেখানো হল শ্রেষ্ঠ গীতিকারদের দিয়ে। স্বদেশী গানের প্রখ্যাত সুরকার সুকৃতি সেনকে আহ্বান করা হল। দেশপ্রেমের গান রূপায়ণের ভার দেওয়া হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কুশলী শিল্পীদের উপর। স্টাফের সদস্যদের মধ্যে থেকেও বিজনবালা ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে একটি কোরাল গ্রুপ তৈরি করা হল। বিশেষ-ভাবে রচিত হল নাটক, ফিচার এবং আরো নানা ধরনের অনুষ্ঠান। রেডিয়োতে এই-সব বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনার পেছনে কত-না আগ্রহ আর আন্তরিকতা ছিল প্রতিটি সহকর্মীর। নির্দিষ্ট শ্রোতাদের জন্য যে-সব অনুষ্ঠান— Special Audience Programme— যেমন মহিলামহল, গল্পদাদুর আসর, শিশুমহল, পল্লীমঙ্গল আসর, মজদুরমণ্ডলী, সেগুলির জন্যও সুন্দর সুন্দর কর্মসূচী সাজানো হল। দেশপ্রেম এবং দেশমুক্তির উদ্দীপনা প্রকাশের উপযুক্ত সম্ভাব্য সকল রকম অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন এবং রূপায়ণের ব্যবস্থা হল। নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা ছাড়াও যেতে হল বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে এই অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করার অনুরোধ নিয়ে। সকলেই খুশি মনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। অনেকে নতুন আইডিয়া দিয়েও কৃতজ্ঞ করলেন। অকৃপণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন সবাই। এতগুলি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে রেডিয়োতে এক কর্মযজ্ঞের শুরু। এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের ব্যাপার। ইডেন উদ্যানে বর্তমান

আকাশবাণী ভবনের মতো অসংখ্য স্টুডিয়ো ছিল না গারস্টিন প্লেসের বাড়িতে। নানা অসুবিধা থাকলেও কাজ এগিয়ে চলল ক্লান্তিহীন সুষ্ঠু শৃঙ্খলায়। আগস্ট মাসের গোড়া থেকে একটি দুটি করে এই-সব অনুষ্ঠানের প্রচার আরম্ভ হল। শ্রোতাদের কাছ থেকে আসতে লাগল প্রশংসার অগণিত চিঠি। এতে আমাদের উৎসাহও বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে এসে গেল সেই পরম শুভ দিনটি।

চৌদ্দই আগস্ট। সকাল আটটার মধ্যেই স্টুডিয়োতে পৌঁছে গেলাম। শার্ট প্যান্ট পরে নয়। খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে। সবাই এসেছেন বাঙালির নিজস্ব পোশাকে, ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, কেউ-বা গলায় একটি চাদর ঝুলিয়ে। এমন-কি, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর পাকা সাহেব বি. কে. নান্দীও গিলে করে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী এবং ফরাসডাঙার চুনট করা ধুতি পরে একেবারে খাঁটি বাঙালীর বেশে। কি সুন্দর লাগছিল! এই নির্মল প্রভাতে সদ্য-স্নাত শুভ্র পোশাকে সবাইকে পূজারী পূজারী মনে হচ্ছিল। একটা দেবালয়ের পরিবেশ। সারাটি দিন অফিসেই রয়ে গেলাম।

চৌদ্দ-পনেরো আগস্টের মধ্যরাত্রি বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত স্বাধীন দেশ। এই উপলক্ষে দিল্লীর সেণ্ট্রাল এসেম্বলী হলে বিরাট সমারোহ। এই পুরো অনুষ্ঠান অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর (তখনো আকাশবাণী নাম হয় নি) দিল্লী কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হবে। সব কেন্দ্রই দিল্লীর সেই অনুষ্ঠান রিলে করবে।

আমাদের রাতের অধিবেশন অন্যদিনের মতো এগারোটায় বন্ধ হল না। প্রোগ্রাম চলতেই থাকল। এগারোটার পর থেকে কলকাতা কেন্দ্রের বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেন অনেক সুধীজন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন সজনীকান্ত দাশ। আবৃত্তি করলেন প্রবোধকুমার সান্যাল, অমল হোম, নিরঞ্জন মজুমদার। তার পর দিল্লী থেকে রিলে।

ভেসে এল পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে স্বতঃ-নিস্থত বাণী 'Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, while the whole world sleeps, India will awake to life and freedom'। এ তো রাজনীতিবিদের ভাষা নয়, এ যে কবির শাশ্বত মর্মবাণী। বলে চললেন নেহরু, 'A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance'.

নেহরু বলে চললেন, 'At the dawn of history India started on her unending quest and the trackless centuries are filled with her striving, and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortunes alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideal which gave her strength. We end today a period of ill-fortune and India discovers herself again'.

প্রতিটি শব্দ আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝংকৃত হয়ে দেশবন্দনার গুঞ্জন তুলল। বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন তখন ধ্যানমগ্ন আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভারতমাতার কল্যাণময়ী মূর্তিখানি উদ্ভাসিত হল। দূর থেকে, যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে ঢং ঢং ঢং শব্দ— এক, দুই, তিন করে বারো বার। এ ধ্বনি থামার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল শঙ্খে বেজে উঠল শৃঙ্খলমুক্ত দেশজননীর আবাহনী।

আহা, শ্রবণ সার্থক, সার্থক এই জীবন। মনে হল চিৎকার করে বলি, 'সময়, পা বাড়িও না, থেমে যাও, এই লগ্নটি হোক চিরায়ত।' চোখের জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে অঝোরে। কান্নায় রুদ্ধ কণ্ঠ। একজন অপরকে কোল দিচ্ছেন। বড়ো ছোটোর কোনো ভেদ নেই। আহা, কি আনন্দের ক্ষণ! অনন্ত তিমির রাত্রির অবসানে জ্যোতির উদয়। নূতন যুগের ভোর।

পুণ্যাহের রাতের অধিবেশন শেষ হল। আহ্লাদের ঢল নেমেছে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে। জয়যাত্রাপথে জাতির দীর্ঘ পরিক্রমার গৌরবময় পরিসমাপ্তি। আমাদের মনে সর্বহারার সব ফিরে পাবার পরিতৃপ্তি। সঙ্গ বিনা মনের এই উদ্দীপন যেন কমে যাবে। সবাইকে নিয়ে, সকলের মধ্যে থেকে মিলনের মাঝেই যেন এই আনন্দের পূর্ণ উপভোগ। রাত্রিটা আমরা স্টুডিয়োতেই থেকে গেলাম। ভোর আটটা থেকে স্টুডিয়োতেই থাকলেও এই আনন্দঘন পরিবেশ ছেড়ে বাড়ি যেতে ইচ্ছে হল না। ঘুমের জড়িমা নেই চোখে। আমাদের মধ্যে অসংযত উল্লাস নেই, একটা প্রশান্ত বিহ্বলতা। গল্প করার মতো গলার আওয়াজটা ফিরে পাচ্ছিলাম না। গলার স্বর যেন বুকে ডুবে আছে।

এমন সময় বয়সে প্রবীণ সহকর্মী বিমল চক্রবর্তী একটু চেঁচিয়ে ক্যান্টিনের মালিককে আবার চা পাক করবার আদেশ দিলেন। ওঁর চা পাক করার কথা বলাটাই কেমন যেন হাসির ঘরে চাবির দম দেওয়া। সবাই হেসে ওঠেন। 'চা পাক করা' কথাটাই হাসির উৎস। বিমলদা হাসির কারণটা ঠিক বুঝলেন না। বললেন, 'বাড়িতে রান্না করাকে পাক করা বলে না?' আবার হাসি। বিমলদা রেগে ওঠার পাত্র নন। কথাটা সরলভাবেই বলেছিলেন। বাড়িতেও বোধ হয় চা পাক করতেই বৌঠানকে বলে থাকেন। বিমলদা জানালেন এবারের চা তিনিই দিচ্ছেন। আর-এক

সহকর্মী 'টা'ও আনতে বললেন। তিনিই 'টা'-এর বিল মেটাবেন। এই হাসিটা মনের বিবশ ভাবটাকে কাটিয়ে দিতে সাহায্য করল। সহজ স্বাভাবিক ভাবে আলোচনা করলাম রিলে করা অনুষ্ঠান সম্পর্কে। আগামী কালের প্রোগ্রামগুলিও ঠিক আছে কিনা দেখে নেওয়া হল। এইভাবে স্বাধীন ভারতের প্রথম রজনী জেগে কাটিয়ে দিলাম। ভোরের আলো ফুটে উঠল। ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে বাড়ির পথে দক্ষিণের ট্রামে উঠে বসলাম। ময়দানের উপর দিয়ে ট্রাম চলছে। সূর্যের কিরণ এসে পড়ল আমার চোখেমুখে। প্রণাম করলাম মুক্ত ভারতের প্রথম প্রভাতের আলোর দেবতাকে। প্রার্থনা জানালাম : আমার যাত্রাপথ চিরদিন আলোকিত রেখো। ন্যায়ের পথে আমায় চালিত কোরো।

চৌদ্দই আগস্ট রাতটায় আমরা যেমন ঘুমোই নি, এই মহানগরীর কোনো মানুষের চোখেও ঘুম ছিল না। রাস্তায় রাস্তায় উৎফুল্ল জনতার মিছিল, প্রতিটি গৃহ উজ্জ্বল আলোর মালায় সজ্জিত, একটা খুশির বন্যা বয়ে চলেছে মহানগরীর বুকে। এই উৎসবের রাতে ঘুমোবেই বা কে ? কিন্তু সেই পুরনো বাড়িটি, 'হাইদারি হাউস' যার নাম, ১৫১ নম্বর বেলেঘাটা রোডের সেই বাড়িটি আজ নীরব, নিষ্প্রদীপ ; খোলা জানলা দিয়ে একটি দীপশিখাও দেখা যাচ্ছে না। গৃহবাসীদের কোনো সাড়া নেই। তাদের কাছে এই রাতটির যেন কোনো গুরুত্বই নেই। এ যে অসামান্য এক রাত সে কথা জানলেন না, বুঝলেন না এ বাড়ির কেউ। আনন্দ উৎসবের কেউ অংশীদার হলেন না। এ বাড়ি যে জন-গণ-নায়ক মহাত্মা গান্ধীর অস্থায়ী আশ্রম।

গান্ধীজির কাছে এ রাত যে শুভ রাত নয়। দেশবিভাগের ফলে এপারে ওপারে একটা ধ্বংসের লীলা যে অবশ্যম্ভাবী সেটা বুঝতে পেরেছিলেন গান্ধীজি। এই রাতেই যে চলছিল হানাহানি অন্য প্রান্তে।

রাত তখন দশটা। নেহরু একটি টেলিফোন কল্ পেলেন লাহোর থেকে। দারুণ দুঃসংবাদ। লাহোর নগরীতে চলছে অগ্নিকাণ্ড। এই নিদারুণ খবরে নেহরু বেদনায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতালাভের মহালগ্নের ঠিক পূর্বমুহূর্তে এই মর্মান্তিক আঘাত। তাই খানিক বাদেই সেন্ট্রাল এসেম্বলী হলে যে ভাষণ তিনি দিলেন তার জন্য শান্তমনে চিন্তা করারও অবসর পেলেন না। অসামান্য এই অলিখিত ভাষণের জন্য কোনো প্রস্তুতি ছিল না।

ওদিকে লাহোর নগরী যখন জ্বলছিল কলকাতায় তখন নাখোদা মসজিদের সামনে হচ্ছিল জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মিষ্টান্ন বিতরণ। যে মহানগরী মাত্র একটি বছর আগে ডিরেক্ট অ্যাকশনের শিকার হয়েছিল আজ রাতে সেখানে হিন্দু-মুসলমানে ভাই-ভাই। বেলেঘাটায় গান্ধীজির উপস্থিতির ফলেই যে সেটা সম্ভব হল। কিন্তু আজ তিনি বড়ো একা। কেউ তো তাঁর ডাকে সাড়া দেয় নি। ভারতবিভাগ তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। মনে শান্তি কোথায়? তাই গান্ধীজির অস্থায়ী আশ্রম এ রাতে উৎসব-মুখর নয়।

রেডিয়োর অনুষ্ঠান-সূচীতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হল। বন্ধ হল বি. বি. সি. থেকে ইংরেজি সংবাদ রিলে করা। প্রতি শনিবার রাতে বি. বি. সি.-র বিচিত্রা নামে বাংলা অনুষ্ঠানের রিলেও উঠিয়ে দেওয়া হল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চারুকলা, সংগীতের বিষয়ে নানা প্রকার প্রোগ্রাম রূপায়ণের ব্যবস্থা হল। অনুষ্ঠান সম্পর্কে চিন্তা, পরিকল্পনার দিগন্তটা বড়ো হয়ে গেল। নূতন অনেক কিছুই ভাবা হল। রাতের অধিবেশন শেষে ঘোষক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, 'প্রবাসে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক শুভকামনা, দূরের যাঁরা যাত্রী তাঁদের যাত্রাপথ হোক নির্বিঘ্ন, সমুদ্রের বুকে যাঁরা আছেন তাঁদের পাড়ি হোক নিঃসংকট।' রাতের অধিবেশন শেষে এমন কল্যাণকামনা

প্রথম প্রথম মন্দ লাগে নি। কিন্তু রেডিয়োর পক্ষে একটু বেশি মনে হওয়ায় কিছুদিন পর বন্ধ করে দেওয়া হল।

মুক্তিসংগ্রামে যাঁরা ছিলেন নেতৃস্থানীয়, যাঁদের সাধারণত আগে ডাকা হত না, এখন তাঁদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হল। প্রায়ই দেখতে পেতাম গান্ধী-টুপি মাথায় নূতন নূতন বক্তার আগমন। গান্ধী-টুপিটা তখন একটা বিরাট 'স্ট্যাটাস-সিম্ব্‌ল', বিশেষ সম্মানের প্রতীক ছিল। কত সহস্র লক্ষ যে বিক্রি হয়েছে! তখন বাজারে গান্ধী-টুপির একটা 'বুম্‌' চলেছে। অনেক রাম, শ্যাম, হরিদাস গান্ধী-টুপি মাথায় অফিসে এসে মাতব্বরি করার সুযোগ খুঁজেছে। আমরা অবশ্য কিঞ্চিৎ আলাপেই বুঝে নিতে পারতাম গান্ধী-টুপি পরাটা কতকালের অভ্যাস। তবে এদের সবাইকে আপ্যায়ন করতে সচেষ্ট ছিলাম। কারণ বলা তো যায় না কার সঙ্গে কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পরিচয় আছে। সত্যি বলতে কি গান্ধী-টুপিটাকে কিছুটা ভয়, কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখেছিলাম তখন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় অনেকে যেমন এগিয়ে এলেন ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে, তাঁদের অনেককে নিয়ে আমাদের সমস্যাটাও বেড়ে গেল। প্রথমত তাঁরা সবাই ব্যস্ত, রিহার্সালে আসতেই পারেন না। এমন-কি, রিহার্সালের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন না। তার পর কথিকার স্ক্রিপ্‌ট্‌ যেটা লিখে আনলেন সেটা জনসভায় বক্তৃতার ভাষণের মতো। রেডিয়োর কথিকার উপযোগী করে নেবার জন্য সামান্য কিছু পরিবর্তনের কথা বললে অসন্তোষ লুকোবার চেষ্টা করতেন না। আর দিল্লীতে যাঁদের কিছুটা প্রভাব আছে তাঁরা মন্ত্রীর কাছে নালিশ করতেও দ্বিধা করতেন না। 'রেডিয়ো টক', অর্থাৎ বেতারের কথিকার তখন থেকেই অবনতির শুরু। কিছুদিন পর উপর থেকে নির্দেশ এসে গিয়েছিল যে কথিকার ব্যাপারে আমাদের কিছু বলারই থাকবে না।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মেহ্‌রা মাসানী তাঁর লেখা বই *Broadcasting and the People*-এ মন্তব্য করেছেন, 'The staff of AIR did try at the start and succeeded upto a point, to persuade speakers, even VIPs, to rewrite some parts of their scripts to make them more intelligible or less pompous, and in the course of rehearsals, some of the more obvious faults in pronunciation, diction, intonation and so forth, were removed. But in nineteen-fifties it was decided that the staff should not interfere in any way with the style of a speaker even if, unaware of the nature of the broadcasting medium, he had used long and complicated sentences which may be difficult to follow in a spoken radio talk।'

একটি গ্রাহক-যন্ত্রের সামনে কথিকা শুনবার ক'জন আগ্রহী শ্রোতা থাকেন ? কোনো বাড়িতে সেই নির্দিষ্ট সময়ে একজন কিংবা দুজনের বেশি থাকেন না রেডিয়োর সামনে। বক্তা দেখতে না পেলেও তাঁর বলাটা শুনছেন একজন বা দুজন। লক্ষ লক্ষ গ্রাহক-যন্ত্র হয়তো খোলা আছে সেই সময়। কিন্তু গ্রাহক-যন্ত্রের সামনে বসা একটি-দুটি শ্রোতাকে নিয়েই বক্তার কারবার। সুতরাং তাঁর বলাটা একজন-দুজনের কাছে যেভাবে বলা হয় সেরকম হবে। আর যেহেতু শ্রোতা মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছেন না কিংবা পত্রিকার লিখিত প্রবন্ধের মতো আবার পড়ে দেখবার সুযোগ নেই, রেডিয়োতে বলাটা সেজন্য হতে হবে অতি স্পষ্ট উচ্চারিত। অস্পষ্ট একটি শব্দ অনেক সময় ঠোঁট নাড়া দেখেও বুঝতে পারা যায়। কিন্তু রেডিয়োতে সেটা তো দেখতে পাই না। ভাষা হবে সহজ, বাক্য হবে ছোটো

ছোটো। তাই পত্রিকার জন্য লেখা স্ক্রিপ্‌ট্‌ অথবা জনসভার ভাষণের মতো স্ক্রিপ্‌ট্‌ রেডিয়োতে কি করে চলবে? স্বাধীন ভারতের রেডিয়োর প্রথম বলি হল 'রেডিও টক'।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বজন-তোষণও শুরু হয়ে গেল। রেডিয়ো মাধ্যমটিকেই যাঁরা ভালো করে জানতেন না বুঝতেন না, এমন বহু অনভিজ্ঞ লোক এসে গেলেন রেডিয়োতে। সদর দরজা দিয়ে নয়। খিড়কি দরজার ভিতর দিয়ে, U.P.S.C.-এর নজর এড়িয়ে। উপযুক্ততা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল না। কোনো বৃহৎ ব্যক্তির সুপারিশই মূলধন। অস্বস্তি বোধ করলেও প্রতিবাদ উচ্চারণের উপায় ছিল না। ফলে পেশাদারি দক্ষতা রেডিয়ো থেকে লোপ পেতে থাকল আস্তে আস্তে। কাজের মধ্যেও একটা শিথিলতা প্রবেশ করতে আরম্ভ করল।

এই সময় পর পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল কলকাতায় এলেন। পণ্ডিত নেহরু বিনা নোটিশেই স্টুডিয়োতে এসে উপস্থিত। বোধ হয় অক্টোবর মাসের শেষের দিক। ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দেবার জন্য তিনি এসেছেন। সদ্য-স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু জন-বল্লভ প্রিয়তম নেতা। জনসমাবেশ বিরাট বিপুল হল এবং আরো কাছে এগিয়ে এসে তাদের চিরপ্রিয় নেতাকে দেখবার অদম্য আগ্রহে সমস্ত বাধা-নিষেধের বেড়া ভেঙে জনসমুদ্র মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল। দারুণ বিশৃঙ্খলা, গণ্ডগোল এবং যে মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সেটাও ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। পাবলিক অ্যাড্রেস্ সিস্টেম অকেজো। পুলিসী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি প্রধানমন্ত্রীকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে পেছনের রাস্তায় গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হল। জনতা যেমন নেহরুজিকে ভালোবাসে তিনিও ভালোবাসেন তাদের সামনে উপস্থিত

হতে। কিন্তু সেদিন তিনি তাদের সামনে গিয়ে কিছু বলতে পারলেন না তাদেরই প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে গাড়িটি সরাসরি রেডিয়োর স্টুডিয়োতে চলে এল।

জনগণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ রেডিয়োতে প্রচার করা হবে রাতের অধিবেশনে। তাই রেকর্ড করতে চলে এলেন তিনি। কিন্তু স্ক্রিপ্ট্ কোথায়? রেডিয়োতে বলবেন এমন কথা তো ছিল না। লেখা না দেখেই তিনি বললেন। একসঙ্গে দুই কপি রেকর্ড করা হল। তখনো টেপ রেকর্ডিং চালু হয় নি। ডিস্কে একনাগাড়ে পনেরো মিনিটের বেশি রেকর্ড করা যায় না। ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় থামলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বললেন হিন্দিতে। স্ক্রিপ্ট্ যে সামনে নেই তাতে কোনো অসুবিধাই হল না। সাবলীল ভাবে অবিরাম শব্দগুলি মুখ থেকে বের হয়ে এল। শব্দের খোঁজে কোথাও থামা নেই, নেই কোনো আড়ষ্টতা। অনায়াসে অনর্গল বলে গেলেন। অসাধারণ একটি বলবার ক্ষমতা দেখলাম নিজের চোখে। রেডিয়োর মাইক্রোফোনের সামনে কাউকে স্ক্রিপ্ট্ ছাড়া বলতে দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বললেন।

মাসখানেক বাদে কলকাতায় এলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। উপ-প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও বেতারের মন্ত্রী। এক শক্তিমান পুরুষসিংহ। তাঁকে বলা হত '**India's last Moghul**'। এই মানুষটির মানসিক বলিষ্ঠতার অনেক কথা শুনেছি। একবার বোম্বাই-এর এক বিচারালয়ে একটি মামলার বিষয়ে জুরির সামনে নিজের যুক্তিতর্কের সারাংশ নিবেদন করছিলেন। সেই সময়ে স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদের টেলিগ্রাম কেউ তাঁর হাতে দিল। এক নজরে টেলিগ্রামটি পড়ে নিয়ে নির্বিকার অবিচলিত চিত্তে মামলার শুনানি চালিয়ে গেলেন। চরিত্রের বলিষ্ঠতার জন্য রাজনৈতিক মহলে 'লৌহমানব' (**Iron man**) বলে পরিচিত ছিলেন। প্রশাসনে কোনো শিথিলতা

তিনি ক্ষমার চোখে দেখেন না, এটা সুবিদিত। তাই এবার ময়দানের সভায় পুলিসী ব্যবস্থা ক্রুটিবিহীন। প্রধানমন্ত্রীর সভার মতো বিপুল জনসমাবেশ না হলেও প্রায় কাছাকাছি। অতি সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে সভা শেষ হল। সভাশেষে রেডিয়োতে এসে একটি ছোটো ভাষণও রেকর্ড করে গেলেন।

রেডিয়ো যে জনসংযোগের বিরাট একটি মাধ্যম সর্দার প্যাটেল মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেই সেটা উপলব্ধি করলেন। এই বিশাল দেশে তখন মাত্র ছ'টি রেডিয়ো স্টেশন— দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই মাদ্রাজ, ত্রিচিনপল্লী ও লক্ষ্ণৌ। ঢাকা, পেশোয়ার এবং লাহোর কেন্দ্র পড়ল পাকিস্তানে। তাই তিনি রেডিয়োর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে নির্দেশ দিলেন অচিরে বিভিন্ন রাজ্যে বেতার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্ল্যান পেশ করে অনুমোদন করিয়ে নিল। ঝড়ের গতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল পাটনা, কটক, অমৃতসর, শিলং-গৌহাটি, নাগপুর, বেজওয়াদায়। ক্রমশ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আরো কেন্দ্র স্থাপিত হল।

এমন এক বিরাট দেশ যেখানে মানুষ বাস করে কোটি কোটি, যোগাযোগ চলাচল ব্যবস্থা যে দেশে প্রাগৈতিহাসিক কালের, সে দেশে সুদূর অঞ্চলের মানুষের কাছে সংবাদ এবং রাষ্ট্রনীতি পৌঁছে দিতে এবং বিভিন্ন রাজ্যের নানা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে সংহতি, ঐক্য এবং দেশপ্রেম উদ্‌বুদ্ধ করতে রেডিয়োর যে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা আছে সেটা উপলব্ধি করে সর্দার প্যাটেল তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা এবং সূক্ষ্ম দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। যে যে রাজ্যে বেতার-কেন্দ্র স্থাপন করা হবে সেখানে উপযুক্ত লোকনিয়োগের জন্য নিরপেক্ষ সিলেক্‌শন বোর্ড গঠন করতে নির্দেশ দিলেন, 'অ্যাড্ হক্' নিয়োগ একেবারে বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ হয়ে গেল 'অ্যাড্ হক' প্রমোশনও। নিয়োগ এবং পদোন্নতি সব ব্যাপারেই নিয়ম বিধি প্রতিপালনের

নির্দেশ দিলেন, এর ফলটা দারুণ ভাবে বোঝা গেল এক বছর পর। অনেক অফিসার যাঁরা 'অ্যাড্ হক' প্রমোশন পেয়ে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের পুরনো পদে নামিয়ে আনা হল। আমার সহকর্মী বন্ধু পাঞ্জাবের ছেলে গুর্দিতচাঁদও এই আদেশের বলি হলেন। তাঁর পদাবনতি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিলেন চাকরি। রাগ করে নয়, বাইরে থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে পারবেন বলে। আর সেটা করতে সক্ষমও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু 'অ্যাড্ হক' অ্যাপয়েন্টমেণ্ট পেয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা রয়েই গেলেন।

এই সময়েই নূতন আর-এক কর্মচারী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল রেডিয়োতে। নাম war service candidates। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে রণাঙ্গন থেকে বহু দূরে যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক দপ্তর ছিল। সাজ-সরঞ্জাম তৈরির এবং সরবরাহের হিসেব নিকেশ রক্ষা করাই ছিল এই-সব দপ্তরের মুখ্য কাজ। যুদ্ধশেষে এই দপ্তরগুলি উঠিয়ে দেওয়া হল। এই-সব দপ্তরের বেকার কর্মীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে অন্যান্য সরকারি অফিসে সুযোগ সুবিধা মতো এদের নিয়ে নেওয়া হবে। ব্রিটিশরাজ বিদায় নেবার কালেও এই আশ্বাসের কথা ভোলে নি। ইংরেজ সরকারের এই প্রতিশ্রুতি মেনে নিল ভারত সরকার। যে-কোনো অফিসে যে-কোনো খালি পদের জন্য এদের অগ্রাধিকার দেওয়া হল। ঠিক হরির লুটের মতো ব্যবস্থা। কপাল যার ভালো তিনি ভালো পদ পেয়ে গেলেন। এই-সব নিয়োগের জন্য কোনো স্ক্রিনিং-এর প্রয়োজন হল না। প্রোগ্রাম সেক্রেটারি মিস্টার দাশ দুঃখ করে আমায় বলেছিলেন যে তিনি I. C. S-এর জন্যই নমিনেশন পেয়েছিলেন প্রথমে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত শেষ পর্যন্ত রেডিয়োর সামান্য প্রোগ্রাম সেক্রেটারির পদটিই পেলেন। ওদিকে আমাদের অফিসেই দুজন অতি সুন্দরী মহিলা এলেন বেশ উচ্চপদেই— গৌরী চট্টোপাধ্যায় এবং লতিকা সেনগুপ্ত। শতকরা সত্তর ভাগ খালি পদ

এই-সব কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পদগুলি যখন পার্মানেণ্ট করা হল তখনো এঁরাই অগ্রাধিকার পেলেন।

দেখতে দেখতে সাতচল্লিশ সন শেষ হয়ে গেল। কি গৌরবোজ্জ্বল একটা বছর! কত প্রতিশ্রুতি, কত সম্ভাবনা, কত ভবিষ্যৎ গড়ার আশা রেখে গেল পরের বছরের জন্য। নূতন উদ্দীপনার সঙ্গে, এগিয়ে চলার শপথ গ্রহণ করে প্রসন্ন চিত্তে সাতচল্লিশ সনকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে দেশবাসী বরণ করে নিল নূতন বছরকে। কিন্তু একটা মাসও গেল না, আকাশ ভেঙে পড়ল জাতির শিরে ৩০শে জানুআরির সন্ধেয়।

দিল্লীতে প্রার্থনাসভায় মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অহিংসার দূত হিংসার শিকার হলেন। ছ'টা বাজার কিছুক্ষণ আগে অফিসের টেলিপ্রিণ্টারে ছাপা হয়ে বের হল গান্ধীজিকে প্রার্থনাসভায় তিনবার গুলি করা হয়েছে। টেলি-প্রিণ্টারের পাশে দাঁড়ানো সহকর্মী চিৎকার করে সবাইকে জড়ো করলেন। টেলিপ্রিণ্টার নীরব বেশ কিছুক্ষণ। কী নিদারুণ উৎকণ্ঠার নীরবতা। নিশ্চল টেলিপ্রিণ্টার আবার সচল হল। দুরু দুরু বুক কাঁপছে। চরম নিষ্ঠুর খবরই এল টেলিপ্রিণ্টারে। 'হা রাম' বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মহাত্মা গান্ধী। নড়তে পারছি না, পা যেন বসে গেছে মেঝেতে। সমস্ত অনুভূতি অসাড়। ডিউটি অফিসার দৌড়ে এসে বললেন ছ'টার নিউজ শুরু হতে দেরি নেই। স্পীকারের সামনে দাঁড়ালাম। সংবাদে বলা হল, 'Mahatma Gandhi was assassinated in New Delhi at twenty minutes past five this afternoon. His assassin was a Hindu।' শেষ বাক্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেশটা একটা রক্তস্নান থেকে অব্যাহতি পেল। দিল্লীর এই খবরের পর এখন সমস্ত অনুষ্ঠান পরিবর্তন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনেব ব্যবস্থা করতে হবে।

আনন্দোচ্ছল সব কিছু বন্ধ করে উপযুক্ত শোকপ্রকাশের আয়োজন করতে হল। আমরা যোগাযোগ করলাম স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। একে একে সবাই এলেন, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। দিল্লী থেকেও রিলে করা হল বহু অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী নেহরু কান্নায় ভেঙেপড়া কণ্ঠে বললেন :

'The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. The light has gone out, I said, yet I was wrong. For the light that shone in this country was no ordinary light. In a thousand years that light will still be seen··· the world will see it and it will give solace to innumerable hearts. For that light represented something more than the immediate present ; it represented the living, the eternal truths, reminding us of the right path, drawing us from error, taking this ancient country to freedom.'

সমস্ত ভাষণটা সকরুণ হাহাকার। দেশ শুধু শোকেই মূহ্যমান নয়, মুখে তার চিরকালের কলঙ্কের কালিমা। একটা আর্ত জিজ্ঞাসা সবার মনে— এমনটা কি করে সম্ভব ?

মর্মান্তিক গুরুদশার অবসান হল। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক প্রোগ্রামে ফিরে এলাম। গান্ধীজির আদর্শ, অহিংসার নীতি, ন্যায় ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, গান্ধীজির দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা আমাদের নানা অনুষ্ঠানে রূপায়িত হতে শুরু করল তখন থেকে। শিশুর কাছে, বালকের কাছে, কিশোর কিশোরীর সামনে, এমন-কি, যে জাতি সুন্দর করে বাঁচতে

শেখে নি, সেই জাতির কাছে তুলে ধরার এমন একটি মহৎ জীবন সমগ্র বিশ্বেই বিরল। যা-কিছু সৎ, যা-কিছু শুভ্র নির্মল, যা-কিছু মহনীয় বরণীয় তিলে তিলে তা দিয়েই যেন বিধাতাপুরুষ এই মহা-জীবন গড়েছিলেন। তাই তিনি মহাত্মা। মানুষ নামে প্রাণীটি পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবে যতদিন ততদিনই তিনি বেঁচে থাকবেন সেই মানুষের মনে।

এবার যেন বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। পাটনা কেন্দ্র চালু হয়ে গেল ১৬শে জানুআরি, কটক কেন্দ্র এই মাসেরই ২৮ তারিখে। কয়েকজন এখান থেকে চলে গেলেন। আমার কথাও উঠেছিল। কিন্তু রেহাই পেয়ে গেলাম। মার্চের মাঝামাঝি বদলির আদেশ এসে গেল। যেতে হবে শিলং। শিলং-এর নাম শুনেই মনটা খুশি। ছেলেবেলা থেকেই পাহাড় আমায় সব সময় টেনেছে। আমাদের ছোটো শহরের চার ধারে ছিল অনুচ্চ পাহাড়ের রেখা। নামগুলিও কি সুন্দর! ময়নামতী, কোটবাড়ি, সোনামোড়া, লালমাই। ভোরে রোদ ওঠার আগে, গোমতীর তীরে দাঁড়িয়ে পুবে তাকিয়ে কত রহস্যময় লেগেছে এই পাহাড়গুলিকে। এরা আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। পশ্চিম আকাশ যখন লাল, মেঘের আড়ালে ডুবে যায় সূর্য, ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যার ছায়া, তখন অন্ধকারের বুকে ধীরে ধীরে মুছে-যাওয়া ময়নামতীর দিকে তাকিয়ে মনটা আমার কোথায় উধাও হয়ে গেছে। দূর তো বেশি নয়। গিয়েছি বার বার। হেঁটে গিয়েছি, সাইকেল চালিয়ে গিয়েছি। পিক্‌নিক্ করেছি। আবার যেতে ইচ্ছে হয়েছে। আর-এক দিক থেকেও যাওয়াটা মঙ্গলের। শরীরটা ভালো থাকছিল না কলকাতায়। দেহটা ভালো হবে শিলং পাহাড়ে। আর রূপসী শিলং দেখে নয়ন সুখ পাবে, মন পাবে আনন্দ। আমার বাঁধাছাঁদা শুরু হল।

২

শিলং, ১৯৪৮ সনের এপ্রিল, প্রথম সপ্তাহের শেষের দিক। সন্ধে হয়-হয় এমন সময় শিলং এসে পৌঁছলাম আসাম ক্যারিয়িং কোম্পানির মোটরগাড়িতে। শিলং আসাম রাজ্যের রাজধানী। তখনো মেঘালয় নামটির জন্ম হয় নি। শিলিগুড়ি থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু দার্জিলিং শহর পর্যন্ত ছোটো ট্রেনের রেল লাইন আছে। কিন্তু পাঁচ হাজার ফুটেরও কিছু নীচে শিলং পর্যন্ত রেল লাইন নেই। যাবার রাস্তা দুদিক থেকে। গৌহাটি থেকে বাসে তেষট্টি মাইল। ওদিকে সিলেট থেকে একশো মাইলের উপর। সিলেটের তখন সদ্য পাকিস্তানভুক্তি হয়েছে। তাই আমি এসেছি গৌহাটি হয়ে।

সিলেট-শিলং এবং গৌহাটি-শিলং এই দুটি বাসের রাস্তাই আসাম ক্যারিয়িং কোম্পানির একচেটিয়া দখলে। সুন্দর ব্যবস্থা। বাসগুলি ভালো। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্য বড়ো বাস। নির্দিষ্ট সংখ্যার আসন। একজনও বেশি যাত্রী তুলবে না, মাঝ রাস্তায়ও নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য আর-একটি বড়ো বাস, যার পেছনের দিকটায় থাকে মেল এবং সামনের ক'খানি ভালো আসনে যাত্রীরা বসেন। আর প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জন্য বেশ ভালো মোটরগাড়ি। সামনে পেছনে গদীর ওপর পরিষ্কার ঢাকনা। কেবল তিনজন যাত্রীই যান এক-একটি গাড়িতে। সামনে একজন, পেছনে দুজন। ভারি আরাম। জাঁদরেল ম্যানেজার লালমোহন দত্ত একটা অসাধারণ শৃঙ্খলার সঙ্গে এই দুটি বাস রুট চালাতেন। কত বড়ো গলার আওয়াজ! ঘোষালের যাত্রাদলের সেই প্রভাত বোস, যিনি

নরকাসুর, কংস এই-সব ভূমিকায় অভিনয় করতেন, ঠিক তাঁর মতো গলার আওয়াজ লালমোহন দত্তর। ঘন ঘন 'কুদানি' অর্থাৎ ধমক দিচ্ছেন। ভিতরের মানুষটি 'মৃদুনি কুসুমাদপি' টের পেলাম কিছুক্ষণ পরই।

গাড়ি থেকে নেমে শুনলাম মালের গাড়ি আসতে আধ ঘণ্টার উপর দেরি হবে। এর মধ্যে আমাকে একটা হোটেলের খোঁজ করতে হবে। ভাবলাম এ ব্যাপারে ম্যানেজারই পরামর্শ দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি। একজন পোর্টার পথ দেখিয়ে ম্যানেজারের ঘরের দরজায় নিয়ে গেল। ভিতরে যাবার সাহস নেই ওর। কি করে হবে? এই দরজা দিয়েই ঘন ঘন 'কুদানি'র নিষ্ক্রমণ, নানা প্রকার আদেশ, নির্দেশের। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে নমস্কার করলাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে জানালাম যে শিলং-এ এই প্রথম আসা। পরিচিত কেউ নেই এখানে। ম্যানেজারমশায় যদি দয়া করে একটা হোটেল সম্পর্কে পরামর্শ দান করেন তবে কৃতজ্ঞ হব। জেনে নিলেন সঙ্গে কে আছে। আমার মুরদটাও বললাম। 'আসছি' বলে আমায় বসিয়ে রেখে বাইরে গেলেন। ফিরলেন আমার একটি সিগারেট শেষ হবার পর। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন আমার স্ত্রীকেও, কোলে আমার শিশুকন্যা। ঠিক পেছনে ট্রের উপর চা নিয়ে এল একজন বেয়ারা। লালমোহন দত্ত আমার স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন, 'একা দাঁড়িয়ে আছেন দেখে অনুমান করলাম আপনার শ্রীমতী। মিসেস্ চৌধুরী বলে ডাকতেই সাড়া দিলেন। নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। আপনারা চা খেয়ে চলে যান হোটেলে। কাছেই, আর ঘরটিও ভালো। আমার লোক পৌঁছে দিয়ে আসবে। মালগুলি এলে আমি হোটেলে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।' চা-এর সঙ্গে অতি উপাদেয় কেক্ খেলাম। উঠে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে আমিই বিব্রত বোধ করলাম। আগে থেকে হোটেল যে ঠিক করা ছিল না ওটা

যেন ওঁরই কর্তব্যের ক্রটি মুখের ভাবটা সেরকম। এই প্রৌঢ় সজ্জন মানুষটির ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হল শিলং-এর দিনগুলি ভালো যাবে। আর তাই হয়েছিল দীর্ঘ ছ'বছরের শিলং বাস।

প্রথম প্রভাত। আমার হোটেলের নাম 'পাইন ভিউ', 'পাইন উড্' নয়। দ্বিতীয় হোটেলটিতে থাকবার পয়সা আমার নেই। আমার হোটেলের নামটা যথাযথ। চারি দিকেই পাইন গাছের সারি। সারি বললে ঠিক হবে না, বন। কিন্তু সাজানো বন। মানুষের পরিকল্পনার স্বাক্ষর আছে। শিলং-এর যে উচ্চতা তাতে প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবে পাইন গাছের জন্ম দিতে পারে না। এই শহরের যখন পত্তন হয় তখন একটি পাইন গাছও ছিল না। সুদূর হিমালয় থেকে পাইনের চারা এনে লাগানো হয়। হিমালয় সুদূরই, বহুদূর। শিলং শহর খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটের সামান্য কম। অনেকটা পুব সীমান্তে, সেজন্য সূর্য ওঠে সকাল সকাল। ভোর ছ'টাতেই পাইন পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ল ঘরের জানলায়। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে গরম জামা গায়ে বাইরে এলাম। রোদ কি স্নিগ্ধ! আকাশটা কত বড়ো আর সুনীল! হাওয়া মুক্ত, পবিত্র, ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই। কি সুন্দর সকাল! সমস্ত পরিবেশটাই কবিতায় ভরা। ঘণ্টাখানেক হেঁটে বেড়িয়ে এলাম। উঁচুনিচু বেশি নেই, সম-মালভূমি, টেবিল-ল্যাণ্ড।

ফিরে এসে দেখলাম বিশ বাইশ বছরের দুটি তরুণ আমার অপেক্ষায়। একজন বাঙালি, নাম বললেন জিতেন দেব। দ্বিতীয় জন এই পাহাড়েরই ছেলে, নাম হেম স্যুয়েট, মুখে তার শিলং-এর নির্মল প্রভাতের মতো হাসি। জিতেন দেব হেম স্যুয়েটের পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন যে ভালো গান করেন এবং গিটার বাজান, আর হেম বললেন যে জিতেন ভালো কণ্ঠশিল্পী এবং বাঁশি ও তবলা

ভালো বাজাতে পারেন। কেউ নিজের কথা বলেন না, অপরের কথা বলেন, এটা বেশ ভালো লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম আমার কাছে আসা কোন প্রয়োজনে, আমার পরিচয়ই তো ওঁরা জানেন না। ওঁরা বললেন বিলক্ষণ জানেন। রেডিয়োর জন্য স্টুডিয়ো তৈরি হচ্ছে। গানের শিল্পীরা ঘন ঘন যান সেখানে কাজ কতটা এগিয়েছে দেখতে। ওঁদের যেন তর সইছে না। গতকাল গিয়ে শুনেছেন কলকাতা থেকে প্রোগ্রামের একজন অফিসার আসবেন বিকেলের গাড়িতে। ওঁরা দুজন বাস-স্টেশনেও গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে মোটামুটি অনুমানও করতে পেরেছিলেন। লালমোহন দত্তর অফিসে গিয়ে পরে জেনে নিয়েছেন। তাই সকাল সকালই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। খুব ভালো লাগল ওঁদের সঙ্গে কথা বলে। মাঝে মাঝে অফিসে এসে দেখা করতে বলে বিদায় জানালাম ওঁদের।

দশটার সময় হাজির হলাম রেডিয়ো স্টেশনে বদলির আদেশটি হাতে নিয়ে। নির্দেশ ছিল ইন্‌স্টলেশন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে রিপোর্ট করার। একটি বেতার-কেন্দ্র চালু হবার আট-নয় মাস আগে থেকেই স্টুডিয়ো তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায়। কেন্দ্রটি যদি খুব বড়ো হয়, স্টুডিয়ো সংখ্যা বেশি, তা হলে আরো আগেই কাজ আরম্ভ হয়। শিলং-এ মাত্র দুটি স্টুডিয়ো হবে আর একই সঙ্গে যুক্তভাবে গৌহাটি কেন্দ্রও চলবে। রাজ্যের রাজধানী শিলং, এখানে আছেন রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ, বিধানসভার অধিবেশনও এখানেই বসে। কাজেই শিলং-গৌহাটি রেডিয়োর হেডকোয়ার্টার হল শিলং-এ। এখানেই হবে স্টেশন ডিরেক্টরের দপ্তর।

আসাম সরকারের কাছ থেকে শিলং রেডিয়োর জন্য যে বাড়িটি পাওয়া গেল সেটি অসাধারণ সুন্দর। বিধান পরিষদের জন্য বাড়িটি তৈরি হয়েছিল। একেবারে ওয়ার্ড লেক্-এর উপর— পশ্চিম পারে।

সামনে অপূর্ব দৃশ্য। বিধান পরিষদ উঠিয়ে দেবার পর সম্পূর্ণ বাড়িটিই রেডিয়োর কাছে ভাড়া দেওয়া হল। ইন্‌স্টলেশন ইঞ্জিনিয়ার কালিপদ মুখোপাধ্যায় শিলং এবং গৌহাটি দুটি কেন্দ্রেরই স্টুডিয়ো তৈরির দায়িত্বভার গ্রহণ করে শিলং-এ রয়েছেন। অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমায় বললেন যে প্রোগ্রাম বিভাগে আমিই প্রথম এখানে এসেছি। আজই বিকেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টরের আসার কথা। উনি এলে প্রোগ্রামের কাজ আস্তে আস্তে শুরু হবে। সমস্ত বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন, স্টুডিয়োর কাজ কতটুকু এগিয়েছে তাও দেখলাম। আমার মনে হল আরো অন্তত দুই মাস লাগবে কাজ শেষ হতে। এই সময়টা প্রোগ্রাম প্রস্তুতির জন্য লেগে যাবে। অডিশনের মাধ্যমে শিল্পী নির্বাচন করতে হবে সংগীতের, নাটকের। এর আগেই ঘোষকের নির্বাচন শেষ করতে হবে। স্কুলে কলেজে গিয়ে কথিকার জন্য শিক্ষক অধ্যাপক মশায়দের সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন। নিয়োগ করতে হবে স্টাফ আর্টিস্টদের, গানের সঙ্গে যাঁরা বাজাবেন। গীতিকারদের সঙ্গেও যোগাযোগ করার দরকার। একেবারে শুরু থেকেই শুরু করতে হবে, নূতন একটি রেডিয়ো স্টেশনের গোড়াপত্তন।

ইন্‌স্টলেশন ইঞ্জিনিয়ার কালিপদ মুখোপাধ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বললেন, 'আজ থেকেই একটি গাড়ি আসাম সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে রেখেছি। আপনি শহরটা সার্ভে করুন, লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অন্তত লোকে জানুক যে প্রারম্ভিক কাজ অর্থাৎ "স্পেড্-ওয়ার্ক" যাকে বলে, সেটা আরম্ভ হয়ে গেছে।'

গাড়ি নিয়ে গোটা শহরটা ঘুরে দেখলাম। পশ্চিমে বড়োবাজার থেকে পুবে নংথুমাই এবং দক্ষিণে লাবাণের শেষ প্রান্ত থেকে উত্তরে গল্‌ফ্ কোর্স পর্যন্ত। ড্রাইভারের কাছে শুনলাম যে গল্‌ফ্ খেলার

এই মাঠ পৃথিবীবিখ্যাত। কিন্তু সবটা ঘুরে দেখার সময় নেই আমার। বাদ্যযন্ত্রের দোকান দেখলাম দু-তিনটি। গাড়ি থামিয়ে একটি বড়ো দোকানে ঢুকলাম। মালিক মাখনবাবু। তবলা বাঁয়া আছে। একরকম চলনসই। তানপুরাও আছে, খুবই সাধারণ। যন্ত্র মেরামতের কাজ এবং তবলা ছাউনির কাজও হয়। ঐ দোকানেই গানের মাস্টার মতি মিঞা, জিতেন রায়চৌধুরী সংগীতবিশারদ, এঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অফিসে আসবার অনুরোধ জানালাম এঁদের। তার পরই গেলাম ডিরেক্টর অব পাবলিসিটির অফিসে।

ডিরেক্টরের নাম সুরেশ ভট্টাচার্য। বাঙালি কিনা বুঝতে পারলাম না। বয়সটা মধ্যপঞ্চাশে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গৌরকান্তি। ইংরেজিতে নিজের পরিচয় দিতেই তিনি বাংলায় শুরু করলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজটা আমাদের হয়ে অনেকটাই করে দেবেন তিনি। আর এটা তো ওঁর বিভাগেরই কর্তব্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করে ফেললেন। বাংলা বলছিলেন নিখুঁত উচ্চারণে। তবু জিজ্ঞাসা করি কী ভাবে তিনি বাঙালি কিনা। শুনেছি আসামের শিক্ষিতজনদের মধ্যে অনেকেই ভালো বাংলা বলতে পারেন। এর পর লেডি কীন্ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতে যাব শুনে ভট্টাচার্যমশায় নিজেও আমার গাড়িতে উঠে বসলেন। আমার সুবিধাই হল। স্থানীয় বড়ো একজন অফিসার সঙ্গে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ করাটা সহজ হয়। প্রিন্সিপ্যালের নাম উষা ভট্টাচার্য। তাঁকে অফিসেই পাওয়া গেল, তখন ক্লাসে ছিলেন না। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুরেশ ভট্টাচার্য বললেন যে উষা ভট্টাচার্য ওঁর বোন।

শিলং-এর উষা ভট্টাচার্য নামটা পরিচিত। কোথায় শুনেছি বা পড়েছি মনে পড়ছে না। স্মরণশক্তিকে ধিক্কার দিচ্ছি। কথা বলছি। কিন্তু মনের গভীরে হাতড়ে চলছি কোথায় আগে পেয়েছি

এই নাম। মনে পড়ে গেল। উষা ভট্টাচার্যকে যখন বললাম যে ওঁর কথা আমি পড়েছি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় তখন মহিলার মুখে খুশিতে আনন্দোচ্ছল একটি কিশোরীকে দেখতে পেলাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে জানাশোনা সবাইকে রেডিয়োতে যোগাযোগ করতে বলবেন। ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। সুরেশ ভট্টাচার্যকে নিজের অফিসে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম আমি।

বিকেলে বের হয়ে দেখা করতে গেলাম দেবেশ দাশ I. C. S.-এর সঙ্গে। তিনি অ্যাডিশন্যাল চীফ সেক্রেটারি আসাম সরকারের। সাহিত্যচর্চা করেন। নাম আগেই শুনেছি। শ্রীমতী দাশ— কমলা দাশ, বিদুষী, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। ভদ্রতায়, আন্তরিকতায় উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা। অজানা এই জায়গায় মস্ত বড়ো এক বাঙালি রাজপুরুষের গৃহে এমন মধুর সহৃদয় ব্যবহারে বুক আমার ভরে গেল। দাশসাহেব এখানকার বাঙালি সমাজের শিরোমণি। বাঙালির সব সাংস্কৃতিক ব্যাপারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দাশ-দম্পতির কাছে এখানকার বাঙালিদের সংগীত, সাহিত্য-চর্চার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করলাম। শিলং-এর সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালির অবদানই বেশি। উৎসব তো একটা-না-একটা লেগেই আছে, নাচ, গান, থিয়েটারের। সাহিত্যবাসর প্রতি শনিবার। দাশসাহেব আরো বললেন যে এখানকার অসমীয়া সমাজও সাহিত্য সংগীতে খুবই অনুরাগী। আর খাসি ছেলেমেয়ে সবাই তো গান গাইতে পারে। শ্রীমতী দাশ বললেন যে শহরটা যেমন সুন্দর মানুষগুলিও সুন্দর এই শহরের। শুধু বাইরে নয়, ভিতরেও। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে প্রীতি ও সৌহার্দ্য। খুব ভালো লাগল এঁদের সঙ্গে কথা বলে। জানাও গেল অনেক। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেবার আগে আবার আসব এই প্রতিশ্রুতি দিতে হল।

পাশেই চীফ সেক্রেটারি দেশাই সাহেবের বাংলো। সন্ধে সাড়ে ছ'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ঠিক সময়েই হাজির হলাম। মিস্টার দেশাই দুহাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে বসালেন।

বললেন, 'তুমি আমার জামাইয়ের সহকর্মী; সুতরাং তুমি আমাদের আপনার লোক। আমার জামাই এখনই যে-কোনো মুহূর্তে এসে পৌঁছে যাবে। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার গেছে বাস স্ট্যাণ্ডে।'

বলতে বলতেই একটি গাড়ি এসে গাড়ি-বারান্দায় থামল। জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বললেন যে জামাই এবং মেয়ে এসে গেছে। আমাকে একটু বসতে বলে তিনি বাইরে গেলেন। আমি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। দেশাই সাহেবের জামাতা কোন পোস্টে আসছেন রেডিয়োতে? খানিক বাদে মেয়ে জামাইকে নিয়ে ড্রয়িং রুমে এলেন মিস্টার দেশাই।

পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন জামাইকে, 'ইনি তোমার সহকর্মী, এইমাত্র দেখা করতে এসেছেন আমার সঙ্গে। ভালো হল, তুমিও এখানেই পেয়ে গেলে ওঁকে। এখন তোমরা একটু কথাবার্তা বলে নাও নিজেদের মধ্যে।'

আমি দেশাই সাহেবকে বললাম যে দীর্ঘ পথচলার শেষে উনি নিশ্চয়ই শ্রান্ত। এখন পরস্পর পরিচয় লাভের সুযোগটাই মাত্র নেব খুব সংক্ষেপে। নমস্কার বিনিময়ের পর নাম জানা-জানি। ওঁর নাম ক্ষিতীশ গণেশ জাথার। জাথার এবং বেরীর লেখা ইকনমিক্স্-এর বই পড়ানো হয়। ইনি সেই জাথারের সুযোগ্য পুত্র। রেডিয়োতে এর আগে কাজ করেন নি। এই প্রথম চাকরি করা জীবনে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টর হিসেবে শিলং কেন্দ্রে আগামী কাল কার্যভার গ্রহণ করবেন। মানুষটির খুব মিষ্টি ব্যবহার, চেহারাও জামাই জামাই। এমন মানুষের সঙ্গে কাজ করতে

অসুবিধা হবার কথা নয়। কাল অফিসে দেখা হবে এই বলে বিদায় নিলাম।

সারাদিন ঘোরাঘুরি কম হয় নি। কিন্তু কোনো ক্লান্তি নেই এখানে। রাস্তায় এখন আর লোকজনের ভিড় নেই। রাত তো বেশি হয় নি। প্রায় জনশূন্য রাস্তা। পাহাড়ের মানুষ সন্ধের পর বাইরে থাকে না দেখলাম। কোনো কোলাহল নেই, ট্রাম বাস লরির কানফাটা আওয়াজ নেই, চার দিকে একটা নীরব প্রশান্তি। দূরের বাতিগুলোকে পাহাড়ে হেলান দেওয়া দীপান্বিতার প্রদীপের সারি মনে হয়। এ যেন এক মায়াময় স্বপ্নরাজ্য। পুলিস-বাজারে পৌঁছে মানুষের চলাচল দেখতে পেলাম। রাজ্যবিধান সভার একটু পশ্চিমে পুলিস-বাজারের পুলিস পয়েন্টে মিশেছে সাতটি রাস্তা। মনে হবে এই পুলিস পয়েন্ট থেকে বের হয়ে সাতটি রাস্তা শহরের সাত দিকে চলেছে। গৌহাটি রোডের দুই পাশে বড়ো বড়ো দোকানগুলি। মারকেটিং সেণ্টার এবং শহরের 'ডাউন টাউন' এই পুলিস-বাজার। পুলিস-বাজার পার হয়ে ফিরে এলাম হোটেলে, দিনের কাজ শেষ। গরম জলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নেবার পর লেখার টেবিলে বসে ডায়ারির পাতা খুললাম।

পরের দিন অফিসে এলাম যথাসময়ে। প্রায় একই সময়ে এলেন জাথার সাহেব। আমরা ইন্স্টলেশন ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে গিয়ে বসলাম। কিন্তু কিসের উপর বসলাম? প্যাকিং বক্স্-এর উপর পিসবোর্ড এঁটে আসন করা হয়েছে ক'খানা। আগের দিন এই ঘরে বেশ কয়েকটি ভালো চেয়ার দেখেছি। মিস্টার মুখোপাধ্যায় বললেন যে একটি ছোটো টেবিল এবং চারখানা চেয়ার এ ঘর থেকে তুলে নিয়ে পাশে আর-একটি ঘরে দেওয়া হয়েছে যাতে জাথার সাহেব এবং আমার একটু সাময়িক বসবার ব্যবস্থা হয়। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন যে ফার্নিচারের জন্য কয়েকটি মূল্য তালিকা আনা হয়েছে।

সেগুলি পরীক্ষা করে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী অর্ডার দেওয়া যেতে পারে। ফার্নিচার না আসা পর্যন্ত এ ক'টা দিন কষ্ট করেই কাটাতে হবে। অ্যাকাউন্টেন্ট বা হেডক্লার্ক আসার আগে টাকা-পয়সার লেন-দেন আমরা করতে পারব না। তাই আমি মিস্টার মুখোপাধ্যায়কে কিছু কাগজ পেন্সিল, খাতাপত্রের ব্যবস্থা করতে বললাম। তৎক্ষণাৎ ওঁর ক্লার্ককে এগুলি আনার নির্দেশ দিলেন তিনি। ইন্‌স্টলেশন ইঞ্জিনিয়ার স্টুডিয়ো তৈরির ব্যাপারে যাবতীয় খরচ করতে পারবেন। কিন্তু আমরা স্টেশনের স্টাফ। আমাদের জন্য ইন্‌স্টলেশন অ্যাকাউন্টের টাকা খরচ করবার এক্তিয়ার নেই ওঁর। সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকাউন্ট। তবে বিশ পঁচিশ টাকার কাগজ কলম নিজের অ্যাকাউন্টে দেখাতে পারবেন। আর-একটা বিষয়েও রাজী হয়ে গেলেন মিস্টার মুখো-পাধ্যায়। আমার অনুরোধে একটি বড়ো কার্পেট একটা ঘরের জন্য দিতে রাজী হলেন। এই ঘরটি হবে আমাদের সাময়িক স্টুডিয়ো। শিল্পীদের অডিশন নেওয়া হবে এই ঘরে। মাইক্রোফোনের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। অন্য ঘর থেকে শোনবার জন্য স্পীকারও লাগানো হল। কোনো অসুবিধা নেই কার্পেট কিনতে। শিলং-এর মতো শীতের দেশে প্রত্যেক স্টুডিয়োর জন্য পুরু উলের কার্পেটই লাগবে। পরে এই কার্পেটটি স্টুডিয়োতে নিয়ে গেলেই হবে। স্টুডিয়ো সাজাতে যাবতীয় খরচ ইন্‌স্টলেশন ইঞ্জিনিয়ারের।

এ-সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পর উঠতে যাচ্ছিলাম এমন সময় মিস্টার মুখোপাধ্যায় বললেন, 'বসুন মশায়, আসল কাজটাই তো বাকি। কাজের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে গেলে ভণ্ডুল লেগে যাবে।'

জাথার সাহেবের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে নজর ফেরালেন আমার দিকে। একটি যেন মজার ব্যাপার আছে আঁচ করলাম।

তিনি বললেন, 'এই জাথার সাহেবের বিষয়ে কি ভাবলেন?

আরে মশাই, এ ভদ্রলোক এসেছেন সুদূর ধারওয়ার থেকে এমন একটি ভালো চাকরি জুটিয়ে, তার ওপর বড়োলোক শ্বশুরের বাড়িতে বাস করে অফিস করবেন, অথচ এই উপলক্ষে আপনারা ওঁকে কিছু করবার সুযোগ দিচ্ছেন না। অন্তত ওঁকে সেলিব্রেট করবার সুযোগ দিন।'

জাথার সাহেব প্রসন্নচিত্তে ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করলেন। স্টুডিয়োর কাছেই শিলং-এর সব চেয়ে বড়ো কনফেকশনার 'মরেলো'। টাকা দিয়ে একজন পিওনকে পাঠানো হল, ব্যবস্থা শুধু আমাদের তিনজনের জন্যই নয়। ইনস্টলেশন স্টাফে আছেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার, দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং চার-পাঁচজন মেকানিক। সবাইকে এই জলযোগে ডাকা হল। ক্লার্ক এবং পিওনও বাদ পড়ল না। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ। পরিচয়ও হয়ে গেল সবার সঙ্গে।

এবার ইনস্টলেশন ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার মুখোপাধ্যায় শিলং-গৌহাটি কেন্দ্র যুক্তভাবে কী করে কাজ করবে সে বিষয়ে বলতে শুরু করলেন। দুই স্টুডিয়োর ব্যবধান প্রায় চৌষট্টি মাইল হলেও টেলিফোন যোগাযোগ থাকবে সব সময়ের জন্য। একটা আলাদা নিজস্ব টেলিফোন লাইন থাকবে দুই স্টুডিয়োর মধ্যে। দু জায়গাতেই ভিন্ন [illegible] ট্রানস্‌মিটার থাকবে। গৌহাটির ট্রানস্‌মিটার বেশি শক্তিশা[illegible]রেই এ[illegible] কিলো ওয়াট শক্তির মিডিয়ম ওয়েভ। শিলং-এর ট্রান[illegible] না, অনেক কম শক্তিশালী। মিস্টার মুখোপাধ্যায় বললেন যে এ[illegible] সঙ্গে দুটি ট্রানস্‌মিটারই চলবে। কিন্তু দুটি স্টুডিয়ো একসঙ্গে চালু থাকবে না। দুই স্টুডিয়োর নিজস্ব অনুষ্ঠান একসঙ্গে ট্রানস্‌মিটারে যাবে না। যখন শিলং-এ অনুষ্ঠান হবে তখন সেই অনুষ্ঠান শিলং-এর ট্রানস্‌মিটারে তো যাবেই, টেলিফোন লাইনে শিলং-এর অনুষ্ঠান গৌহাটির ট্রানস্‌মিটারেও যাবে। অনুরূপ ব্যবস্থা

যখন গৌহাটি স্টুডিয়ো থেকে প্রোগ্রাম চলবে। পর্যায়ক্রমে একবার শিলং স্টুডিয়োর এবং পরের বার গৌহাটি স্টুডিয়োর প্রোগ্রাম একই সঙ্গে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে দুই ট্রান্স্মিটার থেকেই প্রচারিত হবে। বুঝতে পারা গেল এ ব্যাপারে সযত্ন সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম শিলং এবং গৌহাটির ট্রান্স্মিটারের প্রচারের পরিধি কত হবে। মিস্টার মুখোপাধ্যায় জানালেন শিলং-এর ট্রান্স্মিটার প্রায় বিশ মাইল দূরের শ্রোতার কাছে অনুষ্ঠান পৌঁছে দিতে পারবে। গৌহাটি ট্রান্স্মিটার থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনতে পাওয়া যাবে ৫০।৬০ মাইল দূর থেকে। তিনি আরো বললেন যে দুই স্টুডিয়োর মধ্যে অনিবার্য কারণে যদি টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তবে আকাশপথে, যাকে এয়ার রিসেপ্শন বলে, এক কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অন্য কেন্দ্র ধরতে পারবে না। আকাশপথে গৌহাটি থেকে শিলং-এর প্রোগ্রাম পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, আর মাঝে পাহাড় থাকায় গৌহাটির প্রোগ্রামও শিলং থেকে ধরা যাবে না। এ বিষয়ে টেলিফোন ডিপার্টমেণ্ট এই লাইন সব সময় ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। একটু হেসে মিস্টার মুখোপাধ্যায় বললেন যে ভাড়া তো আর কম নিচ্ছে না।

আমি জানতে চাইলাম যে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানের গঠন সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দিল্লী থেকে এসেছে কিনা। যাচ্ছিলাছুই আসে নি। আমি নিবেদন করলাম যে আমরা নিঃসন্দেহে, আসলনিতে পারি যে প্রচারের মুখ্য ভাষা হবে অসমীয়া, যেহেতু এই গেগদ্ধে কেন্দ্র আসামে খোলা হচ্ছে। সুতরাং অসমীয়া গান— আধুনিক, লোকসংগীত এ-সব অনুষ্ঠান-সূচীর ভিতর থাকবেই। কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন আধঘণ্টার অসমীয়া প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। কাজেই এই গান সম্পর্কে আমার আইডিয়া আছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের

কোনো সীমানা নেই। আর অনুষ্ঠানে কথিকা থাকবে, অসমীয়া এবং ইংরেজি ভাষায়। খাসি এবং জয়ন্তিয়া ভাষাতেও কিছু অনুষ্ঠান নিশ্চয় হবে। এ দুটি ভাষা জানি না আমরা। আপাতত এ দুই ভাষার কথা না ভেবে সংগীতের অডিশন শুরু করা যেতে পারে। জাথার সাহেবও গানবাজনা জানেন। আমাদের দুজনকে নিয়েই আপাতত অডিশন কমিটি গঠিত হবে। এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন জাথার সাহেব। অভিজ্ঞ মিস্টার মুখোপাধ্যায়ও সায় দিলেন। সেদিনই এই মর্মে এক চিঠি পাঠানো হল দিল্লীতে অনুমোদনের জন্য। আর সেটা পেতেও দেরি হল না। অডিশন শুরু হল।

কথা আছে না লেডিজ ফার্স্ট। প্রথম দিনের অডিশনে পাশ করলেন দুজন তরুণী শিল্পী। প্রথম বন্দনা বরুয়া। তিনি বর্তমানে কলকাতাবাসী, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বরুয়া সাহেবের সহধর্মিণী। খুবই সুকণ্ঠী। যতটুকু জানি সংগীতজগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। দ্বিতীয় শিল্পী গিরিজা বরদলৈ, আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ মহাশয়ের কন্যা। পরে আরো পাস করলেন দীপালি বরবরা, তরুণ হাজারিকা, পরিমল বরুয়া, লোহিত কাকতি, ধীরেন দাস, কমল হাজারিকা, যোগেন গগৈ, হরিপ্রসাদ দাস, রুদ্র বরুয়া। রুদ্র বরুয়া এখন আসাম সরকারের অধীনে সংগীতের ব্যাপারেই একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। এঁদের কণ্ঠ খুব অনুশীলিত ছিল না, কিন্তু আওয়াজ কি সুমধুর! পরিষ্কার খোলা আওয়াজ, ধ্বনি সুকোমল, উপরে নীচে অনেকটা খেলে। এটা প্রকৃতির দান। মুক্ত পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় গলা ভালো থাকবেই।

শিশিরকণা দে নামে এক শিল্পী অডিশন পাস করলেন বেহালায়। অডিশনের অল্প সময়ের বাজনাতেই প্রতিভার ঝলক দেখতে পেলাম। শিশিরকণার পরিণত বয়সের বাজনা শুনে

দেশের সকল প্রান্তের শ্রোতা মুগ্ধ হয়েছে। শিশিরকণাকে খুব কাছে থেকে গড়ে উঠতে দেখেছি। নিষ্ঠা আর ভাবনার কোনো ঘাটতি ছিল না বলেই তাদৃশী সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। শিশিরকণা শিখতে শুরু করলেন উস্তাদ মতি মিঞার কাছে। তার পর বাহান্ন সনের গ্রীষ্মে লক্ষ্ণৌ থেকে ভি. জি. যোগ এলেন শিশিরকণাকে শেখাতে, রইলেন প্রায় তিনমাস। আসা যাওয়া এবং শিলং-এর মতো মহার্ঘ জায়গায় ভালো হোটেলে থাকার সমস্ত খরচই অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করলেন শিশিরকণার সংগীতপ্রিয় পিতৃদেব ডাক্তার বিমল দে। গুরু প্রণামীও ভালোই ছিল। কিন্তু বাপের খরচ সার্থক হল। তালিমের সময় সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা, তার পর তিনঘণ্টা সময়ের ভিতর স্নান, আহার, বিশ্রাম। আবার বিকেল তিনটে থেকে রাত আটটা অবধি। গুরুর অকৃপণ দান কঠোর সাধনায় আয়ত্ত করতে শুরু করলেন শিশিরকণা। শিক্ষা এবং অনুশীলন চলল প্রতিদিন।

আমাদের অডিশনে উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পী আরো কয়েকজন পাস করলেন যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীতে। আমরা নিজস্ব যন্ত্রীদেরও পেয়ে গেলাম এঁদের মধ্য থেকেই। বেহালা, এস্রাজ, তবলা, বাঁশি, সেতার, গিটার, এই-সব যন্ত্র বাজিয়েকে শিলং-এ পেয়ে গেলাম। একজনকেও বাইরে থেকে আনাতে হয় নি। এটা কিন্তু গৌহাটিতে সম্ভব হয় নি। গৌহাটির জন্য অধিকাংশ যন্ত্রীকে আসামের বাইরে থেকেই আনাতে হল। এর প্রথম কারণ এই যে দেশবিভাগের পর বেশ কয়েকজন শিল্পী জীবিকার খোঁজে সিলেট থেকে শিলং চলে এসেছিলেন। দ্বিতীয়ত বিজনী, রূপশি, গোয়ালপাড়ার বড়ো বড়ো জমিদারগণ শিলং-এ স্থায়ীভাবে বাস করতেন। এঁরা সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই এই পাহাড়ী শহরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা ছিল অনেক দিন থেকে। এই কারণেই শিশিরকণার

মতো শিল্পীর জন্ম সম্ভব হল শিলং-এ। শিলং-এর মেয়ে বেলা চৌধুরীও বিধাতার অভিশাপ নিয়ে পৃথিবীতে যদি না আসতেন, অন্ধ যদি না হতেন, তবে আজ ভারতের প্রথম সারির শিল্পীরূপেই স্বীকৃতি লাভ করতে পারতেন এ বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। শিলং-এ যেটা সম্ভব হল, অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব যন্ত্রী পাওয়া গেল, পঁচিশ বছর পরও বাঙালির শহর শিলচরে সেটা সম্ভব হল না। রেডিয়ো স্টেশন চালু হল শিলচরে বাহাত্তর সনে। একজন যন্ত্রীও পাওয়া গেল না সেখানে। সব যন্ত্রীকে আনাতে হল বাইরে থেকে। তখনকার দিনে অডিশনের জন্য প্রার্থীদের কাছ থেকে অডিশন ফি নেবার নিয়ম ছিল না। চিঠি পেলেই অডিশনের জন্য ডাকা হত। শিলং-এ আমরা চিঠির জন্যও অপেক্ষা করতাম না। রবিবার বা বন্ধের দিন বাদে বিকেল দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অডিশন নেওয়া হত। মাস খানেকের মধ্যে আমাদের শিল্পীসংখ্যা মন্দ হল না।

ইতিমধ্যে স্টেশন ডিরেক্টর এসে গেলেন। পুরুষ নন। মেহ্‌রা মাসানী নামে এক মহিলা। রেডিয়োতে এই প্রথম নারী স্টেশন ডিরেক্টর। স্যার রুস্তম মাসানীর কন্যা, মিনু মাসানীর ছোটো বোন। লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স্-এর স্নাতক। ব্যক্তিত্বটা এত বড়ো ছিল যে কিছুদিন পর শিলং ছেড়ে তাঁর চলে যাওয়ার আগে বুঝতে পারি নি তিনি যুবতী এবং দারুণ রূপসী ছিলেন। স্টেশন ডিরেক্টর আসার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ যেন বিদ্যুতের গতিতে এগিয়ে চলল। কি করতে হবে, আগে কোন কাজটা, সে-সব বিষয়ে স্পষ্ট লিখিত নির্দেশ পেতে লাগলাম। যাকে বলে সুষ্ঠু পরিচালনা তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল। অথচ এত উঁচু পদের মানুষটির তুলনায় আমি যে মইয়ের এত নীচে রয়েছি সে দূরত্বটা বুঝতে দিতেন না। ঘন ঘন ডেকে পাঠাতেন না। জরুরি কিছু হঠাৎ করণীয় থাকলে নিজে এসে বলে যেতেন। এরকম কর্ত্রী পেয়ে সবাই খুশি।

স্টেশন ডিরেক্টর আসার আগেই হেড ক্লার্ক, অ্যাকাউন্টেন্ট এসে গিয়েছিলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই করণিকের সব পদেই লোক নেওয়া হল। গৌহাটিতেও তাই। ওখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর এলেন এ. এস. থিয়োডোর, মাদ্রাজ থেকে বদলি হয়ে। এখন শুধু প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং পরিচালনার ভার যাঁদের উপর থাকবে সেই প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগটাই বাকি। প্রোগ্রাম অফিসার মাত্র দুজনই ডিপার্টমেন্টের পুরনো লোক কলকাতা থেকে এসেছেন। আমি শিলং-এ। ইউ. এল. বরুয়া প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ গৌহাটিতে। অন্তত আরো সাত-আটজন অফিসার নিয়োগ করতে হবে যার জন্য বেশ কিছুদিন আগেই বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। সিলেক্‌শন্‌ বোর্ড বসল শিলং-এ নির্দিষ্ট দিনে। প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নির্বাচিত হলেন সৈয়দ আবদুল মালিক, সত্যপ্রসাদ বরুয়া, ফণী তালুকদার, ভূপেন হাজারিকা, মৃগেন রায়চৌধুরী, নারায়ণ বেজবরুয়া, বীরেন ফুকন, রোশনারা খাতুন, মুনিন বরকটকী এবং নয়রঞ্জন বরা। মোট দশজন। শেষোক্ত নয়রঞ্জন বরা দিল্লীপ্রবাসী অসমীয়া সন্তান। জন্ম, পড়াশুনা সেখানেই শুনেছি। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি শিলং এসেছেন। এসেই তিনি 'প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করলেন। তিনি ছাড়া শিলং-এ এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় সভ্য কেউ ছিলেন বলে শুনি নি। হয়তো ছিলেন, আমরা জানি না।

এই সময়ে 'জনগণমন অধিনায়ক' গানখানি ভারতের জাতীয় সংগীত নির্বাচিত হওয়ার সিদ্ধান্তে সমগ্র আসামে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শোনা যেতে থাকে যে এই গানটি পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে গণ-আন্দোলন চালানো হবে। কারণ, এ গানে আসামের উল্লেখ নেই। প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নয়রঞ্জন বরা স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে সর্বপ্রকার সহ-

যোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচনের বিরোধিতা করা অর্থহীন, এ কথা বললেন। রেডিয়োর কাজে যোগ দিয়ে তিনি নামের প্রথম অংশটা ছেঁটে দিয়ে শুধু রঞ্জন হয়ে রইলেন।

শিলং অফিসে কাজে যোগ দিলেন ভূপেন হাজারিকা, নারায়ণ বেজবরুয়া এবং রঞ্জন বরা। বাকিরা গৌহাটি অফিসে যোগ দিলেন। মুনিন বরকটকী এলেন আরো কিছুদিন পর শিলং অফিসে। শিলং কেন্দ্রের জন্য ঘোষক নিযুক্ত হলেন পদ্ম বরকটকী এবং জ্ঞানদা কাকতি। বরকটকী কবি, গীতিকার; সাংবাদিকতাও করেছেন আগে। জ্ঞানদা কাকতি পরবর্তীকালে চিত্রজগতে খ্যাতিলাভ করেছেন। একজন প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভও বদলি হয়ে এলেন শিলং-এ দিল্লীর এক্‌স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিস থেকে, নাম নন্দলাল চাউলা। স্টাফ পুরোপুরি হয়ে গেল। স্টুডিয়োর কাজও শেষ হতে চলল।

প্রোগ্রামের মধ্যে কিছুটা সংযোজন হল। এই পাহাড়ে দুটি জাতির বাস, খাসি এবং জয়ন্তিয়া। একই মানবগোষ্ঠীর সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাষা ভিন্ন। এই দুই ভাষাতেই আধ ঘণ্টা করে প্রোগ্রাম হবে, খাসি প্রোগ্রাম সপ্তাহে চারদিন, জয়ন্তিয়া প্রোগ্রাম তিনদিন। এস. জি. নালে নামে একজন অ্যাডভোকেটকে নিযুক্ত করা হল খাসি অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য। জয়ন্তিয়া প্রোগ্রামের পরিচালক নিযুক্ত হলেন পি. আর. কিণ্ডিয়া। এস. জি. নালে প্রোগ্রামের কাজে অতি নিষ্ঠাবান। মানুষটি শিশুর মতো সরল। এ মানুষ উকিল হলেন কিভাবে! পি. আর. কিণ্ডিয়া অতি উৎসাহী চালাক চতুর ছেলে। মুখে হাসি লেগেই আছে। পরবর্তীকালে মেঘালয়ে একজন নেতা হলেন। কিছুদিন মন্ত্রীও ছিলেন।

খাসি, জয়ন্তিয়া দুটি ভাষাই লেখা হয় রোমান হরফে। তখনো কোনো সাহিত্যকর্ম নেই দুটির একটি ভাষাতেও। পাশাপাশি এই

দুই ভিন্ন ভাষাভাষীর বাস। আমার দীর্ঘ শিলং বাসের কালে এদের মধ্যে কখনো রেষারেষি লক্ষ্য করি নি। আগে বা পরে কখনো হয়েছে তাও শুনি নি। সুন্দর প্রীতির সম্পর্ক নিত্যকালের। আদিবাসী, গিরিজনদের মধ্যে থেকেছি অনেক কাল বিভিন্ন রাজ্যে। কিন্তু খাসি এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মানুষদের মতো এমন সোজা নিরীহ প্রকৃতির মানুষ কমই দেখেছি। কোনো তিক্ততার স্মৃতি নেই।

প্রোগ্রাম বিভাগে আমরা প্রস্তুত। স্টুডিয়ো তৈরির কাজও শেষ। স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার এলেন সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফও সবাই এসে গেছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ইন্‌স্টলেশন ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে স্টুডিয়োর দায়িত্ব গ্রহণ করে নিল। এবার শিলং এবং গৌহাটি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সুষ্ঠু এবং সুচারুভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য মিটিং ডাকা হল। গৌহাটি থেকে এলেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টর মিস্টার থিয়োডোর, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ। অনুপুঙ্খ আলোচনার পর ঠিক হল যে দৈনন্দিন অনুষ্ঠান তালিকায় কোন কেন্দ্র থেকে কি কি অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে তা স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে। দুই কেন্দ্রের ডিউটি অফিসার অধিবেশন শুরু হবার আগে ভালো করে অনুষ্ঠান-সূচী মিলিয়ে নেবেন টেলিফোন লাইনে। একটি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান-শেষে অন্য কেন্দ্রে যাবার আগে বিশেষ সাংকেতিক ঘোষণা থাকবে। সংবাদ বা দিল্লী থেকে অন্য কিছু অনুষ্ঠান রিলে করার কালে দুই কেন্দ্রের ডিউটি অফিসার প্রয়োজনবোধে আবার প্রোগ্রাম মিলিয়ে নেবেন। দুই স্টুডিয়োর ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে নিতে হবে। এবং ডিউটি অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ারদের সর্বক্ষণ সতর্ক এবং তৎপর থাকতে হবে। এই মিটিং-এ স্টেশন চালু করার দিনও ঠিক করা হল। বিশেষ উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্টেশনের প্রোগ্রাম ট্রান্‌স্‌মিটার থেকে প্রথম প্রচার করা হবে।

পৌরোহিত্য করবেন রাজ্যপাল স্যার আকবর হাইদারি। দিল্লীর কর্তৃপক্ষ রাজ্যপালকে উদ্‌বোধন করবার আমন্ত্রণ জানাবেন।

গৌহাটির অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর থিয়োডোরকে এই প্রথম দেখলাম। ওঁর স্বাস্থ্য শুধু ভালো নয়, একজন পালোয়ানের মতো দেখতে তিনি। মানুষটির বিনয়-নম্র স্বভাব। কয়েকদিন রইলেন শিলং-এ। একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বুঝতে পারলাম মানুষটির পিছুটান আছে। প্রমোশন-সহ বদলির আদেশ, গ্রহণ না করলে জীবনের সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবার ভয়। তাই এত দূরে গৌহাটিতে আসতে হল মাদ্রাজ থেকে। কিন্তু বাড়ির জন্য ভীষণ উদ্‌বেগ। একমাত্র ছেলে পোলিও রোগে আক্রান্ত। মোটামুটি চিকিৎসা যা সম্ভব চলছিল, এমন সময় প্রমোশনের আদেশ এল, কিন্তু বদলি-সহ। আজকের মতো তখনকার কালটা ছিল না। খুবই সীমিত সংখ্যক ছিল রেডিয়ো স্টেশন। প্রমোশন এমনই একটি দুর্লভ বস্তু যে নাম শুনেই শিহরণ জাগত। ভালো যদি কিছু এল জীবনে তার সঙ্গে বদলির এই লেজুড় কেন! অনেক দ্বিধা, চিন্তা-ভাবনার পর বদলি-সহ প্রমোশন নিলেন। থিয়োডোর এখনো বুঝতে পারছেন না তাঁর এই এত দূরে আসাটা, যেখান থেকে পরিবারের কোনো সাহায্য করাই সম্ভবপর নয়, সেটা কল্যাণজনক হল কিনা। এখন শুধু দুশ্চিন্তা ছাড়া কি আর করার আছে! তবে তিনি ঠিক করলেন স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলবেন। বললেনও কথা। তিনি স্টেশন ডিরেক্টরের অতিথি। খাবার টেবিলে কথাটা তুললেন। গৌহাটি ফিরে যাবার আগে থিয়োডোর সাহেব একটু প্রসন্ন মনে আমায় বলে গেলেন যে স্টেশন ডিরেক্টর খুবই সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর কথা শুনেছেন এবং এ বিষয়ে কিছু একটা করবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছেন। এ ব্যাপারে স্টেশন ডিরেক্টর যে কিছু ভেবেছেন সেটা বুঝতে পারলাম কিছুদিন পর।

স্টেশন চালু হবে জুলাই মাসের পয়লা তারিখ। রেডিয়োর সব অনুষ্ঠান অনেক আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হয়। শিল্পীদের কাছে কণ্ট্রাক্ট পাঠানো হল। সংগীত, কথিকা, নাটকের জন্য আলাদা আলাদা চুক্তিপত্র। চুক্তিপত্রে দিন ক্ষণ এবং অনুষ্ঠানটি কি বিষয়ে সেটা উল্লেখ করা থাকে। গান যদি হয় তবে কি ধরনের গান, কথিকা হলে তার বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে লেখা থাকে। এই প্রস্তাবে রাজী থাকলে শিল্পীকে সই করে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে হবে আমাদের কাছে। চুক্তিপত্রে অনেক অনেক শর্ত লেখা থাকে। ইংরেজি না-জানা সাধারণ মানুষের বুঝতে বেশ কষ্ট হয়। কষ্ট হবেই তো। ভাষাটা আইনের, সহজ সরল নয়। দক্ষিণা কত টাকা সেটাও পরিষ্কার ভাবে সংখ্যায় এবং কথায় লেখা থাকে।

সই-করা চুক্তিপত্র ফিরে আসতে লাগল শিল্পীদের কাছ থেকে। কিন্তু মুশকিল দেখা দিল। সই-করা চুক্তিপত্রের সঙ্গে কোনো কোনো খামের ভিতর দশটাকার নোটও পাওয়া গেল। অর্থাৎ উল্টো বুঝলেন শিল্পীরা। যেখানে রেডিয়ো থেকে শিল্পীকে দক্ষিণা দেওয়া হবে বলা হয়েছে, ইংরেজি না জানার ফলে শিল্পী মনে করলেন যে রেডিয়োকে টাকা দিয়ে গাইবার বা বাজাবার সুযোগ ক্রয় করতে হবে। দু-একজন আবার করুণমুখে চুক্তিপত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসে টাকাটা পরে দেবার আবেদন জানালেন।

আমাদের কাজ বেড়ে গেল। নিজে যাঁরা এলেন তাঁদের ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল। ওঁরাই রেডিয়ো থেকে টাকা পাবেন জেনে দারুণ খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। যাঁদের কাছ থেকে খামের ভিতর টাকা পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের ডেকে পাঠানো হল এবং এলে পর টাকা ফেরত দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হল। আর-একটা অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হল।

রেডিয়োর নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদিত গীতিকারের গানই শুধু

গাইতে দেওয়া হয় শিল্পীকে। কিন্তু তখন পর্যন্ত খুব বেশি সংখ্যক গীতিকারের সঙ্গে আমাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। শিল্পীদের বলা হল যে অনুমোদিত গীতিকারের গান আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। কিন্তু সুর দেবে কে সে গানে? এ ব্যাপারে অনেককে সাহায্য করলেন আমাদের জিতেন দেব, স্টাফ আর্টিস্ট। কিছুদিন পরেই বেশ কয়েকজন সুরকারকে দেখতে পেলাম এই শহরে। মন্দ করলেন না সুর। প্রোগ্রামের জন্য রিহার্সালেও ডাকা হল শিল্পীদের। একটি রেডিয়ো স্টেশন নূতন চালু হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কাজের অন্ত নেই। নবনিযুক্ত অফিসারদের কাছেও সব কিছুই নূতন। তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়াটাও প্রাথমিক উদ্যোগপর্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

উদ্‌বোধনের দিন সমস্ত শহরটাতে একটা থমথমে ভাব সকাল থেকে। অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে বিকেল সাড়ে চারটেয়। গভর্নর স্যার আকবর হাইদারি স্টেশন উদ্‌বোধন করবেন। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে গভর্নর যে ভাষণ দেবেন সেটিই আকাশে প্রচারিত হয়ে শ্রোতাদের কাছে চলে যাবে। সভা বসবে রেডিয়ো ভবনের সেই আগেকার বিধান পরিষদ হলে। এই হলটি স্টুডিয়ো থেকে একটু আলাদা।

'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিতে আসাম রাজ্যের নাম নেই বলে রেডিয়োর উদ্‌বোধন উপলক্ষে রেডিয়োর সামনে গণবিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে, সে খবর আমরা জানতে পেরেছি। স্টেশন ডিরেক্টর অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে আশঙ্কায় বেশ উদ্‌বিগ্ন। কিন্তু ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীএন. এ. এস. লক্ষ্মণম সেদিনই সকাল দশটা নাগাদ পৌঁছে গেলেন। স্টেশন ডিরেক্টর মিস্ মাসানী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ডি. জি.-র উপস্থিতিতে মিস্ মাসানী শুধু আদেশ পালন করবেন, আদেশ দেবার দায়িত্ব তাঁর আর রইল না এই সংকটময় পরিস্থিতিতে।

বিকেল তিনটে থেকেই রেডিয়ো ভবনের গেটের বাইরে লোক জমা হতে শুরু হল। সংখ্যা একটু একটু বাড়তেই লাগল। জনতা মারমুখী নয়। হাতে লাঠি সড়কি নেই, ইট পাটকেলও ছুড়ছে না। মাঝে মাঝে শ্লোগান শোনা যাচ্ছে। আগে থেকে ঠিক করা ব্যবস্থা অনুযায়ী স্টেশন ডিরেক্টর ঘোষিকা জ্ঞানদা কাকতিকে সঙ্গে নিয়ে স্টুডিয়োর ভেতরে ঢুকে গেলেন। স্টুডিয়োর দিকটা বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত। লোহার গ্রিল বন্ধ করে দেওয়া হল। নির্দিষ্ট সময়ে মিস্ মাসানীর কণ্ঠ আকাশে প্রথম ধ্বনিত হল। তিনি ইংরেজিতে ঘোষণা করলেন। জ্ঞানদা কাকতি অসমীয়ায়। এর পর 'জনগণমন অধিনায়ক' গান এবং গভর্নরের ভাষণ প্রচারিত হল। কিন্তু এই সময় জনতা উদ্‌বেল হয়ে উঠল। রেডিয়ো প্রাঙ্গণে ঢুকে গেল অনেক লোক। কিন্তু কোনো হিংসাত্মক কাজ করল না। দরজা জানলায় একটু করাঘাত মাত্র। একটি কাঁচও ভাঙল না। স্টেশন চালু হল। বিক্ষুব্ধ জনতা ধীরে ধীরে চলে গেল। প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়বার সময় পুলিস যেমন নীরব দর্শক ছিল, জনতার চলে যাবার সময়ও পুলিস শান্তভাবে সেটা নিরীক্ষণ করল। জনতা নিজেই সরে গেল। পুলিসকে কোনো পরিশ্রম করতে হল না। বিক্ষোভকারীদের আস্ফালন ছিল, হুমকি ছিল, ধ্বংস করার প্রবৃত্তি ছিল না। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল আমাদের গা থেকে। হাঙ্গামার যতটা ভয় ছিল সে তুলনায় তেমন কিছু গণ্ডগোল হয় নি। আর দুই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় হল। শান্তির নিশ্বাস ফেললাম।

আমি চাকরিতে যে পদে আছি সেখান থেকে ডিরেক্টর জেনারেল অনেক দূরের মানুষ, দ্যুলোকবাসী। তিনি রাজধানী থেকে শিলং এলেন শুধু একটি দিনের জন্য। দূর থেকে চেহারাটা দেখলাম। ডিপার্টমেন্টের সর্বোচ্চ অধিকারী, অসীম ক্ষমতা তাঁর হাতে। এত কাছে পেয়েও পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হল না সে কথা

ভাবছিলাম। মনে মনে খুব ইচ্ছা ছিল ডি. জি.-র সঙ্গে পরিচিত হতে।

সুযোগটা কিন্তু এসে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। স্টেশন চালু হবার ঠিক পরের দিন।

ভোর ছটার আগেই স্টুডিয়োতে চলে এসেছি। এমনিতে আমার আসার কথা নয়। কিন্তু নূতন যন্ত্রীরা কেমন বাজান, ঘোষক কিভাবে বলেন, রেকর্ড বাজান, সে-সব দেখবার প্রয়োজন বোধেই এসেছিলাম। সকালের অধিবেশন ভালোভাবেই উতরে গেল। নটা নাগাদ ঘরে বসে কাজ করছি এমন সময় ঘরে কেউ ঢুকলেন মনে হল। কোনো স্টাফ আর্টিস্ট হবে ভেবে চোখ তুলে আর তাকাই নি। কিন্তু একটি টুল টানার শব্দে মুখ তুলে দেখি স্বয়ং ডি. জি. টুলের উপর আমার টেবিলের সামনে বসছেন। মহাবিব্রত হয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুপ্রভাত জানাবার ভাষাও মুখ দিয়ে বের হল না। তিনিই বললেন, 'হ্যালো, ইয়ং ম্যান, গুড মর্নিং।' তাঁর বলার পর আমার মুখ থেকে 'গুড মর্নিং' বের হল। এত সকালে কেন এসেছি জানতে চাইলেন। খুব ভোরে আসার উদ্দেশ্য বললাম। আমাকে বসতে বললেন। কিন্তু বসি কি করে আমার চেয়ারে, তিনি টুলের উপর বসে আছেন। ঘরে আর একটি চেয়ারও নেই। হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন বসবার জন্য। ধপ্ করে বসে গেলাম। যেন কত দিনের চেনা এইভাবে ব্যক্তিগত খোঁজখবর নিলেন। কতদিন কাজ করছি রেডিয়োতে জিজ্ঞাসা করলেন। অন্তরঙ্গভাবে পারিবারিক বিষয়েও প্রশ্ন করলেন। তার পর তিনি বললেন যে প্রাতরাশের পর সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছেন একটু হাঁটতে। পাইন উড্ হোটেলের কাছেই শিলং-এর লেক। লেকের পারে বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেলেন রেডিয়োর বাড়ি। বেশ কাছেই, তাই এসে পড়লেন। স্টুডিয়োর দিক্‌টায় যান নি। ডিউটি অফিসারও

লক্ষ করেন নি। আর চৌকিদার হাফশার্ট গায়ে মানুষটিকে কেউকেটা কি করে ভাববে? ভেবেছে স্থানীয় কোনো লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মিনিট দশেক রইলেন ডি. জি.। অনেকটা সহজ হয়ে এলাম। বললেন যে বিকেলের 'গেট'-এ ফিরে যাবেন তিনি। সন্ধেয় গৌহাটিতে প্লেনে উঠবেন। দুপুরের পর কিছুক্ষণের জন্য অফিসে আসবেন বলে বিদায় নিলেন।

বড়ো রাজপুরুষের সাময়িক সান্নিধ্যে জীবন ধন্য হয়ে যায় না। কিন্তু সেই সকালে কিছুক্ষণের জন্যও তাঁর সহৃদয়তা আমায় অভিভূত করেছিল। তাঁর উদারতার আরো পরিচয় পেলাম কিছুদিন পরই।

ডি. জি. চলে যাওয়ার দশ-বারোদিন পর স্টেশন ডিরেক্টর আমায় ডেকে পাঠালেন। বললেন যে গৌহাটির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টর থিয়োডোরের সমস্যাটা ডি. জি.-র কাছে বলেছিলেন তিনি। থিয়োডোরকে আবার মাদ্রাজে ফিরিয়ে নিতে রাজী হয়েছেন ডি. জি.। একজন অফিসারকে প্রমোশন দিয়ে বদলি করে আবার দুই-তিন মাসের মধ্যেই আগের স্টেশনে ফিরিয়ে নেওয়া এবং তাও পদাবনতি না করে— এমন সদাশয়তার নজির সরকারি চাকরিতে বেশি দেখা যায় না। বেশিদিন রইলেন না এই ডি. জি. আমাদের ডিপার্টমেণ্টে। ঝড় নেমে এল তাঁর কর্মজীবনে। সে অন্য ইতিহাস।

স্টেশন ডিরেক্টর আমায় বললেন যে থিয়োডোরের জায়গায় তিনি একজন বাঙালিকে আনতে চান। কারণ একজন অবাঙালির চেয়ে একজন বাঙালির পক্ষে অসমীয়া ভাষাটা বুঝতে অসুবিধা কম হবে। তিনি বললেন যে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ এক বাঙালি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টরকে দিল্লী থেকে এখানে পাঠাবার কথা ভাবছেন। নামটাও বললেন। আমার খুবই পরিচিত। মনে হল স্টেশন ডিরেক্টর অন্য কোনো উপযুক্ত বাঙালির নাম আমার কাছ থেকে

শুনতে চান। এতদিন বোম্বাই-এ থাকায় তিনি সব বাঙালি অফিসারের নাম জানেন না। আমার পরিচিত কেউ আছেন কিনা জানতে চাইলেন। এক সেকেণ্ডও ভাবতে হল না। একটি নাম নিবেদন করলাম। তাঁর সম্পর্কে আমার এত উচ্চ ধারণা যে এক মুহূর্তও ভাবতে হল না। সেই অফিসার তখন কটকে প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ। ওঁকে আনাতে হলে প্রমোশন দিতে হবে। নামটি নোট করে আমায় বিদায় দিলেন মিস্ মাসানী। সেই বাঙালি অফিসারই কিছুকালের মধ্যে প্রমোশন পেয়ে গৌহাটিতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টরের পদে যোগ দিলেন।

দেবেশ দাশ মশায়ের বাড়িতে প্রায়ই আড্ডা বসত। তিনি গল্প পড়ে শোনাতেন, কোনো কোনোদিন স্বরচিত কবিতাও পাঠ করতেন। গানও লিখেছেন এবং সে গান গেয়ে শুনিয়েছেন শ্রীমতী কমলা দাশ। একদিন আমার হাতে ভাঁজকরা একটি কাগজ দিয়ে দাশসাহেব বললেন বাড়ি গিয়ে খুলে পড়তে।

বাড়িতে ফিরে কাগজখানা খুলে দেখি 'জনগণমন অধিনায়ক' গানখানি ; কিছুই বুঝতে পারি নি প্রথমে। ফের পড়লাম। দেখি অসম্ভব কাণ্ড! 'সিন্ধু' কথাটির জায়গায় 'অসম' কথাটি বসানো রয়েছে। এমন পরিবর্তন কি করে হতে পারে! করার অধিকারই বা কার? কিছুকাল পর বাঙালিদেরই এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'সিন্ধু'র বদলে 'অসম' বসিয়ে এই গানটি গাওয়া হল। ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদেরই এই অনুষ্ঠান। গানটি যখন গাওয়া হল শ্রোতাদের কেউ এই সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন না মনে হল। কিন্তু প্রধান অতিথি গভর্নর জয়রামদাস দৌলতরাম হঠাৎ সচকিত হলেন। বাংলা ভাষার এই গানের এই ছোটো পরিবর্তন গুজরাতের মানুষটি সঠিক বুঝতে পারলেন কি? দেবেশ দাশ মশায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হল। তিনি জানালেন, যে ব্যক্তি এই পরিবর্তনের কথা

ভেবেছেন তাঁর অভিমত এই যে আসামের জনগণ যখন এই গানটির ব্যাপারে এত মনঃক্ষুণ্ণ তখন অতি সামান্য এই অদল-বদলে দোষ কোথায়! আর এখন যখন সিন্ধু নামে দেশটি ভারতে রইল না তখন 'সিন্ধু' উড়িয়ে সে জায়গায় 'অসম' শব্দটি বসিয়ে দিলে কি আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়! এই উদ্ভাবনী প্রতিভার মালিকের নামটি দেবেশ দাশ মশায় আমায় বললেন না। অবাক হয়ে ভাবলাম যে 'সিন্ধু' নামটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য সেই মানুষটি উপলব্ধি করলেন না। তবে এ অপ-প্রয়াসটি ব্যর্থ হয়ে গেল।

শিলং-এর বাঙালিদের মনে মহাদুঃখ যে সুদীর্ঘ কাল আসামে বাস করা সত্ত্বেও শিলং বা গৌহাটি কেন্দ্র থেকে কোনো বাংলা অনুষ্ঠানই প্রচার হয় না। মাতব্বর-গোছের কয়েকজন বাঙালি আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করলেন। আমার বিনীত উত্তর যে এটা পলিসির ব্যাপার, আমার মতামতের ঊর্ধ্বে। ওঁরা মিস্ মাসানীর সঙ্গে দেখা করলেন। বোধ হয় দিল্লীতেও লিখলেন। ক'দিন পর ভূপেন হাজারিকাকে এবং আমাকে ডেকে পাঠালেন মিস্ মাসানী তাঁর ঘরে। উনি বললেন যে পোস্ট্যাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে রেডিয়ো লাইসেন্সের লিস্ট আনিয়েছেন একটি। নামগুলি পড়ে যাবেন তিনি এবং কোন নামটি অসমীয়া, কোনটি বাঙালি সেটা আমাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে নামের পাশে অসমীয়া কি বাঙালি সেটা চিহ্নিত করবেন।

দীর্ঘ তালিকা। কিছু কিছু পদবী এমন যে বুঝবার উপায় নেই বাঙালি না অসমীয়া। চৌধুরী, রায়চৌধুরী, তালুকদার, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, গোস্বামী, দাশ— এই-সব পদবী অসমীয়াদের মধ্যেও রয়েছে। আবার বরুয়া আছে বাঙালি এবং অসমীয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই। কিন্তু বরদলৈ, মেধী, ফুকন, বরফুকন, শইকিয়া, হাজারিকা, বরা, বরবরা, কাকতি, চেংকাকতি, খাউন্দ, বেজবরুয়া, গগৈ,

বরকটকী, বরপূজারী— এই-সব পদবী আসাম রাজ্যের বাইরে নেই। কামাখ্যা মন্দিরের পুরোহিতবংশের পদবী শর্মা। এই পদবী বাঙালির মধ্যেও দেখেছি। আসামের একটি অভিজাত পরিবারের পদবী আগরওয়াল। নিশ্চয়ই বহিরাগত। মুসলমানের পদবী দেখে বাঙালি কি অসমীয়া বুঝবার সাধ্য নেই। নওগাঁ-নিবাসী ইক্রামল মজিদের বিদুষী কন্যা, কলকাতার অরবিন্দ দাশগুপ্তর স্ত্রী, ভারত-বিখ্যাত সংগীতশিল্পী পরভিন্ সুলতানা আসাম-দুহিতা। কোনো কোনো নাম নিয়ে অসুবিধা খানিকটা হলেও কাজটি শেষ হল। দেখা গেল সমগ্র আসামে রেডিয়ো লাইসেন্স যাঁদের চালু আছে তাঁদের মধ্যে বাঙালির বিপুল সংখ্যাধিক্য।

কিছুদিন পর মিস্ মাসানী আদেশ দিলেন সপ্তাহে একটি করে বাংলা গানের অনুষ্ঠান প্রচার করতে। মালতী দাশগুপ্ত প্রথম বাংলা গানের শিল্পী শিলং রেডিয়োর। তিনি লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয় থেকে সংগীত-বিশারদ পরীক্ষা পাস করেছেন। রেডিয়োতে রাগপ্রধান বাংলা গানে এই শিল্পী অডিশন পাস করলেন। তিনি খেয়াল গানেরও শিল্পী।

এই 'রাগপ্রধান' নামটি স্বর্গত সুরেশ চক্রবর্তী মশায়ের দেওয়া। সম্ভবত ঢাকা রেডিয়োতে যখন প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ ছিলেন তখন রাগাশ্রিত বাংলা গানের তিনি এই আখ্যা দেন। ওঁর ধারণায় এটি পুরো খেয়াল অঙ্গের নয়, ঠুংরিও নয় পুরো। একটি রাগ কিংবা মিশ্ররাগের উপর ভিত্তি করে গানের শরীরটি গড়তে হবে। কথা ছেড়ে খেয়ালের মতো বিস্তার, বিন্যাস থাকবে না। থাকবে না তান, সরগম, বাঁট, তেহাই। আবার ঠুংরির 'বোল' বানাবার আঙ্গিকটিও বর্জন করতে হবে। সুরেশবাবুর সঙ্গে দীর্ঘকাল দিল্লীতে কাজ করেছি। রাগপ্রধানের এই সংজ্ঞাই তিনি দিতে চেয়েছেন। তবে রাগপ্রধান ছাঁচে-গড়া সংগীত নয়, শিল্পীর স্বাধীনতা আছেই। শিল্পী

কুলতিলক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'নবারুণরাগে তুমি সাথী গো', 'ফুলের দিন হল অবসান', 'শেষের গানটি যাব গেয়ে', 'তব লাগি ব্যথা'— এই গানগুলি বোধ হয় রাগপ্রধান শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের রেকর্ড-করা নজরুল গীতি 'নীলাম্বরী শাড়ি পরে নীল যমুনায় কে যায়' আর-একটি সুন্দর রাগপ্রধান বাংলা গান। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর রেকর্ড 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়' নজরুলের সুরে অতি চমৎকার রাগপ্রধান। আর এই গানগুলি বাংলা সংগীতের ধারায় অনন্তকালের মহাসংগীত। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গান 'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়', 'একি তন্দ্রাবিজড়িত আঁখিপাতে' বাংলা গান হলেও রাগ-প্রধান শ্রেণীতে পড়বে না। কারণ খেয়াল পদ্ধতির অনুকরণে এই গানগুলিতে তান ব্যবহার করা হয়েছে। চলনটাও খেয়ালেরই মতো। বাংলা খেয়ালই বলি না কেন এমন ধারার গানকে? কিন্তু খেয়ালের কৌলিন্য কখনো দাবি করতে পারবে না হিন্দুস্থানী সংগীতের পণ্ডিতদের কাছ থেকে। রেডিয়োর সংগীতের শ্রেণী বিভাগে রাগপ্রধানকে উপ-শাস্ত্রীয় (Light Classical Music) সংগীতের অন্তর্ভুক্ত করেছে ঠুংরি, দাদ্‌রা এবং টপ্পার পাশে।

মালতী দাশগুপ্তর পরে আরো কয়েকজন বাঙালি শিল্পী পর পর অডিশন পাস করলেন। অরুন্ধতী দাশগুপ্ত, তারা সেন, বিজয়া নন্দী মজুমদার, আশা চক্রবর্তী, রাধিকা চক্রবর্তী, পরমেশচন্দ্র সিংহ— এঁরা রবীন্দ্র-সংগীতের শিল্পী নির্বাচিত হলেন। বাংলা আধুনিক গানের শিল্পী হলেন দীপা দত্ত, কল্যাণী দত্ত, লিলি দত্ত, কল্যাণী দাশ, সুনন্দা রায়, সত্যব্রত রায়, মিলন মজুমদার, রমলা ভট্টাচার্য, পরেশ চক্রবর্তী, মলিনা দত্ত। শেষোক্ত শিল্পী বিখ্যাত অভিনেতা উৎপল দত্তর বড়ো বোন। শিলং শহরে বাঙালি শিল্পীদের সংখ্যাই বেশি ছিল এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একটা-না-একটা লেগেই ছিল।

রেডিয়োতে সীমিত বাংলা অনুষ্ঠান হওয়ায় অনেকেই ভজন এবং শাস্ত্রীয় সংগীতে অডিশন পাস করে নিলেন।

আজ আসামে সৈয়দ আবদুল মালিক সাহিত্যের জগতে এক দিক্‌পাল পুরুষ। তিনি মাত্র মাস দুই গৌহাটি কেন্দ্রে প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কাজ করলেন। কিন্তু তাঁকে চলে যেতে হল। শুনলাম, কাগজপত্র নিজে দেখি নি, পুলিস ভেরিফিকেশন রিপোর্ট প্রতিকূল ছিল। কিন্তু এ কাজটা ওঁর রেডিয়োতে যোগ দেবার আগেই কেন করা হল না বুঝতে পারি নি। আমার ক্ষেত্রে নিয়োগের আগেই পুলিস ভেরিফিকেশন করিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেটা জানি। সৈয়দ আবদুল মালিকের মতো একজন সাহিত্যিক স্টাফে থাকলে রেডিয়োর ইমেজটা বেড়েই যেত। তখনই গল্পলেখক হিসেবে নবীনদের মধ্যে অগ্রণী। আজ ছোটোগল্প এবং উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই বিরাট খ্যাতি।

মুনিন বরকটকী মাত্র কয়েকটি দিন কাজ করে নিজেই ছেড়ে চলে গেলেন। মানুষটি মিহি খদ্দরের ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরিহিত ঋজু দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। অত্যন্ত মৃদুভাষী, ধীর, স্থির। আমাদের ঘোষক পদ্ম বরকটকীর আত্মীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিন চারদিনের বেশি তিনি কাজ করলেন না। ছেড়ে দিলেন। আসাম সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের গেজেটেড অফিসার ছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর আমার হাতে ওঁর টেবিলের ড্রয়ারের চাবিটি দিয়ে বললেন, 'আমার ট্রে-তে কোনো কাগজপত্র পড়ে নেই, অসমাপ্ত কোনো কাজও নেই। আমি এই কাজে সুবিধা করতে পারব মনে হয় না। এখানে অফিসে আসার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু ছুটি হবার, অর্থাৎ বাড়ি ফিরবার নির্দিষ্ট সময় নেই। সব কিছুতেই একটা তাড়া। এরকম কাজে আমি নেই মশায়।'

মুনিন বরকটকীর কথাটা অভ্রান্ত। রেডিয়োর সেই আমলে

প্রডিউসার, প্রডাক্‌শন অ্যাসিস্ট্যান্ট এই-সব পদ ছিল না আমাদের কাজে সাহায্য করার জন্য। প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেস্‌ক্‌ এবং স্টুডিয়ো দু জায়গার কাজই করতে হত। সুতরাং দশটা-পাঁচটার কাজ ছিল না। আমার বিশ্বাস আর কিছুদিন থাকলেই ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের মজাটা পেয়ে যেতেন মুনিন বরকটকী। ছেড়ে দিয়ে আগের ডিপার্টমেণ্টে চলে গেলেন।

শিলং-এর পাইনের কুঞ্জে নির্ঝরিণীর কুলুধ্বনিতে মিশে যাওয়া খাসি-বালার গান আমায় মুগ্ধ করেছে বার বার। খাসি-কন্যার মিষ্টি হাসি, তার গভীর মধুর চাহনি আমার মনে রঙের ছোপ লাগিয়েছে। কিন্তু এই চাহনিতে কোনো ইশারা নেই। এই পাহাড়ী মেয়ের চলা ছন্দোময়, নির্ভীক অথচ অনুদ্ধত। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে তার সাহসের অভাব নেই। আমার সহকর্মী বান্ধবী অ্যাল্‌ট্রিসিয়া রায়ের কাছে জানতে চেয়েছি মেয়েদের এই স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন জীবনধারার কথা।

বেশ গর্বের সঙ্গে নিজ সমাজব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিস্‌ রায় বলেছেন, 'এটা ভালো করে জেনে রাখ যে তোমাদের মতো, আর তাই-বা কেন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই মতো, নারীর অধিকার নিয়ে পুরুষের সঙ্গে কোনোদিন আমাদের লড়াই করতে হয় নি। আমাদের এই ছোট্ট মানবগোষ্ঠীর জন্ম-লগ্ন থেকেই যেন নারী-পুরুষের সমান অধিকার চিহ্নিত হয়ে আছে।'

আমার দিকে চেয়ে আবার বলতে শুরু করলেন অ্যাল্‌ট্রিসিয়া রায়, 'জানো, খাসি কথাটার অর্থ কি? আমাদের ভাষায় "খা"র অর্থ হল জন্মলাভ করা, আর, "সি" শব্দটিতে বোঝায় শাশ্বতী মা। তাই "খাসি" একসঙ্গে বোঝায় শাশ্বতী মায়ের সন্তান। পিতৃদেবের কথাটি এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় মার আসনটি সব চেয়ে বড়ো, সব চেয়ে উঁচুতে। এই সমাজের বাঁধুনি মাতৃধারায়,

যাকে ইংরেজিতে বলে matrilineal। সেজন্য অনেক পরিবারের নাম-গোত্র মা'র নাম-গোত্র অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো সেই আদিম সমাজের মানুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পরিবারের সব চেয়ে প্রধান স্থানটি মাকে ছেড়ে না দিলে স্বামী, ছেলেমেয়ে, স্বজন প্রিয়পরিজনকে একসূত্রে গেঁথে রাখাটা খুব সহজ হয় না। পুরুষের কাজ বাইরের জগতে। ঘরে সন্তান ধারণ, লালন-পালন এবং সংসারের যা-কিছু প্রয়োজন তার দায়িত্ব নারীর উপর। এতবড়ো দায়িত্ব যাকে নিতে হয় তার হাতে যথেষ্ট ক্ষমতাও দিতে হয়। নারীর হাতে সেই ক্ষমতাটা ছেড়ে দিয়ে আমাদের সমাজের কোনো ক্ষতি তো হয় নি।'

একটু হেসে রহস্যভরা চোখে অ্যাল্‌ট্রিসিয়া প্রশ্ন করলেন, 'সেই ক্ষমতা, সেই শক্তির উৎস কি জান?'

হেসে উত্তর দিলাম, 'আন্দাজ করতে পারি। সেটা তোমাদের দেহের লাবণ্য, দারুণ মিষ্টি হাসি, আর চোখের জাদুভরা চাহনি; সমস্ত পুরুষ ভেড়া বনে যায়।'

মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'এখন ইয়ার্কি করো না, কথার খেই হারিয়ে যাবে। বলছিলাম সমাজে নারীর ক্ষমতাটা কি কারণে। অত্যন্ত স্থূল পার্থিব ব্যাপার। উত্তরাধিকারের কথাটা বলছিলাম। পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ধারাটি পুরোপুরি নারী-পরম্পরা। ছেলে কিছুই পাবে না। মা'র অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি আসবে কনিষ্ঠা কন্যার হাতে। ছোটো মেয়ের যখন বিয়ে হবে তখন ওর স্বামী পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্ত্রীর ঘর করতে আসবেন।'

এই বলে স্মিত হেসে আবার শুরু করলেন, 'এই ব্যবস্থাটা কেমন? স্ত্রীর বদলে স্বামীই বিয়ের পর স্ত্রীর গৃহে চিরস্থায়ী বাসের জন্য আসবেন? এ রীতিটা তোমাদের সমাজে চালু হলে তোমাদের মেয়েরা কি খুশিই না হতেন!'

একটু থেমে অ্যালট্রিসিয়া আবার বলতে লাগলেন, 'ভাইয়েরা এবং বড়ো বোনেরা বিয়ের পর অন্যত্র চলে যান। মায়ের এই বাড়িটিতে শুধু ছোটো মেয়ে থাকবে, তার পর তার ছোটো মেয়ে, এমনি ধারায় চিরন্তনী মাতৃগৃহ। খাসি ভাষায় এই মাতৃগৃহকে বলা হয় Ka Ling Seng। সম্পত্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট দায়িত্ব ছোটোমেয়ের উপর এসে পড়ল। অন্যত্র চলে গেলেও ভাই-বোনদের সঙ্গে যোগসূত্র রাখবার কাজটি ছোটোবোনের। ওদের বিপদে আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ওদের ভালো-মন্দ সব কিছুর সঙ্গেই নিজেকে জড়িয়ে রাখতে হবে। এটা বংশানুক্রমিক সামাজিক দায়িত্ব ছোটোমেয়ের। আর এই ভূমিকাটাকে খাসি ভাষায় বলা হয় Ka Nongri Ling।"

এই সুজাতা খাসি-কন্যা অ্যালট্রিসিয়া শুধু বিদুষী নন, সুন্দরীও। তাঁর কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

হঠাৎ কথা থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কি দেখছ এমন করে?'

বললাম, 'তোমায় দেখছি, সুন্দর মুখখানিই দেখছি শুধু। খাসি মেয়ের দেহ তো অসূর্যম্পশ্যা। সারাটি দেহ এতগুলি ভিন্ন কাপড়ের টুকরোয়, পরতে, ভাঁজে আবৃত যে দেহের জিয়োগ্র্যাফিটাই বুঝতে পারা যায় না।'

চুপ করে রইলেন অ্যালট্রিসিয়া কিছুক্ষণ। তার পর খুব ধীরে ধীরে বলে গেলেন, 'তোমার কথা সত্যি। অনেকটা আবহাওয়ার জন্যই পোশাক একটু বেশি পরতে হয়। শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তো আছেই। বৃষ্টি হলেও ঠাণ্ডা। বৃষ্টি কখন নামবে কিছুই তো ঠিক নেই। কাজেই মেয়েদের এই পোশাকটা প্রয়োজনের তাগিদেই।'

তার পর গলার স্বর একটু উঠিয়ে বললেন, 'পুরুষের কাছে, বিশেষত পাহাড়ের নীচের লোকদের কাছে, খাসি মেয়ের আকর্ষণের কথা আমরা জানি না তা নয়। তবে নগ্ন দেহের আবেদনে পুরুষের মন ভোলানোর প্রয়াস নেই খাসি মেয়ের।'

হঠাৎ কথা থামিয়ে বললেন, 'এতটা জ্ঞানদান করলাম, এবার চা খাওয়াও।'

অফিসে আমার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল বর্ষণমুখর এক সন্ধ্যায়। প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নিয়োগের কিছুদিন পর অ্যালট্রিসিয়া রায় ট্রান্স্মিশন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে শিলং কেন্দ্রে যোগ দিলেন। এটাও ক্লাস টু পোস্ট।

দিনের কাজ শেষ। বাড়ি যাবার উপায় নেই বৃষ্টি না থামলে।

চা খেতে খেতে আমি বললাম, 'তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটা কি রকম একটু বল না।'

খুশি হয়ে অ্যাল্ট্রিসিয়া বললেন, 'এটা ভালো প্রশ্ন করেছ। তোমাদের মতো মা-বাবার বা গুরুজনের ঠিক করা বিয়ে নয়। প্রতিটি বিয়ে ভালোবাসার পরিণতি। একেবারে পাশ্চাত্য রীতি, কিন্তু ধার করা নয়। এটা আমাদের চিরাচরিত প্রথা। জানো তো আমাদের সমাজে ছেলেমেয়ের মেলামেশার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। মন-জানাজানি যখন ভালো করে হল তখন ছেলে তার মা-বাবাকে গিয়ে বলল যে এই মেয়েকেই সে ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। মেয়েও জানাল তার মা-বাবাকে। দুইপক্ষের গুরুজনেরা এগিয়ে এলেন এদের সাহায্য করতে। পরিবারিক অলঙ্ঘ্য কোনো নিষেধ যদি না থাকে তাহলে উভয়পক্ষের গুরুজনেরা একটি বিয়ের দিন ঠিক করে আত্মীয় বন্ধুদের খবর পাঠিয়ে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সবান্ধব বর গুরুজনদের সঙ্গে রওয়ানা হল কন্যার বাড়ির পথে। কন্যাপক্ষের লোকেরাও এগিয়ে এলেন অনেকটা দূর বরযাত্রীদের

আবাহন করতে। মেয়ের বাড়িতে পৌঁছবার পর তাম্বুল দিয়ে বরকে এবং বরপক্ষীয়দের সম্বর্ধনা করা হল। বরপক্ষের একজন প্রতিনিধি কন্যাপক্ষের উদ্দেশে বললেন যে এমন চরিত্রবান ছেলে আর হয় না। এই বিয়ের কনেটি বৈ বর আর অন্য মেয়েকে জানে না। দ্বিতীয় কোনো মেয়ের দিকে কখনো চোখ তুলেও তাকায় নি জীবনে। মেয়ের পক্ষেরও একজন এসে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন যে এই মেয়ে একেবারে ভার্জিন, এমন ভালো মেয়ে তো আর হয় না। অন্য পুরুষের দিকে কদাপি চোখ তুলে তাকায় নি। এই পাত্রই মেয়ের জীবনের প্রথম পুরুষ। অতঃপর উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা বরকনের পরস্পরের আজীবন আনুগত্য এবং ভালো-বাসার শপথের কথা জানালেন। এবার এলেন পুরোহিত মশায়। তাঁর সামনে দুটি শুক্‌নো লাউয়ের পাত্রে রাখা আছে সোমরস, একটি বরের অপরটি কনের। পুরোহিত মশায় দুটি পাত্র থেকে ঢেলে বর-কনের মধ্যে সোমরসের বিনিময় করালেন। তার পর কনের হাতে একটি আংটি পরিয়ে দিল বর। ব্যস্‌, বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ। পুরোহিত মশায় দেবতা Synshar-এর কাছে নবদম্পতির কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা জানালেন। পূর্বপুরুষদের কাছেও প্রার্থনা করলেন এই দম্পতিকে আশীর্বাদ করতে। উপস্থিত সবাইকে এই বিয়ের সাক্ষী হতে অনুরোধ করলেন। তার পর তিন টুকরো শুকনো মাছ ঘরের চালে গুঁজে দিলেন পুরোহিত মশায়। প্রথম সন্তানের জন্মের আগে এই তিন টুকরো শুকনো মাছ সরানো হবে না। এবার পান এবং ভোজন, তার পর উৎসবের সমাপ্তি।'

খানিক থেমে অ্যালট্রিসিয়া আবার বললেন, 'তোমাদের মতো আমাদের বিয়েতে এত ক্রিয়া-কাণ্ড যাগ-যজ্ঞি স্ত্রী-আচার নেই। অনেক সহজ সরল আমাদের বিয়ে।'

আমি বললাম, 'শুনেছি, তোমাদের বিয়ে নাকি সহজেই ভেঙেও

যায়।'

ওঁর উত্তর, 'ঠিকই শুনেছ। জীবনটাকেই আমরা সহজভাবে দেখতে শিখেছি। তাই ভালো মন্দ যা যখন এসে পড়ে, সুখ বা দুঃখ, সেটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করি। বিয়ের আগে থেকে, অনেক দেখে, জেনে শুনে, যাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম সেই সম্পর্কের মধ্যে ফাঁক যদি এসে যায় কখনো, ফাঁকি দিয়ে সেই ফাঁকটাকে ভরাতে চাই না আমরা। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের পদ্ধতিটা সহজতর করে নিয়েছে আমাদের সমাজ। কত সহজেই না বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় শোনো। স্বামী স্ত্রী দুজনেই পাঁচটি করে কড়ি নেবেন। স্বামী নিজের হাতের কড়িগুলো স্ত্রীর হাতে দিয়ে দিলেন। স্বামীর দেওয়া কড়ির সঙ্গে নিজের হাতের কড়ি মিশিয়ে স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিলেন স্ত্রী। আর সব কড়ি হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন স্বামী। বিবাহ বন্ধনটাও হাওয়ায় উড়ে গেল। স্ত্রী মুক্ত, স্বামীও। অনুষ্ঠানটির সাক্ষী রইলেন কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি। এবার আবার নতুন করে জীবন শুরু করার স্বাধীনতা এদের।'

জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না, 'এত সহজেই বিবাহ বিচ্ছেদ যদি হয়ে যায় তবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আসবে না?'

কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম অ্যালট্রিসিয়া বেশ দুঃখ পেয়েছেন মনে। কিন্তু বের হয়ে গেছে মুখ থেকে, ফিরিয়ে নিই কি করে!

জোর করে মুখে হাসি টেনে অ্যালট্রিসিয়া বললেন, 'আমরা বনবাসী, পাহাড়ী-অরণ্যের প্রাণী। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় তোমাদের নীতির মান অনুযায়ী যে মন্দটা চোখে পড়ে সেটা ভারতের বৃহত্তর সমাজদেহকে সংক্রমিত করবে না। আমরা নীচে নামি না পাহাড় ছেড়ে। নীচের আবহাওয়া এবং পরিবেশ কোনোটাই আমাদের সয় না। তবে মনে রেখো আমাদের সমাজে কোনো পুরুষ একাধিক নারীকে বিয়ে করে গৃহে রাখতে পারেন না। সপত্নীর

সঙ্গে বাস করার দুঃখটা আমাদের কোনো মেয়েকে সইতে হয় না।'

আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বললেন অ্যালট্রিসিয়া, 'তুমি কি ইঙ্গিত করতে চাইছ যে আমাদের হৃদয়ের গভীরতা নেই, প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই? সমস্তটা শহর ঘুরে দেখ বছরে ক'টা বিয়ে ভেঙে যায়। আর খাসি মেয়ে ভালোবাসতে পারে কিনা জেনে এস Shakespeare-এর কাছ থেকে।'

অ্যালট্রিসিয়ার মুখে একটা চ্যালঞ্জের ভাব যেন। কিন্তু শেক্স্‌পীয়র নামটার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না।

আমি বললাম, 'শেক্স্‌পীয়র মানুষের মনের অলিগলির সন্ধান রাখতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু যে মানুষটা মরে গেছেন তিনশো বত্রিশ বছর আগে তিনি এখনকার খাসি মেয়েদের মনের খবর রাখবেন কি করে? তাঁর কোনো নাটকে কি খাসিবালার চরিত্র আছে?'

হেসে বললেন অ্যালট্রিসিয়া, 'আমারই ভুল হয়েছে। আগেই তোমায় বলা উচিত ছিল এই নামে একজন ইংরেজ পুরুষ এক খাসি কন্যার পাণিগ্রহণ করে এই শিলং-এই বহাল তবিয়তে আছেন।'

সেদিন বাড়ি ফিরবার আগে অ্যালট্রিসিয়ার কাছে আরো জেনেছিলাম যে খাসিদের মধ্যে যাঁরা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন, সংখ্যাটা বেশ বড়ো, তাঁদের বিয়ে এবং বিচ্ছেদের নিয়ম ঐ ধর্মের বিধান অনুযায়ী। আরো জানলাম যে অ-খ্রীস্টান খাসিদের মধ্যে বিধবা বিয়ের কোনো বাধা নেই। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর একটি বছর পার না হলে বিয়েটা হয় না। ভেবে আনন্দ হল যে মেয়েরা ঐ সমাজে কতটা সম্মানের আসন অধিকার করে আছেন! তুলনা করব আমাদের সুসভ্য সমাজের সঙ্গে? না থাক, ওঁরা যে পাহাড়ী!

দুদিন পর গেলাম শেক্স্‌পীয়রের সঙ্গে দেখা করতে। কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারছিলাম না। কে জানে এই শেক্স্‌পীয়র সেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের কোনো উত্তর পুরুষ কিনা!

শিলং-এর অভিজাত লাইমুখার পল্লীতে ছোটো একটি পরিচ্ছন্ন বাংলোতে তিনি থাকেন। স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়, অতিশয় বিনয়ী। ইংরেজ-সুলভ গাম্ভীর্য নেই। বেশ সমাদর করেই আমায় বসালেন। কিন্তু কৌতূহল আমার মিটল না। জন্ম-মাটি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের খাসি সমাজের বিষয়ে যতটা জানেন নিজের কুলপঞ্জীটা ততটা জানেন না। সেই বিরাট মানুষটির সঙ্গে পারিবারিক কোনো সূত্র আছে কিনা বলতে পারলেন না। না বললেন না? যে ক'ঘর ইংরেজ আছেন এই শহরে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তিনি কি ঐ সমাজে একঘরে? আমি হতাশ হলাম। তিনি বললেন যে এসেছিলেন যুবাবয়সে। দেশে আর ফেরা হল না খাসি-দুহিতার প্রেম-ডোরে বাঁধা পড়ে।

খাসিদের বিষয়ে বলবার জন্যে রেডিয়োতে ওঁকে ডাকলাম।

খাসি গানের সব চেয়ে ভালো শিল্পী ষোড়শী এডিথ্। পুরো নাম এডিথ্ আরমিনা ওয়ালাং। বুঝতেই পারা যায় না নামটা থেকে যে এই মেয়ে ভারতীয়। মেয়েটি খ্রীস্টান। ওঁর গানও পাশ্চাত্য সংগীতের ধারায়। সামান্য দু-একজন ছাড়া আমাদের অধিকাংশ শিল্পীই পশ্চিমের লঘু সংগীতের নিম্ন মানের অনুকরণে গান করেন। যেহেতু খাসি সমাজে এ জাতীয় গানেরই বেশি প্রচলন, আমরাও রেডিয়োর জন্য এই গান গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম।

এডিথ কিন্তু গান গেয়ে আমাদের মুগ্ধ করে দিলেন। তীক্ষ্ণ সুরেলা আওয়াজ, স্বরের রেশ থামতে চায় না যেন। আহা, এ মেয়ে যদি ভালো শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন! এঁর গানের রিহার্সালে সহযোগী যন্ত্রীর অভাব হত না কখনো। আমাদের স্টুডিয়োর নিজস্ব শিল্পীরা খাসি বা জয়ন্তিয়া গানের সহযোগিতা করতে পারতেন না। কাজেই খাসি গানের সঙ্গে শিল্পীদের নিজের সহযোগী শিল্পী আনতে বলা হত। অন্যদের বেলায় সহযোগী শিল্পী ঠিক মতো আসতেন না।

কিন্তু এডিথের গানের সময় সহযোগী শিল্পী আসতেন অনেক। ওঁর গানের অ্যাড্‌মায়ারার অগুন্‌তি। আমিও তাঁদের একজন।

গানটা এডিথের পেশা নয়। শিলং-এ গানটাকে পেশা করলে পেট ভরে না। এ শখটা কাজের ফাঁকে অবসর বিনোদনের জন্যে। আসাম সরকারের লোকরঞ্জন শাখায় কাজ করতেন এডিথ। সে কাজ নেই এখন। কণ্ঠ শিল্পীকে রেডিয়োতে স্থায়ী কাজ দেবার অসুবিধা আছে। কোনো যন্ত্র ভালো বাজাতে পারলে গানের সহ-যোগিতার জন্য নিয়ে নেওয়া যায়। ভালো গিটার বাজাতে পারতেন বলে হেম স্যুয়েট রেডিয়োতে স্থায়ী নিজস্ব শিল্পীর চাকরি পেয়ে গেলেন। এডিথকে প্রতি মাসেই গান গাইতে ডাকা হত। এটা তো স্থায়ী চাকরী নয়। খাসি মেয়ে খুবই কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। ছেলেরা তত নন। বসে থাকবেন না মেয়েরা। একটা না একটা কিছু জুটিয়ে নেবেনই। এডিথও বসে রইলেন না।

এক রবিবারের সন্ধ্যায় লাবাণের বাজারে গেলাম স্ত্রীর সঙ্গে। শিলং-এ দৈনন্দিন মাছ-তরকারির বাজার সন্ধ্যায় বসে। ঘুরতে ঘুরতে মাছের দোকানগুলির সামনে এলাম। দেখলাম ডালার উপর নানা রকম মাছ সাজিয়ে বসে আছেন এডিথ। আমায় চেনেন এমন কোনো ভাব দেখলাম না ওঁর চোখে-মুখে। আমার স্ত্রী কিন্তু ওঁর কাছ থেকেই মাছ কিনলেন। কিন্তু গোল বাঁধল দাম দিতে গিয়ে। দাম নেবেন না এডিথ। আমাকে দেখিয়ে হিন্দি-বাংলা-খাসি ভাষায় বললেন আমার স্ত্রীকে যে রেডিয়োর এক সাহেবের কাছ থেকে দাম নিতে পারবেন না। মুশকিলের ব্যাপার। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দামটা গছানো হল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমার স্ত্রী মন্তব্য করলেন, 'এমন সুন্দরী মেয়ে মেছুনী?'

যখন বললাম যে এই মেছুনী শিলং রেডিয়োর একজন খুব

ভালো শিল্পী, আমার স্ত্রী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না কথাটা।

এঁরা কোনো কাজকেই অসম্মানের মনে করেন না শুধু ভিক্ষে করা ছাড়া। শিলং-এ ভিক্ষুক দেখি নি।

অসমীয়া, খাসি, জয়ন্তিয়া, শাস্ত্রীয়, বাংলাগান— এই বিভিন্ন জাতীয় সংগীতের উপরও আমরা মণিপুরী কীর্তনের দুইজন বেশ ভালো শিল্পী পেয়ে গেলাম। উমা দেবী এবং কালোসোনা রাজকুমার। উমা দেবী খুব অভিজাত পরিবারের মেয়ে। বিজনী এস্টেটের রাজকুমারী। খুবই সুকণ্ঠী। এই দুই শিল্পীর কীর্তনে বাংলা কীর্তনের বিভিন্ন ঘরানার কীর্তন ঢঙের প্রভাব সুস্পষ্ট। খুব কঠিন তালেও গাইতে পারতেন উভয় শিল্পী। এঁরা রেডিয়োর প্রোগ্রামে খুবই সুখ্যাতি অর্জন করলেন। কালোসোনা রাজকুমারের কীর্তন ১৯৫৭ সনেও শিলচরে শুনেছি। কণ্ঠের শক্তি বা আবেদন কমেছে মনে হয় নি। আমাদের রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী পরমেশ সিংহের কাছে শুনেছি যে এই দুই কীর্তনের শিল্পী 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষায় গান করেন। পরমেশ সিংহ নিজেও এই ভাষাভাষী। কিছুদিন পর শিল্পীসন্ধানে মণিপুরের ইম্ফলে গিয়ে জানতে পেরেছি যে খোদ মণিপুরের অধিবাসীরা 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ভাষাকে কোনোপ্রকার স্বীকৃতিই দেয় না। মূল মণিপুরের ভাষা 'মিতেই'।

অনেকের মুখেই ভালো একজন শিল্পীর কথা শুনছি। কিন্তু তিনি অডিশন দিতে এলেন না। শুনলাম ছোটোভাই রেডিয়োতে কাজ করেন বলে তিনি আসতে চান না। আমাদের নতুন কেন্দ্র। যত বেশি শিল্পী পাওয়া যায় ততই ভালো। ভালো একজন শিল্পী রেডিয়োর বাইরে থাকবেন কেন? খবর পাঠালাম, তবুও এলেন না। একদিন গেলাম। বড়োবাজারে ছোটো একটি দোকানের মালিক। একেবারে রাজপুত্রের চেহারা। নাম বেরীওয়েল কিণ্ডিয়া। তাঁর

ছোটো ভাই পি. রিপ্‌ল্‌ কিণ্ডিয়া আমাদের জয়ন্তিয়া অনুষ্ঠানের পরিচালক, স্টাফ আর্টিস্ট।

বেরীওয়েলকে বললাম একটু বেহালা বাজনা শুনতে এসেছি। খুব খুশি। দোকানের সামনের ঝাঁপ বন্ধ করে দিলেন। হাতে তুলে নিলেন বেহালাটি। ছড়ে রজন ঘষে যখন তারে ছোঁয়ালেন বের হল সুরেলা গভীর ধ্বনি। পাকা হাত, 'কঁকে কঁকে' আওয়াজ নেই, আঁচড়ানো স্বর নেই। বুঝিয়ে রাজী করালাম নিয়মমাফিক অডিশনে উপস্থিত হতে। এমন শিল্পী পাশ তো করবেনই জানা কথা। অডিশন পাশ করে বেহালা এবং জয়ন্তিয়া গানের শিল্পী হলেন। এমন একটি মিষ্টিমধুর মানুষ সারাজীবনেই কম দেখেছি। এমন সরল হাসিই দেখতে পাই না আজকাল। স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে রইলেন যে ক'জন বি. কিণ্ডিয়া তাঁদেরই একজন। ওঁর গানও পাশ্চাত্য লঘুসংগীতের ধারায়। ওঁর কাছেই জানতে চাইলাম পশ্চিমী প্রভাবমুক্ত প্রাচীন কোনো সংগীতের ধারা আছে কিনা। তিনি বললেন যে আছে, তবে শিলং শহরে বা আশেপাশে নেই। প্রতিশ্রুতি দিলেন যে প্রাচীনপদ্ধতির লোকসংগীতের গাইয়েদের কাছে খবর পাঠাবেন। আরো বললেন যে এব্যাপারে আমাদের স্টাফ আর্টিস্ট হেম স্যুয়েটের কাছেও সাহায্য পাওয়া যাবে।

বেরীওয়েলের কাছে শুনলাম জয়ন্তিয়াদের সামাজিক নিয়ম-প্রথা প্রায় খাসিদের মতোই। ওঁদের প্রাচীন নাম **Pnar**। পরে হল Synteng। Teng হল সেই শাশ্বতী মাতা। আর Synteng শব্দটিতে বোঝায় সেই মাতার সন্তান। Synteng কথাটির আধুনিক রূপান্তর জয়ন্তিয়া। শিলং-এর পুবে, প্রায় ৪০ মাইল পুবে, জোয়াই একটি ছোটো শহর। এটি জয়ন্তিয়াদের শহর। এই অঞ্চলেই জয়ন্তিয়াদের বাস। গৌহাটি থেকে বের হয়ে একটি জাতীয় সড়ক শিলং হয়ে জোয়াই-এর উপর দিয়ে দক্ষিণমুখী চলে আস্তে আস্তে

পাহাড় থেকে নেমে সমতলে এসে শিলচরে পৌঁচেছে। জোয়াই-এর এই অঞ্চলটায় আমি গিয়েছি। আমার চোখের দেখায় জয়ন্তিয়াদের গায়ের রঙ খাসিদের তুলনায় এক পোঁচ কালো। একটু কি রক্ষণশীলও তুলনায় জয়ন্তিয়ারা? তবে গায়ের রঙ, মুখের আদল, মাথা কপাল এবং নাকের পার্থক্য এতই সামান্য যে জানা না থাকলে কে খাসি, কে জয়ন্তিয়া বোঝবার উপায় নেই চেহারা দেখে।

অনেক চেষ্টার পর মাত্র তিন-চার জন প্রাচীন ধারার গানের শিল্পী পেলাম। কিন্তু এই গানকে সংগীতের বিচারে— লোকসংগীতের বিচারে— বড়ো অকিঞ্চন মনে হল। লোকসংগীতেও স্বরের একটা সুষ্ঠু অবস্থান থাকবে নির্দিষ্ট দূরত্বে। যেখানে-সেখানে স্বরের অবস্থান হলে সুরসৃষ্টি হতে পারে না। প্রাচীন খাসি গানে চার-পাঁচটি নোটেরও উপস্থিতি লক্ষ করেছি। কিন্তু খুব এলোমেলো। কোনো গানেই কাঠামো, একটা সুগঠিত শরীর খুঁজে পাই নি। এক গান দুবার একই সুরে গাইতে শুনি নি। অধিকাংশ গানই শ্মশান-সংগীত (dirge)। এমন-ধারা বিলাপ সংগীতের ন্যূনতম শর্তও মেটাতে পারে না। তবে এমনও হতে পারে যে প্রাচীন রীতির উপযুক্ত ধারককে তখনো খুঁজে বের করতে পারি নি। এই শিল্পীরা নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসতেন যা একেবারেই তাঁদের নিজস্ব। 'দুইতারা' (**Duitara**) একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্র। এটা তাঁদের **harp**। তার আছে তিনটি, চারটি তারের 'দুইতারা'ও দেখেছি। আমরাই কি তাঁদের কাছ থেকে নিয়েছি আমাদের দোতারার নামটা? দ্বিতীয় বাদ্যযন্ত্রটি Maryngod, দেখতে অনেকটা আমাদের সারিন্দার মতো, বাজাতে হয় ছড় দিয়ে। **Marynthing** নামে যন্ত্রটির একটি মাত্র তার। সেটিও ছড় দিয়েই বাজাতে হয়। Sarong নামেও আর-একটি বাদ্যযন্ত্র দেখেছি, আকৃতিতে অনেকটা আমাদের সারেঙ্গীর

মতো। তার মাত্র তিনটি। তা, বাদ্যযন্ত্রটি যেমন হোক, রিয়াজি হাতে না পড়ায় নির্মম যন্ত্রণার উৎস মনে হয়েছিল।

শিলং-গৌহাটি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে চলতে লাগল। সমগ্র আসামবাসী রেডিয়োর প্রোগ্রামে খুশি, সেটা শ্রোতাদের চিঠিপত্র দেখে বুঝতে পারলাম। একজন সহৃদয় স্টেশন ডিরেক্টরের নেতৃত্বে আমরাও খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছি। আগস্ট-এর শেষের দিক। একদিন প্রোগ্রাম মিটিং-এ মিস্ মাসানী বললেন যে গতরাত্রে দিল্লী থেকে টেলিফোনে তিনি বদলির নির্দেশ পেয়েছেন। বদলি হয়ে যাচ্ছেন অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর বহির্বিভাগের ডিরেক্টরের পদে। এটা একটা পদোন্নতি। এই তো সেদিন এলেন বোম্বাই থেকে, চার মাস মাত্র, এরই মধ্যে যেতে হচ্ছে দিল্লী। মনে দারুণ দুঃখ হল। ভালো লাগার মতো অনেক গুণ এই মানুষটির মধ্যে। সব চেয়ে বড়ো কথা নীচে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা ভেবেছেন সব সময়ে। মনে পড়ে, বৃষ্টিভেজা রাস্তায় পিছলে পড়ে গিয়ে চোট লেগে যায় ডান হাতে। ক'টা দিন হাত নাড়াচাড়া ডাক্তারের বারণ। স্টেশন ডিরেক্টরের নির্দেশে অফিসের গাড়ি আমায় বাড়ি থেকে নিয়ে আসত এবং অফিস ছুটির পর পৌঁছেও দিত। শুধু তাই নয়, নিজের স্টেনো-গ্রাফার আমায় দিয়ে দিলেন কয়েকদিনের জন্য, কারণ ডান হাতে কোনো কাজ করতে পারছিলাম না, লিখতেও পারছিলাম না। তখন স্টেনোগ্রাফারের সাহায্য পাবার অধিকার ছিল না আমার পদমর্যাদা অনুযায়ী। ব্যাপারটি সামান্যই, কিন্তু তিন দশক পরেও মনে আছে।

সমস্ত চাকরি-জীবনে যে-ক'জন সহৃদয় অফিসার দেখেছি মিস্ মাসানী তাঁদের পুরোভাগে। তাই মিস্ মাসানী চলে যাবেন শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওঁর যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। আমাকে বললেন, প্রোগ্রাম সম্পর্কে কোনো বিশেষ প্রস্তাব থাকলে

অনুমোদন করিয়ে নিতে। ছুটি প্রস্তাব পেশ করলাম। এক, কলকাতা থেকে শাস্ত্রীয়-সংগীতের ভালো একজন শিল্পী আনা। সাধারণত নতুন কেন্দ্র যখন খোলা হয় সেদিন দেশের সেরা দু-একজন শিল্পীকে প্রোগ্রাম দিয়ে আনা হয়। শিলং-এ গোলমাল হবার ভয়ে বাইরে থেকে কোনো শিল্পী আনা হয় নি। প্রথম প্রস্তাবে কলকাতা থেকে তারাপদ চক্রবর্তীকে আনাবার কথা বললাম। দ্বিতীয় প্রস্তাব, মণিপুরে গিয়ে শিল্পীর সন্ধান করা। দারুণ কৌতূহল ছিল এই রাজ্যটির বিষয়ে। মণিপুরী কীর্তন, মণিপুরী নৃত্যের কথা কত শুনেছি। ভারতের পূর্বপ্রান্তিক এই দেশটি দেখার খুব আগ্রহ। মিস্ মাসানী বললেন যে নিজে হাতে করে প্রস্তাবপত্র নিয়ে যাবেন দিল্লীতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য। দিল্লী থেকে এই প্রস্তাব-ছুটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে ফিরে এল মিস্ মাসানীর চলে যাবার পক্ষকালের মধ্যেই।

এ কাহিনীর শুরুতে বলেছিলাম যে ভালো গান শুনতে পাবার সুযোগ আছে বলেই রেডিয়োর চাকরিতে এসেছিলাম। কিন্তু যে দেড় বছর কলকাতায় রইলাম সে সময়টা কলকাতার একটা দুঃসময়। পর পর অনেক অঘটন সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল। ধর্মঘট, দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গা, দেশবিভাগ। নিজ গৃহ এবং আত্মীয় প্রিয়-পরিজনকে চিরকালের জন্য ছেড়ে চলে আসার বেদনা; এ-সব কারণে মনটা ছিল অশান্ত। কলকাতার জীবনও ছিল অস্থির। স্বাধীনতালাভের আনন্দ-উৎসবের পর এল গান্ধীহত্যার গভীর বিষাদ। শান্তি কোথায় মনে যে গান শুনব! কলকাতায় গান শোনা হয় নি। শিলং-এর মনোরম পরিবেশে গান শোনবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। সুযোগও এসে গেল।

শিলং শহরে দিলীপকুমার রায় এলেন। তখন ওঁর নামের পাশে পণ্ডিচেরি কথাটা থাকত। আসবেন আগে থেকেই জানতাম

এবং রেডিয়ো প্রোগ্রামের জন্য কলকাতা কেন্দ্র থেকে অনুমতি আনিয়ে রেখেছিলাম। তিনি শিলং-এ এসে উঠলেন শ্রীমতী সতী চৌধুরীর গৃহে। সাহিত্যে, সংগীতে জগৎজোড়া খ্যাতি। 'তরঙ্গ রোধিবে কে' 'দোলা'— তাঁর লেখা এ-সব উপন্যাস আমাদের মনকেও দোলা দিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র, শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য এই বিরাট মানুষের আগমনে শিলং শহর আনন্দমুখর হয়ে উঠল। সেদিনে তাঁর কণ্ঠে যৌবন, দেহেও। তপঃপূত জ্যোতির্ময় কান্তি। মনে হয় না সারা বিশ্বে এমন সুদর্শন পুরুষ বেশি ছিলেন। রেডিয়োর পক্ষ থেকে আহ্বান জানালাম। প্রসন্নমনে গ্রহণ করলেন আমাদের আমন্ত্রণ। গাইলেন পিয়ানো বাজিয়ে। আমাদের ছোটো স্টুডিয়ো। সামান্য কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে স্টুডিয়োতে বসে গান শুনতে ডাকলাম। দিলীপকুমার রায় বাংলা গান গাইলেন নিজের এবং তাঁর পিতৃদেবের রচনা থেকে। জর্মন, ফরাসী ভাষায়ও গান করলেন। উপস্থিত শ্রোতারা গান শুনে মুগ্ধ, অভিভূত। এমন সুরেলা রসাল ভরাট কণ্ঠ খুব বেশি তো শুনি নি জীবনে। শুনেছি, বার বার শুনেছি ওঁর গান। ছোটো আসরে পদপ্রান্তে বসে শুনেছি, তন্ময় হয়ে যাওয়া বিরাট জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে শুনেছি, শুনেছি গ্রমোফোন রেকর্ডে। কিন্তু অধম আমি বার বার ব্যর্থ হয়েছি তাঁর গান বিশ্লেষণ করে বোঝবার প্রয়াসে। তাঁর স্বরবিন্যাস, তানের নিঃসরণের প্রণালী বা প্রয়োগ-কৌশল, কারু-কর্মের রীতি আমি বুঝি নি। এ গানে আবেদন আছে নিশ্চয়ই। না হলে এত শ্রোতা মুগ্ধ হলেন কী করে! অনেকের মতে ওঁর সংগীতের আবেদন 'সাবলাইম'। আমার বুদ্ধিতে এই সংগীতের 'টেক্‌নিক্‌' অনধিগম্য। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে দেখেছি কত অজস্র শ্রোতা ওঁর গানে মন্ত্রমুগ্ধ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে শ্রোতাকে এইভাবে মুগ্ধ করা যায় না। আমার দুর্ভাগ্য আমি বুঝতে পারি নি।

কিছুদিন পরে শ্রীমতী সতী চৌধুরীর গৃহেই আর-এক অসাধারণ শিল্পীর বাজনা শোনার সৌভাগ্য হল। পেশায় অ্যাটর্নি। তবলা বাজান শখের তাগিদে। হঠাৎই শিলং এসে গেছেন দু-একদিনের জন্য। অসামান্য বাজনা শুনলাম, লহরা। ওঁর সঙ্গে বাজাবার মতো উপযুক্ত মানের শিল্পী শিলং-এ নেই। তাই শুধু লহরাই শুনলাম। কত উচ্চমানের তালিম এবং কত দীর্ঘ সাধনায় এই পারদর্শিতা! ছন্দের বিচিত্র নক্‌শা, বিষম তেহাই, দুনী, চৌদুনী, আটদুনী, চক্রধা এবং 'বোল' বাণীর রঞ্জিনী ধ্বনি— সবে মিলে আমার রক্তের মধ্যে একটা নৃত্যের হিন্দোল। সত্যিই অসাধারণ শিল্পী হীরু গাঙ্গুলি মশায়। কিন্তু রেডিয়োর শ্রোতাদের কাছে ওঁর বাজনা পরিবেশন করতে পারলাম না। হীরুবাবু থাকতে পারলেন না।

আমাদের কালেই প্রথম সম্ভ্রান্ত ঘরে তবলা বাজাবার চর্চাটা শুরু হয়। খুব অভিজাত পরিবারে আগে একেবারে কেউ তবলা বাজাতেন না, তা নয়, তবে সেটা নেহাতই শখের ব্যাপার। যেমন বাজাতেন মোড়াপাড়ার জমিদার রায়বাহাদুর কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরকম ক'জনই বা ছিলেন? আর, যাঁরা বাজাতেন তাঁদের শিল্পমান সাধারণত পেশাদার তবলিয়ার উচ্চমানে পৌঁছত না। একটা কারণও বোধ হয় ছিল যেজন্য সম্ভ্রান্ত ঘরের উচ্চশিক্ষিত কোনো সন্তান তবলা বাজনাটা ভালো করে শিখতে চাইতেন না। আগের কালে গাইয়ে বা সেতার-সরোদের শিল্পীর সঙ্গে শুধু সহযোগিতার ভূমিকাই ছিল তবলিয়ার। বাজাতে হত পেছনে বসে। মূল শিল্পীর সহযোগী শিল্পী হিসেবে তবলা-বাদকের মঞ্চে বা আসরে অপ্রধান ভূমিকা। নিজগুণে একটি আলাদা যন্ত্র হিসেবে তবলার স্বীকৃতি বা সমাদর ছিল না। শুধু তবলা-বাজনার— কেবল সহযোগিতার নয়— যে নান্দনিক আবেদন আছে এবং রসঘন ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করে সমৃদ্ধ ছন্দসুষমায় শ্রোতাকে সংগীতের আনন্দলোকে পৌঁছে দিতে পারে সে

উপলব্ধি আগে হয়তো তত বেশি ছিল না। 'সোলো' তবলা বাজনার প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড বোধ হয় উস্তাদ আহমেদ্ জান থিরাকুয়া খাঁ সাহেবের। সে তো আমারই কালে।

তবলাকে কৌলীন্য দিয়ে মর্যাদার আসরে বাঙালি-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে অভিজাত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত দুই শিল্পী হীরু গাঙ্গুলি এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের অবদান অমূল্য। পেশা হিসেবে গ্রহণ না করেও এঁদের বাজনার মান পেশাদার তবলিয়ার সমতুল্য। অনেক সুযোগ্য শিষ্যও এঁরা তৈরি করেছেন। একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তবলিয়ার প্রতি বেতার-কর্তৃপক্ষের দক্ষিণার বিষয়ে যে সমদৃষ্টি রয়েছে সেটা মহ্‌ফিল উদ্যোক্তাদের আছে কি? মনে রাখতে হবে যে চামড়ার আচ্ছাদন থেকে সূক্ষ্ম গীতধ্বনি উৎপাদন করাটা সহজ ব্যাপার নয়। সংগতের জন্যও প্রয়োজন সূক্ষ্ম শিল্পবোধ, শুধু নৈপুণ্য নয়, ছন্দোময় রসময় হতে হবে সংগত। সংগত হল গানের সঙ্গে বাজনার মিল। একটা সঙ্গ-সুখ, মিলনের আনন্দ থাকবে তাতে। রাজযোটকের বিয়ে কি করে সম্ভব হয় যদি লড়াইয়ের মনোভাব থাকে? কাজেই ভালো 'সংগতিয়া' না হলে আসরই মাটি হয়ে যাবে। তবলিয়ার প্রাধান্য তা হলে মূল যন্ত্রী থেকে কম কিসে? তাই ফি-এর ব্যাপারে রেডিয়োর সমদৃষ্টি।

এবার পূর্বানুমোদিত ব্যবস্থা অনুযায়ী তারাপদ চক্রবর্তীকে কলকাতা থেকে আনানো হল। কিন্তু মাসটা জানুআরি। বরফশীতল আবহাওয়া। স্নোফল বা তুষারপাত শিলং-এ হয় না। উচ্চতা তো মাত্র পাঁচ হাজার ফুটের মতো। আমার বাড়ির উল্টো দিকে ঐ-যে পাহাড়, যার চূড়াটা ছ হাজার চারশো পঞ্চাশ ফুট উঁচু, 'শিলং-পিক্' যার নাম, সেখানেও কখনো বরফ জমা দেখি নি। শিলং-এর ওটাই সর্বোচ্চ চূড়া। কিন্তু ভোরে উঠে দেখতে পাওয়া যায় ঘাসের শিষে শিশিরবিন্দু ঠাণ্ডায় জমে আছে। রোদ ওঠার আগে পর্যন্ত বাড়ির

সামনের লন্ সাদা শিশিরের চাদরে ঢাকা। পাইনবনের ফাঁকে সূর্যের কিরণ যখন এসে পড়ল ঘাসের উপর তখন সাতরঙা ফুলঝুরি চোখের সামনে। মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরও খুব ভোরে নলের মুখাগ্নি না করলে জল বের হয় না। বালতির জল যেটা রাখা ছিল সন্ধে রাত্রে, বাথরুমে ভোরের বেলা সেই জলের উপর এক সেন্টিমিটার পুরু বরফের সর পড়ে আছে। কলকাতাবাসী তারাপদ চক্রবর্তী মশায়ের এই নির্দয় শীতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে মনে হল না। শীতের দেশে শীতের কামড় থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঘরের জানলা সব কাচের হলেও ভারী গরম কাপড়ের পর্দায় ঢেকে দেওয়া। শোবার আগে ঘর গরম করে নেওয়া হয়। রুম-হিটারের ব্যবস্থা না থাকলে কাঠের উনুনে রাতের খাবার-দাবার শোবার ঘরেই গরম করে নেওয়া হয়। আর বিছানায় লেপের নীচে গরম জলের ব্যাগ, নয়তো বোতল। তবে জ্বলন্ত উনুন সারারাত ঘরের ভিতর কখনো থাকবে না। তা হলে মৃত্যু, **asphyxia**। অধিকাংশ বাড়িতে চিমনিও আছে। শিলং-এ কাচাঁ কয়লা খুবই সস্তা। চক্রবর্তীমশায় আমার গৃহেই অতিথি। সকালের প্রোগ্রামের জন্য রেডিয়োর গাড়ি ওঁকে নিতে এল সকাল সাড়ে ছটায়। চা খেয়ে তারাপদবাবু যখন গাড়িতে উঠলেন, আমি হলফ্ করে বলতে পারি ওঁর স্ত্রীও ঐ মূর্তিটি দেখে নিজের স্বামী বলে চিনতে পারতেন না। মাথায় পুরু উলের বাঁদরটুপিতে কান অবধি ঢাকা, বড়ো ওভারকোটের নীচে অদৃশ্য রয়েছে ফুলহাতা সোয়েটারের উপর গরম সার্জের পাঞ্জাবি। গলায় মাফ্লার এবং ওভারকোটের উপর দামী কাশ্মীরি শাল। ছোটোখাটো মানুষ তারাপদবাবুকে ঐ পোশাকে বিপুলকায় দেখাচ্ছিল।

শিলং-এ তারাপদবাবু এই প্রথম এলেন এবং এই নূতন স্টুডিয়োতে তিনিই প্রথম বহিরাগত উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পী। স্টাফ আর্টিস্টদের

দারুণ আগ্রহ তাঁর গান শোনবার। সবাই স্টুডিয়োতে উপস্থিত। এঁদের মধ্যে আমিও বসে গেলাম কার্পেটের ওপর। প্রোগ্রাম শুরু হবার আগে তানপুরায় গলা মিলিয়ে গলাটা একটু গরম করে নিচ্ছিলেন তারাপদবাবু। সহযোগী শিল্পীদের রাগ ও তালটা বুঝিয়ে দেবার জন্য 'স্থায়ী' একটু গেয়ে শোনালেন। দেখলাম হঠাৎ মতি-মিঞা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। এখনই প্রোগ্রাম শুরু হবে। মতিমিঞাকে বাইরে গিয়ে স্পিকারে শোনবার অনুরোধ করলাম। আধ ঘণ্টার অনুষ্ঠান শেষে বাইরে এসে দেখি আমার সহকর্মী নারায়ণ বেজবরুয়া মতিমিঞার পাশে লাউঞ্জে স্পিকারের সামনে বসে আছেন। উভয়েরই চোখ ছলছল। তারাপদবাবুর সঙ্গে বেজবরুয়ার পরিচয় করিয়ে দিলাম।

বেজবরুয়া বললেন, 'কালোয়াতি গানে আমার ভীষণ ভীতি। তবে অতিথি-শিল্পী গান পরিবেশন করবেন, ভদ্রতাবশেই রেডিয়ো খুললাম। কিছুক্ষণ শোনার পরই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। 'সাইরেন'-এর মতো আমায় যেন স্টুডিয়োর দিকে টেনে নিয়ে এল এ সংগীত। স্টুডিয়োতে যখন পৌঁছলাম ওঁর গান শেষ হতে সামান্যই বাকি। বোকামিটা বুঝতে পারলাম স্টুডিয়োতে পৌঁছে। রাস্তায় যে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল।'

গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের নিকট-আত্মীয়, শিশিরকণার প্রথম গুরু মতিমিঞার উক্তি, 'আহির ভৈরব রাগের স্থায়ীটা ধরতেই আমার বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। চোখের জল রাখতে পারলাম না।'

কনট্রোল রুমের ইঞ্জিনিয়ার জানালেন যে অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করা হয়েছে। শিল্পী হিসেবে তারাপদ চক্রবর্তী তখন মধ্যগগনে। রাত্রের অনুষ্ঠান শোনবার জন্য কর্তৃপক্ষ কয়েকজন শ্রোতাকে স্টুডিয়োতে আমন্ত্রণ করলেন। এক ভদ্রমহিলা গানের কথা কিছু বললেন না।

তবে জানালেন যে শিল্পীর হাতের মুদ্রা দেখতে খুব ভালো লেগেছে। বর্ণনা করলেন যে গাইতে গাইতে শিল্পী দৃশ্যমান নয় এমন কিছু ডান হাতে হাওয়া থেকে কুড়িয়ে এনে বাঁ হাতের মুঠোতে রাখলেন এবং কিছুক্ষণ পর মুঠো খুলে আবার ছড়িয়ে দিলেন হাওয়াতেই। হাতের ঐ চলাচলটা খুব আনন্দ দিয়েছে ভদ্রমহিলাকে। হায় রে, কাকে ডাকলাম গান শুনতে!

চার-পাঁচদিন রইলেন তারাপদবাবু। গান-পাগলা রামানুজ ভট্টাচার্য, অধীর দেব, মতিমিঞা, কুমুদ গোস্বামী, জিতেন দেব এবং সুখাইর-এর জমিদারপুত্র দ্বিজরাজ চৌধুরী— ওঁরা ঘুমোবার সময় বাদ দিয়ে বাকি সময়টা তারাপদবাবুর সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিতেন। প্রাণভরে গানও শুনে নিলেন। একদিন রাত্রে খেয়াল ঠুংরি গাইবার পর হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে একটি বাংলা গান ধরলেন। স্বরচিত পল্লীগাথা, এক দুখিনী মায়ের করুণকাহিনী। ভাবপ্রবণ আবেদন নিঃসন্দেহে। কিন্তু শুনতে শুনতে শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেল। গান থেমে গেলেও অনেকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারলাম না। আর বিস্ময়ের কথা যে এই গান যেন এক সাদামাটা পল্লী গায়কেরই গান। দীর্ঘদিনের অনুশীলনের কোনো ছাপ নেই কণ্ঠে। বলতে চাইছি পল্লীগীতি পল্লীগীতির মতোই গাইলেন। কোনো অলং-করণের প্রয়াস নেই, যে সংযমটা এত বড়ো খেয়াল গাইয়ের কণ্ঠে আশ্চর্য মনে হল। তারাপদবাবুর গানে যেটা সব চেয়ে বড়ো কথা সেটা তাঁর আওয়াজের বিশুদ্ধতা, পরিষ্কার সরস কণ্ঠস্বর। সংগীতের এইটিই প্রথম শর্ত। নীচে, উপরে সুসমঞ্জস ধ্বনি! তারসপ্তকে অস্বাভাবিক কোঁত-কাতরানি নেই। অনায়াসে স্বাভাবিক আওয়াজ রেখে যতটুকু নীচে নামা যায় বা ওপরে ওঠা যায় তার অধিক বিস্তৃতি শিল্পীসুলভ কুশলতায় বর্জন করতেন তারাপদবাবু। তানের গতিতে বাড়াবাড়ি ছিল না; সাবলীল, মুক্ত, ছিমছাম। তাঁর অতি সুরেলা

গলার আবেদন সোজা এসে শ্রোতার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিল, শ্রোতাকে সহজেই নিজের অনুভবের অংশীদার করে নিলেন শিল্পী। এটাই তো আর্ট। নৈপুণ্য, ছন্দোময়তা এবং রসের মধুর মিলন।

মণিপুর যাবার যে প্রস্তাব দিল্লী থেকে অনুমোদিত হয়ে এল তাতে গৌহাটির অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর দিলীপকুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে আমায় যেতে হবে। দিলীপবাবু ১৯৪৯ সনের ফেব্রুআরির মাঝামাঝি সময়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। মণিপুর রাজ্যের কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখে যাবার দিনক্ষণ এবং অনান্য সব বন্দোবস্ত করলেন দিলীপবাবু। শিলং থেকে আমি গৌহাটি যাব। সেখানে থেকে ট্রেনে মণিপুর রোড স্টেশন। ওখানে মণিপুর সরকারের গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

শিলং-গৌহাটির রাস্তাটা তখনকার দিনে খুব প্রশস্ত ছিল না। পাহাড়ের ধার কেটে তৈরি হয়েছে সড়ক, একদিকে খাড়া দেওয়াল, উল্টো দিকে গভীর খাদ। চালকের সামান্য অসতর্কতায় যাত্রীসহ গাড়ি দু-তিন হাজার ফুট নীচে পড়ে যেতে পারে। পড়লে মৃত্যু অবধারিত। কেউ যদি বেঁচেও থাকে তার কাছে সাহায্য পৌঁছানো সহজ ব্যাপার নয়। আনন্দবাজার পত্রিকার শিলং-এর প্রতিনিধি হেমন্ত গুপ্ত এই রকম দুর্গম চেরাপুঞ্জির রাস্তায় মারা গেলেন। তাঁর গাড়ি বহু নীচে খাদে পড়ে গেল। আহা, মাত্র একটি বছর আগে বিয়ে করেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত অসমীয়া পরিবারে। শিলং-গৌহাটি সড়কে ড্রাইভার খুবই সতর্ক। রাস্তাও একটু চওড়া। তবু এই রাস্তায় গাড়ি চলাচলের সুনিয়ন্ত্রিত সতর্কতার ব্যবস্থা ছিল। দিনে মাত্র তিনবার গাড়ি-চলাচলের ব্যবস্থা এই সড়কে। প্রথম ছাড়বে সকাল সাতটায়, তার পর বেলা সাড়ে দশটায় এবং সবশেষে বেলা তিনটেয়। দুই দিক থেকেই এই নিয়ম। বলা হত এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর গেট। মাঝপথে নংপো নামে এক জায়গায়

নীচে নামবার গাড়ি এবং ওপরে ওঠার গাড়ি এসে দাঁড়াত। ওপর থেকে সব গাড়ি নংপোতে না আসা পর্যন্ত ওপরে শিলং-এ যাবার কোনো গাড়িকে ছাড়া হবে না। নংপোর গেট বন্ধ থাকবে। নির্দিষ্ট সময়ে দুদিকে যাবার গেটই খুলে দেওয়া হয়।

ভারি সুন্দর জায়গা এই নংপো। বড়ো বড়ো চার-পাঁচটি চা-এর স্টল। রাস্তার দুই পাশে নানারকমের ফলের ঝুড়ি নিয়ে বসেছে আশপাশের পাহাড়ী গাঁয়ের মেয়েরা। একটু দূরেই ঘন জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এখানে। শিলং-গৌহাটি, দুই নগরীর সম্পূর্ণ বিপরীত মেজাজের মধ্যে মিতালি বন্ধনের ভূমিকা এই নংপোর। উপরে ওঠবার যাত্রীদের জন্য ঠাণ্ডা শুরু এখানে। সোয়েটার গায়ে দিতে হবে। নীচে যাবার যাত্রী গরমজামা খুলে নেবেন, গরমেরও পূর্বাভাস। আজকের শিলংযাত্রী কিন্তু যাওয়া-আসার কোনো বাধানিষেধ দেখতে পাবেন না। সড়কটি অনেক চওড়া হয়েছে। অবাধে যে-কোনো সময় গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়।

খুব ভোরে একটু একটু ফর্সা হতে শুরু হয়েছে এমন সময় ট্রেন থেকে নামলাম মণিপুর রোড স্টেশনে। শহরটির নাম ডিমাপুর, বর্তমান নাগাল্যাণ্ড রাজ্যে। এখন ডিমাপুর বড়ো শহর। তখন অতি নগণ্য। এখন স্টেশনের নামটিও ডিমাপুর। এখান থেকে একশো বত্রিশ মাইল সড়কযোগে ইম্ফল, মণিপুরের প্রধান শহর। ওখানেই যাচ্ছি আমরা। সঙ্গে সুটকেস বিছানা। এই ছোটো স্টেশনে কোনো পোর্টার দেখলাম না। প্ল্যাটফর্মের বাইরে কোনো গাড়িও নেই আমাদের অপেক্ষায়। ভাবলাম ইম্ফল থেকে গাড়ি হয়তো সময় মতো এসে পৌঁছতে পারে নি। অগত্যা বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করতে হল। স্টেশন মাস্টারের কাছে খবর পাওয়া গেল, নিষ্ঠুর সংবাদ— গতকাল মণিপুরের একটি জীপ-গাড়ি এসেছিল আমাদের নিতে, ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে আমাদের অনুসন্ধান করে না

পেয়ে জীপটি ফিরে গেছে। আরো মর্মান্তিক খবর বাকি ছিল। দিনের মণিপুরগামী একটি-মাত্র বাস ঘণ্টা-খানেক আগে ছেড়ে গেছে। আমাদের অসহায় অবস্থা। স্টেশন মাস্টার পরামর্শ দিলেন থানায় গিয়ে পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে। কিছু একটা ব্যবস্থা তিনি হয়তো করে দিতে পারবেন। সেই আশায় আমরা অদূরে থানায় গেলাম। সহৃদয় ইন্‌স্‌পেক্টববাবু একটি মালবাহী ট্রাকের ড্রাইভারের পাশে দুটি আসনের ব্যবস্থা করে দিলেন। সন্ধের মধ্যে ইম্‌ফলে পৌঁছে দেবে বলে ড্রাইভার আশ্বাস দিল। মণিপুর যাবার পারমিটও আমাদের দেওয়া হল থানা থেকে। এ পারমিট যে লাগবে তাও জানা ছিল না। হয়তো মণিপুর স্টেটের গাড়িতে গেলে পারমিটের প্রশ্ন উঠত না।

দশটা নাগাদ ট্রাক রওয়ানা হল। ড্রাইভার নাগা। চলছি মণিপুর হাইওয়ে দিয়ে। রাস্তা কলকাতার রেড রোডের চেয়েও চওড়া। যুদ্ধের সময় রেড রোড যেমন রানওয়ে হিসেবে প্লেন ওঠা-নামার জন্য ব্যবহৃত হত এই সড়কটিও তেমন নিয়মিত রানওয়ে ছিল। এক মাইল দু মাইল পর পর রাস্তার ডান দিকে বা বাঁ দিকে, একটু ভেতরে 'ইউ' আকৃতির বিরাট চত্বর। বিমান রাখার স্থান, 'হ্যাংগার'। এখন কোনো বিমান আর নেই, তবে স্তূপীকৃত ভাঙা গাড়ি সব পড়ে আছে; মিলিটারি লরী, ট্রাক, জীপ। যেতে যেতে এইগুলো দেখে যুদ্ধের বিভীষিকার কথা ভাবছিলাম।

ঐ সামনে কোহিমা শহর, ডিমাপুর থেকে মাত্র পঞ্চান্ন মাইল। বেলা একটা নাগাদ আমাদের ট্রাক কোহিমা শহরে পৌঁছল। একটু এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভার ট্রাক থামিয়ে নেমে পড়ল। নেমে যাবার আগে কি বলেছিল এক বিন্দুও বুঝতে পারি নি। আমিও নামলাম। কয়েক পা এগোবার পর ডান দিকে একটা 'ওয়ার সেমিট্রি'। যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে। একটি স্মৃতিস্তম্ভে ইংরেজিতে লেখা—

WHEN YOU GO HOME
TELL THEM OF US AND SAY
FOR YOUR TOMORROW
WE GAVE OUR TODAY

কি করুণ মিনতি! ওগো বন্ধু পথিক, ক্ষণেক থেমে যাও। তোমার পদধ্বনি শুনে চিনতে পেরেছি তুমি আমার দেশেরই মানুষ। আমায় দেখতে পাবে কি করে? কবরের নীচে মাটিচাপা পড়ে আছি যে! প্রিয়জন জানবে না কোথায় কত দূরে। একফোঁটা চোখের জল পড়বে না এই কবরের উপর। তোমরা যারা বেঁচে রইলে, ঘরে ফিরে গিয়ে সবাইকে ডেকে ক্ষণেকের জন্য আমাদের কথা স্মরণ করতে বোলো। বোলো, তোমাদের আগামী কালের জন্য আমাদের আজকের দিনটি বিসর্জন দিলাম।

বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। বুঝতে পারলাম কবরের নীচের এই হতভাগ্যরা দ্বিতীয় মহাসমরের বলি। কোটি মৃত সৈনিকের আত্মার করুণ ক্রন্দন পৃথিবীর যুদ্ধ বন্ধ করতে পারবে কি? যুদ্ধটা যে সভ্যতার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সকল দেশের মানুষ যদি বাউল, সহজিয়া হয়ে যেত, আর তাদের রসিক-প্রধানের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হত, তবে হয়তো বা মানুষে মানুষে হানাহানি থেমে যেত। কিন্তু সে তো আমার কল্পনার বিলাস। আমার সামনে ঐ উঁচু পাহাড়টি আই. এন. এ.-র সেনাদল দখল করে বসেছিল। মিত্রশক্তির পক্ষে কোহিমার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল মার্কিনী সৈন্যের হাতে। দুই পক্ষে এত গোলা-গুলি ছোঁড়া হল যে যুদ্ধশেষের এত দিন পরেও চার দিকের গাছগুলি পত্রবিহীন, নীরস তরুবরের মতো যুদ্ধের চিহ্ন গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আই. এন. এ বাহিনী ভারতের মাটিতে পা বাড়াল, কোহিমাকে

অবরোধ করে রাখল বেশ কিছুকাল। স্ট্র্যাটিজির দিক থেকে আই. এন. এ.-র অতি চতুর চাল। মিত্রশক্তি Stillwell রেললাইন বসাল, বর্মা রোড তৈরি করল, কিন্তু আই. এন. এ. যে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কোহিমা পর্যন্ত এগিয়ে এল বিনা বাধায়, এটা একটা মোক্ষম রণকৌশল। মিত্রশক্তি টেরই পেল না। কিন্তু মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য, আই. এন. এ.-র সাপ্লাই লাইন ব্যাহত হল। জাপান সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরবরাহ দিতে পারল না। আহার্যের অভাব, বারুদ নেই, ঘরের শত্রু বিভীষণেরও আবির্ভাব ঘটল। জয়যাত্রা তাই ব্যর্থ হল। কদম কদম বাড়িয়ে দিল্লী যাওয়া আর হল না।

নাগা ট্রাক-ড্রাইভার আমাদের বসিয়ে রেখে সেই-যে উধাও হয়ে গেল, ফিরল ঘণ্টা-দুই বাদে। ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস নেই। কোহিমা আসার পথে এক জায়গায় ট্রাক থামিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করে কাছেরই গাছের ডালে বসা বনমোরগ মারল একটা। এটা দেখার পর এই ড্রাইভারকে ভয় না করে উপায় কি? কোহিমার বুকে যে যুদ্ধ হল তার ফলে মৃত্যু হয় অগণিত সৈন্যের। মৃত সৈন্যের হাতের অস্ত্র পেয়ে গেল আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরা। তাই নাগাদের হাতে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র। ড্রাইভার সদয় হয়ে বিকেল তিনটে নাগাদ আবার তার ট্রাক চালু করল। এবার নামল মুষলধারে বৃষ্টি। পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ির গতিও কমল। সন্ধ্যার পর একটা জায়গায় ট্রাক থেমে গেল। ড্রাইভার নেমে গেল এবং জানাল যে ট্রাক আর চলতে পারবে না এই রাত্রে। ড্রাইভার অবশ্য দয়া করে রাস্তার ধারে কিছু নীচে একটি ঘর দেখিয়ে বলে দিল যে ওখানে রাত্রের খাবার পাওয়া যাবে। কিন্তু থাকা হবে কোথায়? সে কথার জবাব দেবার জন্য ড্রাইভার আর দাঁড়িয়ে নেই। অন্ধকারে মিশে গেল।

পঞ্চাশ-ষাট ফুট নীচে একটি ঘরে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মিস্টার সেনগুপ্ত এবং আমি ট্রাক থেকে নেমে সাবধানে খুব আস্তে আস্তে ঐ আলোর উৎসের দিকে এগোতে লাগলাম। কাছে গিয়ে দেখি তিন-দিক-খোলা একটা বাঁশের চালা। যে দিকটায় বেড়া আছে তার ঠিক মাঝখানে একটি দরজার ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে দরজা খুলে কেরোসিনের কুপি হাতে বেরিয়ে এল খর্বাকৃতি একটি লোক। হিন্দিতে আহ্বান করল মেঝেতে উঠে আসতে। কাছে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম মানুষটি নেপালী। মনে কিছুটা ভরসা পেলাম। মাঝবয়সী এই দারুণ জোয়ান লোকটির কাছে আমাদের বিপন্ন অবস্থার কথা বললাম। ও আমাদের অভয় দিল। নিজেই ট্রাক থেকে আমাদের বিছানা স্যুটকেস নিয়ে এল। বলল যে ট্রাকে থাকলেও চুরি যেত না কিছু। এখানে চুরি-টুরি হয় না। মেঝের উপর বড়ো দুটি টেবিলের পাশে বেঞ্চ পাতা। শোবার ব্যবস্থা কোথায় হবে জানতে চাইলে লোকটি বলল যে ভিতরে আর-একটি মাত্র ঘরে স্ত্রীকন্যা নিয়ে নিজে থাকে। সুতরাং তিন-দিক-খোলা এই চালাঘরেই টেবিলের উপর বিছানা পেতে রাতটা কষ্ট করে কাটিয়ে দিতে হবে আমাদের। অবশ্য আশ্বাস দিল যে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ও তো পাশেই রয়েছে। ডাল-রুটি বানিয়ে দিল। সারাদিন অনাহারের পর অমৃতের মতো মনে হল। পরিবেশন করতে করতে বলল যে জায়গাটির নাম মাও। এখান থেকেই মণিপুর রাজ্যের শুরু। গ্রামের মানুষগুলি ভালো, সরল ও কর্মঠ। ওর দোকানে গ্রামের ছেলেরা চা-রুটি খায়, ন্যায্য দাম দেয়, ঠকাবার চেষ্টা নেই। জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না একা এই নির্বান্ধব দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বাস করতে ওর ভয়ডর লাগে কিনা।

নেপালী লোকটির উত্তর, 'সাহেব, এরা ভিন্ন জাতির মানুষ হলেও পাহাড়ী তো, তাই আর-এক পাহাড়ের মানুষটিকে ওরা খুব দূরের লোক ভাবে না। আমিও যথাসাধ্য সদ্ভাব রেখে চলবার চেষ্টা করি।'

একটু থেমে আবার বলল, 'প্রায় দশ বছর আগে এখানে এসে ডেরা বাঁধি। এর আগে ইম্‌ফলে ছিলাম। যাওয়া-আসার সময় দেখতাম এই জায়গায় এসে সব গাড়ি থামে। খুব দূরে নয় ইম্‌ফল থেকে। এখানে দোকান খুললাম। এখন পর্যন্ত কোনো বিপদে পড়ি নি, যুদ্ধের সময়েও না। এখন অবশ্য ছেলে ছোকরাদের হাতে কিছু দামী দামী বন্দুক রিভলবার এসে পড়েছে। আমি তাতে ভয় করি না এদের।'

গলার আওয়াজ একটু নিচু করে বলল, 'সাহেব, আমার কাছেও খুব ভালো জিনিস আছে।'

বাপ রে, বলে কি লোকটা! এ কোন দেশে এলাম! আমরা দুজনেই কেমন যেন হয়ে গেলাম। গাঢ় অন্ধকার রাত, চার দিক নিঝুম, এই অজানা পাহাড়ে তিন-দিক-খোলা একটি চালার নীচে রাত কাটাতে হবে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে একটা অন্য জগতে চলে এসেছি। ভয়, বিপদ, এ-সবের বোধশক্তিটাও যেন হারিয়ে ফেলেছি।

রাত হয়েছে, অন্ধকার চেপে ধরেছে। দোকানের মালিক বিছানা খুলে টেবিলের উপর বিছিয়ে দিল। সুটকেস থেকে টর্চ বের করলাম। দোকানী কম্বল গায়ে দিয়ে শুতে বলল। শেষ রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। জায়গাটির উচ্চতা ছ হাজার ফুটের উপর। আমাদের আবার অভয় দিয়ে কেরোসিনের কুপিটি নিয়ে দোকানী ভিতরে চলে গেল। একেবারে অজানার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বিছানায় গা রাখলাম। ভাবলাম যদি বেঁচে থাকি, পরদিন পৃথিবীর

আলোর মুখ দেখতে পাই আবার, তবে এই রাত্রির স্মৃতি জীবনে বিস্মৃতি হবে না।

আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে অনেকটা সময় কেটে গেল। বোধ হয় শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ জেগে গেলাম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি যেন বিপদের সংকেত পেয়ে জাগিয়ে দিল। একটা গা-ছম্‌ছম্‌-করা ভাব। চোখ খুললাম, চার দিক গাঢ় কালিমায় ঢাকা, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দূর থেকে একটা চাপা ফিস্‌ফিসানি কানে এল। ঘরের ভিতর টর্চের ফোকাস।

যত জোরে পারি চিৎকার করে ডেকে বললাম, 'সেনগুপ্ত সাহেব, ডাকাত! ডাকাত!'

সেনগুপ্ত সাহেবও চিৎকার করে উঠলেন, 'রিভলভার! মাই রিভলভার!'

এইগুলি প্রচণ্ড ভয়ের চরম আর্তস্বর। নেপালী দোকানের মালিকও ছুটে বের হয়ে এল ঘর থেকে। দূরে মিলিয়ে যাওয়া জুতোর শব্দ ওপরের রাস্তায়। এতক্ষণে নিজের টর্চের কথা মনে পড়ল। বাইরে ফোকাস করলাম। দেখা গেল না কাউকে। এখন দোকানী ঘরে কুপিটাও জ্বালিয়েছে। ভয় কমে এসেছে। উপলব্ধি করলাম সেনগুপ্ত সাহেবের কল্পিত রিভলভারের অস্তিত্ব ঘোষণাটা মোক্ষম কাজে লেগেছে।

নেপালী লোকটি বলল, 'এমনটি কখনো হতে দেখে নি।'

সহৃদয় দোকানের মালিক চায়ের ব্যবস্থা করল। হাতঘড়িতে তখন ভোর চারটে। পুবের আকাশ একটু একটু ফর্সা হচ্ছে। একটা বিভীষিকার রাত কেটে গেল। আর্মিতে কাজ করি না; বনবিভাগ, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া বা জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতেও নয়। আমার জীবনে এমন একটা অভিজ্ঞতা কখনো আসতে পারে ভাবতেই পারি নি। বিপদ দুয়ারে এসেছিল, মৃত্যুর

সম্মুখে দাঁড়িয়ে কি করতে পারতাম ? আত্মরক্ষার কোনো উপায় তো ছিল না। বেলা একটু বাড়লে বিছানা গুটিয়ে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাক-ড্রাইভার এসে জানাল সে প্রস্তুত। নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম ইম্‌ফলে বেলা দশটার সময়।

ভারতের এই প্রাচ্য-প্রত্যন্তের দেশীয় রাজ্যটি দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-ভুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উনপঞ্চাশ সনের পনেরো অক্টোবর সি-শ্রেণীর রাজ্য হল। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সাতান্ন সনে এবং বাহাত্তরের একুশে জানুআরি ভারতের বিংশতিতম রাজ্য। রাজধানী ইম্‌ফল ছিমছাম পরিচ্ছন্ন শহর। একটা পেট্রোল পাম্পের সামনে ট্রাক থামল। এর বেশি যাবে না। ক্যাব, ট্যাক্সি নেই, সাইকেল রিক্‌সা নেই, এমন-কি, পোর্টারও নেই। ট্রাক থেকে মালপত্র নামিয়ে অসহায় দাঁড়িয়ে আছি। সাইকেল চড়ে যাচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক, আমাদের বিপন্ন মুখ দেখেই বোধ হয় থামলেন। আর-একজন সাইকেল যাত্রীকেও ডেকে দাঁড় করালেন। দুই সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে আমাদের মালগুলি রাখা হল। ভালোমানুষ দুজনই মণিপুরের সন্তান। বয়স মধ্য চল্লিশে। পরনে বাঙালির মতো ধুতি, গায়ে হাফ-সার্ট, কপালে তিলক আঁকা। পোশাকটা বাঙালির মতো, আরো বিস্ময়. বলছেনও বাংলা কথাই, উচ্চারণ ত্রুটিহীন। যেন অনেক কালের চেনা একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা। এঁদের সঙ্গে চললাম সারকিট হাউসের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। ওঁরা দুজনেই স্কুলের শিক্ষক। জানালেন যে প্রবীণ বয়সীরা প্রায় সবাই বাংলা বলতে পারেন বেশ ভালো। আর লেখায় তো কোনো অসুবিধাই নাই। ওঁদের নিজ ভাষার লেখাটাও বাংলা হরফেই। নবীনরা অবশ্য এখন বাংলা শিখছে না আর। হরফ এক হলেও মণিপুরী ভাষা 'মিতেই'-এর সঙ্গে বাংলা ভাষার কোনো মিলই নেই। সবাই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। ধর্মটা

এসেছে নবদ্বীপ থেকে। কথা বলতে বলতে আধ মাইল হেঁটে সারকিট হাউসে এলাম। এঁদের দুজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

সারকিট হাউসের নোটিশবোর্ডে আমাদের নামে রিজার্ভেশন রয়েছে দেখলাম। চৌকিদার ঘর খুলে দিল। গতরাত্রির আদিম পরিবেশের পর সভ্যতার প্রাচুর্য। আরামেব নিশ্বাস ফেললাম। চা খেতে খেতে সেনগুপ্ত সাহেব কর্মতালিকাটা ভেবে নিলেন। প্রথমেই টেলিফোন করলেন মেজর খাটিংকে। তিনি এ রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী। সেনগুপ্ত সাহেবের পত্রালাপ এই মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গেই হয়েছে। কিছুক্ষণ পরই মেজর খাটিং এলেন। আমাদের আসার তারিখটি মন্ত্রীমশায়ের অফিসেই গোলমাল হয়ে গেছে এবং ভুলবশত একদিন আগেই গাড়ি পাঠানো হয়েছিল ডিমাপুর রেলস্টেশনে। মেজর খাটিং সংগীতের শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বললেন. একটা নির্দিষ্ট সময়ে এক জায়গায় সব শিল্পীদের একত্র করবার চেষ্টা তিনি করবেন। পরে আমাদের এ বিষয়ে পাকা খবর দেবেন ব'লে তিনি বিদায় নিলেন। আজকের দিনটায় আমাদের আর কিছু কাজ নেই। দুদিনের অস্নাত, শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহটিকে স্নানের তৃপ্তি দান করলাম। তার পর বিলাসপূর্ণ খাবার-ঘরে উৎকৃষ্ট আহারের পর মোলায়েম শয্যায় দেহটি এলিয়ে দিতেই গাঢ় নিদ্রা।

ঘুম ভাঙলো বেলা শেষে। শহরটা ঘুরে দেখব বলে বের হলাম। পূর্ণচন্দ্রের রাত। পুব আকাশে চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙে নেমে আসছে। একটু এগিয়ে গিয়ে বাজার। জিনিসপত্র বিকিকিনি করছে মেয়েরা। আকাশে চাঁদ, মাটিতেও চাঁদের হাট। ছোটো ছোটো দোকানে সবজি, চাল, ডাল এবং নানারকম বেসাতি ডালার ওপর সাজিয়ে বিক্রি করছে মণিপুরকন্যারা। পরনে তাঁতে-বোনা শাড়িতে রঙ ও নক্‌শার বাহার। এখনই যেন পাট ভেঙে

পরেছে। অঙ্গে কোনো আভরণ নেই। মাথার চুলে সযত্ন বিন্যাসের স্বাক্ষর। চাঁদের আলোর নীচে কি পবিত্র দেখাচ্ছিল। তাঁতে-বোনা শাড়িকাপড়, বিছানার চাদর, টেবিলের ঢাকনা, বিখ্যাত মণিপুরী 'লাইছাম্পি' নিয়েও কেউ বসেছে। টেবিলের ঢাকনায়, বালিশের ওয়াড়ে চিকন ছুঁচের কাজ। পুরুষ ক্রেতা নেই, মেয়েরাই বেচা-কেনা করছে। বাজারে নোংরা নেই। সোরগোল নেই। একটা জাতির পরিচ্ছন্নতার মাপটা হাটে-বাজারেই বেশি। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সমস্ত বাজারটা। বাঁশের ও বেতের তৈরি বাক্স-প্যাঁটরায় অতি সূক্ষ্ম কাজ, তবে বাজারে আর্ধেকটা জুড়েই তাঁতের শাড়ি-কাপড়ের দোকান। দামে বেশ সস্তা। কিনে ফেলতে ইচ্ছা করে সবগুলিই, দেখতে এত সুন্দর। তাঁতশিল্প এ রাজ্যের সব চেয়ে বড়ো কুটিরশিল্প। বাজারটা দেখে, এদিক-ওদিক আর-একটু ঘুরে সারকিট হাউসে ফিরে এলাম। হাটে-বাটে সর্বত্রই মেয়েরা। এ যেন এক প্রমীলারাজ্য।

পরের দিনটাও আমাদের বিফলে গেল। দুপুর পর্যন্ত মেজর খাটিং-এর কোনো বার্তা না পেয়ে আমরাই গেলাম ওঁর অফিসে। হতাশ হয়ে শুনলাম যে তিনি হঠাৎ জরুরি কাজে শহরের বাইরে গিয়েছেন। ফিরবেন দু-একদিন পর। দুটো দিন কোনো কাজ হল না, খুবই দুশ্চিন্তায় পড়লাম। বিকেল বেলায় অনুসন্ধান করতে করতে একটি নাচের স্কুলে এলাম। সেখানে গুরুর কাছে খবর পেয়ে আশ্বস্ত হলাম যে আগামী কাল এক মস্ত বড়ো গানের আসর বসছে 'রূপমহল' থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে। আমাদের শোনাবার জন্যই এই আয়োজন করেছে সেখানকার শিল্পীসংঘ। সন্ধ্যার পর দুই ভদ্রলোক এলেন সারকিট হাউসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। শিল্পীসংঘের পক্ষ থেকে আমাদের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। আগামী কাল বিকেল ছটায় রূপমহল মঞ্চে এই অনুষ্ঠান।

সময়নিষ্ঠা দেখে খুশি না হয়ে পারলাম না। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ছটার সময় শুরু হল অনুষ্ঠান। সেনগুপ্ত সাহেব বেতারের ভূমিকা একটু ব্যাখ্যা করে উদ্যোক্তাদের এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। প্রথমে উচ্চাঙ্গ সংগীত। পর পর খেয়াল গাইলেন দুজন শিল্পী। উভয়েই লক্ষ্মৌ ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয়ের 'বিশারদ'। তার পর আধুনিক গানের আরম্ভ। এই গানে হিন্দি সিনেমার সুরের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু মঞ্চে পরিবেশনার মুনশিয়ানা দেখে আমরা অবাক। কোনো নাটকেরই একটি দৃশ্য যেন। শিল্পী বনের ধারে শুষ্ক পত্রহীন এক গাছের নীচে বসে আপনমনে গাইছেন। তার গানে মুগ্ধ হয়ে ধূসর আকাশ সুনীল হল, সবুজ পাতায় ছেয়ে গেল গাছটি। একটু পরে সেই গাছে ফুলও ফুটল। সবই আলোর কারসাজি। আর-একটি দৃশ্য, পাশাপাশি দুই বাড়ির জানলায় মুখ বাড়িয়ে যুবক-যুবতী ভালোবাসার গান শোনালেন। অতি সুন্দর উপস্থাপনা, যেন থিয়েটার দেখছি। পরে শুনলাম এই শহরে দুটি পেশাদারি মঞ্চ রয়েছে, প্রতিদিন দুবার হচ্ছে নাটক। একটি তো এই 'রূপমহল' থিয়েটারই। মাইল-খানেক দূরে আছে আর-একটি। এবারে শুনলাম মণিপুরী কীর্তন। বাংলার কীর্তনের প্রভাব যথেষ্ট। কিছুটা আর্ত বিলাপের ভাব শিল্পীদের নিজস্ব অবদান। তাল-মানের ঘাটতি নেই। শিল্পী-তালিকা আগেই আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। পাশে বসে এক হেডমাস্টারমশায় গানের অর্থ বাংলায় আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠান শেষে আমরা বেশ ক'জন শিল্পী নির্বাচন করতে সক্ষম হলাম। পেলাম খেয়াল, আধুনিক ও মণিপুরী কীর্তনের শিল্পী— পুরুষ ও নারী। কীর্তনটা যেন শুধু মেয়েদেরই গান মনে হল। এই-সব শিল্পীদের পেয়ে আমাদের এই সফর মোটামুটি সার্থক হল।

ইম্‌ফল শহরের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। নিকটবর্তী রেল-স্টেশন একশো বত্রিশ মাইল দূর। অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, উপত্যকা, অধিত্যকা পার হয়ে রেল-স্টেশন। অতীতের মুণ্ডশিকারীদের একটা রাজ্যের উপর দিয়ে এই সড়ক। মোটর-গাড়িও খুব বেশিদিন আগে আসে নি এই সড়কে। তা হলে এই রাজ্যের মানুষগুলি বাইরের বিশ্বের সঙ্গে কি করে যোগাযোগ রাখতেন জানতে কৌতূহল হয়। নাকি বাইরের জগৎটার সঙ্গে ওদের পরিচয়ই ছিল না? শিলচর থেকে লক্ষ্মীপুরের ভেতর দিয়ে ইম্‌ফল যাবার একটা রাস্তা আছে আমি দেখেছি। শিলচর থেকে লক্ষ্মীপুর পঁয়ত্রিশ মাইল। তার পর একটি পাহাড়ী নদী নৌকোয় পার হলে ইম্‌ফলের সড়কের শুরু। বাস যাওয়া-আসা করে এই রাস্তায়। কাছাড়ের রাজার সঙ্গে মণিপুর রাজাদের বৈবাহিক সম্পর্ক এবং যুদ্ধটা ইতিহাসের ঘটনা। তা হলে এই লক্ষ্মীপুরের রাস্তাই কি প্রাচীন কালের যোগসূত্র? এই তথ্য আমি খুঁজে বের করতে পারি নি। ইম্‌ফল ভারতের পুব-সীমানার শেষ শহর। শিক্ষায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতটুকু পেছনে পড়ে নেই। মণিপুরী নৃত্য সর্বভারতে খ্যাত এবং আদৃত। ভারতীয় নৃত্যের চার ঐতিহ্যময় ঘরানার একটির জন্মস্থান এই শহর। ইম্‌ফল শহরে বেড়াতে বেড়াতে প্রতিটি বাড়ি থেকেই নূপুরের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। নাচটা মণিপুরী মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সব মেয়েরাই নাচ শিখবে। তাই মণিপুরের বাতাসে নূপুরধ্বনি মিশে রয়েছে। এই শহরে এসে এমন একটি শিল্পীজাতের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ধন্য হলাম।

শিলং-এ নতুন স্টেশন ডিরেক্টর এলেন, নাম পি. সি. চ্যাটার্জি। সরাসরি এই পদে নিয়োগ। এর আগে অবশ্য কিছুদিন রেডিয়োর সংবাদ-বিভাগে নিউজ এডিটরের পদে কাজ করেছেন। কিন্তু

সংবাদ-বিভাগ থেকে পদোন্নতিতে স্টেশন ডিরেক্টর হওয়া যায় না। তিনি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন। এ বছরই ইউ. পি. এস. সি. সোজাসুজি স্টেশন ডিরেক্টর পদে কয়েকজনকে নির্বাচিত করল। এর আগে ডিপার্টমেন্টের অভিজ্ঞ অফিসারদের প্রমোশন দিয়ে এই পদে উন্নীত করা হত। ঐ বছরে বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলিও স্টেশন ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। চ্যাটার্জি অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায় পদবী বাঙালি ছাড়া ভারতের অন্য রাজ্যের মানুষের নেই। চ্যাটার্জি, চাটুতি, চট্টোপাধ্যায় চট্ট-গাঞীর উত্তর পুরুষ, কুলীন ব্রাহ্মণ। চট্টের সঙ্গে উপাধ্যায় বা আচার্য যোগ করে চট্টোপাধ্যায়, চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জি পদবীর নূতন স্টেশন ডিরেক্টরের প্রতি যে স্বাভাবিক স্বাজাত্যবোধ মনে জেগেছিল সেটা ধাক্কা খেল যখন জানতে পারলাম তিনি বঙ্গভাষায় কথাও বলতে পারেন না। পূর্বপুরুষের কোনো একজন খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে পাঞ্জাববাসী হলেন। পি. সি. চ্যাটার্জি সেই কুলের। কৃষ্টিতে পুরোপুরি পাঞ্জাবী। পুরো নাম প্রভাসচন্দ্র চ্যাটার্জি। স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার বিশ্বাস ঠাট্টা করে বলেছিলেন, চ্যাটার্জি যখন, বাংলা বলতে পারেন বা না পারেন, আপনি আমাদের আপনজন। চ্যাটার্জি সাহেব মানুষটি কিন্তু খাঁটি সোনার। দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, উদার মানসিকতা, বয়সেও নবীন। এই স্টেশন ডিরেক্টর পরবর্তী কালে ডিরেক্টর জেনারেল হয়ে উনআশি সালে অবসর গ্রহণ করেছেন। রেডিয়োর অনেক প্রগতিমূলক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে এই মানুষটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। রেডিয়োর ভিতরে এবং বাইরেও সমাদর লাভ করেছেন প্রচুর। পি. সি. চ্যাটার্জিকে পেয়েও আমরা মহাখুশি। কাজে খুব উৎসাহ দিতেন এবং ভালো কাজের বিনিময়ে অকুণ্ঠ প্রশংসা পাওয়া যেত ওঁর কাছ থেকে। নানা বিষয়ে ওঁর আগ্রহ, কৌতূহল। খাসি, জয়ন্তিয়া,

নাগা, লুসাইদের বিষয়ে অন্তহীন জিজ্ঞাসা তাঁর। আসামের বনভূমি, গাছ-গাছালি, আসামের পাখি, বন্যপ্রাণী, আসামের চা, সীমান্তের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ— এ-সব বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রস্তুত করেছি চ্যাটার্জি সাহেবের নির্দেশে।

এগিয়ে আসছে খাসিদের সব চেয়ে বড়ো পরব নংক্রেম। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে শিলং শহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে স্মিট নামে একটি গ্রামে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম, খাইরিম স্টেটের রাজার গ্রাম। খাসি পাহাড় প্রাচীন কালে প্রায় পঁচিশটি ছোটো ছোটো সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি রাজ্যের আয়তন সামান্য, আয়ও খুবই কম। অধিপতিদের বলা হয় সীয়েম (Syiem)। এখনো সামন্ত প্রথাটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। এখনো ষোলোজন সীয়েম রয়েছেন তাঁদের ছোটো ছোটো সামন্ত রাজ্যের অধিপতি সেজে। এগুলির মধ্যে খাইরিমই সর্বপ্রধান এবং এই রাজ্যের সীয়েমই সব চেয়ে বেশি সম্মানিত। তাঁর নিজের গ্রাম স্মিট-এ বর্ষার সময় এই বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। বহু মানুষের সমাবেশ এই উপলক্ষে। পাঁচ দিন চলবে এই অনুষ্ঠান। দিন ধার্য হবার পর সীয়েম প্রজাদের কাছে বেতের তৈরি ছোটো ছোটো বেত-বলয় (cane ring) পাঠিয়ে দিলেন। এই বেতের বলয়গুলি উৎসবে যোগদানের জন্য সীয়েমের নির্দেশের প্রতীক স্বরূপ। বলিদানের জন্য মোরগ এবং অজ-শাবকও চাওয়া হল প্রজাদের কাছে। সানাই এবং বাঁশি -শিল্পীদের এবং নানা ধরনের ঢোল-বাদকদের বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হল।

শুরুতে রাজপরিবার এবং প্রজা-সাধারণের কল্যাণার্থে প্রার্থনা অনুষ্ঠান। প্রথম দুই রজনীতে ঘটা করে সীয়েম পরিবারের পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দ্বিতীয় রাত্রে আবার রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী Ka Blei Symshar-এর পুজো করা হয়। দিবাভাগে চলতে থাকবে নাচ। তৃতীয় দিনের প্রভাতে বাদ্যকরদের

মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হবে। বিকেলে একটি আড়ম্বরপূর্ণ মিছিল সীয়েমের বাড়ি থেকে বের হয়ে বলির অঙ্গনে পৌঁছবে। পুরোহিত তখন সীয়েমের হাতে একটি মোরগ দেবেন বলির জন্য। এর পর শুরু হবে পুরুষদের নাচ। সীয়েমও যোগ দেবেন সে নাচে। পরদিন প্রভাতে অবিবাহিত খাসি-বালারা নাচবে রাজগৃহের ভিতর-প্রাঙ্গণে। রাজবাড়ির মহিলারাই শুধু এ নাচ দেখতে পাবেন। বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ। বেলা একটু বাড়লে রাজবাড়ির সামনের খোলামাঠে নাচ শুরু হবে। এবার নারী পুরুষ সবাই সে নাচে অংশগ্রহণ করবে। রাজপরিবারের একজন অবিবাহিত মেয়েও যোগ দেবে। মাথায় সোনার মুকুট, বিচিত্র বর্ণের উজ্জ্বল পোশাক পরনে। একজন ছাতাও মেলে ধরবে সেই মেয়ের মাথায়। একক বা যুগল নৃত্য দেখলাম না। কিংবা মধ্যভারতের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত গোষ্ঠীবদ্ধ নাচও দেখলাম না। মেয়েরা সকলেই আলাদা আলাদা ধীরপায়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়বে। মেয়েদের পোশাকে কত রঙের বাহার। পা পর্যন্ত ঢাকা পোশাকে। খুব ভারী ভারী অলংকার গায়ে, গলায় সোনালী পাথরের মোটাদানার মালা। মাথায়ও আছে রুপালী মুকুট। গুটি-গুটি পা-পা করে শামুকের গতিতে মেয়েরা মাঠের চার দিক ঘুরে আসবে একক ভাবে। দেহ কিন্তু একটুও দুলছে না। পায়ে ঘুঙুর বাঁধা নেই। কোনো ছন্দের কাজ নেই। হাতের অঙ্গুলিবিন্যাস দেখতে পেলাম না; ভ্রূভঙ্গী, চোখের চমক, মুখের বিশেষ অভিব্যক্তি— দেহের কোনো মুদ্রাই নেই মনে হল। তবে দূর থেকে দেখলে মনে হয় একঝাঁক প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকজন পুরুষ এক হাতে তরোয়াল অন্য হাতে চামর দুলিয়ে রণোন্মত্ত সৈনিকের মতো লম্ফঝম্ফ করছে। ঠিক মেয়েদের সলজ্জ গুটি-গুটি পা-পা-র উল্টোটা। পুরুষের মাথায় পাগড়ি, পরনে সিল্কের ধুতি, গায়ে হাতাহীন নকশা-করা কোট। এ কেমনধারা নাচ? কোন্

আর্টের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে? নৃত্যপর্বের শেষ হলে শুরু হল ছাগ-বলির পালা। উৎসবের পঞ্চম দিনে ছাগমাংস বিতরণ এবং পান-ভোজন। রাত্রির মধ্যযামে সীয়েমের নেতৃত্বে দরবারকক্ষে সমবেত প্রার্থনার পর নংক্রেম উৎসবের উপর আনুষ্ঠানিক যবনিকাপাত।

এই নাচের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় এমন-কিছু বাদ্যযন্ত্র দেখলাম। আমাদের নাকারা জাতীয় একটি ঢাক, নাম— কা-না-করা (Ka Nakra)। আর-একটি ড্রাম Ka Sing Diengphong— এটিতে ঘন বেতের বুনটের উপরটায় চামড়ার ছাউনি। এটি আকারে একটু ছোটো। আর-একটি ছোটো ড্রাম মেয়েদের নাচের সঙ্গে বাজানো হয়। এটিকে বলে Ka Ksing Kynthei। আকারে আরো ছোটো একটি ড্রামের নাম Sing Naila। তার পর আছে Tang-muri, আমাদের সানাই-এর মতো। আর-একটি যন্ত্র দেখলাম ভেঁপুর মতো, নাম Turoi। বড়ো করতাল আছে। নাম Chaw Chaw। নাচের সঙ্গে এই বাদ্যযন্ত্রগুলির কোনো সমন্বয় আছে বা তার প্রয়াস আছে এমনটা মনে হল না। কেউ কারুর সঙ্গে নেই। নাচে বা বাজনায় সৌষম্য-সঙ্গতি-সামঞ্জস্য এই রকম কোনো ধারণা ক্রিয়াশীল আছে বলে তো মনে হল না। এই নাচ বা বাজনার জন্য অনুশীলন পরিশীলনের প্রয়োজন হয় এ কথা আমায় কে বলবে!

শিলং-এর রামকৃষ্ণ আশ্রমে মাঝে মাঝে যেতাম। একদিন সেখানে পরিচয় হল সতীশ মহারাজের সঙ্গে। চেরাপুঞ্জীর রামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি প্রধান। পৃথিবীবিখ্যাত এই চেরাপুঞ্জীতে তিনি রয়েছেন দীর্ঘকাল।

প্রণাম করে একটু ঠাট্টা করে বললাম, 'মহারাজকে দেখে খুব ভিজে স্যাঁতসেঁতে মনে হচ্ছে না তো!'

হেসে তিনি জবাব দিলেন, 'ওখানকার বৃষ্টিটা বড়ো মজার। একসঙ্গে সমস্ত দেহটা ভিজিয়ে দেয় না। এক সময়ে মেঘ এসে

মাথাটা, কাঁধটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। পা শুকনো, কোমরের নীচটায় বৃষ্টি পড়ল না। আবার পাঁচ মিনিট প্রবল বর্ষণের পরই আকাশে রোদ। মেঘ যে ছোঁওয়া যায় চেরাপুঞ্জীতে। আবার দুরন্ত ছেলের মতো কখনো পালিয়ে যায়। দুষ্টুমি করে হঠাৎ এক টুকরো মেঘ খোলা জানলায় ঘরে ঢুকে বিছানা ভিজিয়ে গেল। বাইরে তখন রোদের ঝিকিমিকি।'

সতীশ মহারাজের কাছে স্বপ্নরাজ্য মেঘনগরের গল্প শুনছি। মহারাজ জানালেন যে সেখানে অনেক শিল্পীর সন্ধানও পাওয়া যাবে। তাঁর নিজের স্কুলেই নাকি কিছু শিল্পী আছে। চেরাপুঞ্জী যাবার প্রস্তাবটি স্টেশন ডিরেক্টর অনুমোদন করলেন।

একদিন সকালে মেঘমালার দেশ চেরাপুঞ্জীতে পৌঁছে গেলাম। মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই আকাশে। সতীশ মহারাজের সঙ্গে আগেই ব্যবস্থা ছিল। ওঁর স্কুলের কয়েকজন ছাত্রের গান শুনলাম। রাগভিত্তিক খাসি ভাষায় গান একেবারে পাঠশালা মানের। এ গান চলবে না। আশপাশের গ্রামের অনেক শিল্পীও এসেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে প্রাচীনরীতির গানের কয়েকজন শিল্পী আমরা বেছে নিলাম। এতে সতীশ মহারাজ খুব খুশি। এবার মহারাজ নিয়ে চললেন জায়গাটা ঘুরে দেখাতে। শিলং থেকে দূরত্ব মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল। কিন্তু পাহাড় চেরাপুঞ্জীর একটু দক্ষিণে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেছে। দেখলে মনে হয় একেবারে খাড়া নেমেছে সমতলে। পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নীচে পাকিস্তানের গ্রামগুলি দেখতে পেলাম। একটু পুবঘেঁষে এখানকার বিখ্যাত মোস্‌মাই ফল্‌স্। এটা বর্ষার কাল নয়। এই জলপ্রপাতের এখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শীর্ণ ধারা মাত্র দেখলাম। মহারাজ বললেন যে খুব বৃষ্টির সময়ে এই ধারাগুলি একসঙ্গে মিলিত হয়ে প্রায় তেরোশো ফুটের বিস্তার লাভ করে আঠারোশো ফুট নীচে লাফিয়ে পড়ে। দক্ষিণে

নীচের আকাশের দিকে চেয়ে মহারাজ ব্যাখ্যা করলেন যে বর্ষায় বঙ্গোপসাগরের মেঘ এসে প্রথম ধাক্কা খায় চেরাপুঞ্জীর খাড়া পাহাড়ের দেওয়ালে, ছিটকে সে মেঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে চেরাপুঞ্জীর বুকে, শুরু হয় মুষলধারে বর্ষণ। দিনের বেলায় হলে বর্ষণশেষের একটু পরেই রোদ। বলতে বলতেই দেখলাম এক টুকরো সাদা মেঘ পাহাড়ে আছড়ে পড়ে তেড়ে এল আমাদের দিকে। ছাতা খোলার সময় পেলাম না। বর্ষার মেঘ নয়। সামান্য ভিজিয়ে দিয়েই বাতাসে মিলিয়ে গেল। মেঘ আর রোদের লুকোচুরি। মহারাজ বুঝিয়ে বললেন যে এরকমটা বর্ষাশেষে শরৎকালেই বেশি হয়।

হঠাৎ সতীশ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'জানেন, বছরে কতটা বৃষ্টি হয়?'

বললাম, 'শুনেছি, প্রায় সাড়ে চারশো ইঞ্চি গড়ে।'

মাথা নেড়ে জানালেন, 'প্রায় ঐ রকমই। কোনো বছর একটু বেশি, কোনো বছর কম।'

একটু চুপ থেকে, কিছু একটা স্মরণ করে নিয়ে বললেন, 'অনেক বছর আগে, ১৮৬১ সনে, সারা বছরে বৃষ্টি হল এত বেশি যে যোগফল গিয়ে দাঁড়ালো নশো পাঁচ ইঞ্চিতে। এ পর্যন্ত এটাই সব চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত। আর ১৮৭৬ সনে একদিনেই বৃষ্টি হল একচল্লিশ ইঞ্চি। এটাও আজ পর্যন্ত একদিনের বৃষ্টি হওয়ার রেকর্ড।'

মহারাজ আরো জানালেন যে এখানে বৃষ্টিটা রাত্রিতেই বেশি হয়, দিনের বেলায় কম। সকালের দিকটায় বর্ষাকালেও আকাশ নির্মেঘ। যত বৃষ্টিই হোক জল দাঁড়ায় না, কাদা নেই; মাছি, মশা, পোকামাকড় নেই। স্বাস্থ্যকর জায়গা, মানুষগুলি দারুণ ভালো। চুরি, ডাকাতি, মারামারির কথা শোনা যায় না বড়ো। ভালো লাগল চেরাপুঞ্জী সফর। কিছু শিল্পী পাওয়াতে যাত্রাটাও সার্থক

হল। মহারাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। পরে অনেক-বার গিয়েছি চেরাতে। প্রতিবারই ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে।

শিলং এর স্টুডিয়োতে আনানো হয়েছিল তারাপদ চক্রবর্তীকে। কিছুদিন পর গৌহাটি স্টুডিয়োতে একটি কনসার্টের জন্য আনানো হল উস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ এবং চিন্ময় লাহিড়িকে। তবলা সহযোগিতার জন্য এলেন কানাই দত্ত। চিন্ময়বাবু আমার পূর্ব-পরিচিত। একবার আমার কলকাতার চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটের গৃহে পায়ের ধুলোও দিয়েছিলেন। অসাধারণ স্বাস্থ্য, ব্যায়ামপুষ্ট দেহ। বিয়ে হবে কিছুদিন পরই। মনে আছে, আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন ওঁর ভাবী পত্নীকে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলাটা অভ্যাস করিয়ে দিতে। সদম্ভে হেসে আরো বলেছিলেন, ওঁর স্ত্রীকে ইংরেজির তালিম দিয়ে নিজেও এককালে গর্ববোধ করতে পারবেন, কারণ এই ভাবী-বধূর স্বামী অদূর ভবিষ্যতে ভারতের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠসংগীতের শিল্পী ব'লে স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন। নেহাতই ঘরোয়া কথার উল্লেখ করলাম শুধু এইটুকু বলার জন্য যে যৌবনে এই সংগীত-সাধকের তাই ছিল প্রতিশ্রুতি, শিল্পী-জীবনের আদর্শ। কলকাতায় চিন্ময়-বাবুর গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয় নি। শিলং-এ আনাতে পারলে শান্ত পরিবেশে খুব গান শুনতে পাব এই আশায় গৌহাটিতে চিন্ময়বাবুর কাছে ফোন করলাম। তিনি সদয় হলেন। রাজী হলেন কানাইবাবুও। কানাইবাবু তখন কলকাতা রেডিয়োতে কাজ করছিলেন। লাহিড়িমশায়ের সঙ্গে এলেন ওঁর শিষ্য কালীপদ দাশ। এঁরা আমাদের সঙ্গে চার-পাঁচ দিন রইলেন। বাড়িটা সংগীতময় হয়ে গেল। ছুটি নিলাম অফিস থেকে। সকালে চা-জলখাবারের পর গান শুরু হয়ে চলে দুপুর দেড়টা অবধি। আবার সন্ধের পর শুরু হয়ে গান চলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত। এই ক'টা দিন গান শোনার কি অসীম পরিতৃপ্তি। সহযোগিতায়

কানাই দত্তর মতো সুদক্ষ তবলিয়া থাকায় সোনায় সোহাগা।

গান শুনে মনে হল এমন সুষ্ঠুধারার খেয়াল-এর রূপায়ণ আগে কমই শুনেছি। রাগের সম্প্রসারণ সুপরিকল্পিত, এলোমেলো কিছু নেই। 'পকোড়' বা রাগপরিচায়ক অঙ্গ সর্বদা যেন শিল্পীর চোখের সামনে। আরোহী ও অবরোহীতে রাগের বিশুদ্ধ বিন্যাস। স্বরের এমন কোনো জোট নেই যা আপাত-সুন্দরের প্রয়াসে রাগের বিশুদ্ধতাকে কলঙ্কিত করবে। বিশেষ করে ভালো লাগল এজন্য যে খেয়ালের লিরিক পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। প্রতিটি কথা স্পষ্ট উচ্চারিত এবং বিস্তারের আলপনায় কথা বিকৃত হচ্ছে না। 'সরগম'-এর বাঁধুনিতে পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলা এবং বলার কায়দায় মুনশিয়ানা। একেবারে মাপা তান। 'সম'-এ আসতে কোনো কাতরানি নেই। 'বরাবর' 'ত্থনী' 'চৌত্থনী' তানের গতি সাবলীল। ভালো ভালো নকশার তানও শুনলাম। তাল-এর হিসেবটার মধ্যে বুদ্ধি প্রচুর। স্থায়ীতে ফিরে 'সম'-এর মুখে গোঁজামিল নেই। প্রতিবারই স্থায়ী ধ্রুব, অবিকৃত। শিল্পীর যে কি গভীর অনুভব সেটা শ্রোতা হিসেবে আমার হৃদয়ই বলে দিল। ভালো শিক্ষালাভ না হলে এবং সনিষ্ঠ অনুশীলন না থাকলে গাইবার এমন শক্তি তো অর্জন করা যায় না। চিন্ময়বাবু ঠুংরি গেয়েও আমায় আনন্দ দিলেন। মূলত 'পূরব' ঠুংরি। কিন্তু মাঝেমধ্যে 'বোল' বানাবার ফাঁকে ফাঁকে ভিন্ন ধারা 'পাঞ্জাব' ঠুংরি থেকে আহৃত শোভার সুচারু প্রয়োগ দেখলাম। অনুরাগ, অভিমান, বিরহের ভাববিহ্বলতা শিল্পীর মুখে-চোখে ফুটে উঠছে বিভিন্ন দৃষ্টি-নন্দন মুদ্রায়— একটা ললিত অনুভাব। এই চার-পাঁচটা দিন চিন্ময়বাবুর গান শুনে ভাবীকালে অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির মিলনে তাঁর আর্টের পূর্ণ পরিণতি-প্রাপ্তির চিত্রটা বার বার আমার কল্পনায় ভেসে উঠেছিল। শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছবার সকল গুণই তো ছিল শিল্পীর।

হঠাৎ একদিন চললাম নাগাপাহাড়ের উদ্দেশে। তখন ইংরেজিতে 'নাগা হিলস্' বলত। 'নাগাল্যাণ্ড' নামটা এই সেদিনের। আগে থেকে কিছুই জানতাম না। কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। যথারীতি দশটায় অফিসে এসেছি। ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন স্টেশন ডিরেক্টর যে এগারোটার মধ্যেই তৈরি হয়ে বের হতে হবে। তিনিও আগে জানতেন না। অফিসে এসে ডাক খুলে দেখেন, দিল্লীর আদেশ অনুযায়ী আজই রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। দুজনেরই প্রবল আগ্রহ নাগা দেশ দেখার। সুযোগটা অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে গেল। এবার অফিসের গাড়িতেই যাওয়া ঠিক হল। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম। দেখলাম মুখখানি মলিন হয়ে গেছে। যে দেশটা সম্পর্কে এত কাহিনী জড়িয়ে আছে, দুজনে একসঙ্গে সে দেশ দেখতে না পাওয়ার দুঃখ তো আছেই। খানিক বাদেই হাসি ফিরে এল মুখে।

তাড়াতাড়ি সুটকেস গুছিয়ে পথ-খরচা দিয়ে বললেন, 'দুজনেরই যদি যাওয়া সম্ভব হত কি ভালোই না লাগত! তবে এমন সুযোগ, একার হলেও নিতে হবে। ফিরে এসে ঐ দেশের কথা সবিস্তারে বলবে।'

বাড়িতে বিষণ্ণ মুখ এবং মন রেখে যাত্রা শুভ হত না নিশ্চয়ই।

নাগাভূমির উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করেছি আগে একবার। কিন্তু কাছে থেকে সেই মানুষ ক'জনকে দেখেছি! শুনেছি বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাম— আও নাগা, সেমা নাগা, লোটা নাগা, কন্যাক নাগা, আংগামী নাগা ইত্যাদি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আসামের রাজধানী শিলং-এ আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে মাত্র একজন নাগা-পুরুষের সঙ্গে। যদিও কলকাতা ময়দানের লক্ষ লক্ষ ফুটবল-প্রেমিক এক নাগা-তরুণকে অনেক আগেই নায়কের আসনে বসিয়েছে। বলের আর্টিস্ট, মোহনবাগান দলের কাপ্তেন টি. আও নাগাভূমিরই সুসন্তান। অতিশয় সুভদ্র শিষ্টাচারী স্পোর্টসম্যান, কখনো প্রতিপক্ষের

কারো মাথা ফাটান নি খেলার মাঠে, যদিও টি. আও অতীতের মুণ্ড-শিকারীদেরই উত্তরপুরুষ। শিলং-এ আমার পরিচিত নাগা ভদ্রজনের নাম Shilo Pongener Ao। আসাম সরকারের অধীনে একস্ট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনরের পদাধিকারী।

পরিচয়টা একটু নাটকীয় ভাবেই ঘটেছিল। অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছে, সন্ধ্যা নেমেছে। উঠব-উঠব করে ঘরে আলোর সুইচ টিপে দিই নি। এমন সময় নিঃশব্দে একজন ঘরে ঢুকলেন এবং কোনো ভূমিকা না করেই ইংরেজিতে বললেন যে তিনি 'হেড্ হান্টিং' সম্বন্ধে বলতে চান। ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারি নি, 'হেড্ হান্টিং' কথাটাই কানে এসেছিল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললাম। ভদ্রলোককে বক্তব্যটা স্পষ্ট করে বলতে অনুরোধ জানালাম। মানুষটি পর পর দুবার হেড্ হান্টিং কথাটা উচ্চারণ করলেন। আগা নেই, গোড়া নেই, হঠাৎ হেড্ হান্টিং সম্পর্কে বলতে চাইলে একটু মুশকিলেই পড়তে হয়। ভদ্রলোকটিকে বসতে অনুরোধ করলাম। নিজের নাম বলে ওঁর নামটি জানতে চাইলাম। নাম শোনার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। দারুণ আনন্দও হল। নাগাসন্তান, উচ্চশিক্ষিত এবং নিজেদের সম্বন্ধে বলতে চাইছেন, এর চেয়ে প্রামাণিক আর কী হতে পারে। আলোচনা করলাম অনেকক্ষণ ভদ্রলোকের সঙ্গে। শুধু হেড্ হান্টিং-ই নয়, মনে হল নাগাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই ওঁকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া যায়। ইংরেজি উচ্চারণও মোটামুটি পরিষ্কার। কথা ব'লে চারটি বিষয় ঠিক করে নিলাম নাগাদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে। কিন্তু কর্তার অনুমতি নিতে হবে। স্টেশন ডিরেক্টরকে বাড়িতে ফোনে ব্যাপারটা বলামাত্র তিনি আইডিয়াটা লুফে নিলেন। মিস্টার আওকে স্ক্রিপ্‌ট্ লিখে আনতে অনুরোধ করলাম।

এর আগে একজন নাগা ট্রাক-ড্রাইভার দেখেছি, কিন্তু এই প্রথম বিদ্বান, কালচারড্ এক নাগা নাগরিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। মণিপুর

যাত্রাপথে নাগা ট্রাক-ড্রাইভারের পকেটে পিস্তল আছে জানার পর প্রাণের ভয়টা পরিচয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভাষাটাও বাধা ছিল। যে দেশের মানুষ দেখেছি মাত্র দুজনকে ; যে দেশটার কথা একটা আতঙ্ক, দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা জাগায় মনে ; যে দেশের লোক অদূর অতীতে নরমুণ্ডের মালা পরত গলায় এবং মালার মুণ্ডসংখ্যার আধিক্য যে সমাজে বীর্য, পৌরুষের ছিল প্রতীক ; আমি চলেছি সেই দেশের মানুষের সঙ্গে ক'টা দিন থাকব বলে। একটা প্রচণ্ড শিহরন মনে। কিছুটা ভয় যে নেই মনে তাও নয়।

কয়েক মাস আগের কথা। নেফা অর্থাৎ নর্থ ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার এজেন্সির সৃষ্টি হল। আজকের কেন্দ্রশাসিত যে রাজ্যটার অরুণাচল নাম, সে অঞ্চলটাই ছিল নেফার শাসনাধীন। নবনিযুক্ত অফিসার, কর্মচারীর দল নিয়ে অভিযাত্রা শুরু হল তেজপুর ছাড়িয়ে আরো গভীর অরণ্য-পাহাড়ের অভ্যন্তর দেশে। সঙ্গে যথেষ্ট পুলিস রক্ষী-বাহিনী ছিল। কিন্তু রক্ষা করতে পারল না এই অভিযাত্রী দলটিকে। রাতের অন্ধকারে, অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিরীহ অসন্দিগ্ধ ঘুমন্ত মানুষদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চার দিক থেকে অসংখ্য অরণ্যবাসী। শুনেছি বলি হল শতাধিক। এই হতভাগ্যরা নূতন চাকরি নিয়ে নবীন উদ্যমে অরণ্যের মানুষদের সেবার জন্যই যাচ্ছিলেন। অজানা দেশে অসহায় মর্মান্তিক মৃত্যু। প্রিয়-পরিজন জানলেন না অরণ্যের কোন্ গভীর নিভৃতে মাটিচাপা পড়ে আছে অন্তরতম মানুষটি। আমাদের অস্থায়ী এক ঘোষক, শিলং-এর ভৈরব বরুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র প্রদীপও ছিলেন এই নিহতদের মধ্যে। প্রাণচঞ্চল ছেলেটির চেহারা ভাসে চোখের উপর। নাগাদেশে মুণ্ডশিকার বন্ধ হয়েছে জানি। নেফা অঞ্চলের অধিবাসীরা নাগাদের প্রতিবেশীই। কাজেই ভয়টা মনের এক কোণে ঠাঁই নিয়ে বসে আছে। কিন্তু আবার নাগাভূমে যাবার আকর্ষণটাও কম নয়।

আমাদের গাড়ি শিলং থেকে বের হয়ে গৌহাটির প্রায় বিশ মাইল দূরে ডান দিকে মোড় নিয়ে আপাব আসাম হাইওয়ে দিয়ে চলল। সুন্দর বাঁধানো রাস্তা। গ্রাম, মাঠ, প্রান্তর পার হয়ে পূর্ণ গতিতে গাড়ি চলেছে সোজা সামনে। অনেকদিন পর পাহাড় থেকে নেমে সমতলভূমির দু পাশের দৃশ্য অতি মনোরম লাগছে। আমি সমতলের মানুষ। এই জগৎটা আমার চেনা। পূববাংলার সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। অনেকটা পথ পার হয়ে গাড়ি এসে থামল নওগাঁর সারকিট হাউসে। রাত প্রায় আটটা। রাত্রিটার জন্য চলার বিরতি। আলাদা আলাদা দুটি ঘর পেয়ে গেলাম সারকিট হাউসে।

স্নান এবং খাওয়া-দাওয়া শেষে একটু বিশ্রাম করে শোবার আগে টয়লেটের দরজা খুলে যেই সুইচ টিপেছি সামনে হাত-চারেক দূরে কি যেন চিক্‌চিক্‌ করছে দেখছি। লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলাম। মনে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে একটু এগিয়ে ভালো করে নজর দিয়ে দেখি একটি নাগশিশু যেন শান্তভাবে শুয়ে আছে। লক্ষ করলাম সরু জলনিকাশের নালাপথে খুব আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বের হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, মানুষের পায়ের শব্দ পেয়েও পালিয়ে যাবার চেষ্টা নেই। আমার দিকে সাপটার মাথাটি, তাও যেন অসাড়। তাকিয়ে রয়েছি। একটু একটু করে অর্ধেকটা দেহ বের হয়ে গেছে। নালাটার ওপর জানলাটা খোলা। বাইরে একটা চাপা ফোঁস-ফোঁসানি শুনতে পাচ্ছি। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে শুনছি। এবার ফোঁস ফোঁস আরো স্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। দৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে আমার পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ নিয়ে ফিরে এলাম। ডাকলাম চৌকিদারকে। তাড়াতাড়ি ছুটে এল। টয়লেটে সাপটার শরীরটা নালা দিয়ে আরো অনেকটা বেরিয়ে গেছে মনে হল। চৌকিদার বলল, বাইরের দিকটায় একটু ঘুরে দেখে আসতে হবে।

চৌকিদারের হাতে বেশ বড়ো লাঠি, আমার হাতে প্রকাণ্ড টর্চ। খুব অপরিষ্কার নয় বাইরেটা। হাঁটু-সমান উঁচু কয়েকটা পাতাবাহার কচু গাছ। টর্চ ফোকাস করে এক অসাধারণ দৃশ্য দেখে ভয়ে পিছিয়ে এলাম কয়েক পা। চৌকিদারের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। একা এই দৃশ্য দেখার সাহস কখনো হত না। চৌকিদার বলল, সাক্ষাৎ নাগ-রাজ। দুজনেই আরো এক-পা দু-পা এগোলাম। টর্চ ফোকাস করাই রইল। টয়লেটের সরু নালা বেয়ে জল যে নয়ানজুলিতে এসে পড়ছে সেখানে ফোকাস পড়ল অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রায় ছ ইঞ্চি ছড়ানো একটি ফণার উপর। কী বীভৎস দৃশ্য! নিশ্চয়ই দশ-বারো ফুট দূরে দাঁড়িয়েছি। তবু হাত কাঁপছে। টর্চ ধরে রাখতে পারছি না। জোর করে হাত শক্ত করে টর্চ ধরে রইলাম। যা ঘটছে সেটা দেখে আমি সম্মোহিত। টর্চের ফোকাস ফণীরাজের দেহটা আস্তে আস্তে জরিপ করল। আবার এসে ফোকাস বিদ্ধ হল ফণার উপর। মাথাটা প্রায় তিন ফুট উপরে তুলে ভিতরের নালার মুখের সাপটির প্রায় সবটা দেহই নিজের মুখের ভিতরে তুলে নিয়েছে। টর্চের ফোকাস আবার আস্তে আস্তে ফণা থেকে শুরু করে লেজের উপর ফেললাম। আট হাতের কম নয় লম্বায়। কালো-হলুদ-সোনালীতে মেশানো উজ্জ্বল গায়ের রঙ। ফিস্‌ফিস্ করে চৌকিদার বলল যে শঙ্খচূড়। তার হাতের লাঠিতে এত বড়ো সাপ মারা অসম্ভব। একটা বন্দুক থাকলে স্যুট্ করা যেত। ওকে বললাম, বন্দুক দিয়ে নয়, ক্যামেরা দিয়ে স্যুট্ করার এমন অপূর্ব দৃশ্য আর হয় না। এই সাপ আমার অপরিচিত নয়। দেখেছিও দু-একবার। তবে তার রাজকীয় ডিনার এই প্রথম চাক্ষুষ করে আমার নয়ন সার্থক। টর্চের ফোকাস ঘুরিয়ে ফেললাম মুখের ওপর। বিরাট হাঁ এখনো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সর্পশিশুটি মুখগহ্বরে আর দৃশ্যমান নয়। এই হাঁ-এর উপর যতবার ফোকাস পড়েছে, চোখ বন্ধ করেছি

ভয়ে। এটা সাংঘাতিক, অতি ভয়ানক, কুৎসিত। হাঁ বন্ধ হয়েছে এবার। আহারের পর সামান্য বিশ্রামের প্রয়োজন। ফণা গুটিয়ে দেহটাকে সটান লম্বা করে পড়ে রইল অসাড় হয়ে। পাঁচ-সাত মিনিট বোধ হয়। মানুষ-নামক শত্রুটির অস্তিত্ব টের পেয়েছে। কিন্তু ভয়ডর নেই। রাজকীয় চালে ধীরে ধীরে চলে গেল ফোকাসের বাইরে। আফসোস হল টর্চের ফোকাস না হয়ে মুভি ক্যামেরার ফোকাসে যদি সমগ্র দৃশ্যটা ধরে রাখা যেত! বসে রইলাম বারান্দায় কিছুক্ষণ। চৌকিদারকেও যেতে দিলাম না। হ্যাঁ, ভয়েই। পর পর দুটি সিগারেট খেলাম। চৌকিদারকেও দিয়েছি। দুজনেই নীরবে সিগারেট খেয়েছি। দুঃসাহসী একটি অভিযানে সে যে আমার সহযোগী বন্ধু। কিন্তু সারাটা রাত ঘুমোতে পারলাম না। একটু চোখ বুজে এলেই শঙ্খচূড়ের বিরাট মুখের হাঁ-টা সামনে ভেসে উঠছে। জেগেই কাটিয়ে দিলাম। অতি প্রত্যুষে বিছানা ছেড়ে স্নান করলাম ভালো করে। দিনের আলোয় রাতের বিভীষিকা কেটে গেল। চা-জলখাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তার দু পাশে শুধু চা-এর বাগান। এই প্রথম এত কাছে থেকে দেখছি। চা তো খাচ্ছি রোজ দুবার, তিনবার। শুকনো দুমড়নো পাতাটি চিনি। সবুজ পাতাটি দেখি নি আগে। চা গাছের চেহারাও অজানা। আর সবুজ গাছটি যে-বাগানে সযত্নে লালিত-পালিত সে-বাগানটাও এই প্রথম দেখলাম। কদমছাঁট লক্ষ লক্ষ বামন গাছের সারি। ছোটো ছোটো ঝোপের মতো গাছগুলিকে সস্নেহ ছায়ার আঁচলে ঘিরে রেখেছে দশ-বারো ফুট দূরে দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা শিরীষ আর খয়ের গাছ। বটের মতো পত্রবহুল নয়। কিন্তু প্রচণ্ড রোদ থেকে কিছুটা আড়াল দিচ্ছে এই চা-এর কোমল ছোটো গাছগুলিকে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা গাছগুলিকে বলে 'শেড্ ট্রি'। এত চায়ের বাগান পার হয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে সারা দুনিয়াটাকেই

গ্রাস করে নেবে। রাজ্যের মস্ত বড়ো একটা অংশে চা-এর চাষ। নওগাঁ, জোরহাট, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, তেজপুর জেলার বিরাট অঞ্চল জুড়ে শুধু চা আর চা। এই এলাকার চা-এর লিকার গাঢ়, ঘন যেজন্য 'আসাম টি'র জগৎজোড়া খ্যাতি। আসামের কাছাড় জেলাতেও চা-এর চাষ হয়, কিন্তু স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে আপার আসামের চা-এর মতো উৎকৃষ্ট নয়।

চা আসামের বৃহত্তম শিল্প। চা-বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম, এই যে বেঁটে ছোটো গাছগুলি সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রান্তর দখল করে নিয়েছে এগুলি কি আমার দেশের প্রকৃতিরই দান ? নাকি আমার বাড়ির বাগানের নারকেল, সুপুরি, বাতাবি, গোলাপ গাছের মতো অন্য দেশ থেকে এসেছে ? কবে শুরু হল চা-এর চাষ ? ভাবতে লাগলাম, এই যে দুটি কচি পাতা ও একটি কুঁড়ি থেকে আমার ধূমায়িত চা-এর কাপ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের রূপান্তর তার বিষয়েও তো আমি কিছু জানি না। জানি না চা-এর উন্নতি এবং প্রগতির বিষয়ে অনুসন্ধান এবং গবেষণার কাজ ভালো ভাবে চলছে কিনা। টকলাই রিসার্চ ফার্মের কতটুকু চিন্তা বা অবদান ? সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থাও আছে কি ? আমি কিছুই জানি না। হয়তো আমার মতো এমন অনেকেই আছেন। একটা কথিকামালা প্রচারের ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ? আইডিয়াটা অনুমোদন করেছিলেন স্টেশন ডিরেক্টর। সিরিজের নামটা দেওয়া হয়েছিল 'টু লীভস্ অ্যাণ্ড এ বাড্'। ধার করা এই নাম।

দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পশ্চিম গগনে সূর্য এলিয়ে পড়ছে। আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছল কোহিমায়। ফিলমস্ ডিভিশন থেকে একটা পার্টি এসেছে নাগাদের বিষয়ে ডকুমেন্টরি ছবি তুলতে। আমাদের একটা মস্ত সুযোগ প্রতিবেশী এই মানুষগুলিকে দেখবার জানবার এই শুটিং উপলক্ষে। তাই দিল্লী

থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই ফিলমস্ ডিভিশন পার্টির সহযাত্রী হতে। ওঁরা একদিন আগেই চলে এসেছিলেন।

কিন্তু খুব কিছু একটা দেখতে পেলাম কি? নাগাদের নাচ, উৎসবের বিচিত্র বর্ণের পোশাক দেখলাম বটে, তবে তালিম-দেওয়া সাজানো ব্যাপার। রাজপথের উপর প্রায় একশো জন পুরুষকে দাঁড় করানো হয়েছে। কোনো নারী নেই। পুরুষদের খুব শক্ত সুগঠিত দেহ, বেশ লম্বা। গায়ের রঙটা একটু হলদেটে। অনাবৃত দেহের উপরটা; বুকে, পিঠে, দুই বাহুতে উল্‌কি আঁকা। মাথায় পাখির পালক-গোঁজা ফেটি। কোমরে জড়ানো কালো লুঙ্গির মতো কাপড় আজানুলম্বিত। কোমরে কড়ির মালাও দেখেছি। গলায় কিন্তু মুণ্ডমালা নেই। হাতে দীর্ঘ বর্শা এবং ঢাল। নানা দলে ভাগ করে এক দলকে দিয়ে শিকার-নৃত্য, আর-এক দলকে দিয়ে রণ-নৃত্য, আবার অন্য এক দলকে দিয়ে দৌড়-ঝাঁপও করানো হল। রণ-নৃত্যের দলটি যুদ্ধের প্রচণ্ড সিংহনাদ করল, পিলে-চমকানো 'নাগা ওয়ার ক্রাই'। অতি তীক্ষ্ণ, জোরালো, আকাশ-বিদীর্ণ করা পাশবিক ধ্বনি। গাঁও-বুড়োরা নাগামিজ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন দলগুলির কাছে ডিরেক্টরের নির্দেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। নাগামিজ হল নাগা এবং অসমীয়া ভাষার সংমিশ্রণে একটি চালু কথ্য ভাষা। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাগাদের মধ্যে lingua franca হিসেবে এই ভাষার ব্যবহার। না হলে এক গোষ্ঠীর ভাষা অন্য গোষ্ঠীর লোক বুঝবে কি করে? ছবি তোলার জন্য সাজানো-গোছানো ব্যাপার দেখে নাগা-জনজীবনের কিছুই ভালো করে জানা যায় না, তবু সামান্য যা দেখলাম তার দামও কম নয়।

এলামই যখন এত দূরে তা হলে মানুষগুলিকে আরো একটু কাছে থেকে দেখার চেষ্টা করি-না কেন! পরের দিন ভোরবেলা শহরের পাশেই কোহিমা নামে গ্রামটি ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া

হল। স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জিও চললেন। শহরের লাগোয়া পশ্চিম দিকে একটি পাহাড়ের নীচ থেকে গ্রামের আরম্ভ। বাড়িগুলি পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে উঠেছে। দুপাশের বাড়ির মাঝ দিয়ে পায়ে-চলা সংকীর্ণ পথ দিয়ে ক্রমে উপরে যাচ্ছি। ঘরের চাল টিনের, বেড়া কঞ্চির। উঠোন শুকনো পরিচ্ছন্ন। গৃহলক্ষ্মীরা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত। আমাদের দিকে কোনো কৌতূহলের দৃষ্টি নেই। বাড়িগুলি থেকে কোনো কোলাহল শোনা যাচ্ছে না। অপরিচিত আগন্তুকদের আগমনে সারমেয়কুলের রুষ্ট চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল না। খুব ঘন বসতি। প্রায় শ'তিনেক ফুট চড়াই-এর পর পাহাড়টির সানুদেশে পৌঁছে গেলাম। ওখানে একটি 'অবজারভেশন টাওয়ার'। শক্ত কাঠের খুঁটির উপর ছোটো একটি ঘর, প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু। নীচ থেকে সরু কাঠের সিঁড়ি উঠেছে। এই 'অবজারভেশন টাওয়ার' উত্তর দিকে গ্রামের শেষ প্রান্তে। দেখে মনে হল অনেক কাল অব্যবহৃত। অতীতে পালা করে সতর্ক প্রহরী দিনরাত শত্রুর আগমন লক্ষ্য করত। এই উঁচু জায়গা থেকে নিশ্চয় চার দিকের অনেকটা দেখতে পাওয়া যাবে। অপরিচিত মানুষের সন্দেহজনক গতিবিধি দেখতে পেলে গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে বিপদের সংকেত ঘোষণা করত গ্রামবাসীদের উদ্দেশে। এ-সব তথ্য আমি আগেই জেনেছি Shilo Pongener Ao-এর স্ক্রিপ্‌ট্‌ পড়ে। এ-সব তো অতীতের কথা।

গ্রামগুলি খুব কাছাকাছি নয়। কোহিমায় আসবার সময় পাঁচ-সাত মাইল পর পর এক একটি গ্রাম দেখেছি। এক গাঁয়ের লোক ভিন্‌ গাঁয়ের শত্রু। ভাষাও ভিন্ন। পাশের গ্রামের একটি লোককে অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করে দেহ থেকে মুণ্ডটি কেটে বর্শার ফলায় গেঁথে গ্রামে ফিরে এলে বীরের সংবর্ধনা পাওয়া যেত। তরুণীদের কাছে সেই বীর তরুণের যোগ্যতাও বেড়ে গেল। কি সন্ত্রস্ত অশান্ত

জীবন, কি অদ্ভুত শিভল্‌রি, বীরধর্ম! সে কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম গ্রামের অন্য পথে। সেই যুবা-ঘর— যেখানে তরুণরা বিয়ের আগে একসঙ্গে বাস করবে— সেই আবাস-গৃহটি কিন্তু দেখতে পেলাম না। হয়তো আজ সে-সব প্রতিষ্ঠান লোপ পেয়েছে।

পরিচয় হল না কোনো গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে। আমাদের সঙ্গেও রয়েছেন একটি বিদুষী মহিলা, মিসেস চ্যাটার্জি। সাহস করে এগিয়ে গেলেন না মিসেস চ্যাটার্জি কোনো বাড়ির অভ্যন্তরে। ভিতর থেকেও বাইরে এলেন না কোনো কুলবধূ এই বিদেশীদের পরিচয় জানতে। কিন্তু পরবর্তী কালে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটেছিল নাগা-কন্যা বাঙালি ঘরের এক কুলবধূর সঙ্গে। তিনি আমার সহকর্মী অসীম রায়ের বিদুষী ভার্যা। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে উলূপীর পরিণয়ের পর একটি নাগা-কন্যার সঙ্গে সমতল ভারতের কোনো পুরুষের বিবাহের এটিই দ্বিতীয় নিদর্শন। অসীম রায়কে শাবাশ জানিয়েছি বার বার। অপ্রতিম রমণীরঞ্জন নায়ক অর্জুনের সমকক্ষ। নাগাভূমিতে গিয়ে এমন সুন্দরী এক নাগা-বালার দেহ-মন জয় করাটা সহজ কর্ম ছিল না। অসীমবাবুর সৌজন্যে দেখলাম, জানলাম এক প্রেমময়ী স্ত্রীকে, স্নেহময়ী জননীকে। ভদ্রমহিলা স্বামীর সঙ্গে বাস করতে পারছেন না কিছুকাল। বদলির চাকরিতে স্বামী কাজ করছেন আমার সহকর্মী হিসেবে অন্য জায়গায়। তিনি থাকছেন কোহিমায় ওঁর রুটি-কেক্‌ তৈরির কারখানার দায়িত্বে। দুই ছেলের ছোটোটিকে দেখলাম। প্রায় ছ ফুট উঁচু, অসামান্য সুদর্শন এক তরুণ, কলকাতার কোনো মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। ভদ্রমহিলা স্বামীর কাছে এসে থাকতেন মাঝে মাঝে। আমাদের গৃহেও এসেছেন কয়েকবার। স্বামীর বদলির বিষয়ে কিন্তু মুখ ফুটে একবারও বলেন নি, যদিও বুঝতে পারতাম তাঁর মনের কথাটি। খুবই সম্ভ্রান্ত, রক্ষণশীল, ধীর, স্থির।

কোহিমা শহরটি তখন খুবই ছোটো। কিন্তু নজরে পড়ল দুটি মস্ত বড়ো বাড়ি। প্রথমটি স্কুল-গৃহ। এত বড়ো স্কুলের বাড়ি, প্রাঙ্গণ, আর কোথাও দেখেছি মনে পড়ল না। বিরাট জায়গা নিয়ে দোতলা বাড়ি স্কুলের, প্রকাণ্ড কম্‌পাউণ্ড। দ্বিতীয়টি হাসপাতাল, অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। তখনই, সেই পঞ্চাশ সনের মার্চ মাসে, এক্স-রে ব্যবস্থা আছে শুনলাম। আসামের রাজধানী শিলং-এ কোনো হাসপাতালে এ ব্যবস্থা ছিল না। কলকাতায় ডাক্তারি পাস করে টি. আও সদ্য এসেছেন এ হাসপাতালে।

এই শহরে ইনফরমেশন্ সেণ্টারে পরিচয় ঘটল এক নাগাযুবকের সঙ্গে। মানুষটি পরবর্তী কালে বিরাট এক গোলমেলে ভূমিকা নিয়েছিলেন। সাদাসিধে মানুষটি। এমন কোনো বলিষ্ঠতা লক্ষ করি নি যা তাঁকে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের নায়ক হতে সাহসী করে তুলবে ভবিষ্যতে। তবে খুব সামান্য পরিচয়ে একটি মানুষের অন্তর্জগৎ কি করে দেখতে পাব! যে ক'জন নাগা-সন্তানকে কাছে থেকে দেখেছি তাঁরা কথা বলেছেন কম, শুনেছেন বেশি, মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই কি ভাবছেন। দুঃখ, আনন্দ, বিদ্বেষ কোনো-কিছুরই প্রকাশ নেই মুখে-চোখে। আমার পরিচয় এই যুবার অফিসঘরে মাত্র কয়েক মিনিটের। ভদ্রতার অভাব দেখি নি। গিয়েছিলাম একটি-দুটি গ্রামের খবর নিতে, খুব দূরে যেন না হয়, গ্রামটি ঘুরে মানুষজনদের একটু দেখে আসা। একটি গ্রামের নাম বললেন, মাইল পনেরো দূরে, রাস্তাঘাট ভালো, পরিষ্কার করে পথের নির্দেশও দিলেন। আরো জানালেন সে গ্রামে গিয়ে যেন মিস্টার জন্-এর সঙ্গে দেখা করি। পাশের চেয়ারে একজন নাগা ভদ্রলোক বসেছিলেন, আলাপে যোগ দিলেন না, পরিচয়ও হল না। এই যে অতি সাধারণ, দেখতে নিরীহ এক সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে কথা হল তাঁর নাম এ. জেড. ফিজো, তখন তাৎপর্যহীন সামান্য একটি নাম।

পরদিন আমরা গেলাম কিগুয়েমা গ্রামে। মিস্টার জন-এর বাড়ি খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধা হয় নি। আধুনিক কায়দায় হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। ইংরেজি বলেন নির্ভুল উচ্চারণে। আশ্চর্য! ইনি তো সেই ভদ্রলোকটি যাঁকে দেখেছিলাম গতকাল ইনফরমেশন সেন্টারে, মিস্টার ফিজোর অফিসে! মিস্টার জনই বললেন যে গতকাল আমাদের দেখেছেন, যদিও পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি। মিস্টার ফিজো কিন্তু মিস্টার জন-এর কথাও বলেছিলেন। তখন কেন পরিচয় করিয়ে দিলেন না বুঝতে পারলাম না।

শহর থেকে দূরে মিস্টার জন-এর সুদৃশ্য বাংলো-বাড়ি। বসবার ঘরে সোফা কোচ। আমাদের আপ্যায়ন করলেন চা দিয়ে নয়, নাগামধু দিয়ে। একটি বাঁশের চোঙা, এক লিটার জল ধরবে। চোঙাটি ঘোলের মতো তরল পদার্থে ভরা। চোঙা থেকে প্রথমে কিছুটা পান করলেন মিস্টার জন। তার পর মিসেস চ্যাটার্জির হাতে দিলেন সেই চোঙাটি। ইতস্তত করে একটু চুমুক দিলেন তিনি। তার পর মিস্টার চ্যাটার্জির ঠোঁটের স্পর্শলাভ করে ফিরে আসে চোঙাটি আমার হাতে। চুমুক না দিয়ে উপায় নেই। বুঝতে পারলাম পান না করলে গৃহস্বামীর অবমাননা করা হবে। সামান্য পান করলাম। পচাই-এর গন্ধ। ঠোঁট চেপে বমি দমন করলাম। প্রাণপণ চেষ্টায় মুখের হাসিভাব ধরে রাখার চেষ্টা করছি। চেষ্টা সফল হল। এবার মিস্টার জন আমার হাত থেকে চোঙাটি নিয়ে আমায় উদ্ধার করলেন। তিনি এক চুমুক খেয়ে পানপাত্রটি রাখলেন টেবিলের উপর। মহাখুশি তিনি। নাগামধু দিয়েই এই বিদেশীদের আপন করে নিলেন। এর পর আমাদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামটি ঘুরিয়ে দেখালেন। খুবই ছোটো গ্রাম, গ্রাম-কোহিমার তুলনায় অনেক ছোটো। দশ-বারোটি মাত্র বাড়ি। গ্রাম-সীমান্তে কোনো অবজার-ভেশন টাওয়ার নেই। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে এই

গ্রামটির নতুন পত্তন হয়েছে। তাই প্রাচীনের কোনো নিদর্শন নেই। মিস্টার জন ধনী কনট্রাক্টর। তাঁর বাড়িটিই এই গ্রামে সব চেয়ে বড়ো। নাগাদের মধ্যে পর্দাপ্রথা নেই। কিন্তু মিস্টার জন-এর পরিবারের কোনো মহিলাকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল না, আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা থাকা সত্ত্বেও। শিলং-এর খাসি-সমাজে কিন্তু অন্য রকম দেখেছি। শিলং-এর খাসি-গৃহে কোনো অতিথি এলে মেয়েরা অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে আসবেনই। নাগা-ভূমিতে আমাদের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ শেষ হল। খুব দেখবার, বোঝবার, জানবার সুযোগ পেলাম কোথায়! দীর্ঘদিন কাছে থেকে আপন করে না নিতে পারলে মানুষটিকে চিনতে পারব কেমন করে! তবু কয়েকটা দিন নাগাভূমির কিছু মানুষকে তাদের নিজ পরিবেশে আপন বাসভূমে দেখে এলাম। সেটাই মস্তবড়ো লাভ।

স্টুডিয়ো কনসার্টের জন্য আনানো হল সংগীতের এক মস্তবড়ো পণ্ডিতকে। আচার্য শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজংকার ভাতখণ্ডে সংগীত মহা-বিদ্যালয়ের আচার্য। পাণ্ডিত্যের সাগর। দেশের সর্বত্র বরেণ্য গুরু। সংগীত পরিবেশনে সর্বাগ্রে রাগের বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ। বোদ্ধা শ্রোতাকে রাগের বিন্যাসেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে প্রতিবেশী রাগের সীমানায় ট্রেসপাস করছেন না। চুলচেরা শ্রুতির বিচার। ফরমাশ অনুযায়ী যে-কোনো রাগ গাইবার শক্তি আছে। আমার বাড়িতে পর পর পূরিয়া, মারওয়া, সোহিনী রাগ গেয়ে শোনালেন প্রতিটি রাগের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। আদর্শ শিক্ষক, তাই রাগের বিশুদ্ধতার দিকে যতটা লক্ষ, অলংকরণের প্রতি ততটা নেই। অনুশীলনের কিছুটা ঘাটতি আছে মনে হয়েছে। সেটা স্বাভাবিক, কারণ এত বড়ো একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর। কাজেই রিয়াজের জন্য খুব বেশি সময় কি করে দেবেন! কিন্তু সে ঘাটতি পূরণ করে দিলেন পবিত্র রাগমূর্তি রূপায়ণে। মানুষটিকে ভীষণ ভালো

লেগে গেল। একটু একটু বাংলা বলতে চেষ্টা করেন। আমোদপ্রিয়, কৌতুকস্থষ্টিতে পারদর্শী। ওঁর শিষ্যা মালতী দাশগুপ্ত আমায় বললেন যে লক্ষ্ণৌ কলেজের পরিবেশে এরকম খোলা মনের মানুষটিকে দেখা যায় না। সেটা সম্ভবও নয়। বিদ্যায়তনের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে, নিয়মনিষ্ঠ অধ্যয়ন অধ্যাপনার জগতে একজন অধ্যক্ষের ভিতর খোলা মনের শিল্পীকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। জানালেন যে নিজের গুরুর কাছে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংগীতের শিক্ষাদানই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই নিজের অনুশীলনের জন্যও পুরোপুরি সময় দিতে পারছেন না। বিরাট একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা এবং অধ্যাপনাতেই প্রায় সবটা সময় চলে যায়। আর্টের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে গেলে দীর্ঘ একনিষ্ঠ সাধনার কোনো বিকল্প নেই। সেটা পারলেন না ব'লে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

একটা নিষ্ঠুর প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলাম। বললাম, 'অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে সংগীতের মতো চারুকলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক শিক্ষা তেমন কার্যকর হয় না। সেজন্য আপনার ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয় থেকেও খুব ভালো শিল্পী বের হচ্ছে না। অতএব এরকম প্রতিষ্ঠানের কি সার্থকতা?' প্রশ্ন করেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম পণ্ডিতজি হয়তো ক্ষুণ্ণ হবেন এই ভেবে।

কিন্তু না, তিনি হেসেই জবাব দিলেন, 'আপনার প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হই নি। অন্যত্র এমন প্রশ্নের জবাব আগেও দিতে হয়েছে।'

আমার দিকে তাকিয়ে উল্টো প্রশ্ন করলেন, 'এরকম বিদ্যায়তন দেশে না থাকলে শিল্পীরা শিখবেন কোথায়? রাগসংগীতে অনেক বাছ-বিচার আছে। অতি সূক্ষ্ম নন্দনতত্ত্ব রয়েছে। ইতিহাস আছে জন্ম এবং ক্রমবিবর্তনের, থিয়োরি জানতে হবে, প্রয়োগ-নৈপুণ্যও। এতটা শেখাবার উপযুক্ত শিক্ষক সব জায়গায় আছে কি?'

উত্তরে আমি দাবি করলাম, 'প্রায় প্রতি শহরেই উস্তাদ আছেন,

তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করা যায়।'

হাসলেন পণ্ডিতজি এবং একটু চিন্তা করে বললেন, 'প্রতি শহরের সেই উস্তাদগণই কোথায় শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেলেন ? সমগ্র দেশটার মধ্যে ঘুরে দেখুন শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারাবাহিকতা যথাযথ চালু আছে কিনা এবং সেই ঐতিহ্যের বহুল প্রচারও সম্ভব হয়েছে কিনা। দূরে গিয়ে দরকার নেই। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, আর্টে আজকের দিনে সব চেয়ে অগ্রসর আপনার প্রদেশের কথাই ধরি। রাগসংগীতের আলোচনা এটা। একটা সময়ে বাংলায় সংগীতের চর্চা খুবই বেশি ছিল। না হলে লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থ আমরা পেতাম না। এই পণ্ডিতের আর-এক খানা সংগীতের গ্রন্থও ছিল, নাম ছিল "রাগসংগীতসংগ্রহ"। দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় গ্রন্থটি পাওয়া যায় নি। একটা আর্টের অধিক প্রচলন না থাকলে সে বিষয়ে ব্যাকরণের বই লেখা হয় না।'

আমার দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন চর্যাগীতির বিষয়ে মোটা-মুটি জানা আছে কিনা। কিছুই জানি না। তবু জানি এই ভাব প্রকাশ করলাম মাথা নেড়ে।

পণ্ডিতজি শুরু করলেন, 'চর্যাগীতির কালটা লোচন পণ্ডিতের অনেক আগের। এই গানগুলি অতি সাধারণ লোকের মধ্যেই খুব চলিত ছিল। কোন গীতটি কি রাগে গাওয়া হবে সাধারণ মানুষেরা সেটা জানতেন। তাতে বোঝা যায় রাগসংগীত কত প্রচলিত ছিল সেই প্রাচীন কালেও সাধারণ লোকেরই মধ্যে। পরবর্তী কালে জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদগুলিও বিশেষ রাগে এবং তালে গাওয়া হত। রাগের সংখ্যা এগারো, তাল মোট পাঁচ প্রকারের। চর্যাগীতির রাগতালিকা এবং গীতিগোবিন্দের রাগ ও তালগুলি থেকে এ ধারণা করা অসংগত নয় যে রাগসংগীতের বহুল প্রচার ছিল অতীতের বাংলায়। সেজন্য পুঁথিও লেখা হল। লোচন পণ্ডিত ছাড়াও হয়তো

আরো বৈয়াকরণ ছিলেন সেদিনে। কিন্তু সে ঐতিহ্যটা কি লোপ পেয়ে যায় নি? তার কারণটাও ঐতিহাসিক। একটির পর একটি বিদেশী আক্রমণ ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলার বুকে। এমন আক্রমণের ফলে সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, বিজ্ঞান কিছুই বেঁচে রইল না। শার্ঙ্গদেব-পূর্ব লোচনের কালেরও আগে থেকে চলে-আসা সংগীতের ধারাটি বাংলা থেকে মুছে গেল।'

মুগ্ধ বিস্ময়ে মানুষটির পাণ্ডিত্যের অনুধাবন করছি। আমারই দেশের সংগীতের ইতিহাস শুনছি ভিন্‌দেশীর কাছে। কি অগাধ পাণ্ডিত্য! খানিক চুপ করে থেকে সংগীতের এই মহাগুরু আবার শুরু করলেন, 'ধ্রুপদ এবং পরবর্তী কালে খেয়ালের ধারার যখন প্রবর্তন হল তখন উত্তর ভারতও অশান্ত, অস্থির সামাজিক জীবন, ঘন ঘন যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব। সুতরাং ঐতিহাসিক কারণেই সংগীত ছিটকে-ছুটকে কয়েকটি ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।'

চুপ করে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ পণ্ডিতজি। আবার বলতে লাগলেন, 'এই-সব ঘরে স্বরলিপির প্রচলন ছিল না। রাগবিকৃতির সম্ভাবনা দেখা দিল।' একটু হেসে পণ্ডিতজি বললেন, 'যখন সংগীতের খুব চর্চা থাকে তখনো কোনো কোনো রাগ নিয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। লোচন পণ্ডিত ভৈরবীতে সাতটিই শুদ্ধ স্বরের যৌক্তিকতা দেখিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে কেউ কেউ ভৈরবী রাগে কোমল ধৈবতও ব্যবহার করে থাকেন। এমন যদি অবস্থা হয় তা হলে রাগ-প্রমিতি, standardisation, অবশ্য-প্রয়োজনীয়। সে অসাধ্যসাধন করলেন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। সেটা নিজের খেয়ালখুশিমত করলেন না। বড়ো বড়ো গুণীজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন এক-একটি রাগের বিভিন্ন "বন্দিশ", কম্পোজিশন। শুনে শুনে সর্বজনগ্রাহ্য রাগমূর্তি স্বরলিপিবদ্ধ করলেন। সমস্ত জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ধন। এ না হলে ক্রমে রাগরূপায়ণে

বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল।'

একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন, 'ঘরানার গুমরের কথা কিছু কিছু শুনেছি। ওখানে শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়াটা সহজ ছিল না। শুনেছি অনেক সাধ্য-সাধনার পর উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ গুরুর কৃপা লাভ করেছিলেন।'

এবার আমি বললাম, 'পণ্ডিতজি, এমন কথা শুনেছেন কিনা জানি না যে গুরুর নিজ পুত্র কন্যা যে তালিম পান, বাইরের থেকে আসা শিষ্য সেরকমটা পান না। এমন-কি, আপন জামাতাও না। গুরুগৃহবাসী শিষ্যের মুখেই এ কথা শুনেছি।'

আমার কথা শুনে হাসলেন পণ্ডিতজি, কোনো মন্তব্য করলেন না। তিনি আবার বললেন, 'মনে রাখতে হবে সংগীতের ঘরগুলি অসংখ্য ছিল না এবং উত্তর ভারতের বাইরে ছিলই না বলা যায়।' এবার একটু কঠিন স্বরেই বললেন, 'বড়ো বড়ো নগরগুলিতে আর্ট কলেজ স্থাপিত হয়েছে আমরা জানি। সেখানকার শিক্ষাশেষে সবাই কি নন্দলাল বসু হয়ে বের হচ্ছেন? শিষ্য চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিটা সেখানে শেখে। তার পর তার নিজের সাধনা। আমাদের কলেজেও সংগীতের জগৎটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। একটা বিজ্ঞানভিত্তিক সুনিয়ন্ত্রিত পাঠক্রম রয়েছে সেখানে। তিন-চার বছরের শিক্ষালাভের পরই এক-একজন বিরাট শিল্পীরূপে বের হয়ে আসবে এমনটা আমরা আশা করি না। সেই ছাত্রকে শুনতে হবে বড়ো শিল্পীদের গান এবং প্রতিদিন দীর্ঘ সময় অনুশীলন করতে হবে। এর শেষ নেই। আর একটা জায়গায় পৌঁছে কেউ যদি মনে করে যে রিয়াজের আর প্রয়োজন নেই তা হলে তার আর্টেরও ওখানেই শেষ। গান-বাজনা ক্রিয়াসিদ্ধির ব্যাপার, অনুশীলন ছেড়ে দিলেই গেল।' থামলেন, একটু হেসে বিনীত ভাবে বললেন পণ্ডিতজি, 'মাস্টার মানুষ, সুযোগ পেলেই জ্ঞানদান করি, এবার বক্তৃতা থামাই।'

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিবেদন করলাম, 'পণ্ডিতজি, আমাদের রথ দেখা, কলা বেচা দুটোই হল। এত ভালো গান শুনলাম, আবার সেইসঙ্গে অসাধারণ এক পণ্ডিতের কাছে সংগীতের কিছুটা ইতিহাসও জানলাম।'

আমার কথা শুনে খুশি হয়ে পণ্ডিতজী বললেন, 'আমি ঠুংরি গাই না তবে রসমধুর গান শোনাচ্ছি একটু।' এই কথা ব'লে তানপুরা নিজের হাতে নিয়ে গাইলেন—

ললিত-লবঙ্গ-লতা পরিশীলনকোমল মলয় সমীরে
মধুকর-নিকর করম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জ কুটীরে।

বসন্ত রাগে গীতগোবিন্দের পদ।

আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ, ১৯৫০ সন। আমাদের রেডিয়োতে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয় বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। খুবই যত্নের সঙ্গে প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয় যাতে রূপায়ণে কোনো ত্রুটি না থাকে। সকাল থেকেই স্টুডিয়োতে রয়েছি। দেহ ও মন ক্লান্ত। সান্ধ্য অধিবেশনের সব অনুষ্ঠান খুব ভালো করে দেখে ডিউটি অফিসারকে বুঝিয়ে দিয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অফিস ছেড়ে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম। পথ তো কম নয়, চড়াইও প্রায় তিনশো ফুট, যাব লাবাণের শেষ প্রান্তে। অফিস থেকে ফেরার পথে শ্রান্ত পায়ে উপরে ওঠবার সময় রোজই প্রতিজ্ঞা করি দূরের এই বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে অফিসের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করব। সে সময় বাড়ি পাওয়া মুশকিল ছিল না। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে প্রতিদিনই রাস্তার প্রতিজ্ঞা ভুলে যাই। এমন সুন্দর বাড়ি, এরকম শান্ত পরিবেশ ছেড়ে যেতে মনটা চায় না। বাড়িটার উপর মায়া পড়ে গেছে। বাড়ির নামও 'গিরিমায়া'। ড্রইংরুমের চার দিকের দেয়ালে সুধীর খাস্তগীরের ফ্রেস্‌কো পেন্টিং। এমন নান্দনিক বিলাস ছেড়ে দিয়ে যাই কি করে! কিন্তু কোনো

কোনো দিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে খুব ক্লান্তি বোধ করতাম। উপরে ওঠবার সময় আজও বেশ কষ্ট হচ্ছিল। পা আর চলছে না।

চলতে চলতে বুঝিবা একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। পায়ের নীচের মাটি হঠাৎ দুলে উঠল প্রবল ভাবে। কাত হয়ে পড়েই গেলাম। এটা কি! আমার কি হঠাৎ মাথা ঘুরছে! অসুস্থ হয়ে পড়লাম হঠাৎ! এমন সময় দুপাশের বাড়িগুলি থেকে একসঙ্গে শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টাধ্বনির আর্তনাদ। একটা চাপা গুড়গুড় শব্দও শুনতে পাচ্ছি। পথচারী আর কেউ নেই। উঠে দাঁড়ালাম। এখনো মৃদু দোলা অনুভব করছি। বুঝতে পারলাম প্রচণ্ড ভূমিকম্পের প্রথম ধাক্কাটি পার হল। ভূকম্পনের এত বড়ো দোলা আগে কখনো অনুভব করেছি মনে হল না। এখন লোকজনের কোলাহল শুরু হয়েছে। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে কেউ রাস্তায় আসছে না। ঘর নিরাপদ। ঘরের চাল টিনের এবং খাগড়ার বেড়ার উপর চুণ-বালির প্রলেপ। ভূমিকম্পের দোলায় তাই ঘর ভাঙবে না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছলাম। একটু বিশ্রাম করে হাতমুখ ধোবার জন্য কল খুলে দেখি শুধু কাদাগোলা জল বের হচ্ছে। আধ ঘণ্টা পর আর-একবার কয়েকটি দোলা। প্রথমবারের মতো তত তীব্র নয়। চিন্তা হল শিলং এবং গৌহাটি স্টুডিয়োর মধ্যে যে টেলিফোন যোগাযোগ সেটা ঠিক আছে কিনা। স্টুডিয়োতে টেলিফোন করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লাইন খারাপ। ইতিমধ্যে স্টুডিয়ো থেকে গাড়ি এসে উপস্থিত! ভয় যা করছিলাম তাই হয়েছে। গৌহাটির সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। গৌহাটি কেন্দ্রের কোনো অনুষ্ঠান আমরা পাব না। এখান থেকে প্রোগ্রাম চালাতে হবে। কতক্ষণ আর গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো যায়! পৌঁছে গেলাম স্টুডিয়োতে। রাত্রের অধিবেশনের জন্য নতুন করে আইটেম সাজাতে হল। পরের দিন সকালের জন্যও। অনেক দেরিতে বাড়ি ফিরতে পারলাম।

রাত্রের রান্না করতে পারলেন না আমার স্ত্রী। কলের জলে কাদা ছিল অনেকক্ষণ। শেষ রাত্রে আর-একবার ভূমিকম্প হল।

খুব সকালে আবার স্টুডিয়োতে চলে এলাম। ধ্বংসের কোনো চিহ্ন নেই। স্টেশন ডিরেক্টর নিজেও চলে এসেছেন স্টুডিয়োতে সাতটা না বাজতেই। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কখন এসেছি। যখন শুনলেন রাত্রেও অধিবেশন শেষ হবার পর বাড়ি ফিরেছি এবং সকালের অধিবেশন শুরু হবার আগেই আবার এসে গেছি তখন খানিক চুপ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ঘণ্টাখানেক পর ডেকে পাঠালেন আমায় তাঁব ঘরে। গিয়ে দেখি প্রাতরাশ সাজানো টেবিলের উপর দুজনের জন্য। যোগ দিতে আহ্বান করলেন আমায়। খেতে খেতে বললেন 'তোমার উপর খুব খুশি হয়েছি। রেডিয়োকে এত ভালোবাস সেটা জানতাম না।' আমিও হেসে জবাব দিলাম, 'ন্যাচরাল বেণ্ট অব্ মাইণ্ড। এই মাধ্যমটিকে খুবই ভালো লেগে গেছে।' এই যে বোঝাবুঝিটা হয়ে গেল এই মানুষটির সঙ্গে সেদিন, সেটা রেডিয়োতে আমার শেষ দিনটি পর্যন্ত ছিল।

খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ভূমিকম্প মাঝে মাঝেই হয়। কিন্তু এবারের মতো এত বড়ো ভূমিকম্প কয়েক বছরের মধ্যে হয় নি। সেই আগে হয়েছিল বিরাট ভূমিকম্প ১৮৯৭ সনের জুন মাসের ১২ তারিখে। অনেক পাহাড় ধসে পড়েছিল, পাহাড়ের গায়ে তৈরি অনেক বাড়িঘর ভেঙে পড়েছিল। বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এবার শিলং শহরের কোনো ক্ষতি হয় নি, এই পাহাড়ের অন্য অঞ্চলেও কিছু হয় নি। কিন্তু ভীষণ ধ্বংসলীলার খবর আসামের উত্তর-পুব অঞ্চল থেকে আসতে লাগল। হাইওয়ের অনেক জায়গায় চওড়া এবং গভীর ফাটল দেখা গেল। ভূমিবিন্যাসের অদল-বদল ঘটেছে আপার আসামের অনেক জায়গায়। কোনো কোনো নদীব গতিপথে পাহাড় উঠে দাঁড়িয়েছে, ফলে নদীর স্রোত ভিন্ন ধারায় বইতে শুরু করেছে।

চাক্ষুষ বিবরণ দিলেন গাছ-গাছালির এক বিদেশী পণ্ডিত গবেষক। কয়েকজন স্থানীয় লোক সঙ্গে নিয়ে তিনি দূর পাহাড় অরণ্য অঞ্চলে বিভিন্ন চারাগাছের নমুনা সংগ্রহ করছিলেন ঘুরে ঘুরে। যেখানে পাহাড় ছিল না সেখানে ভূমিকম্পের ফলে হঠাৎ এক পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। সঙ্গীসহ আটকা পড়ে গেলেন। পথ গেল হারিয়ে, ফেরার রাস্তা নেই। অনেক ঘুরপথে অনেক দিনের চেষ্টায় ফিরে আসতে পারলেন লোকালয়ে। ভূমিকম্প এবং নদী নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বেশ কিছু কথিকা প্রচারের ব্যবস্থা করা হল আমাদের রেডিয়ো থেকে।

গুরদিত চাঁদ আওয়াস্তি নামে এক অফিসার বদলি হয়ে এলেন শিলং-এ। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এই মানুষটির দেহের ক্ষেত্রফল প্রকাণ্ড। পাঞ্জাবের সন্তান। চেহারাটা এত ভালো এবং মুখের হাসিটি এমন স্নিগ্ধ যে প্রথম দর্শনেই মানুষটিকে ভালো লেগে যায়। দেহের আয়তন বড়ো হলেও অনুপাতে গলার আওয়াজ ছোটো। কথার সঙ্গে হাসির অন্তরঙ্গ সহবাস। বলার মধ্যে কৌতুকরসের প্রবাহ এবং কৌতুকটা প্রায়শ নিজেকে নিয়েই। নিজ সমাজের প্রথা অনুযায়ী বিয়ে করতে গিয়েছিলেন অশ্বারোহণে। অশ্বটি নিতান্ত দুর্বল ছিল না। আর কনের বাড়িও বেশি দূরে নয়। কিন্তু বিয়ে-বাড়ি পর্যন্ত তুরঙ্গমটি আওয়াস্তিকে বহন করতে সক্ষম হল না। বিয়েবাড়ির কাছাকাছি গিয়ে বসে পড়ল, আর উঠল না। কয়েক-দিন বাদেই পশুক্লেশ নিবারণী সভা থেকে ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে নোটিশ এল। এমন কত যে গল্প নিজেকে নিয়ে। আনন্দের খনি ভদ্রলোকটি। উপরের, নীচের সব সহকর্মীকে খুশি করেছেন মিষ্টি ব্যবহারে। কাজেও অসম্ভব নিষ্ঠা, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী।

অফিসে আসতে শুরু করলেন ট্যাক্সিতে। জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ শারীরিক কোনো ক্লেশ হল কিনা। জানালেন সেরকম কিছু

নয়। এই বিশাল মানুষটিকে গরম কোট-প্যাণ্ট পরা অবস্থায় আরো বিরাটকায় দেখায়। বৃহৎ কোনো রাজপুরুষ ভেবে রাস্তার দুপাশ থেকে অজস্র সেলাম জানানো হচ্ছে ওঁকে। রোজ হেঁটে এলে ইজ্জত থাকে কি করে? অগত্যা ট্যাক্সিতে আসতে হচ্ছে। সন্ধের পর রাস্তায় লোকজন কম, হেঁটে বাড়ি ফিরতে সেলাম গ্রহণ করতে হয় না বেশি।

একটা বড়ো ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়েছে শিলং-এ। দেশের বেশ কয়েকজন নামী খেলোয়াড়কে বাইরে থেকে আনানো হবে। কর্নেল সি. কে. নাইডু আসবেন, মুস্তাক আলি আসবেন, কমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে কলকাতা থেকেও আসছেন অনেকে। আমরা ধারাবিবরণ প্রচারের ব্যবস্থা করেছি। ইঞ্জিনিয়াররা খেলা শুরু হবার অনেক আগেই যন্ত্রপাতি নিয়ে 'কমেণ্টারি বক্সে' চলে গিয়েছেন। সময়মতো স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে দুজন ভাষ্যকারকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। কিন্তু গেটের কাছে এগোতেই পুলিস বাধা দিল। পাস্ দেখিয়েও কোনো কাজ হল না। যে-কোনো মুহূর্তে রাজ্যপাল এসে পড়বেন। এখন কাউকে যেতে দেওয়া হবে না। কোনো কর্মকর্তাকেও দেখতে পাচ্ছি না। এদিকে প্রচারের সময় এগিয়ে আসছে। কি করা যায় এই অসহায় অবস্থায় ভাবছি, এমন সময় আর-একটি গাড়ি থেকে আওয়াস্তি নামলেন। নেমেই ডান হাতটি সেলাম গ্রহণ করার ভঙ্গিতে উপরে তুলে গেটের দিকে গজেন্দ্রগমনে এগিয়ে চললেন। আমরাও পেছনে পেছনে ঢুকে গেলাম। গেটের সামনে আমাদের আটকে দিল দেখে একজন ইঞ্জিনিয়ার বুদ্ধি করে কমেণ্টারি বক্স থেকে অফিসে আওয়াস্তিকে ফোন করে দিয়েছিলেন। গেটের কাছে আওয়াস্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দুই দিক থেকে পুলিসের স্যালুট্।

একদিন অফিসে এলেন আওয়াস্তি অতি সুন্দর একটি পোশাক

পরে। কাপড়টাই শুধু দামী নয়, বোঝা যায় ভালো দর্জির হাতে তৈরি। প্রোগ্রাম মিটিং-এর শেষে বিখ্যাত কনফেক্‌শনার মরেলোর উর্দিপরা বেয়ারা ট্রের উপর কফি এবং স্ন্যাক্ নিয়ে ঘরে ঢুকে আমাদের সামনে পেয়ালা এবং প্লেট রাখল। কফি এবং সুস্বাদু স্ন্যাক্ খেতে খেতে জানতে চাইলাম, কে খাওয়াচ্ছেন। আওয়াস্তি বললেন যে উনিই সবার সঙ্গে একটু কফিপানের আনন্দ উপভোগ করতে চাইছেন। উপলক্ষ কি? বিবাহ-বার্ষিকী কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে ঠাট্টা করেই বললেন, 'ভাই, আমার ব্যক্তি-মর্যাদাটা পদ-মর্যাদাকে ছাপিয়ে গিয়েছে এমন কোনো নালিশ দিল্লীতে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁচেছে। তাই সদাশয় সরকার বাহাদুর পদমর্যাদা ছেঁটে দিয়ে ব্যক্তি-মর্যাদাকে একটু খাটো করবার প্রয়াসী হয়েছে।'

মর্মান্তিক খবর। বুঝতে পারলাম আওয়াস্তির পদাবনতির আদেশ এসেছে! কফি খেতে খেতে আওয়াস্তি বললেন, 'মন খারাপ করে লাভ কিছু তো হবে না। দুঃখেষু নিরুদ্‌বিগ্নমনা হওয়া ভালো। আমি তো নিজের চালাকি দিয়ে উপরে উঠি নি। কর্তারাই উঠিয়েছিলেন, তাঁরাই আবার নামিয়ে দিলেন। আমার কোনো অপরাধে নয়। কর্তাদের ভুল নীতির শিকার হয়ে আমি যে পরাজিত মানুষটি নই তার জন্যও আনন্দ করা উচিত।' চেয়ে দেখি স্টেশন ডিরেক্টরের চোখ ছলছল। কঠিন বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আওয়াস্তি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন নি সেটা খুব কাছে থেকেই দেখেছি। রেডিয়োর চাকরি জীবনে পরাজয় মানে না এমন দ্বিতীয় জন আমি দেখি নি। আঘাত এসেছে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এবং সেটা লুফে নিয়ে দ্বিগুণ জোরে ফিরিয়ে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষের দিকে। কর্তৃপক্ষ ব্যতিব্যস্ত হয়েছে দেখেছি। কিন্তু এই সুদক্ষ অফিসারটি আর রইলেন না বেশিদিন রেডিয়োতে। চতুর্দশ বছরের চাকরিতে দ্বাদশবার বদলি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। পুত্র কন্যার শিক্ষা

ব্যাহত হচ্ছে। নীতির দিকে থেকেও মেনে নিতে পারছেন না। ইস্তফা দিলেন চাকরিতে।

এতবার বদলি কেনই বা হবে? এর উল্টোটাও কিন্তু দেখেছি। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক নেতার কৃপাধন্য হয়ে আমাদেরই একাধিক সহকর্মী একই স্থানে প্রায় সারা জীবনটাই কাটিয়ে দিতে পেরেছেন। কর্তৃপক্ষ অবশ্য শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। হয়তো দিল্লীরই বিভিন্ন বিভাগে চার-পাঁচ বছর পর পর বদলি করা হয়েছে সেই ভাগ্যবানদের। খাতাপত্রে বদলিটা দেখানো হচ্ছে। পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠলে জবাব দিতে অসুবিধা নেই। বলিষ্ঠ ন্যায়-নীতির অভাব কতবার যে দেখেছি। দেশটাই ছারখার হয়ে গেল এই নীতিহীনতার জন্য।

আজ যাঁরা রেডিয়োতে কাজ করছেন আওয়াস্তির কাছে তাঁদের ঋণের অন্ত নেই। ইতিহাসই ছিল না ভারতীয় বেতারের আওয়াস্তির লেখা বই বের হবার আগে। ষাট দশকের গোড়ার দিকে রেডিয়োর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উপহার দিলেন তিনি। ভারতে রেডিয়ো সম্পর্কে প্রথম পুস্তক। বিস্তারিত বিবরণ, অনুপুঙ্খ তথ্য, মাধ্যমটির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় সমৃদ্ধ। বেতারকর্মীর নিত্যসঙ্গী হবার দাবি রাখে ইংরেজিতে লেখা জি. সি. আওয়াস্তির বই 'Broadcasting in India'।

শিলং স্টুডিয়োতে তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী এলেন পর পর। প্রথমে শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী, সংগীতের একটা বিশিষ্ট ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সংগীতের শিক্ষালাভ বারাণসীতে বড়ে রামদাস-এর কাছে। খেয়াল গাইলেন, গাইলেন টপ্পা ও ঠুংরি রেডিয়োর অনুষ্ঠানে। বেতারের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর যে ক'টা দিন রইলেন আমার গৃহে, গান গেয়ে মাত করে দিলেন আমায়। খেয়াল বেশি শোনালেন না, সেরকম মুনশীয়ানারও স্বাক্ষর ছিল না

খেয়াল গানে। খেয়ালটা পরে গাইতেনও না। কিন্তু শুনলাম ঠুংরির বারাণসী খানদানী স্টাইল। ঠুংরির বাণীতে একটি-দুটি কথার সংযোজন লক্ষ্য করেছি, যেমনটা শোনা যায় কীর্তনের আখরে, মান কিংবা বিরহ বর্ণনায়। সংগীতে অসামান্য নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখেছি। বাসিবস্ত্রে কখনো গান গাইতেন না। সুনিবদ্ধ ঠুংরির অনেক বন্দিশ শুনেছি ওঁর মুখে। গাইতেন তন্ময় হয়ে। আর টপ্পা গাইলেন অতি বিশুদ্ধ। বলতে কি, আমি ওঁর কাছেই টপ্পা যা শোনার শুনেছি। পরবর্তী কালে দিল্লীতেও ওঁর কাছে টপ্পাই বেশি শুনতে চেয়েছি। শুনিয়েছেনও আমায় বার বার। আর কেউ কি গাইতেন টপ্পা? মনে তো পড়ে না। ১৯৫৭-এর মার্চ মাসে সাহিত্যিক নরেন্দ্র মিত্র মশায়ের উত্তর কলকাতার গৃহে আমাকে এবং ভি. জি. যোগকে ছোটে রামদাস টপ্পা গেয়ে শোনালেন। কিন্তু তখন ওঁর গলা আর চলে না, সূক্ষ্ম অঙ্গুলি সঞ্চালনেই বোঝাতে চাইলেন, গলায় যেটা প্রকাশ পেল না। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কিন্তু গলাটি সব সময় পরিষ্কার থাকত না। খোলা আওয়াজটাই পেতেন না অনেক সময়। কণ্ঠ বাদ সাধলেও ঠুংরি ও টপ্পার সম্রাজ্ঞী তিনি।

একসঙ্গেই এলেন তিমিরবরণ এবং বদায়ুঁনিবাসী ভারত বিখ্যাত উস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর শিষ্য তিমির-বরণের প্রচণ্ড খ্যাতি, বিশেষ করে অর্কেস্ট্রা-পরিচালক হিসেবে। কিন্তু শিল্পীর কবি-কল্পনার সঙ্গে হাতের আঙুল সহযোগিতা করল না রেডিয়ো কনসার্টে। উস্তাদ নিসার হুসেন খাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য সংগীতে। রাগের বিশুদ্ধ রূপায়ণে খেয়ালের সমস্ত অঙ্গের পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁর গানে। খুবই অনুশীলিত কণ্ঠ, সূক্ষ্ম কারুকার্যে সমৃদ্ধ। সমগ্র দেশে সমাদৃত প্রথম সারির গুণী। কয়েকটা দিন একান্তে বসে এত বড়ো শিল্পীর গান শোনার সৌভাগ্য হল। তার পর তো সারা জীবনই শুনেছি তাঁর গান। সুযোগ পেলে এখনো

শুনি। খেয়ালের নৈকষ্য কুলীন শিল্পী। কিন্তু 'তাঁর গানের বেদন লেগে আমার হিয়া' কেঁপে ওঠে নি কোনোদিন। নৈপুণ্য তো অতুলনীয়, আছে ছন্দোময়তা। কিন্তু শিল্পীমনের গভীর আকুতি রসধারায় সিঞ্চিত করল না তাঁর গানের বিন্যাসকে। সদম্ভ দক্ষতা প্রদর্শনের প্রয়াস আমার মনকে পীড়িত করেছে বার বার। খাঁ সাহেব তাঁর অনুভবের ভাগ দিলেন না আমায়। শ্রোতাকে ভালোবাসলেন না। নৈকষ্য কুলীনের সহজাত দাম্ভিকতায় আমার ছোঁয়ার বাইরে রাখলেন নিজেকে।

শিলং-গৌহাটি বেতার-কেন্দ্রের প্রধান কার্যালয় বা হেডকোয়ার্টার এত দিন ছিল শিলং-এ। স্টেশন ডিরেক্টরের কর্মস্থান তাই শিলং। কিন্তু দিল্লীর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল যে স্টেশন ডিরেক্টরকে গৌহাটি চলে যেতে হবে এবং গৌহাটির অফিসই হবে প্রধান কার্যালয়। স্টেশন ইঞ্জিনিয়ারও চলে গেলেন গৌহাটি। একজন প্রোগ্রাম সেক্রেটারি রইলেন শিলং-এ, বাকি সব করণিক চলে গেলেন গৌহাটি। প্রোগ্রাম বিভাগে রয়ে গেলাম আওয়াস্তি, অ্যালট্রিসিয়া রায় এবং আমি। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে রইলেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং কয়েকজন জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। স্টেশন ডিরেক্টর পি. সি. চ্যাটার্জি বেশিদিন রইলেন না গৌহাটিতে। বদলি হয়ে গেলেন লক্ষ্ণৌতে। কিছুদিন পর আওয়াস্তিও বদলি হলেন লক্ষ্ণৌতে। আমি রয়ে গেলাম শিলং-এর দায়িত্ব নিয়ে। কিন্তু সেও বেশি দিন নয়। ডাক এল রাজধানীর। কিন্তু যাবার আগে গৌহাটি থেকে একটি দুঃখের খবর পেয়ে গেলাম। আমাদের এক সহকর্মী সরকারের গাফিলতির শিকার হল। দারুণ বলিষ্ঠ যুবা, পালোয়ানই বলতে পারা যায়। উচ্চতা ছ ফুট তিন ইঞ্চি, ছাতি চুয়াল্লিশ ইঞ্চি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। এমন একটি দেহের শ্রী বাঙালির মধ্যে কমই দেখা যায়। এদিকে এম. এ. পাস। রাস্তায় বের হলে অনেক বাড়ির দরজা-

জানলার ঈষৎ ফাঁকে ত্রস্ত চকিত দৃষ্টি আমার সহকর্মীকে অনুসরণ করে। কিন্তু না, টিকলেন না, চাকরির জন্য যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় তাতে বাতিল হয়ে গেলেন। একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বান্ধবী রোশনারা মন্তব্য করলেন যে এমনটা কি করে হয়। কেন বাতিল হলেন? চোখ খারাপের জন্য। কিন্তু সরকার চোখের মাথা খেয়ে বসেছিলেন কেন এতদিন? চাকরিতে ঢোকার চার বছর পর মেডিকেল টেস্ট কেন হল? আগে কেন হতে পারল না? তবে ক্যারিয়ার নষ্ট হল না সৌভাগ্যবশত। অতি স্মার্ট ছেলে শশাঙ্ক রায়। বিদেশী একটা এয়ার লাইনে ভালো চাকরি পেয়ে গেলেন।

পুরো ছ বছর থেকে গেলাম শিলং-এ। শীতের দেশে এত দীর্ঘকাল থাকার একটা অসুবিধা আছে। শীতের সঙ্গে দেহের এমন একটা নিবিড় আত্মীয়তা জমে যায় যে পরে নীচের গরমটাকে হজম করতে বেশ কষ্ট হয়। গরমের মুখে আমাকে যেতে হচ্ছে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মুলুকে। মার্চের মাঝামাঝি। এখনো ঠাণ্ডা বেশ আছে শিলং-এ। দিল্লীর গরমটার কথা ভেবে ভয়ই পাচ্ছি। শীত একবার গা-সওয়া হয়ে গেলে শীতের মাসেও খুব অসুবিধা হয় না। শীতের মাসে বরফ-জমা বিন্দুর নীচেও কোনো কোনোদিন তাপমাত্রা নেমে গেছে। কিন্তু কষ্ট তো হয় নি। শিলং শহর শীতে উপেক্ষিতা নয়। শীতের কালেও রাজকার্য শিলং থেকেই পরিচালনা করা হয়। শিলংকে মনে হয় শীতেই বেশি সুন্দরী। প্রভাতে রাশি রাশি শিশিরবিন্দু রৌদ্রকিরণে ঝলমল, দূরের আকাশে কুয়াশার কুহেলী, মিষ্টি-মধুর রোদ। প্রকৃতিতে একটা মৌন স্তব্ধতা। শিলং-এর 'শর্ট রাউণ্ডে' ঘুরেছি, বেড়িয়েছি 'লং রাউণ্ডে', মনে হয়েছে জগৎ ধ্বনিহীন, শব্দহীন। শিলং, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, সিমলা, মুসৌরিকে ভালো করে চিনতে জানতে হলে আসতে হবে শীতের দিনগুলিতে। অন্য ঋতুতে পাহাড়ের গাঢ় আলিঙ্গন লাভ করা যায় না। গ্রীষ্মের

কালে যাঁরা পাহাড়ে যান বেড়াতে পাহাড়ের প্রাণের স্পর্শ পান কি তাঁরা? বহুলোকের ভিড়ে পাহাড় নিজের শুচিতাই যেন হারিয়ে ফেলে। পাহাড়ের লোকেরা বলে সমতলের মানুষের বিপুল সংখ্যার দাপটে পাহাড়ের স্নিগ্ধ শ্যামচ্ছায়া আর থাকে না। তাদের কাছে শীতই ভালো। এই শীতের দেশে রইলাম অনেকদিন।

আজ জীবনের প্রান্তবেলায় পেছনে তাকিয়ে দেখি ভুলি নি তো কিছুই শিলং-এর। চোখের সামনে যেন পর্দায় ভেসে উঠছে একটির পর একটি ছবি, কত চেনা মুখ। কত প্রিয়জনের হাসি। কত মধুর ঘটনা আর কত-না কৌতুকের কাহিনীচিত্র! দেখতে পাচ্ছি প্রৌঢ় মতি মিঞা এবং তরুণ দ্বিজরাজ চৌধুরী— দুজনেই আস্তিন গুটিয়ে পরস্পরকে লড়াইয়ে আহ্বান করছেন। তাঁদের তর্কের মীমাংসার আর অন্য উপায় নেই। কি নিয়ে এই তর্ক? তাল-এর জন্ম আগে না বে-তাল-এর? দ্বিজরাজ তবলিয়া। মতি মিঞা বেহালা-বাদক। ঘটনার সূত্রপাত স্টুডিয়োর ভিতরেই। মতি মিঞার একক অনুষ্ঠানে তালের কিছু গরমিল হয়েছে। সেই থেকেই শুরু। পরের ধাপ, তাল আগে না বে-তাল আগে। নিষ্পত্তি হবে বাহুযুদ্ধে। থামাতে হল আমাকেই। দুর্গেশ চৌধুরী স্টুডিয়োতে বেহালা বাজানো শুরু করলেন অতি শান্তভাবে মাইক্রোফোনের সামনে বসে। বাজাচ্ছিলেন চোখ বুজে। গৎ যখন মধ্যলয় পেরিয়ে দ্রুতগতিতে চলল, উত্তেজনায় এবং ভাবের আতিশয্যে শিল্পী দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বাজিয়ে চললেন মাইক্রোফোনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। লেগে গেল দৌড়ছুট ইঞ্জিনিয়ার, ঘোষক এবং ডিউটি অফিসারের।

দরদী এসরাজ-বাদক কুমুদ গোস্বামী প্রোগ্রামের আগে অতি নিখুঁতভাবে যন্ত্র মিলিয়ে নিলেন। কিন্তু স্টুডিয়োর লালবাতি যেমনি জ্বলে উঠল মাথাটি ঝাড়া দিয়ে কয়েকটি 'কানমলায়' যন্ত্রের প্রধান তারগুলি সম্পূর্ণ বেসুরো করে দিলেন। লালবাতি দেখবামাত্র

নার্ভাস। অথচ স্টুডিয়োর বাইরে এত ভালো শিল্পী। এদিকে মাথা ঝাড়া দেবার ফলে মহা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড। গোঁসাইজির সযত্নে লুক্কায়িত ইন্দ্রলুপ্ত উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। মাঝখানটা একেবারেই খালি, কেবল চার দিকে চুলের ঝালর। পেছনের চুল অনেক লম্বা। ঘন তেলের ফাউন্‌ডেশনের উপর মাঝের ফাঁকটাতে পাট করে বসানো থাকে পেছন থেকে টেনে আনা চুলগুলি। স্টুডিয়োর লালবাতি জ্বলে উঠবার পর নার্ভাস হয়ে মাথা নাড়ার ফলে মাঝের চুলগুলি স্থানচ্যুত হওয়ায় টাক বের হয়ে পড়ল। পাশের তানপুরা-বাদক হেম স্যায়েট পেছনে মুখ ঘুরিয়ে হেসে ফেললেন। তবলিয়া দ্বিজরাজ চৌধুরীও বাজাতে বাজাতেই হাসলেন। অবশ্য নিঃশব্দে। কুমুদ গোস্বামী এঁদের হাসি দেখে দ্বিতীয় রিপু দ্বারা আক্রান্ত হলেন। আধঘণ্টার অনুষ্ঠানটি মাটি হল, যন্ত্র আর সুরে ভিড়ল না।

এমন কত চিত্র চোখের সামনে। বড়ো ভালো লেগেছিল শিলং-এর দিনগুলিকে। হৃদয় ভরে আছে। শিলং-এর সঙ্গে যোগাযোগটা এখনো আছে যে। এই সেদিন জিতেন দেব পাঠিয়ে দিলেন আমার দুই কন্যার অতি শিশুকালের ফোটো। চিন্ময় লাহিড়ি এবং কানাই দত্তর সঙ্গে ঝুমুন্ আর রুমির ছবি। সাতাশ বছর আগে জিতেনেরই তোলা ছবি। পঁচিশ বছর পর বেলা চৌধুরী এসে গান শুনিয়ে গেলেন। সে বালিকাটি আর নেই এখন। আহা, বলে গেলেন : 'আমি যে আপনাকে দেখতে পাই না। ভগবান চোখ নিয়ে নিয়েছেন।' রামানুজ এলেন বহুকষ্টে ঠিকানা খুঁজে বের করে। নিদারুণ গ্রীষ্মের দুপুরে দ্বিজরাজ চৌধুরী এসে ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ করে গেলেন। পঁচিশ বছর পর দেখা। চেরাপুঞ্জীর কমলা লেবু আসে এখনো এক ডাক্তার-বন্ধুর স্নেহের দান হিসেবে। যেগোযোগটা গৌহাটির সঙ্গেও নেহাত কম ছিল না। মনে পড়ে কিছুকাল আগে কি এক বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রেকর্ড করে পাঠালাম আমার ছোটো

একটি ভাষণ গৌহাটি কেন্দ্রের অনুরোধে। সোদর-প্রতিম ভূপেন হাজারিকা অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও কষ্টস্বীকার করে এসে আমার ইংরেজিতে লেখাটির অসমীয়া অনুবাদ করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রেকর্ড করে গেলেন। বলে গেলেন আমার উচ্চারণে কোনো গোলমাল নেই। সে-সব দিন কি করে পালটে গেল ?

আমাদের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। মালপত্র বাঁধা শুরু করেছি। বিদায়ের দিনগুলিকে মধুময় করে দিল এ. কাননের উপস্থিতি। আসাটা অপ্রত্যাশিত। কি সৌভাগ্য আমার! এখন অফিসের দায়িত্বভার নেই, অফিস যেতে হচ্ছে না। অফুরন্ত অবসর। প্রাণভরে কাননের গান শুনতে পাব। মাত্র একবারই আগে ওঁর গান শুনেছি। বছর-দুই আগে কলকাতায় আমার দাদার বাড়িতে গান গেয়ে মাত করে দিয়েছিলেন। আমার সে গান এত ভালো লেগেছিল যে মনে হয়েছিল কানন তখন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। আরো বৈশিষ্ট্য এই যে দক্ষিণ ভারতের সন্তান কর্ণাটকী সংগীতে না গিয়ে হিন্দুস্থানী পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেন। হাইদ্রাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন বিশেষ একটা পেশাগত ট্রেনিং-এর জন্য। কলেজ স্ট্রীট ওয়াই. এম. সি. এ.-তে জায়গা পেয়ে গেলেন থাকবার। নীচের রেস্তোরাঁর গান-পাগলা ম্যানেজার দুলালবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর মাধ্যমেই আমার সঙ্গে জানাশোনা। এ. কাননের নামের মধ্যে 'টি' কি করে ঢুকল কানন নিজেই জানেন না। আরকট-এর এ, আর কানন হল পদবী। কলকাতায় এসে গানের জগতে মজে গেলেন কানন। চাকরি আর করা হল না। ফিরলেন না দেশে। কলকাতাকেই করলেন ঘর, আর ঘরণী করলেন অতি বিদুষী শিল্পী এক বাঙালি কন্যাকে। তার পর আচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর কাছে সংগীতের শিক্ষালাভ। কানন শিল্পী হিসেবে যত বড়ো, মানুষটা যেন তার চেয়ে অনেক বড়ো। এমন

খোলামনের মানুষ কমই দেখা যায়। শিষ্টাচারে. বিনয়ে, সহৃদয়তায় সবারই প্রিয়সখা। শিলং-এর দিনগুলি গানে, গল্পে, হাসিতে গুলজার করে রাখলেন। বাড়িতে যে ঘরে গান হবে সে ঘরটা গোছানোর কাজে লেগে গেলেন আমাদের সঙ্গে। নিজেই বাজার থেকে সুগন্ধি ধূপকাঠি কিনে আনলেন। আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানালেন বিজনীর বানীসাহেবা এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। ভারি মজা লাগছিল যখন নিজেই বলছিলেন যে এ. কানন নামে খুব একজন ভালো শিল্পী গাইবেন আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে এবং ওঁর উপস্থিতি একান্তই বাঞ্ছনীয়। আমাদের চা তৈরি করে খাওয়ালেন এবং স্নানান্তে শুভ্রবাস পরলেন। গায়ে এবং জামায় লাগালেন দামী আতর। তার পর বসলেন গাইতে।

গান গাইলেন অতি সুন্দর। শিল্পী হিসেবে কানন তখন মধ্য-গগনে। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বভারতে। শ্রোতারা খুবই খুশি হলেন। প্রায় এক সপ্তাহ রইলেন কানন। আমাদের যাবার দিন পিছিয়ে দিলাম। একান্তভাবে শিলং-এর মতো সুন্দর পরিবেশে এমন একজন শিল্পীকে আর পাব কি জীবনে? গান গাইতে কাননের ক্লান্তি নেই। রোজই গান শুনছি— সকালে, বিকেলে, রাত্রে। পরিশীলিত, পরিমার্জিত কণ্ঠ। সব চেয়ে বড়ো কথা একটি তাজা কণ্ঠ। সঞ্চারিণী কল্পনা এবং সুষ্ঠু ব্যঞ্জনা কাননের গানে। অনায়াসে শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। কাননের আর্টের প্রধান লক্ষণ পরিচ্ছন্নতা এবং সহজ চলন। অবান্তর কিছু নেই এবং দক্ষতা প্রদর্শনের প্রয়াস নেই। কানন সত্যিকারের আর্টিস্ট। ব্যাকরণের অস্তিত্ব কেন মানবেন না? তবে ব্যাকরণের 'শুচিবাই' তিনি সহ্য করেন না। তিনি রসিক শিল্পী।

দক্ষিণের তিনজন কণ্ঠশিল্পী হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এঁরা এম. আর. গৌতম, লক্ষ্মীশংকর এবং এ. কানন।

তিনজনই প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। শুনেছি তিনজনেরই গান। তবে কানন বড়ো কাছের মানুষ। তাই অনেক বেশি শোনার সুযোগ পেয়েছি তাঁর গান। বাঙালির ঘরে না জন্মেও কানন বাঙালি হয়ে গেছেন। অল্পসংখ্যক যে ক'জন বাঙালি কণ্ঠশিল্পীর খ্যাতি বরাকরের পুল পার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, কানন তাঁদের মধ্যে একজন। বাংলার গৌরবই বৃদ্ধি হয়েছে তাতে।

শিলং-এ আমার বাড়িতে কাননের সব সময়ের সঙ্গী ছিলেন পাশের বাড়ির গোপাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর গান গাইবার খুব সাধ, সাধ্য ছিল না কিছুই। অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মাঝে মাঝে কাননকে বিশ্রামলাভের সুযোগ দিতেন নিজে গান ধরে। গোপাল-বাবুর একটি গানের কলি মনে আছে—

ও ঘাটের ঘাটোয়ারী নন্দদুলাল হরি।
এমন নিঠুর হরি হরে নিল মন।
আমি ও ঘাটে যাব না সই পানিয়া ভরণ।

'নন্দদুলাল' কথাটিতে একটা সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখাতেন গোপাল-বাবু। কাননকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন কাজটা তুলতে। কি করে আর সেটা পারবেন কানন। সবটাই তো গোপালবাবুর 'প্রাইভেট নোট'। অফুরন্ত আনন্দ দিতে পারতেন গোপালবাবু। বড়ো সরল মানুষ ছিলেন।

কাননের চরিত্রের একটা উদারতা দেখে কৃতজ্ঞ হলেন শিলং-বাসীরা। বিপন্ন হয়ে এক সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা এলেন আমার কাছে। এঁদের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নির্ধারিত দিনে কলকাতার এক আধুনিক গানের শিল্পী আসতে পারছেন না অনিবার্য কারণে। এদিকে টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। আমার কাছে এঁরা অনুরোধ করলেন কাননকে গাইতে রাজী করিয়ে দিতে। বললাম যে কানন খেয়াল-ঠুংরির শিল্পী, আধুনিক গানের শ্রোতারা ওঁকে নেবেন

কেন? উদ্যোক্তাদের খুবই কাতর ভাব দেখে কানন রাজী হলেন ভজন গাইতে। ভজন গাইলেন একটি দুটি। তার পর শ্রোতাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'এবার একটা বিরহের গান গাইছি।

ভালো না লাগলেই বলবেন। আমি তৎক্ষণাৎ থেমে যাব।'

গাইলেন সুমধুর ঠুংরি। মুগ্ধ হয়ে শুনলেন শ্রোতারা।

কণ্ঠ যদি ভালো হয়, গানে থাকে নৈপুণ্য, ছন্দোময়তা আর রস, তা হলে খেয়াল বা ঠুংরি গান সাধারণ শ্রোতা কেন শুনবেন না? তবে গানে আবেদন থাকা চাই। হেঁড়ে গলার 'ছাগী' অর্থাৎ বক্রি তান কোনো শ্রোতাই গ্রহণ করবেন না। আমিও শুনব না সে গান। গলা যদি গানের উপযোগী না হয়, কিন্তু সুরবোধ থাকে গভীর, তবে কণ্ঠসংগীতের বদলে যে-কোনো একটি যন্ত্র শিল্পীর প্রতিভা-বিকাশের সহায়ক হবে। শুরুতে এই বিচারটা করা হয় না অনেক ক্ষেত্রে। সৃষ্টি হয় অ-সুরের। এদেব 'হলপ' তান, 'গমকী' তানের বেলায় ধ্বনিসুষমা বজায় থাকে না। গলা দিয়ে যা নির্গত হয় সংগীত তো নয়ই, সেটা মানুষের আওয়াজও নয়। এতে সংগীতের ক্ষতি হয় অসামান্য। সংগীতকে খুন করার অপরাধে দণ্ডিত হওয়া উচিত এমন নির্বোধ শিল্পীর। ঘরানার বিশিষ্ট শৈলী রক্ষণের জন্যও এই-জাতীয় শিল্পীকে প্রতিপোষণ করা যায় না আর্টেরই স্বার্থে। এরকম শিল্পীর তালিমে আরো কিছুসংখ্যক অ-সুর শিল্পীরই সৃষ্টি হবে। ভয়েস্ প্রডাক্শন— যেটা কণ্ঠসংগীতের প্রধান দাবি— সে সম্পর্কে যে শিল্পী অবহিত নন তালিম দেওয়ার দায়িত্বে তাঁকে নিয়োগ করা যায় না, যত বড়ো ঘরানারই তিনি উত্তরপুরুষ হোন-না কেন।

ফিরে আসি কাননের কথায়। দক্ষিণা নিলেন না কানন তাঁর গানের জন্য। কিন্তু বিনিময়ে পেলেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, অনেক-গুলি মানুষের প্রীতি ও ভালোবাসা। সপ্তাহ-শেষে কানন চলে গেলেন কলকাতায়। আমিও রওয়ানা হলাম দিল্লীর পথে।



রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে, আমার ট্রেন দিল্লী জংশন স্টেশনে এসে থামল। দেরি করেই বের হলাম প্ল্যাটফর্ম থেকে। রাজধানী শহর আমার খুব পরিচিত নয়। একটি টংগাতে উঠে বসলাম। পুবের আকাশ একটু একটু ফর্সা হতে শুরু করেছে। লালকেল্লার পাশ দিয়ে ধীর গতিতে চলছে আমার টংগা। সেই বিশাল রাজপ্রাসাদের দিকে চেয়ে ওমর খৈয়ামের ক'টি লাইন অস্ফুট গুঞ্জনে মুখ থেকে বেরিয়ে এল—

রাত পোহালো— শুনছ সখি, দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক ?
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্‌বিদিক ?
পুব গগনের দেব-শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চশির।

মুঘল প্রাসাদ! মুঘলের আগে এসেছিল পাঠান। তারও আগে শক, হূণ। এই ভারততীর্থে এরা সবাই কি 'এক দেহে হল লীন'? আমার মন বলছে হয় নি, হয় নি। দ্বিখণ্ডিত ভারতের ম্যাপটাও যে তাই বলছে। অভিশপ্ত নগরী এই দিল্লী। কত বিদেশী অভিযাত্রী দিল্লীর বুকে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়েছে। লুণ্ঠন করেছে সমস্ত ঐশ্বর্য, ধ্বংস করেছে প্রাচীন কৃষ্টি, রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে নগরীর বুকে। ধূলিকণা কি এখনো লাল? গভীর নিশীথে কি হাওয়ায় উড়ে চলে ধর্ষিতা নারীর কাতর ক্রন্দন? তৈমুরলঙ, নাদিরশা, আহমদ শা দুররানীর নৃশংস হত্যালীলার বিভীষিকা কি ভুলতে পেরেছে এই নগরী? যুগে যুগে এই নগরী রাজকৃপালাভে গরবিনী রাজধানী।

কিন্তু বার বার লাঞ্ছিতা, ধুলায় অবলুণ্ঠিতা। অগণিত সন্তানের জননী, কিন্তু বীর-প্রসবিনী নয় দিল্লী। তাই বিদেশী অভিযাত্রী নায়ক কতবার দিল্লীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুর্বার গতিতে। কোনো বাধা পায় নি, কেউ রুখে দাঁড়ায় নি। এলই বা কোন্ রাজপথে সেই বিদেশী? অতন্দ্র-প্রহরী হিমালয় বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেশের উত্তরে পশ্চিমে। কিন্তু এসেছে ভাগ্যান্বেষী বীর অভিযাত্রীদল অতি সঙ্কীর্ণ পায়েচলা দুর্গম পাহাড়ী পথে। সম্মুখ রণেরও প্রয়োজন ছিল না। মুষ্টিমেয় কিছু সাহসী লোক দুই পাহাড়-চূড়া থেকে পাথর গড়িয়ে ঠেকিয়ে দিতে পারত বিরাট সৈন্যদলকে। কেউ কি মাতৃভূমি জন্মভূমিকে ভালোবাসে নি? না, দেশকে ভালো বাসে নি ভীরু ভারতবাসী। এ দেশের মাটিতে দেশপ্রেম ফলে না। ফলনের প্রাচুর্য আছে অনৈক্যের, জ্ঞাতি-বিরোধের এবং কাপুরুষতা, লোভ ও লালসার। এমন দেশ বিদেশীর হাতে মার খাবে না!

বহু শতাব্দীর পর ভারত আবার হৃতগৌরব ফিরে পেয়েছে। সেই দিল্লীকেই করেছে রাজধানী। এই শান্ত প্রসন্ন উষায় প্রার্থনা জানালাম ভারতের ভাগ্যবিধাতার কাছে দিল্লীর এই নূতন গৌরব যেন হয় অনন্তকালের, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে। দিল্লীর মাটিকে বড়ো ভয় আমার। এখানে মসজিদ আছে। মন্দির প্রায় নেই। মতিবাগ আছে, নীতিবাগ আছে, কিন্তু সুমতি সুনীতির বড়ো অভাব। এখানকার রাজনীতিতে মনুষ্যত্ব বিকোয় খুব সস্তা দরে। এখানকার রাজপুরুষ ক্ষমতার নেশায় আচ্ছন্ন। এমন জায়গায় চাকরি করতে এলে প্রথমে বুকটা একটু দুরু দুরু করে উঠবেই।

রেডিয়োর বহির্বিভাগের (**External Services**) কাজে যোগ দিলাম। বিশাল ব্যাপার এই বিভাগটি। ভারতের ভাবমূর্তিকে সুষ্ঠুরূপে বিদেশের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব এই বিভাগের উপর।

ভারতের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞান -সাধনার কথা বিশ্বের জনগণের কাছে বুঝিয়ে বলা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আমার দেশের সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা, ধ্যান, ধর্মকর্ম, চারুকলার চর্চা, জাতীয় সংহতি, খেলাধুলার কথা সবই ব্যাখ্যা করা হবে বহির্বিশ্বে। যা-কিছু ঘটছে দেশে, যা-কিছু করা হচ্ছে দেশকে প্রগতি এবং কল্যাণের পথে এগিয়ে নিতে, সবই বলতে হবে। মোট কথা ভারতের সত্যসুন্দর প্রতিমাটি জগৎ-সভার মাঝে বসিয়ে দেওয়া— এই হল এক্স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিস-এর ভূমিকা। চব্বিশটি ভাষায় সারা দিন-রাত অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে— ষোলোটি বিদেশী ভাষায় এবং ভারতীয় ভাষায় আটটি— প্রায় বাহান্ন ঘণ্টার উপর প্রতিদিন। এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আফ্রিকা এবং ইউরোপের শ্রোতাদের উদ্দেশে প্রচার করা হয় অনুষ্ঠান। আর প্রবাসী ভারতীয়দের জন্যও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় যাতে স্বদেশে কি ঘটছে না ঘটছে তা যথাযথ জানতে পারে ওঁরা।

দায়িত্ব যেমন কঠিন, সংগঠনও বিরাট এক্স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিসের। একজন ডিরেক্টরের অধীনে আছেন তিন তিনজন ডেপুটি ডিরেক্টর, যাঁদের পদ হল স্টেশন ডিরেক্টরের। কলকাতার মতো একটি জোনাল স্টেশন থেকে অনেক বড়ো এক্স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিস। অনেক বিদেশী নিয়ে নিত্যদিনের কাজ। বিদেশী ইউনিটগুলিতে কাজ করছেন সেই-সব দেশের লোক। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে অসম্ভব যত্ন এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন। প্রায় প্রতিটি দেশের রেডিয়োর আছে অতি নিপুণ বহির্বিভাগ। আমাদের প্রতিযোগিতা তাদের সঙ্গে। অনুষ্ঠানে যেমন থাকবে কল্পনার বৈচিত্র্য, রূপায়ণে চাই নিখুঁত মুন্‌শীয়ানা। সাধারণত একটি ভাষার পুরো সার্ভিসটি আধ ঘণ্টার। কোনো কোনোটিব সময় আরো কম। সুতরাং সংগীত, কথিকা, খবর সবই সংক্ষিপ্ত। এমন-কি, উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি

অনুষ্ঠানও চৌদ্দ মিনিটের বেশি হবে না। নয় এবং সাড়ে ছ' মিনিটের আইটেমই বেশি। ঘোষণায় শিল্পীপরিচিতি, রাগ এবং যন্ত্রটি সম্পর্কেও কিছু বলা হবে। লঘু সংগীতের ব্যাপারেও তাই। গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি আগেভাগে বাজিয়ে দেখে পরিষ্কার করে মুছে নিয়ে ঘোষণাসহ বাক্সে সাজিয়ে রাখা হবে তিন-চারদিন আগেই। বাজতে বাজতে থেমে গেলে চলবে না এবং সেজন্য মাপ চাইবার কোনো বিধান নেই। প্রতিটি রেকর্ডের শুরুতে সংগীতহীন খাঁজ কতগুলি আছে আগেই পরীক্ষা করে একটি কাগজে লিখে রেকর্ডের লেবেলের উপর লাগিয়ে রাখা হয়, যাতে গান শুরু হবার আগে ধ্বনিহীন একটি মুহূর্তও না থাকে। নির্ধারিত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে অনিবার্য কারণে ভিন্ন কিছু বেতারস্থ করবার কোনো ব্যবস্থাই নেই। তিন মাস আগে India Calling নামে প্রোগ্রাম জার্নালে অনুষ্ঠানসূচি ছেপে বের হয়ে আমাদের দূতাবাসগুলিতে চলে গিয়েছে। বিলি করার দায়িত্ব তাদের প্রচার বিভাগের উপর। প্রোগ্রাম অদল-বদলের কোনো উপায় নেই।

দীর্ঘ সাত বছর কাজ করেছি রেডিয়োর বহির্বিভাগে। শুধু একবার প্রোগ্রামের ব্যাপারে বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছিল। ফরাসী সার্ভিসে দশ মিনিটের জন্য মালিকা পুখরাজের গজল সূচিত হয়েছে। তিন দিন আগে রেকর্ড পরীক্ষা করে ঘোষিকা ম্যাদাম গাঙ্গুলি এসে জানালেন যে একটি গ্রামোফোন রেকর্ডের দুই দিকই আঁচড়ে ভরা। বাজাতে গেলে পিক্-আপ্ থেমে যাচ্ছে। লাইব্রেরিয়ান দুঃসংবাদ দিলেন যে ঐ রেকর্ডের আর কোনো কপি নেই। পুরনো এবং নূতন দিল্লীর সব ক'টি দোকানে খোঁজ করেও ঐ রেকর্ডটি পাওয়া গেল না। মহা দুশ্চিন্তা। কণ্ঠসংগীতের বিখ্যাত শিল্পী অমরনাথ তখন আমাদের মিউজিক সুপারভাইজার। পরামর্শ করলাম দুজনে অতি সংগোপনে। মালিকা পুখরাজের রেকর্ডের দুটি গান আমাদের

কাছে আছে। প্রায় সাত মিনিট চলবে। সুপারভাইজার অমরনাথকে বললাম এই দুটি গানের প্রতিটির শুরু এবং শেষে বাজাবার জন্য ঠিক ঐ স্কেলে এবং সুর অনুযায়ী চারটি আধ মিনিটের অর্কেস্ট্রা তৈরি করতে হবে। অমরনাথ কম্পোজ করলেন এবং বাদ্যবৃন্দগোষ্ঠীর তিন-চারজন শ্রেষ্ঠ যন্ত্রীর সহযোগিতায় চারটি আধ মিনিটের বাজনা রেকর্ড করা হল। এবারের কাজটা খুব সহজ নয়। গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাবার সঙ্গে স্টুডিয়ো রেকর্ডে গৃহীত চারটি কম্পোজিশনের অতি নিখুঁত সমন্বয় চাই। শিল্পী-পরিচিতি এবং গজল বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ হয়ে ঘোষণাটিও সামান্য দীর্ঘায়িত হল। নিপুণ ঘোষিকা চমৎকার ম্যানেজ করলেন। কেউ বুঝতেই পারলেন না, ডিউটি অফিসারও এই চাতুরী ধরতে পারলেন না।

কাজটা ঠিক হল না। লাইব্রেরিয়ানকে পুরনো সব রেকর্ড আলাদা করে তালিকা থেকে বাদ দিতে বললাম। যাঁদের রেকর্ড বেশি নেই এমন শিল্পীকে আর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করতাম না। ম্যাদাম গাঙ্গুলির নৈপুণ্যকে স্বীকার করতে হয়। পর পর এতগুলি দুরকম গতির রেকর্ড খুব সতর্ক এবং পটু হস্তে নির্ভুলভাবে বাজিয়ে গেলেন।

ম্যাদাম গাঙ্গুলি বাঙালির ঘরণী, কিন্তু ফরাসী-দুহিতা। একযুগ আগে নৃত্যের ছন্দে, নূপুর-নিক্কণে, সুচারু মুদ্রায় এবং অঙ্গের লাবণ্যে সারাটা দেশকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। পার্টনার ছিলেন ভারতের চিরকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী উদয়শংকরের। ইনিই সেই চিরপরিচিতা সিম্‌কি। ম্যাদাম গাঙ্গুলির সঙ্গে প্রায় চার বছর কাজ করেছি। খুব প্রাণোচ্ছল, হাসি লেগে থাকত ঠোঁটের কোণে সর্বদা। পরিচয় একটু যখন গভীর হয়েছে দেখেছি মনের ভাব লুকোবার কোনো প্রয়াস নেই। খোলামনে কথা বলছেন, অপ্রিয়ভাষণেও নেই কোনো দ্বিধা। আর্টের আলোচনায়, ভারতীয় নাচের কথায়,

অতীতের বিশেষ একটি অনুষঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু, না, মুখে তৎক্ষণাৎ তালা লেগে গেল। একটি কথাও টেনে বের করা গেল না। একদিন একান্তে বলেছিলেন যে আমার চালাকিটা বুঝতে পারছেন না এমন নয়, কিন্তু যে অতীতটা কবর-চাপা তাকে আর খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে নেই। অন্তত তিনি এর মধ্যে নেই। চলেও গেলেন হঠাৎ কিছু না বলেই। বেদনার ছায়া কি দেখেছি মুখে!

ডিরেক্টর মিস্ মাসানী, যাঁর অধীনে কাজ করেছি ইতিপূর্বে শিলং-এ, আমাকে সংগীত বিভাগের দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখে হয়তো কাজে যোগ দিই নি। তিন-চার দিনের মধ্যেই ব্যাপারটি ঘটে গেল। হিন্দি সার্ভিসে গান গাইলেন বোম্বাই-এর কণ্ঠশিল্পী বিখ্যাত মল্লিকার্জুন মনসুর এবং তাঁর সঙ্গে তবলা-সহযোগিতা করলেন বোম্বাই-এরই শিল্পী উস্তাদ আল্লারাখা। উভয়েরই সমস্ত ভারতে খ্যাতি। তবে গোলমালটা কিসের, কিসের ঝামেলা? ঝামেলা বলতে ঝামেলা! একটা কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হল এই ভালো শিল্পীদের অনুষ্ঠান উপলক্ষ করে।

এই দুজন শিল্পী হঠাৎ দিল্লীতে এলেন রেডিয়োর বাইরে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। থাকবেন দু-একদিন মাত্র। হিন্দি সার্ভিসের প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ একটি নোট পাঠিয়ে দিলেন আমার কাছে, এই শিল্পীদের পরদিনই রেডিয়োতে গাইবার ব্যবস্থা করতে। সংগীত বিভাগের ভূমিকা হল এক্‌স্‌ট্যারনল্ সার্ভিসের সমস্ত ইউনিটে সংগীতের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। কোনো ইউনিট নিজেরা সংগীতের আয়োজন করতে পারবে না, এই ছিল নিয়ম। আমি জানিয়ে দিলাম যে এত তাড়াতাড়ি এই দুই শিল্পীকে রেডিয়োর অনুষ্ঠানে ডাকার অসুবিধা আছে। বোম্বাই কেন্দ্রের শিল্পী ওঁরা। ঐ কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া প্রোগ্রাম দেওয়া যাবে না। রাগ করলেন

হিন্দি সার্ভিসের প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ। অনুমতির জন্য বোম্বাই স্টেশনের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে, অনুমতি পাওয়াই যাবে ধরে নিয়ে, পরদিনই হিন্দি সার্ভিসে শিল্পীদ্বয়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন ঐ প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ। খুব ভালো অনুষ্ঠান হল এবং সঙ্গে সঙ্গে গিঁঠও লাগল। সাধারণত অনুমতি এসে যায় এ-সব ক্ষেত্রে। এটা একটা ফর্মালিটি মাত্র। কিন্তু বোম্বাই কেন্দ্র জবাবে তাদের টেলিগ্রামে সরাসরি অনুমতি না দিয়ে চিঠির অপেক্ষা করতে বলল। ইতিমধ্যে হিন্দি সার্ভিসের প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ শিল্পীদ্বয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তাবটি ডেপুটি ডিরেক্টরকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিলেন। বোম্বাই স্টেশনের চিঠি পেয়ে চক্ষু চড়কগাছ। বোম্বাই স্টেশন এই দুই শিল্পীকে প্রোগ্রাম দিতে নিষেধ করল। এদিকে এই শিল্পীদের অনুষ্ঠানে ডাকা হয়েছে জেনে ডিরেক্টর জেনারেলের দপ্তর কৈফিয়ত চেয়ে পাঠাল। স্বপক্ষে আমাদের একটি মাত্র যুক্তি ছিল যে বোম্বাই কেন্দ্র কেন আগেই আমাদের জানিয়ে দেয় নি যে এই দুজনকে অনুষ্ঠানে ডাকা যাবে না। নিয়মমাফিক এটা করতেই হবে। কিন্তু ওদিকে অনুমতি না পেলে অন্য কেন্দ্রের শিল্পীকে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেও দেওয়া যাবে না। এই নিয়মভঙ্গের জন্য হিন্দি বিভাগের প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ এবং প্রস্তাবটি যিনি অনুমোদন করলেন সেই ডেপুটি ডিরেক্টরকে লিখিত ওয়ার্নিং দিলেন ডি. জি।

এই দুজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীকে অনুষ্ঠানে আহ্বান করতে কেন প্রতিবন্ধ দেখা দিল ? একটু রেডিয়োর ইতিহাসের পাতা উল্টোতে হবে। ১৯৫২-এর নির্বাচনের পর ডক্টর বি. ভি. কেশকর তথ্য ও বেতারের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। একটা খুব চালু গল্প শুনেছি দিল্লীতে। ডক্টর কেশকর এক বাঙালি গুরুর কাছে ধ্রুবপদে শিক্ষালাভের পর রেডিয়োতে গান গাইবার অভিলাষে অডিশন দিয়ে ফেল করেন।

ঘটনাটা প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগের। ফেল করার পর তাঁর ধারণা হল যে রেডিয়োর কর্মীদের মধ্যে সংগীতের পাণ্ডিত্য নেই। সুতরাং মন্ত্রিত্বলাভের পর রেডিযোর অডিশনের জন্য প্রথমে পণ্ডিত রতন-জংকারের নেতৃত্বে একটি অডিশন কমিটি তৈরি করলেন। এই কমিটির সব সদস্য রেডিয়োর বাইরের লোক। এই কমিটি রেডিয়োর প্রতি কেন্দ্রে গিয়ে শিল্পীদের অডিশন নিত। বোম্বাই কেন্দ্রের সব বিশিষ্ট দিক্‌পাল শিল্পীরা এই অডিশন কমিটির তীব্র বিরোধিতা করেন। মল্লিকার্জুন মনসুর এবং উস্তাদ আল্লারাখাও এঁদের মধ্যে ছিলেন। তাই এই-সব শিল্পীদের রেডিয়োতে ডাকা হত না। এঁদের প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে এক্‌স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিস বিপন্ন হল, যদিও কিছু-দিন পরই এই শিল্পীদের উপর থেকে সমস্ত বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হল। না তুলে নিয়ে তো উপায় ছিল না, কারণ এই-সব বিশিষ্ট শিল্পীদের বাদ দেওয়ার ফলে সমগ্র দেশে রেডিয়োর বিরুদ্ধে একটা জনমত দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল। তাই বড়ো বড়ো কেন্দ্রের সুপারিশ অনুযায়ী খ্যাতিমান শিল্পীদের আর অডিশনে ডাকা হল না। কলকাতারও সব নামী শিল্পীদের অডিশন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

অডিশন থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে অব্যাহতিদানের ব্যাপারটা চালু হবার আগে আর-একজন প্রখ্যাত শিল্পীর অডিশনের ঘটনাটা খুবই কৌতূহলজনক। নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে সেই শিল্পী এলেন স্টুডিয়োতে। শুরু করলেন টোড়ি রাগ গাইতে। আওয়াজ এবং শৈলী থেকেও শিল্পীকে চিনতে পারলেন না অডিশন কমিটির সদস্য-গণ। শিল্পীকে তো দেখতে পাচ্ছেন না। অন্য আর-এক স্টুডিয়োতে বসে ওঁরা শুনছেন। শিল্পীর নামও বলার নিয়ম নেই। শুধু রোল নম্বর। শিল্পীকে অল্প কিছুক্ষণ পরই অন্য রাগ গাইতে বলা হল।

শিল্পী সবিনয়ে নিবেদন করলেন : 'পহ্‌লে এক রাগ তো শুন্‌

লিজিয়ে চার ছে ঘণ্টা তক্, চাহে তো চার ছে রোজ। তব্ তো মালুম হোগা কী বাঢ়ত্ কায়সী হোতী হ্যায়। ম্যাঁয় নে বহুত হী মেহ্নত্ কি হ্যায় ইস্ রাগ পর।'

কথা শুনে সদস্যরা চিনতে পারলেন মানুষটিকে। পণ্ডিত রতন-জংকার স্টুডিয়োতে গিয়ে উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন।

রামপুরের মহাপণ্ডিত প্রবীণ উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ অতিশয় সরল মানুষ। এত বড়ো শিল্পী, কিন্তু তিলমাত্র দাম্ভিকতা নেই। বিনয় পাণ্ডিত্যকে কত মহিমময় করতে পারে সেটা দেখেছি উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁর মধ্যে। যতবারই দেখেছি ততবারই খাঁ সাহেবের বিনয়-নম্র ব্যবহারে সম্ভ্রম জেগেছে মনে। খাঁ সাহেব অডিশনের চিঠি পেয়ে বুঝতে পারেন নি ব্যাপারটা কি হচ্ছে। ওঁকে বোঝানো হয়েছিল গুণীজনেরা ওঁর গান শুনতে চাইছেন। তাই গাইতে বসে গেলেন। সংগীতে কি নিষ্ঠা ছিল! আর কি দীর্ঘ সাধনা!

লেখিকা উমা বাসুদেব খাঁ সাহেবের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখলেন দিল্লীর এক পত্রিকায়। উমা তখন আমাদের মিউজিক ইউনিটেই কাজ করতেন এক্স্ট্যারনল্ সার্ভিসে। এই সাক্ষাৎকারে খাঁ সাহেব বলেছিলেন যে একদিন টোড়ি রাগ রিয়াজ করতে বসে কোমল গান্ধার ভালো লাগছে না মনে করলেন। তাই বসে গেলেন এই রাগটিকে নিয়ে এবং ছ মাস শুধু কোমল গান্ধারই রিয়াজ করলেন। এমনটা না হলে কি সিদ্ধাচার্য হওয়া যায়! খুব গুণগ্রাহিতাও ছিল। সেটা দেখেছি আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অনেক কাল আগে।

১৯৪৪ সনে এক মিউজিক কনফারেন্সে আমায় নিয়ে গেলেন নৃত্যশিল্পী মণি বর্ধন। সেই আসরে তারাপদ চক্রবর্তী মালকোশ রাগ গেয়ে মাত করে দিলেন। কণ্ঠ-সহযোগিতা করেছিলেন

উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। উষারঞ্জন তখনো তারাপদবাবুর কাছেই শিখতেন। গানের শেষে তারাপদবাবুকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করলেন মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেব। তারাপদবাবুর কতই না আগ্রহ ছিল খাঁ সাহেবের কাছে শিখবার। কিন্তু সুযোগ পেলেন না বলে বার বার আফসোস করেছেন আমার কাছে।

পণ্ডিত রতনজংকারের নেতৃত্বাধীন অডিশন কমিটি ভেঙে দেওয়া হল কিছুদিন পর। তার পর শিল্পীদের পর পর দুটি কমিটির কাছে গানের পরীক্ষা দিতে হত। স্থানীয় কমিটির কাছে পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারলে দ্বিতীয় আর-একটি কমিটির কাছে আবার পরীক্ষা দিতে হত। এই নিয়মটা উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে বোধ হয় এখনো চালু আছে। স্থানীয় কমিটি দ্বারা মনোনীত হলে শিল্পীর রেকর্ডিং দিল্লীতে পাঠানো হয়। লঘু-সংগীতের ব্যাপারে নিয়মটার পরিবর্তন করা হল। স্থানীয় অডিশন কমিটির কাছে শিল্পীকে একবারই পরীক্ষা দিতে হল এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো-এক শিল্পীকে বি-হাই শ্রেণীতেও মনোনয়ন করার অধিকার রইল স্থানীয় কমিটির হাতে। এই অধিকারটুকুও খর্ব করা হল কিছুকাল পর। তারও একটা কারণ আছে বৈকি! ডক্টর কেশকরের নির্দেশ অনুযায়ী অডিশন বোর্ডের সভ্যদের রেডিয়োর বাইরে থেকে আনানো হল। এই নতুন-প্রবর্তিত পদ্ধতিতে শুধু যে দেরি হচ্ছে তা নয় প্রার্থীর পক্ষে বেশ ব্যয়বহুলও। সংগীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি ধারার জন্য প্রার্থীকে পনেরো টাকা করে অডিশন ফি জমা দিতে হয়। বড়ো একটি কেন্দ্রে সাধারণত এক বছরের আগে কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষার জন্য ডাকা হয় না। এ ছাড়াও আর-একটি সমস্যা এ পদ্ধতিতে নিহিত রয়েছে। বাইরে থেকে যাঁদের অডিশন কমিটির সভ্য নিয়োগ করা হয় তাঁরা প্রায় কেউই অপেশাদার নন। পেশাদার নন অথচ সংগীতে গভীর পাণ্ডিত্য আছে এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া বড়ো কঠিন। অডিশন

কমিটির পেশাদার সংগীতজ্ঞ সভ্যদের নিজ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মমত্ববোধ এবং পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা গেছে অনেক সময়। এই অভিযোগে অন্তত চার পাঁচজন অডিশন কমিটির সভ্যকে যে বাদ দেওয়া হয়েছে এই কলকাতা কেন্দ্র থেকেই, সেটা আমার অজানা নয়। এঁরা সকলেই মানী সুরকার ছিলেন। কিন্তু এই দুর্বলতার ঊর্ধ্বে কেউ নেই এমন কথা বলা অপরাধ হবে আমার। তবে দুর্নীতি প্রবেশের পথটা প্রশস্ত। এই কারণেই কি বি-শ্রেণীর ঊর্ধ্বে শিল্পী নির্বাচনের অধিকার স্থানীয় কমিটির হাতে আর রইল না?

সংগীত জানেন বলে ডক্টর কেশকরের বেশ একটা অভিমান ছিল। সেজন্য সংগীতের ব্যাপারে রেডিয়োর কাজে হস্তক্ষেপ করতেন শুনেছি। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অব মিউজিক বা রেডিয়ো সংগীত সম্মেলনের শিল্পী নির্বাচন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল ডক্টর কেশকরেরই হাতে। কিন্তু সংগীতে জ্ঞানটা কতটুকু গভীর ছিল? সন্ধ্যার পর একদিন তিনি বাড়িতে বসে দিল্লী কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছিলেন। দুজন শিল্পী ঘণ্টাখানেক ব্যবধানে শুদ্ধ-কল্যাণ এবং শ্যাম-কল্যাণ রাগ গাইলেন। মন্ত্রীবাহাদুর খুবই অসন্তুষ্ট এই কারণে যে স্বল্প ব্যবধানে এরকম অতি পাশাপাশি রাগ গাওয়া হল। পরদিন তিনি তীব্র মন্তব্যসহ একটি নোট পাঠিয়ে দিলেন চীফ প্রডিউসার ঠাকুর জয়দেব সিং-এর কাছে।

ঠাকুরসাহেব অতি সৎলোক এবং বিদ্বান, কিন্তু সংগীতের জগতের লোক নন তিনি। দু-একটি রাগের নাম-ধাম নিশ্চয় শুনে থাকবেন। তবে এত কঠিন রাগবিচারের মধ্যে তিনি নেই। মন্ত্রীর নোট পেয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে ডেকে পাঠালেন ডেপুটি চীফ প্রডিউসারকে। সুরেশ চক্রবর্তী তখন এই পদে। নোটটি পড়ে সুরেশদা একটি বিড়িতে অগ্নিসংযোগ করে খুব আয়াস করে টানতে লাগলেন। সুরেশদা কিছুই বলছেন না দেখে ঠাকুরসাহেব তাড়া দিলেন একটা কিছু করার

জন্য। দিল্লী কেন্দ্রের মিউজিক প্রডিউসারকেও তলব করতে বললেন তখনই। বিড়িটি শেষ করে খুব সিরিয়স ভাব দেখিয়ে স্থরেশদা বললেন, 'বিষয়টা খুব সহজ নয়। অনেক চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার আছে।'

ক্যান্টিনকে আমার ঘরে চা পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে দুজনেই এসে গেলেন।

স্থরেশদার চোখ দেখেই বুঝলাম একটা রগড়ের ব্যাপার আছে। চা-পানের পর একটি বিড়ি ধরিয়ে স্থরেশদা আমায় বললেন সব কথা। এতক্ষণ ঠাকুরসাহেব ভাবছিলেন যে স্থরেশদা এ বিষয়ে আমার সঙ্গেও পরামর্শ করবেন। চুপ করে থাকা ছাড়া আমারও গত্যন্তর নেই। স্থরেশদা এবার একটু কৌতুকের ভঙ্গিতে ঠাকুরসাহেবকে বললেন, 'মন্ত্রীবাহাদুরের নোটের জবাব দিলে বিপদ এই যে তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, আর দিল্লী স্টেশনের প্রডিউসারের কাছে জবাবদিহি চাইলে ইজ্জত যাবে এই কারণে যে এই দুইটি রাগের মধ্যে "কল্যাণ" কথাটির এজমালি উপস্থিতি ছাড়া আর কোনো সাদৃশ্য নেই। কাজেই এই উভয়সংকটের মধ্যে পড়ে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। মন্ত্রীবাহাদুর ব্যস্ত মানুষ, ভুলেও যাবেন তাড়াতাড়ি।'

মন্ত্রীমশায়ের সংগীতের জ্ঞানের দৌড় যেমন বোঝা গেল তেমনি স্পষ্ট প্রতিপন্ন হল যে চীফ প্রডিউসার অব মিউজিক-এর মিউজিক-এর জ্ঞানটা খুবই সীমাবদ্ধ।

চীফ প্রডিউসার ঠাকুর জয়দেব সিং সম্পর্কে জি. সি. আওয়াস্তির উক্তি 'The Chief Producer, over sixty-five years of age, had spent his life as a teacher of philosophy in a College in Uttar Pradesh where he ended up as Principal. He was not a musician of any distinc-

tion, nor even an author of note on music।' এখানে দুটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মনে আসবে। প্রথম, পঁয়ষট্টির উপর যাঁর বয়স তাঁর দৈহিক এবং মানসিক ক্রিয়াশীলতার কতটুকু অবশিষ্ট থাকে ? একমাত্র রাজনীতি ছাড়া এই বয়সের অন্য দ্বিতীয় বিচরণভূমি থাকতে পারে বলে তো জানি না। দ্বিতীয়, সংগীতে এই সীমিত-জ্ঞানের অধিকারী একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কি করে ১২০০ টাকা মাইনের এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হলেন ?

এই পদটির জন্য কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নি, ইউ. পি. এস. সি.-র সাহায্য নেওয়া হয় নি, ছিল না কোনো প্রকার নির্বাচন কমিটি। ঐ সময় দেশে পার্লামেণ্ট ছিল না, তা নয়। কিন্তু এম. পি.-রা এ-সব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতেন। সেই সময় মন্ত্রীর ইচ্ছাতেই এই-সব মন্ত্রীমহাশয়ের স্ব-মনোনীত লোকদের নিয়োগ করা হত দিল্লীতে সেন্ট্রাল মিউজিক ইউনিটে এবং দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে। মিউজিক-এর ক্ষেত্রেই এই সুবিধাটা বেশি ছিল। বিনা নির্বাচনেই প্রডিউসাররা এলেন। ফি-সহ কোনো দরখাস্ত করতে হয় নি কাউকে, কোনো প্রতিযোগিতারও সম্মুখীন হতে হয় নি। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতো পণ্ডিত এবং উপযুক্ত একজন ব্যক্তির নিয়োগে আনন্দ হয়। কিন্তু জ্ঞানবাবুর মতো নন এমন লোকও অনেকে ঢুকে গেলেন। আর, পণ্ডিত রতনজংকারের নেতৃত্বে অডিশন ব্যবস্থার যাঁরা বিরোধিতা করেছেন তাঁদের অনেককে ডেকে প্রডিউসার, শলাকর (Adviser) এই-সব পদে নিয়োগ করা হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিলায়েত হুসেন খাঁ, আজমত হুসেন খাঁ, গজানন রাও যোশী প্রভৃতি। এঁরা মস্ত গুণী সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা কথা থেকেই যায়। যে স্ত্রীলোক দ্বাদশবার আঁতুড়গৃহ ঘুরে এলেন, শুধু ঐটুকু অভিজ্ঞতার ফলেই কি তিনি গাইনিকল্যাজি বিষয়ে পারদর্শিতার দাবি করতে পারেন ? রেডিয়ো একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের মাধ্যম। প্রায় সমস্ত

আর্ট ফর্মকে গ্রহণ করলেও রেডিয়োর নিবেদন শুধু শ্রোতার কানে, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশবে, শ্রোতার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। তাই অনুষ্ঠান রূপায়ণের কৌশলও পুরোপুরিই আলাদা। সেটা জানতে বুঝতে শিখতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। বৃদ্ধবয়সে যাঁরা এলেন তাঁদের আগ্রহ উদ্যমেও কি ভাঁটা পড়ে না? তা ছাড়া নিজের রিয়াজ ও ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এই মাধ্যমটির প্রয়োগনৈপুণ্যকে রপ্ত করবার সময়ই বা পাবেন কি করে।

রেডিয়োর প্রডিউসারের থাকবে উদ্ভাবনী-প্রতিভা যাতে সামান্য জিনিসকে অসামান্য করে তুলতে পারেন। নিজের আর্ট ছাড়াও জানতে হবে ভাস্কর্য, সাহিত্য, চিত্রাঙ্কনের কথা— দেশের এবং বিদেশের। জানতে হবে নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা। Lionel Fielden-এর ভাষায় he must know something of everything। আমি এর সঙ্গে যোগ করে বলি he must also know everything of something। আর সব সময় কি সতর্কতার প্রয়োজন! শিল্পী সময় মতো উপস্থিত হলেন না, বা বেসুরো গাইছেন, যন্ত্র-সহযোগিতা হচ্ছে বেসুরো, কখনো-বা রেকর্ডিংযন্ত্র বিকল হল, কত রকম ঝামেলার জন্য যে প্রোগ্রাম স্টাফকে নিয়ত হুঁশিয়ার থাকতে হয় সে বিষয়ে ফিলডেনসাহেবের বর্ণনাটা ভারি সুন্দর 'A broadcasting station, though you may not think it, has a continual series of crisis, the speaker fails to arrive, the lights go out, the lines break down, the singer faints, the manuscript is lost···the singer goes out of tune, the orchestra is out of balance··· All these things need a constant alertness and if that alertness is not present in a programme staff the programmes will decline and fall into a dull

routine। এই যদি রেডিয়ো মাধ্যমটির ন্যূনতম দাবি, তবে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষগুলিকে কি করে খাপ খাওয়ানো যায় এই প্রতিষ্ঠানে? আহা! তারুণ্য ফিরে পাবার জন্য কতই-না প্রয়াস দেখেছি। কেউ কৌমার্যব্রত ভঙ্গ করলেন। কেউ কেউ-বা দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করলেন। বিয়ের আইনটা তখনো যে পাস হয় নি। মাইনেটা তো ভালো। আর তা ছাড়া স্টেশনে স্টেশনে প্রডিউসার, শলাকরদের উপরি রোজগারের পথটা কত প্রশস্ত! কলকাতার এক প্রডিউসারের বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের এত ভিড় যে তাদের সিঁড়িতেও বসে থাকতে দেখা গেছে ঘরে জায়গা না হওয়ায়। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা এবং অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরে কত গানের স্কুল রয়েছে, আছেন ভালো ভালো শিক্ষক। তা হলে এত ছাত্রছাত্রী এঁদের কাছেই গান শিখতে ভিড় করে কেন? উদ্দেশ্য একটাই। অডিশনের বৈতরণী পার হওয়া।

মিউজিক প্রডিউসার স্টেশন ডিরেক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে অডিশন কমিটির একজন সদস্য। সুতরাং সেই প্রডিউসারের ছাত্র-ছাত্রীদের অতি সহজে অডিশন পাস করার একটা ন্যায্য দাবি আছে। পরিবর্তে সেই প্রডিউসার-গানের-মাস্টারের দাবি আছে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বাজারদরের অনেক বেশি দক্ষিণা চাইবার। সেহেতু অডিশনে পাস-হওয়া সেই ছাত্রছাত্রীদের বেসুরো গাইবার অধিকার রেডিয়োর শ্রোতাদের অস্বীকার করার উপায় নেই এবং সেহেতুই রেডিয়োর গানের মান বর্তমানে যা শুনছি তাই। প্রডিউসারের চাকরিটা কিন্তু পার্ট টাইমের নয়। এবং বছরের শেষে একজন প্রডিউসারকে লিখিতভাবে জানাবার নিয়ম ছিল যে চাকরি ভিন্ন অন্য উপায়ে উপরি রোজগার হয় না। এমন-কি, বাইরের কোনো পাবলিক ফাংশনে যোগদানের জন্যও বিধি অনুযায়ী অনুমতি নিতে হয়। তা হলে গান শিখিয়ে পয়সা রোজগার করাটা— রেডিয়োর চাকরির

সুবাদেই সে সুযোগটা যখন বেশি আসে— নীতির দিক থেকে অসততা নয়? দেশে তো তখন 'সদাচার' বলে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, পুলিসের ভিজিল্যান্স বিভাগও ছিল। এই অসাধুতা বন্ধ হয় নি কেন?

শিলং-এ যখন ছিলাম তখন অসমীয়া ভাষাটা শিখে ফেলেছিলাম। এতে লাভ হয়েছে বেশ। অনেক মানুষের প্রীতি ভালোবাসা পেয়েছি তাদের ভাষায় কথা বলতে পারি বলে। ভাষার প্রতি মানুষের বড়ো সহজাত দুর্বলতা। যাদের মধ্যে কাজে করছি তাদের ভাষাটা বুঝতে, বলতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি ওদের অন্তরের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। নিজের কাজেরও খুব সুবিধে হয়।

দিল্লীতে সবাই হিন্দি বলে। আমিও অফিসে হিন্দি বলার চেষ্টা করতাম। আগে কি হিন্দি বলি নি? অনেক বলেছি। আর রাগ হলেই তো হিন্দি বাত বেরিয়ে পড়ত মুখ থেকে। কিন্তু সে বলাটা হয়েছে স্কুলের, কলেজের, অফিসের দরোয়ানের সঙ্গে। ট্রেনে গ্রাম থেকে কলকাতায় আসার সময়ও পোর্টারদের সঙ্গে 'চোস্ত' হিন্দি বলেছি। অবশ্য বুঝতে না পেরে অনেক সময় যা বলতে চেয়েছি তার উল্টোটাই করেছে। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রজনের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলার তো কোনো অভ্যাসই ছিল না আগে। একটি-দুটি সরল শব্দও বাংলায় যে অর্থে ব্যবহার হয় হিন্দিতে ঠিক সেই অর্থে নয়। একটা সমস্যার বিষয়ে আলোচনার জন্য এক সহকর্মীকে পাঁচটার পর 'হমারে ঘরমে' আসতে বলেছিলাম চেষ্টাকৃত হিন্দিতে। সন্ধে পার হয়ে গেল অপেক্ষা করে করে। তিনি এলেন না। বাড়ি ফিরে শুনি বেশ কিছুক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করে তার পর চলে গিয়েছেন। অফিসে আমার রুমে আসতেই বলেছিলাম, অর্থাৎ বলতে চেয়েছিলাম। শুধু শুধু সহকর্মীটির হয়রানি হল।

একদিন দেখা করতে এলেন অসামান্যা সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা।

পোশাকে, কথাবার্তায় খুবই সম্ভ্রান্ত। ঠুংরি, দাদরা, গজল-এর শিল্পী। পাঞ্জাবের এক দেশীয় রাজ্যের রানীসাহেবা। গানটা ওঁর শখ, এই বলেই একজন ওঁর পরিচয় দিলেন। নিজে কথা খুবই কম বলছেন। শুধু সংক্ষেপে জি, হাঁ, ইত্যাদি। কি যে অসুবিধায় পড়লাম। কথা বলছি সম্ভ্রান্ত এক মহিলা-শিল্পীর সঙ্গে। লিঙ্গ-এর ব্যবহার ঠিক হচ্ছিল কিনা কে জানে! যদিও ধীরে বলবার চেষ্টা করছিলাম। ঘাবড়ে গিয়ে ভুলের সংখ্যা বোধ হয় বেড়েই যাচ্ছিল। মহিলাটি মুচকি হাসছিলেন, যেন আমার হিন্দি বলাটা খুব মজা করে উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ নিখুঁত বাংলায় বললেন, 'দয়া করে বাংলায় বলুন। সেটা বুঝতেই সুবিধে হবে বেশি।' ওঁর মুখে সুন্দর বাংলা শুনে বোকার মতো চেয়ে আছি। ওঁর বলাটা আমার চেয়ে ঢের ভালো। অথচ পাঞ্জাব কুলবধূ। তিনি বললেন যে ওঁর বাড়িতে গানবাজনা হবে, খুবই ঘরোয়া এবং আমায় আমন্ত্রণ জানাতেই নিজে এসেছেন। আমার সম্মতি গ্রহণ করে তিনি বিদায় নিলেন। রেখে গেলেন একটু রহস্যের ছোঁয়া। কে তিনি? দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ওঁর সম্পর্কে। ঠিক করে কেউ বলতে পারলেন না। শুধু জানলাম দিল্লীতে এই নৈনা দেবী নবাগতা। কেউ বললেন উনি কপূর্রতলার, কেউ কেউ বললেন পাতিয়ালার।

সস্ত্রীকই গেলাম নৈনা দেবীর বাড়িতে। খুব আদরযত্ন করলেন আমাদের। গান আর হল না সেদিন। বললেন যে উনিই গেয়ে শোনাবেন প্রথমটা এরকমই ভেবেছিলেন। পরে ঠিক করলেন যে আমাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হচ্ছে, গল্প-গুজব করবেন। গানের প্রোগ্রামটা তাই রাখলেন না সেদিন, বাইরের কাউকে বলেনও নি। কথায় কথায় ওঁর পরিচয় বের হয়ে এল। অতি অভিজাত বাঙালি-ঘরের কন্যা, কেশব সেনের নাতনী, সাধনা বোসের ছোটো বোন। সংগীতের শিক্ষালাভ আচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর কাছে। কি

ভালোই যে লাগল মানুষটিকে। একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল সমস্ত জীবনের। দিল্লী এবং উত্তর ভারতে নৈনা দেবী নামেই পরিচিত আমাদের বাঙালিকন্যা সুনয়না। বর্তমানে দিল্লীর দূরদর্শনে মিউজিক প্রডিউসারের কাজ করছেন। উত্তর ভারতে ক'জনই জানেন তিনি বাঙালি মেয়ে। মনটাই শিল্পীর। গান এত ভালো বোঝেন। কত যে ভালো বন্দিশ আছে ওঁর কাছে ঠুংরি এবং দাদরার। গাওয়া পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, অনুভূতি গভীর এবং প্রকাশ করেন সুন্দর।

আমার এক প্রিয়বান্ধবী শিলং-গৌহাটি স্টেশনে নিযুক্ত হন প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পদে ১৯৪৮ সনে। স্বল্পকাল পরই এই পদটি উন্নীত হয় কেন্দ্রীয় ক্লাস-টু শ্রেণীতে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী ইউ. পি. এস. সি.-র অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু তথ্য ও বেতার মন্ত্রক চার চারটি বছর গড়িমসি করে কাটিয়ে দিলেন। পরে ১৯৫২ সনে সমস্ত প্রোগ্রাম অ্যাসিণ্ট্যাণ্টদের তালিকা বার্ষিক এবং অর্ধ-বার্ষিক রিপোর্ট সহ ইউ. পি. এস. সি-র কাছে পাঠানো হল অনুমোদনের জন্য। প্রথম পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পদটি উন্নীত হল। তখনকার রেডিয়োর ডিরেক্টর জেনারেল প্রফেসর আহম্মদ শা বোখারির সুপারিশ ছিল যে এই পদে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের পদোন্নতি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ তাঁর মতে প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেডিয়োর কুশলী পরিচালক ও প্রযোজক। মিস্টার বোখারির ভাষায় এঁরা হলেন pillars of broadcasting। প্রমোশন পেয়ে উপর দিকে উঠে গেলে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং প্রযোজনা থেকে দূরে সরে যাবেন এই-সব প্রফেশন্যাল এক্‌স্‌পার্টরা। কিন্তু প্রমোশনের বদলে মাইনেটা বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রফেসর বোখারি প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের বেতন সুপারিশ করলেন ৪০০-১০০০ টাকা। ঐ এক হাজার টাকাই তখন স্টেশন ডিরেক্টর পদেরও বেতনের সর্বোচ্চ বিন্দু ছিল। পে কমিশন মানল

না সে কথা। কমিশনের সুপারিশে পদটি উন্নীত হল। যা হোক, রেডিয়ো ইউ. পি. এস. সি -র কাছে অনুমোদনের জন্য যে তালিকা পাঠাল তা থেকে বাইশজন নামঞ্জুর হল। আমার বান্ধবী রোশনারা এই হতভাগ্য বাইশজনের একজন। আহা! কত বড়ো দুর্ভাগ্য! যথানিয়মে সিলেক্‌শন বোর্ড দ্বারাই মনোনীত হয়েছিলেন। বিরাট একটি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই আসতে হয়েছিল। পদটি উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউ. পি. এস. সি.-র কাছে তালিকাটি কেন পাঠানো হল না, কেন হল এত দেরি? জীবনের শুরুতেই এতগুলি মানুষের উপর কেন এই অবিচার? এই বিবেচনা না এল মন্ত্রী-মহোদয়ের মনে, না তাঁর মন্ত্রকের কারো মনে।

এই বাইশজনেরই চাকরি গেল। এঁদের মধ্যে সাত-আট বছরের পুরনো দু-একজনও ছিলেন। আরো মজার কথা যে অ্যাড হক যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের কারো নাম এই না-মঞ্জুর তালিকায় ছিল না। জরুরি প্রয়োজনে কখনো কখনো কোনো স্টেশন ডিরেক্টর প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য একটি-দুটি নাম ডিরেক্টর জেনারেল-এর কাছে সুপারিশ করে পাঠাতেন। সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ডিরেক্টর জেনারেল কয়েকজনকে এইভাবে নিয়োগ করেছিলেন। এটাকে বলে অ্যাড হক নিয়োগ। এইভাবে অ্যাড হক নিয়োগের পর চালু হয়েছে অনেকগুলি বেতার-কেন্দ্র— জলন্ধর ১ নভেম্বর ১৯৪৭, পাটনা ২৬ জানুআরি, কটক ২৮ জানুআরি, অমৃতসর ১৬ ফেব্রুআরি, শিলং-গৌহাটি ১ জুলাই, নাগপুর ১৬ জুলাই, এবং বিজয়ওয়াড়া ১ ডিসেম্বর ১৯৪৮। দু-এক বছরের মধ্যে আরো কয়েকটি রেডিয়োর কেন্দ্র খোলা হল। প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টান্ট পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু অ্যাড হক ভিত্তিতে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের কাউকে দরখাস্ত করতে বলা হয় নি। এঁরা সত্যিই ভগবানের অসীম করুণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা চাকরির

জন্য কখনো দরখাস্ত করেন নি প্রার্থী হিসেবে, পোস্ট অফিস থেকে পোস্টাল অর্ডার কিনে কোনো দরখাস্তের সঙ্গে পাঠান নি। কোনো নির্বাচনী বোর্ডের সম্মুখীন হতে হয় নি, কোনো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশলাভ ঘটে নি এঁদের। তা হলে সভ্যসমাজের কোন্ নিয়োগনীতির বলে এঁদের কাজে বহাল রাখা হল এবং শামিল করা হল রীতিসিদ্ধ বিধিবদ্ধ প্রথায় নিযুক্ত অফিসারদের সঙ্গে— সে কথা কিন্তু আমার বান্ধবী তাঁর বুদ্ধি দিয়ে বুঝে উঠতে পারেন নি। বর্তমানের নিয়োগবিধির পরিপ্রেক্ষিতে এই অ্যাড হক নিয়োগটাকে administrative bungling বলা হবে কি? খিড়কি দরজা দিয়ে যাঁরা এলেন তাঁদের রেখে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশকারীদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। এইখানে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কিছু কুট-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন বলে শুনেছি। যে তালিকাটি পাঠানো হয়েছিল ইউ. পি. এস. সি.-র কাছে তাতে বিধিবদ্ধভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম চিহ্নিত করা ছিল না। আর উল্লেখ করা ছিল না অ্যাড হক নিয়োগ-করা ব্যক্তিদের নামও। আমার মনে হয় জানতে পারলে ইউ. পি. এস. সি. অ্যাড হক তালিকাটাই গ্রহণ করত না বিবেচনার জন্য।

এই-সব দেখেই বোধ হয় নীরদ চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে—এক অখ্যাত ভারতীয়ের আত্মজীবনীতে— দেশের কর্ণধারদের বিচক্ষণতা-বিষয়ে কটাক্ষপাত করেছিলেন। নীরদ চৌধুরী মশায় একদা এক্স্-ট্যারনল্ সার্ভিসে Talks Officer পদে কাজ করেছেন। আমার এই বিভাগে আসার আগেই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যান। ওঁকে নিয়ে একটি গল্প শুনেছি। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় অফিসে আসা-যাওয়া। দরিয়াগঞ্জ থেকে বাসেই আসতেন, কনট্ প্লেসে বাস বদল করতে হত। সেদিন বাসের কি গোলমাল হয়ে গেল, কনট্ প্লেস থেকে হেঁটে এলেন এবং খানিকটা শর্টকাট করার উদ্দেশ্যে কোণের একটি গেট দিয়ে ব্রডকাস্টিং হাউসে ঢুকে লিফ্ট্-এর

দরজায় পা বাড়াতেই লিফ্‌ট্‌ম্যান বাধা দিল। আকাশবাণীভবন তখনো তৈরি হয় নি। ব্রডকাস্টিং হাউস তিনতলা বাড়ি। সাধারণত ডিরেক্টর জেনারেল এবং খুব সিনিয়র কয়েকজন অফিসারই ঐ লিফ্‌ট্‌ ব্যবহার করতেন। অন্য আর কেউ এই লিফ্‌ট্‌ ব্যবহার করতেন না। প্রয়োজনই-বা কি মাত্র তিনতলায় উঠতে? লিফ্‌ট্‌ম্যানও সেভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। লিখিত না হলেও মৌখিক নির্দেশ হয়তো কিছু ছিল লিফ্‌ট্‌ম্যানের উপর। নীরদবাবুকে লিফ্‌ট্‌ম্যান চেনে না। তিনি যে রেডিয়োরই একজন অফিসার সে কথা বলার পরও লিফ্‌ট্‌ ব্যবহার করতে দেওয়া হল না নীরদবাবুকে। অফিসে আর গেলেন না। কাছেই পার্লামেন্ট স্ট্রীট থানা। সরাসরি থানাতেই চলে গেলেন নীরদবাবু। নিজের পরিচয় এবং কি পদে চাকরি করেন সে কথা জানিয়ে একজন সরকারি কর্মচারীকে তাঁর কর্মস্থলে যাবার পথে বাধাদানের অভিযোগটি থানায় ডায়েরি করালেন। অভিযোগটিতে আরো ছিল যে কোনো পাবলিক বিল্ডিং বা সরকারি দপ্তরের কোনো প্রবেশপথ বিশেষ কোনো পদাধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা যায় না, সে তিনি যতই উচ্চপদস্থ হোন-না কেন। ব্যাপারটা বোধ হয় আর বেশি দূর গড়ায় নি। কারণ ডি. জি. নীরদবাবুকে ডেকে মিষ্টি কথায় আপস করে নিয়েছিলেন। নীরদবাবু শুধু চলমান জ্ঞানকোষই নন, খুব তেজী পুরুষও।

ফিরে আসি আমার সেই বান্ধবীর কথায়। দিল্লীতে এসে দেখলাম তিনি অসমীয়া ভাষায় ঘোষিকার পদে রেডিয়োর সংবাদ বিভাগে যোগ দিয়েছেন। কিছুদিন পরই ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। রোশনারা ছিলেন খুব হাসি-খুশি প্রকৃতির। চাকরি চলে যাবার এত বড়ো আঘাত, এত বড়ো অপমানটাও ওঁর মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারে নি। কিন্তু তাঁর হাসির অন্তরালে কি সজল মেঘের ছায়া দেখেছি দিল্লীতে? এত বড়ো দুঃখ, চাকরি চলে যাবার এত

বড়ো অপমানটা ভুলে যাওয়া কি সহজ ? দিল্লীতে খুব জানাশোনা ছিল না। প্রায়ই আসতেন আমার অফিসে নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে। এই দূরদেশে এসে আমার সঙ্গে গল্প-গুজবের মধ্যে প্রবাসের দুঃখটাকেও হয়তো ভুলে যেতে চেষ্টা করতেন। নিজ রাজ্যের মানুষদের একটু এড়িয়েই চলতেন মনে হয়েছে। পরিচিত জনের মধ্যেই তো চাকরি থেকে অপসারিত হওয়ার গ্লানি বেশি জাগে মনে। আমি দীর্ঘদিনের সহকর্মী, সমব্যথী, সেজন্য আমাকে খুব আপন ভাবতেন। কি জানি কেন ওঁর ধারণা হয়েছিল আমি একজন মাতব্বর লোক। আওয়াস্তি এবং আরো অনেকে দিনের কাজের শেষে আমার রুমে আসতেন। পরামর্শ হত কি করে এই এত বড়ো অন্যায়ের কথা পার্লামেন্টের সভ্যদের কানে তোলা যায়। নানা জল্পনা-কল্পনা চলত আমার ঘরে মাঝে মাঝে।

সেদিন বোধ হয় রোশনারার মনটা খুব খারাপ ছিল। বিষণ্ণতা ওঁর চোখে মুখে। হঠাৎ বললেন, 'আপনারা তাড়াতাড়ি এই অন্যায়ের প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।' বলতে বলতে দুটি বিন্দু চোখ থেকে নেমে এল গালে। মুছে নেবার চেষ্টা করলেন না। কি বলব সান্ত্বনার কথা! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা গল্প বললাম।

গাঁয়ের খুব প্রতাপশালী গুরুদেব বলাই ভট্টাচার্য। সাধনভজনে পূজা-অর্চনায় সারাটা দিন ঠাকুরঘরেই কা'টান। বলেন খুবই কম এবং কখনো যদি বলেন সাধু ভাষাতেই সে কাজটি করেন। শিষ্যরা যে সব বাক্য বুঝতে পারে তা নয়। একে তো ভাষাটা পঞ্জিকার ভাষার মতো, তার উপর শব্দগুলি অনর্গল ধারায় নিঃসৃত হয় না মুখ থেকে। কেটে কেটে যায়। দীর্ঘ স্বরবর্ণ ধ্বনিটি কোনো কোনো সময় এতটা ঝুলে পড়ে যে পরের শব্দটি পর্যন্ত পৌঁছতে দম ফুরিয়ে যাবার উপক্রম। সব কথা বুঝতে না পারলেও গুরুর প্রতি শিষ্যদের বিশ্বাস ও ভক্তি প্রগাঢ়। গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী পাল-পরিবারের কুলগুরু

তিনি। বৈশাখ-এর এক শুভদিনে ভীম পালের ভৈরববাজারের গদিতে বাস্তুপূজা সমাধা করলেন গুরুদেব দ্বিপ্রহরের আগেই। তার পর ফলাহার এবং দিবানিদ্রা শেষে স্বগ্রামের পথে সশিষ্য নৌকায় গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে আছে পূজায় নিবেদিত ফলমূল দধি মিষ্টান্নের বিরাট ডালাটি— পূজাশেষে গুরুরই যেটা প্রাপ্য। আরো আছে গুরুসেবার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট চাল-ডাল-তরকারি এবং অন্যান্য উপাদেয় ভোজ্যের বিশাল ভাণ্ড। গুরুদেবের মন খুবই প্রসন্ন। পূজার দক্ষিণা এবং গুরুপ্রণামী ভালোই পেয়েছেন। লম্বা পাড়ি দিতে হবে মেঘনা নদীতে। নদীর বুক এখানে অতি চওড়া। ওপারে আশুগঞ্জের বাড়ি-গুলিকে বড়ো বড়ো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। শিষ্য ভীম পাল ভক্তিভরে গুরুদেবের নাম করলেন যাত্রার পূর্বে। নৌকা ছাড়ল। আশুগঞ্জে পৌঁছে নদীর কিনার ঘেঁষে নৌকা নিজ গ্রামের দিকে চলবে, তিন মাইলের নৌকাযাত্রা মেঘনার ভাটি বেয়ে। ওদিকে বায়ুকোণে একখণ্ড কালো মেঘের অস্তিত্ব কেউ লক্ষ করেন নি। কালবোশেখীর উদ্দাম গতি। প্রচণ্ড ঝটিকা ঝটিতি ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর বুকে। নৌকা তখন মাঝ-দরিয়ায়। উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে নৌকা একবার ডুবছে একবার ভাসছে। চারজন মাঝি প্রায় বে-সামাল। ছইয়ের নীচে গুরু-পদতলে বসে ভীম পাল প্রাণভরে অবিরাম জপে চলেছেন, 'গুরু, গুরুদেব, রক্ষা কর।' এক-একটি বড়ো ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুনামের উচ্চারণও তীব্রতর হচ্ছে। দুটি প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাঝখানে পড়ে নৌকাটি প্রায় ডুবেই যাচ্ছে যখন, গুরুদেব আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। শিষ্যের দিকে চেয়ে সক্রোধে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আরে মূ-মূর্খ, ব-বন্ধ কর তো-তোর গু-গুরুদেবের নাম জপা। মৃ-মৃত্যু দাঁড়িয়ে, এখন উ-উপরওয়া-লাকে ডাক, ঈশ্বরের ন-নাম কর, তো-তোর যে বি-বিপদ গু-গুরুদেবেরও সেই বিপদ।' তোত্‌লামি সত্ত্বেও গুরুদেবের কথা হৃদয়ঙ্গম করলেন ভীম পাল। জপতে লাগলেন

ঈশ্বরের নাম। সে যাত্রায় ঈশ্বর রক্ষা করলেন গুরু এবং শিষ্যকে।

গল্পশেষে রোশনারার দিকে চেয়ে বললাম, 'আপনি আমার উপর, আওয়াস্তির উপর এতটা ভরসা রাখছেন কেন? সেই গুরুর মতো আমাদেরও ডুবে যাবার আশঙ্কা আছে যে। ডক্টর কেশকরের খড়্গ শুধু বাইশজনকে বধ করেই থেমে যায় নি। আবার উদ্যত সেই খড়্গ। তবে এবার যাঁদের উদ্দেশে উদ্যত সেই খড়্গ তাঁরা সবাই ইউ. পি. এস. সি.-দ্বারা অনুমোদিত। সেটা মস্ত বাধা। কিন্তু সে বাধা অতিক্রমের চেষ্টা চলছে। ঢাকা এবং লাহোর কেন্দ্র পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় বাঙালি এবং পাঞ্জাবী অফিসারের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। স্টেশনগুলিকে ভাষাভিত্তিক অফিসার দিয়ে সাজাতে হবে। তা যদি হয় তবে বেশ ক'জন বাঙালি এবং পাঞ্জাব-সন্তান এই প্রচেষ্টার বলি হবে।'

আমার কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন রোশনারা। পরে বললেন, 'এমন একটি নিষ্ঠুর ডিপার্টমেণ্টের সংশ্রব আমি পরিত্যাগ করব।'

সত্যিই কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষিকার চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন।

বাইশজনের চাকরি চলে যাওয়ার ব্যাপারটা পত্র-পত্রিকায় ছেপে বের হল। সংবাদটি প্রধানমন্ত্রীর কানেও পৌঁছল, জেনে গেলেন এম. পি.-রাও। প্রফেসর হীরেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এঁরাও মন্ত্রিসভার কাছে ব্যাপারটি পেশ করলেন। এদিকে হারীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পার্লামেণ্টে ডক্টর কেশকরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তাঁর সেদিনের অসামান্য বাগ্মিতা, ব্যঙ্গ-কবিতা, তীব্র কটাক্ষে এবং মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তথ্যনিষ্ঠ মন্তব্যে সমৃদ্ধ ছিল। শুনে বিরোধীপক্ষের সমস্ত সদস্যরা তো বটেই এমন-কি, কংগ্রেসের এম. পি.-রাও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ডক্টর কেশকরের জবাব সন্তোষজনক তো হলই না, প্রত্যয়েরও অভাব ছিল। সংসদের আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে উঠল। সেন্‌সার প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়ে যাবার উপক্রম। এমন বিপন্ন অবস্থায় শাসক পার্টি যা করে থাকে তাই হল। প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেদের সদস্যদের উপর 'হুইপ'-এর নির্দেশ দিলেন। প্রস্তাবটি আর গৃহীত হবার অবকাশ পেল না। পরদিন সমস্ত খবরের কাগজে বিবরণ বের হল, যদিও অনেকটা কেটে-ছেঁটে।

এই ঘটনার পর বেতারমন্ত্রক যেন কিছুটা চুপ মেরে গেলেন। ঐ বাইশজনকে আর ফিরিয়ে নেওয়া হল না ডিপার্টমেণ্টে। অন্যত্র চাকরি পাওয়ার সুবিধাও করে দেওয়া হল না। এঁদের একজনের পক্ষ থেকে একটি মামলাও দায়ের করা হল উচ্চ আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে। মোকদ্দমাটির রায় সরকারের অনুকূলে গেলেও মাননীয় বিচারপতি তীব্র মন্তব্য করলেন সরকারের নির্মমতার উদ্দেশে। অত বড়ো প্রসার্যমান একটি প্রতিষ্ঠানে এই বাইশজনের আর স্থান হল না স্বাধীন ভারতে আমাদেরই দ্বারা প্রথম নির্বাচিত সরকারের অধীনে। অথচ বিনা বাছাইয়ে কতজনেরই না চাকরি হয়ে গেল এই রেডিয়োতেই। এই বাইশজনের জীবনটা ছারখার হয়ে যাওয়ার জন্য বেদনা বোধ করলেন না ডক্টর কেশকর। নিরপরাধ হতভাগ্য এই মানুষগুলি বেতারমন্ত্রকের ভুল নীতির শিকার হলেন। এমন সরকারের, এমন দেশের কি কখনো ভালো হতে পারে? ভালো যে হয় নি স্বাধীনতালাভের কয়েক বছরের মধ্যেই বুঝতে পারল দেশবাসী। কে বাঁচাবে এই দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে?

১৯৫৪ সনের ২৩ অক্টোবর একটি নূতন প্রোগ্রামের প্রবর্তন হল রেডিয়োতে। নাম 'রেডিয়ো সংগীত সম্মেলন'। সপ্তাহব্যাপী উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমারোহ। রবিবার এবং ছুটির দিনে সকাল-সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠান। অন্যান্য দিনে রাত ৯-৩০ মিনিট থেকে মধ্যরাত্রি বারোটা

অবধি। এক্স্ট্যারনল্ সার্ভিস ছাড়া সব স্টেশনকে এ অনুষ্ঠান রিলে করতে হবে। দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে বেতারের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নির্বাচিত করা হল। দিল্লীতে হিন্দুস্থানী সংগীতের অনুষ্ঠান, আর মাদ্রাজে দক্ষিণী সংগীতের। পরবর্তী কালে ব্যবস্থার অদল-বদল হয়েছে। বিভিন্ন বেতার-কেন্দ্রেও আমন্ত্রিত শ্রোতাদের সামনে এই অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হচ্ছে। হিন্দুস্থানী শিল্পী দক্ষিণ ভারতে গিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন এবং দক্ষিণের শিল্পীও উত্তরে আসছেন। টেপ-করা অনুষ্ঠান এখন দিল্লী থেকে বাজানো হয়। হিন্দুস্থানী এবং দক্ষিণী— উভয় সংগীতই সব কেন্দ্র থেকে রিলে করা হয়। সরাসরি এ প্রোগ্রামের সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকার কথা নয়। দীর্ঘ-স্থায়িত্বের উচ্চাঙ্গ সংগীত এক্স্ট্যারনল্ সার্ভিসে প্রচার করা হয় না।

এই বিরাট বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ডিরেক্টরেট-এর সংগীত বিভাগ। আমার সহযোগিতা চাওয়া হল। প্রথম বারের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন খুব কাছে থেকেই দেখতে পেলাম। শিল্পী নির্বাচন করলেন মন্ত্রীমহোদয় নিজে। ডিরেক্টর অব মিউজিক পদে ছিলেন সুমতি মুতাতকর। আর দিল্লী কেন্দ্রের মিউজিক প্রডিউসার ছিলেন তখন ধ্রুবতারা যোশী। শিল্পী নির্বাচনে যোশীজি বা মুতাত-করের কিছুই হাত ছিল না। তবে ডক্টর কেশকর যোশীজি এবং মুতাতকরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর মন্ত্রীমহোদয় এই দুজনকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, এই শিল্পী নির্বাচনটা ঠিক হল তো ?' এঁরা দুজনও তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে!' শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বভার ছিল দিল্লী কেন্দ্রের উপর। সুতরাং আমার দায়িত্বটা ছিল শুধু সঙ্গদান এবং সুযোগটা ছিল কাছ থেকে দেখার। অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে অবশ্য তদারকির ভার ছিল কিছুটা আমার উপর।

সুন্দরভাবে সম্পন্ন হল রেডিয়ো সংগীত সম্মেলন সমারোহ। আয়োজনে কোনো ত্রুটি ছিল না। মন্ত্রীমহাশয় খুশি হলেন। অংশ-গ্রহণকারী সমস্ত শিল্পীদের বাড়িতে আহ্বান করে চা-জলখাবারে আপ্যায়িত করলেন তিনি। একজন কর্মী হিসেবে আমিও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ডক্টর কেশকর অকৃতদার। গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য পালন করলেন অষ্টাদশী ভাগিনেয়ী কুমারী মীরা ক্ষীরওয়াদকর। শ্যামলী মেয়ে, ভারি সুন্দরী, সপ্রতিভ সহজ চলাফেরা। সবার সঙ্গেই কথাবার্তা বলছেন। আমাদের বাঙালি ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেলকেও প্রথম-নাম ধরেই ডাকলেন। সম্বোধনটা স্নেহসিক্ত 'তুমি' নয়। অফিসারটি বয়সে প্রবীণ। রাজবাড়ির মেয়ে হিসেবেই এই সম্বোধনের দাবি। খেয়াল গাইতেন মীরা। আমন্ত্রিত হয়ে রেডিয়োর বিভিন্ন কেন্দ্রে সংগীত পরিবেশন করেছেন অনেকবার। তবে ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে ডক্টর কেশকরের পরাজয়ের পর আর গান শুনেছি মনে পড়ে না।

রেডিয়ো সংগীত সম্মেলন উপলক্ষে কোনো কোনো কেন্দ্রে শ্রোতারা বিশিষ্ট শিল্পীদের গান বা বাজনা সামনে বসে শোনবার একটা সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে সীমিত আসনসংখ্যার একটি অডিটরিয়মে কতজন শ্রোতাকেই বা ডাকা যায়? আর একটি মোটামুটি বড়ো শহরের অসংখ্য সংগীতপ্রেমী:দর তুলনায় আমন্ত্রিত শ্রোতাদেব সংখ্যাটা কি নেহাতই নগণ্য নয়? সংগীত যাঁরা ভালোবাসেন অথচ আমন্ত্রণ পেলেন না, তাঁরা কোন্ অপরাধে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন? এঁরা প্রত্যেকেই লাইসেন্সধারী রেডিয়োর শ্রোতা। দ্বিতীয় প্রশ্ন, সাধারণত কলকাতার মতো বড়ো শহরে মাঝে মাঝে যে টিকিট বিক্রি করে সংগীতের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় রেডিয়ো সংগীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান কি সমমানের? রেডিয়োর শিল্পী তালিকায় এমন অনেকে আছেন যাঁদের অনেক দিন আগেই

সংগীত পরিবেশন থেকে অবসর নেওয়া উচিত ছিল। প্রাক্তন খ্যাতির সুবাদেই হয়তো সেই শিল্পীকে রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। কলকাতার শ্রোতার কাছে সেই শিল্পীর অনুষ্ঠান কি বিশেষ আকর্ষণের হবে? প্রেক্ষাগৃহের অনেক আসনই তো খালি পড়ে থাকতে দেখেছি। তৃতীয় প্রশ্নটি রেডিয়ো মাধ্যমের বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলের দাবি সম্পর্কে। রেডিয়োতে নাটকের স্টুডিয়ো, কথিকার স্টুডিয়ো এবং সংগীতের স্টুডিয়োর ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্পর্কীয় ব্যবস্থা (acoustics) পৃথক পৃথক। নাটক বা কথিকার স্টুডিয়ো থেকে সংগীত পরিবেশন চলবে না, কারণ শ্রুতির সূক্ষ্ম ধ্বনিগুণ অনেকটা স্টুডিয়োতেই নষ্ট হয়ে যাবে। সমস্ত ভারতে এমন ক'টি মঞ্চ আছে যেখানে সংগীতের উপযোগী ধ্বনি সম্প্রসারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে? সুতরাং এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা-হীন মঞ্চ থেকে টেপ-করা সংগীতের অনুষ্ঠান কখনো স্টুডিয়োতে পরিবেশিত সংগীতের মতো নিখুঁত হবে না।

রেডিয়োর সমস্ত অনুষ্ঠান শ্রবণের— চোখকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। কথাটার বিশেষ তাৎপর্য আছে। রেডিয়োর গান, এবং সে গান যদি হয় উচ্চাঙ্গ সংগীত, তবে একটি গ্রাহকযন্ত্রের সামনে বসে একসঙ্গে ক'জন শুনছেন সে গান? একজন বা দুজন বা তিনজন। সে কথাটা জানেন স্টুডিয়োতে বসে যে গাইছেন সে শিল্পী। তিনি একজন দুজন শ্রোতার জন্যই গাইছেন। আবেদনটা একটি দুটি হৃদয়ের কাছেই। তাই শিল্পীর অনুভবের যোগাযোগ খুবই অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু অপর দিকে হাজার শ্রোতার সামনে যে শিল্পী গাইছেন বা বাজাচ্ছেন তাঁর আর্ট উপস্থাপনার পদ্ধতি রেডিয়োর গান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি উপস্থিত শ্রোতাকে খুশি করার নানারকম কৌশল অবলম্বন করছেন। হয়তো একই কাজ করছেন বার বার, চমক সৃষ্টিতে সচেষ্ট, তবলার সঙ্গে করছেন লড়াই এবং উত্তেজনার

মুহূর্তে মাইক থেকে নিজের মুখ সরিয়ে নিচ্ছেন এদিক-ওদিকে। এতে ব্যালেন্সিং নষ্ট হল। তিনি গ্যালারিতে উপবিষ্ট শ্রোতাদের জন্য গাইতে গিয়ে রেডিয়ো মাধ্যমের দাবিটির কথা একেবারে ভুলে গেলেন। আর, বহুজনের কাছে যে আবেদন সেটা রেডিয়োর গানের একের জন্য আবেদনের মতো নিশ্চয়ই হবে না। এর উপরও আছে কথা। বিরোধী ঘরানার কিংবা শত্রুভাবাপন্ন যে-কোনো একজন শ্রোতার উপস্থিতি শিল্পীর অনুষ্ঠানটিই মাটি করে দিতে পারে। শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার চোখমুখের অভিব্যক্তি শিল্পীর রাগরূপায়ণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেই। খোদ রবিশংকরের মতো বিরাট শিল্পীও বলেছেন এ জাতীয় শ্রোতা থাকলে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। সুতরাং আমন্ত্রিত শ্রোতার সামনে নিবেদিত সংগীতের রেকর্ডিং রেডিয়োর অগণিত শ্রোতাকে আনন্দদানে বঞ্চিত করবে। এ যেন স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের স্বার্থে বহুজনের বঞ্চনা। অথচ রেডিয়োর আদর্শ প্রতিটি রেডিয়ো ভবনের সামনে বড়ো করে লেখা 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'। রেডিয়োর সঙ্গে মঞ্চানুষ্ঠানের আসমান-জমিন ফারাক। এই মঞ্চে আসার প্রলোভন কেন তবে? অন্য দিকে ব্যয়ের অঙ্কটাও যে বেড়ে গেল। হল ভাড়া, মঞ্চসজ্জা, আমন্ত্রণলিপি ছাপানো এবং পাঠানোর জন্য অনেক খরচ হয়ে গেল। এদিকে লক্ষ লক্ষ রেডিয়োর শ্রোতারাও বঞ্চিত হলেন এবং রেডিয়োর স্বধর্মও বিনষ্ট হল।

ন্যাশনল্ প্রোগ্রাম অব মিউজিক আরো আগেই চালু হয়ে গিয়েছিল, ১৯৫২ সনের ২০ জুলাই। সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান, প্রতি শনিবার রাত সাড়ে নটা থেকে রাত এগারোটা অবধি। এটি রেডিয়োর খুব জাঁকজমকের অনুষ্ঠান। উদ্দেশ্য ছিল উচ্চাঙ্গ সংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলা। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণী ও হিন্দুস্থানী সংগীতের দুই ধারার মধ্যে সেতু-স্থাপন। সাধু প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে। সেতুর উপর হামাগুড়ি দিয়ে কিছু কিছু রাগ এপার-ওপার করেছে। রবিশংকর

গ্রহণ করেছেন কয়েকটি দক্ষিণের রাগ। গোপালকৃষ্ণও নিয়েছেন উত্তরের গোটা-কয়েক রাগ। অসামান্য শিল্পী উভয়েই। কিন্তু বহুল প্রচার সম্ভব হয় নি। কণ্ঠসংগীতে একেবারেই না। দক্ষিণের রাগ এনে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথও করে গেছেন— যেমন, 'বাজে করুণ সুরে' গানখানি সিংহেন্দ্রমধ্যম রাগের উপর। এমন আরো দু-একটি গান আছে। কিন্তু দুই ধারার মাঝে যে দুস্তর ব্যবধান। শ্রুতির সংখ্যা দক্ষিণে উত্তরের প্রায় তিনগুণ। তাই উত্তরের শিল্পীর কণ্ঠে দক্ষিণের রাগরূপায়ণ পূর্ণাবয়ব হয় না। দক্ষিণী শ্রোতা অতি-পরিচিত রাগটিকে হয়তো চিনতেও পারবেন না। তবু ন্যাশনল্ প্রোগ্রাম অব মিউজিক-এর কল্যাণে পরস্পরের চেনা-জানা পরিচয়টা বেড়েছে অনেক। জাতীয় সংহতির সহায়ক হবে। প্রথম প্রথম শিল্পীকে দিল্লীতে যেতে হত। অনুষ্ঠানটি রেডিয়োর পরিভাষায় 'লাইভ' হত, অর্থাৎ আগে থাকতে রেকর্ড করে নেওয়া হত না। লাইভ প্রোগ্রাম সরাসরি দিল্লী থেকে রিলে করত স্টেশনগুলি। শিল্পী তিনটি অনুষ্ঠানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতেন। শনিবার রাত্রে ন্যাশনল্ প্রোগ্রাম, রবিবার এক্স্‌ট্র্যারনল্ সার্ভিসের জন্য রেকর্ডিং এবং পরদিন সোমবার দিল্লী কেন্দ্রে আর-একটি অনুষ্ঠান। তিন দিনের অনুষ্ঠানের দক্ষিণা এবং আসা যাওয়া, থাকা-খাওয়ার খরচ দেওয়া হত। টাকাটা সামান্যই। কিন্তু মর্যাদা অসামান্য। সাতবছর দিল্লী থাকার সুবাদে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব শিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পেলাম। মস্ত বড়ো ব্যক্তিগত লাভ। আর কত যে গান শুনেছি!

ন্যাশনল্ প্রোগ্রাম উপলক্ষেই গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের গান শোনার দুর্লভ সুযোগ হল। ১৯৫৪ সনে তিনি ন্যাশনল্ প্রোগ্রামের জন্য দিল্লী এলেন। শরীর ভেঙে গিয়েছিল। স্ট্রেচারে করে স্টুডিয়োতে নিতে হল। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল।

কণ্ঠ-সহযোগিতা করলেন সুযোগ্য পুত্র ও শিষ্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টুডিয়োর লালবাতি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেবের হাঁটুতে অঙ্গুলিস্পর্শে রমেশবাবু শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন। কয়েক মুহূর্তের আড়ষ্টতা কাটিয়ে গোপেশ্বরবাবুর কণ্ঠ কিছুটা সাবলীল হল। এর আগে বহুকাল তিনি রেডিয়োতে বা বাইরের কোনো ফাংশনে গাইছিলেন না। এই ন্যাশনল্ প্রোগ্রামের পরও বোধ হয় আর গান নি। ওঁর আর্টের আলোচনা করার অধিকার আমার নেই, এত কম শুনেছি। কিন্তু ওঁর মতো মানী, জ্ঞানী এবং নামী শিল্পীর গান যে পর পর তিনদিন শুনতে পেলাম সেটা পরম সৌভাগ্য। তবে বার বার আফসোস হয়েছে যে বাংলার বিষ্ণুপুর ঘরানার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির গান সমস্ত দেশের শ্রোতাদের শোনার সৌভাগ্য হল না তাঁর কণ্ঠে বার্ধক্য আসার আগে।

ন্যাশনল্ প্রোগ্রামে বাংলার দুই দিকপাল শিল্পীর যুগলবন্দী বাজনার কথা মনে পড়লে এখনো বেদনা বোধ করি। উস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁ এবং মহাপণ্ডিত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গুরু-শিষ্য, এক সঙ্গে বীণা বাজাবেন ন্যাশনল্ প্রোগ্রামে। দুদিকে ভিন্ন ভিন্ন দুটি মাইক্রোফোনের সামনে দুই শিল্পী বসলেন। তৃতীয় মাইকের সামনে পাখোয়াজ বাজিয়ে। সুন্দর করে সুর বেঁধে দুটি যন্ত্রকে নিখুঁত ভাবে মেলানো হল। দশ-পনেরো মিনিট পরই যন্ত্র দুটির সুর উঁচুনিচু হয়ে গেল। মেলাবার চেষ্টা করলেন ওঁরা। কিন্তু পারলেন না। কেন সুর মেলাতে পারলেন না? উপস্থিত শ্রোতার সামনে কি নার্ভাস হয়ে পড়লেন? দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রায় পুরো অনুষ্ঠানেই যন্ত্র দুটি আর মিলল না। এত বড়ো দুই পণ্ডিত, কিন্তু তাঁদের যন্ত্র শত্রুতা করল। তা ছাড়া আমন্ত্রিত শ্রোতার সামনে বাজাবারও অভিজ্ঞতা ছিল না। পাণ্ডিত্যের তুলনায় বাজনার নৈপুণ্য এবং ছন্দোময়তা কম ছিল উভয়েরই। এর আগে এঁদের কাউকেই

কোনো মঞ্চেও দেখি নি। সেদিন দিল্লীর এক নম্বর স্টুডিয়োতে আমি ছিলাম একমাত্র বাঙালি শ্রোতা। কান্না পেয়ে গিয়েছিল আমার। সেদিন আর-একটা কথাও আমার মনে হয়েছিল। এরকম একই যন্ত্রের যুগলবন্দী বাজনা—যেখানে শিল্পীরা সমমানের, সে বাজনা রেডিয়োতে প্রচার কি করে সম্ভব যখন শিল্পীদের দেখতে পাচ্ছেন না শ্রোতারা? কে কোন্ অংশ বাজাচ্ছেন রেডিয়োর শ্রোতারা কি করে বুঝতে পারবেন? সহযোগিতা অন্য জিনিস। সেখানে সহযোগী শিল্পীকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। মাইক থেকে একটু দূরেই বসানো হয় সেই শিল্পীকে।

অনেক দিন ধরে চলেছে এই ন্যাশনল্ প্রোগ্রাম, সাতাশ বছরের উপর। যে গুরুত্ব এবং মর্যাদা ছিল এ প্রোগ্রামের সেটা যেন ক্রমশ কমে আসছে। সে শিল্পীই বা কোথায়? আফসোস করে লাভ নেই। বহু শতাব্দীর সাধনায় একটি বিরাট শিল্পীর জন্ম হয়। উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, উস্তাদ আমীর খাঁ গত হয়েছেন। আলি আকবর খাঁ, রবিশংকর বিদেশী হয়ে গেছেন। ভরসা শুধু নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমজাদ আলি। এঁরা কজন সমস্ত দেশে? নূতন প্রতিভার উদয় কি দেখতে পাচ্ছি পুব গগনে? সংগীতের একটা বন্ধ্যা কাল যাচ্ছে এখন। এটা মাঝামাঝি শ্রেণীর কাল। জানি না শুধু নিষ্ঠার অভাবেই এরকমটা হয়েছে কিনা। ব্যভিচারও ঢুকে যাচ্ছে। এই সেদিন ন্যাশনল্ প্রোগ্রামের শিল্পী তালিকায় একটি নূতন সংযোজন দেখলাম। ন্যাশনল্ প্রোগ্রাম দিয়েই শুরু। হায়রে দুর্ভাগা দেশ, আর্টেরও অপমান শুরু হয়েছে। শিল্পী বাঙালিরই সন্তান বলে বেদনা বোধটা আরো বেশি। অন্য রাজ্যের সংগীত-প্রেমীর কাছে বাংলার ইজ্জতটাও গেল। বরাকরের পুলের পশ্চিম পারে এ গান কি কেউ শুনবে? তা হলে ন্যাশনল্ প্রোগ্রামে কেন স্থান হল? আমি বলি এই ন্যাশনল্ প্রোগ্রামের সংখ্যাটা প্রতি

সপ্তাহে একবারের পরিবর্তে প্রতি মাসে একবার হলে কেমন হয়? অধিক সংখ্যক উপযুক্ত শিল্পী দেশে তৈরি হলে আবার না-হয় সপ্তাহে একবার করা যাবে। বর্তমান মান অনুযায়ী এই প্রোগ্রামকে আর গালভরা নাম জাতীয় প্রোগ্রাম, ন্যাশনল্ প্রোগ্রাম বলে ডাকার কি অর্থ?

বহুকাল পর স্বাধীনতা লাভ করে আমাদের দেশের মানুষ খুব ঘন ঘন ন্যাশনল্ কথাটা উচ্চারণ করতে শুরু করল। ন্যাশনল্ ফ্ল্যাগ, ন্যাশনল্ অ্যান্‌থেম তো থাকবেই যে-কোনো স্বাধীন দেশে। কিন্তু আরো অনেক কিছু ন্যাশনল্-এর জন্ম হল। ন্যাশনল্ লাইব্রেরি, ন্যাশনল্ বার্ড, ন্যাশনল্ অ্যানিম্যাল, ন্যাশনল্ গেমস্, ন্যাশনল্ হলিডে, ন্যাশনল্ মিউজিক এবং তার পর ন্যাশনল্ অর্কেস্ট্রা হল সোনার পাথর-বাটি। অতি উৎসাহে যিনি এই নামকরণ করেছিলেন তিনি গণ্ডগোলটা বুঝতে পারেন নি। এক্‌স্‌ট্যারনল্ সার্ভিস পড়ল খুবই অসুবিধায়। আমাদের দেশের অর্কেস্ট্রাকে বাইরের দুনিয়াতে অর্কেস্ট্রা বলে ঘোষণা করলে বিশেষত পাশ্চাত্য সংগীতের শ্রোতাগণ মুশকিলে পড়বেন। অর্কেস্ট্রা বলতে পাশ্চাত্য সংগীতে অন্যরকম কিছু বোঝায়। তাই রবিশংকরের পরিচালনায় যে ন্যাশনল্ অর্কেস্ট্রার জন্ম হল ১৯৪৯ সনে, তার নামটা পরে বদলে দিতে হল। এক্‌স্‌ট্যারনল্ সার্ভিস ঘোষণা করল instrumental ensemble বলে, ঐকতান-এর ইংরেজি অনুবাদ।

মহাজন বলেছেন নামে কি বা এসে যায়! যায়, এসে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। সমবেত যন্ত্রসংগীতকে অর্কেস্ট্রা বললে পশ্চিমের দুনিয়ায় আমাদের ইজ্জতই যায়। আমাদের সংগীতের ধারায় পশ্চিমের হার্মনিকে টানবার চেষ্টা যে হয় নি তা নয়। কিন্তু ময়ূর-পুচ্ছ ব্যবহারে কাকের যে রকম হয় চেহারাটা তার চেয়ে বেশি কিছু দাঁড়ায় নি এখনো। তবে অন্য দেশের সংগীতের কিছু স্বরগুচ্ছ

আমাদের সংগীতের শরীরে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে। যা এসেছে এখন পর্যন্ত খুবই নিকৃষ্ট মানের। মিশ খায় নি আমাদের সংগীতের ধারায়। নূতন রসেরও সঞ্চার হয় নি। চেষ্টা চলতে বাধা কি। কিন্তু হার্‌মনি আর মেলডির চিন্তাধারা, আদর্শই যে সম্পূর্ণ আলাদা। একূল-ওকূলের মাঝে মস্ত বড়ো সমুদ্র। ন্যাশনল্‌ অর্কেস্ট্রা নাম সেজন্য বদলে দিয়ে রাখা হল 'বাদ্যবৃন্দ'। যথাযথ নাম। বাদ্যবৃন্দের কর্ণাটক সংগীতধারার জন্য নিয়োগ করা হল সুখ্যাত বেহালাবাদক টি. কে. জয়রাম আয়ারকে পরিচালক পদে। আমাদেরই দুটি সংগীতের ধারা সমান্তরালে চলছে এবং দূরে, বহুদূরে গিয়েও যে মিলবে তেমন কিছু ইঙ্গিত নেই। তা হলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অর্থাৎ মেলডি-হার্‌মনির সুষ্ঠু মিলন শুধু কি আকাঙ্ক্ষা হয়েই থাকবে?

রবিশংকরের সেতার বাজনা আমরা বহির্ভারতের শ্রোতাদের জন্য প্রায় সব অনুষ্ঠানেই প্রচার করতাম। সে সময় টেপ ছিল না। কিছুদিন পর পরই রবিশংকরের বাজনা রেকর্ড করতে হত ডিস্‌কে। এই রেকর্ডিং উপলক্ষে পরিচয় হল অসামান্য শিল্পী রবিশংকরের সঙ্গে। রবিশংকর বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া— যেমন ন্যাশনল্‌ প্রোগ্রাম, সংগীত সম্মেলন— দিল্লী স্টেশন থেকে বাজাতেন না। কিন্তু এক্স্‌-ট্যারনল্‌ সার্ভিসের প্রোগ্রামে কখনো আপত্তি করেন নি, বরং আগ্রহ দেখেছি। শিল্পী হিসেবেই যে রবিশংকর বিরাট তা নয়, সংগীতের একটা বিরাট এম্পায়ার গড়ে তোলার সম্পদ নিয়েই যেন সংগীতের জগতে প্রবেশ। পিতৃকুল অতি উচ্চ। অগ্রজ উদয়শংকর; গুরু উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ; স্ত্রী, আলাউদ্দিন-দুহিতা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা এবং শ্যালক হলেন অপ্রতিম আলি আকবর খাঁ। এমন একটি পরি-মণ্ডলে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো রবিশংকর। নিজের বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে আছেন গোপালকৃষ্ণ (বিচিত্রবীণা), সত্যদেব পাওয়ার (বেহালা), উমাশংকর মিশ্র (সেতার) এবং প্রায় নিজের হাতে গড়া

তবলিয়া চতুরলাল। একটা প্রকাণ্ড সংগীতের জগৎ। শিষ্যদের শিক্ষাদান করে কখনো প্রণামী নিতেন না। শুধু তাই নয়, শিষ্যের কল্যাণের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। একবার গোপালকৃষ্ণের রেডিয়ো প্রোগ্রামের উপর বিরূপ মন্তব্য করলেন স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সমালোচক বদ্রীপ্রসাদ শুংলু। বললেন কোশী-কানাড়া রাগের স্বরবিন্যাসে নীচের দিকে ভীমপলাশী রাগের ছায়া এসে পড়েছে। অমনি রবিশংকরের তীব্র প্রতিবাদ ছেপে বের হল সেই পত্রিকায়। লিখলেন যে গোপালকৃষ্ণ তাঁর প্রথম সারির শিষ্য। বাজনাটা তিনি নিজেও শুনেছেন এবং তাতে কোনো ভুল ছিল না। উল্টে রবিশংকর প্রশ্ন করলেন যে সমালোচক জানেন কিনা যে এই রাগের একাধিক রূপ আছে।

নিজের বাড়িতেই শিষ্যদের তালিম দিতেন। অফিসের কাছেই ছিল বাড়ি। মাঝে মাঝে গিয়েছিও সেই বাড়িতে। চতুরলালকেও কিভাবে সংগত করতে হবে সে তালিম দিতে দেখেছি স্বচক্ষে। লয়, তাল, ছন্দের উপর কি অসাধারণ দখল তা দেখেছি। একবার মীরাটের বিখ্যাত তবলিয়া হবিবুদ্দিন খাঁকে আনালাম রবিশংকরের সঙ্গে বাজাবার জন্য। গৎ শুরু হল। কিন্তু একবারও তবলিয়া 'সম'-এ পড়ছেন না। দু-তিনজন পাশে বসে তাল রাখছেন হাতে। কিন্তু তবু তবলিয়ার গোলমাল হচ্ছে বার বার। বাজনা বন্ধ করলেন রবিশংকর। খাঁ সাহেবকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তার পর চা-পানান্তে আধঘণ্টা পর আবার বাজনা আরম্ভ হল। এবার সব ঠিক। চমৎকার সংগত। পরে হবিবুদ্দিন সাহেব আমায় বলেছিলেন যে প্রথমবার গৎ-এর চলনটা ধরতে না পেরে যে 'উঠান' শুরু করলেন সেটা গোলমাল হয়ে যাওয়ায় আর পরে একবারও 'সম'-এ ভিড়তে পারলেন না তিনি। চাকরিতে থাকাকালীন এটাই রবিশংকরের শেষ বাজনা। ঘটনাটা ১৯৫৭ সনের জুলাই মাসের।

সে মাসেই তিনি চাকরি ছাড়লেন।

রবিশংকরের মধ্যে দেখেছি প্রতিভার সঙ্গে তীক্ষ্ণ পার্থিব বুদ্ধির মিলন। এমনটা সাধারণত দেখা যায় না। তাঁর সংগঠন-শক্তিও ছিল ভালো। পরিচয়ের গণ্ডি ছিল বিশাল। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রতিটি ভি. আই. পি.-র সঙ্গে ব্যক্তিগত জানাশোনা। আর, বহু বিদেশী রাজদূতও যে রবিশংকরের গুণগ্রাহী। বাইরে আদৃত এই মানুষটি কি ঘরেও কম ভাগ্যবান ? এমন বিদুষী ভার্যা যাঁর তাঁর তো জীবনের সব চেয়ে বড়ো পাওয়াই হয়ে গেল। অপূর্ব সুরবাহার বাজনা শুনেছি শ্রীমতী অন্নপূর্ণার। বাজিয়েছেন রবিশংকরের সঙ্গে যুগলবন্দী হাজার শ্রোতার সামনে দিল্লীতে দু-দুবার। শুনে মনে হয়েছে গুরু আলাউদ্দিন খাঁ পুত্রকে, জামাতাকে যে তালিম দিয়েছেন তার কণামাত্র কম দেন নি আদরের কন্যাকে। নৈপুণ্যে স্বামীর সমকক্ষই মনে হয়েছে। ধ্বনির সরসতা কি কোমল হাতের ছোঁয়ায় একটু বেশি ? এই অনুষ্ঠানেব আয়োজন করেছিল বিনয়চন্দ্রের পরিচালনায় গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়। তবে সবটা কৃতিত্বই প্রাপ্য রেডিয়োর বিমান ঘোষের। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকলে স্বামী-স্ত্রীর যুগলমূর্তিকে মঞ্চে দেখবার সুযোগ পেতাম না। এই যুগলমূর্তিকে ভারতের অন্যত্র আর কখনো দেখা যায় নি। সংগীতরসিক কলকাতার শ্রোতারা অন্নপূর্ণা-রবিশংকরকে একসঙ্গে দেখতে পেলেন না মঞ্চের উপর, শুনতে পেলেন না তাঁদের বাজনা, সেটা আফসোসের কথা। আর তো কখনো দেখার, শোনার সুযোগও হবে না। দুজনের মাঝে যে ‘অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র’।

কত বড়ো যে শিল্পী রবিশংকর তার যেন পরিমাপ করতে পারি না। বিশাল ক্যানভাসের উপর রাগের রূপায়ণ। আলাপের ব্যাপ্তি অতি মন্দ্র থেকে তার সপ্তক অবধি, যা ধ্বনি-সুষমায় সমৃদ্ধ, ব্যঞ্জনায় গভীর এবং রসে টইটম্বুর। এমন প্রথাসিদ্ধ, সুসম্বদ্ধ কাব্যময়

আলাপ এবং ধ্যানগম্ভীর বিশুদ্ধ রাগের রূপ আর কোথায় শুনব? প্রতিটি বন্দিশের মধ্যে ঐতিহ্যের কৌলীন্য। রবিশংকর 'লয়'-এর রাজা। বাজনায় সুচারু ছন্দের খেলা। 'তেহাই'গুলিতে সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসেবের ক্রিয়াকাণ্ড চলছে অবলীলায়। অতি দ্রুত গতিতেও যখন বাজাচ্ছেন শিল্পী তখনো স্বরগুলি স্ফটিক-স্বচ্ছ। বাজনার সময় মনে হয় শিল্পী যেন রাগের ধ্যানমূর্তিতে বিলীন হয়ে গেছেন। এমন মহান শিল্পী বাঙালির সন্তান বলে আমার কত গর্ব! আর আমার এত কাছের মানুষটি!

কিন্তু বাস্তব জীবনে শিল্পীও যে মাটিরই মানুষ। শিল্পীর জীবনে হঠাৎ অশুভ ক্ষণ এসে যায়, যখন অমঙ্গলের দূত চোরের মতো এসে মনটাকে দখল করে বসে। শুভবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। এমন একটা কিছু ঘটে যায় যার জন্য সমস্ত জীবনটাই হাহাকারে পরিণত হয়। তেমনি দেখলাম রবিশংকরের জীবনেও। বহু দূরে চলে গেলেন তিনি সন্তানের জননী স্নেহময়ী স্ত্রীর কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, প্রিয়তম বন্ধুর সঙ্গেও হয়ে গেল বিচ্ছেদ। বন্ধু বিমান ঘোষের সঙ্গে কি গভীর প্রীতির সম্পর্ক! আর বিমানবাবুর মতো বন্ধুবৎসল মানুষটিও খুব বেশি নেই এই সংসারে। কিন্তু দিল্লীতে রবিশংকরের দু-মাসের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিচ্ছেদ-বিভেদের উপদেবতারা সক্রিয় হয়ে উঠল। সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে রুশ দেশে গিয়েছিলেন রবিশংকর। দু মাস পর দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এমন সহৃদয় রবিশংকরের মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। গৃহে ঢুকল চরম অশান্তি। এমন-কি, শুনলাম যে পরম বন্ধু বিমান-বাবুর বিরুদ্ধেও নিষ্ঠুর এক লিখিত অভিযোগ পেশ করলেন কর্তৃপক্ষের কাছে রবিশংকর। আর সঙ্গে সঙ্গে বিমানবাবুরও বদলির আদেশ হয়ে গেল জম্মু কেন্দ্রে। বিমানবাবু দিল্লী কেন্দ্রে কাজ করছিলেন সে সময়। এ কথা হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল! আমরা বিস্ময়ে হতবাক্,

মর্মাহত। স্তম্ভিত হয়ে গেল বন্ধুমহল। এটা কি করে সম্ভব! কার কাছে কি শুনলেন রবিশংকর? দুজনই বাঙালির সন্তান, দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই নির্মম ঘটনায় আমরা বাঙালিরা খুবই দুঃখ পেলাম। অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছ থেকে এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিমানবাবু বিবশ হয়ে গেলেন। মনে যে কি 'শক্' পেলেন সেটা আন্দাজ করতে পারি। চোখমুখেরও কি অবস্থা দেখেছি। ভেবেছি কেন এত নিষ্ঠুরতা পৃথিবীতে! দীর্ঘকাল বিমানবাবুকে দেখেছি, কাজ করেছি একসঙ্গে। ওঁর সম্পর্কে কোনো কথা বিশ্বাস করব কেন? কর্তৃপক্ষ কিন্তু বিমান-বাবুর বদলির আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হল, কারণ বদলির এই আদেশটা ছিল একতরফা, কনস্টিটিউশনের বিধি-বিরোধী। বিমানবাবুকে তো কিছু বলবার, ব্যাখ্যা করবার সুযোগই দেওয়া হয় নি এই বদলির আদেশের আগে। অবশ্য এই বদলির আদেশ তখনকার মতো প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও কিছুকালের মধ্যে বিমানবাবুকে দিল্লী ছেড়ে যেতেই হল। জম্মুর পরিবর্তে লক্ষ্ণৌ। পরে বিস্মিত হলেও খুব খুশি হয়েছি দেখে দুই বন্ধুর পুনর্মিলন। ভেবে আরো আনন্দ পেয়েছি এইজন্য যে বিমানবাবু সম্পর্কে আমাদের ধারণাটাই ছিল সত্য। তা না হলে হারানো বন্ধুত্বটা ফিরে এল কি করে?

এক্স্ট্যারনল্ সার্ভিসে যখন কাজ করতাম তখন প্রায়ই স্বর্গত উস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ সাহেব অফিসে পায়ের ধুলো দিতেন। ভারতীয় কলাকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বেশ কিছুদিন দিল্লীতেই থাকছিলেন। এমন মজলিসী মানুষ কমই দেখেছি। দারুণ জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। বাঙালি শ্রোতার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। কলকাতার কথা উঠলেই বলতেন যে সারাটা দেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু কলকাতার সাধারণ শ্রোতার মধ্যেও সংগীতের প্রতি যে প্রীতি লক্ষ করেছেন তেমনটা অন্যত্র দেখতে পান নি।

শ্রোতাদের রুচিও ভালো। আরো বলতেন যে বাঙালিরা শিল্পীকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে জানে। বলতেন বাঙালি শিল্পীর জাত। তিনি বলেছেন আমায় যে কলকাতায়ই নাকি জীবনে সব চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করেছেন। কথাগুলি আন্তরিকতার সঙ্গেই বলতেন। ঠাট্টা করে বলতেন যে আমি বাঙালি বলে খুশি করার চেষ্টা করছেন না। আর আমিও যে খাঁ সাহেবকে একটা বেশি প্রোগ্রামে ডাকব সে প্রশ্নই ওঠে না। কথাবার্তায় চালচলনে আভিজাত্য, অসামান্য সম্ভ্রমজ্ঞান। তিনি বিকেলের দিকেই আসতেন। পাঁচটায় অফিস ছুটি হবার পর সবাই চলে গেলে খালি গলায় প্রায়ই গান শোনাতেন। ধ্রুপদের বিভিন্ন রাগের সুন্দর সুন্দর গান। অপূর্ব কণ্ঠ, মনে হয়েছে সমস্ত জীবনভর কণ্ঠেরই অনুশীলন করেছেন। একটু চা-পানের পর ঠুংরি গাইতেন। কী যে গভীর অনুভূতি এবং সুচারু প্রকাশ! গলায় খুব চিকন কাজ। হঠাৎ গান থামিয়ে একটু হেসে সেদিনের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ঠুংরির কাজ নিখুঁত অনুকরণ করে জিজ্ঞাসা করতেন ঠিক ঠিক হয়েছে কিনা।

খাঁ সাহেবের ঠিক বয়সটা জানতাম না। তবে দেখে ষাটের মাঝামাঝি মনে হয়েছে। কিন্তু অনায়াস দক্ষতায় কত সূক্ষ্ম 'তরকিব্'-এর কাজ গলা দিয়ে বের করতেন। আমরা জানি যে এক অতি নিপুণ সেতার-শিল্পী ঠুংরি বাজাতে বাজাতে হঠাৎ একটা ঠুংরির বোল গেয়ে শুনিয়ে দেন। মজা আছে বেশ। কিন্তু উস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ সাহেবের কণ্ঠ অনেক সরস ও পরিশীলিত ছিল। ঠুংরির এই-সব কাজ দেখিয়ে বলতেন যে এগুলি খুব খানদানী চিজ নয়। রিয়াজের একটা বিশেষ পদ্ধতি জানা থাকলে এ-সব কাজ গলা দিয়ে বের করা খুব কঠিন নয়। তিনি নিজে ধ্রুপদী সংগীত ভালোবাসেন বলেই বোধ হয় তরকিব্-এর কাজ পছন্দ করতেন না। বড়ে গুলাম সাবির খাঁর সারেঙ্গী বাজনার খুব তারিফ করতেন। এই অসামান্য সারেঙ্গী-

শিল্পীটিও মাঝে মাঝে আমাদের এই আলোচনায় এসে যোগ দিতেন। উস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ সাহেব বলতেন যে সারেঙ্গীবাদনের সঙ্গে অনুশীলন করলে খুব তাড়াতাড়ি গলা তৈরি হয় এবং গলা খুব সুরেলা হয়।

নিজের বড়ো ছেলের সম্পর্কে খাঁ সাহেবের দুঃখটা ছিল খুব বেশি। দারুণ প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু একনিষ্ঠ সাধনা ছিল না। আমি দেখেছি সেই ছেলেকে। কন্দর্পকান্তি। বাজনাও শুনেছি, হাতটি ছিল ভালো। সংগীতে ছেলের মনোযোগ ছিল না বলে ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ আলিকে ভালো তালিম দিয়েছিলেন। রেডিয়োর 'এ' শ্রেণীর শিল্পী, আমাদের এক্স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিসে স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন। একবার ন্যাশনল্‌ প্রোগ্রাম অব্‌ মিউজিক-এ বাজালেন আহম্মদ আলি। কিন্তু আহম্মদ আলিও আস্তে আস্তে সংগীতের জগৎ থেকে সরে গেলেন। আমজাদ তখন ৬।৭ বছরের। খাঁ সাহেব কিন্তু ঐ শিশু-হাতেই সরোদ তুলে দিলেন। আমজাদ দাদাদের মতো পিতৃদেবকে নিরাশ করলেন না। আজ আমজাদ তাঁর অতি যোগ্য ছেলে। দেশে-বিদেশে কত খ্যাতি। কিন্তু আমার মতো পিতৃদেবের এত ভালো গান কি শুনতে পেয়েছেন?

এক ব্যক্তি নিজেকে শিল্পী বলে, ভুল বলছি, 'স্টুডিয়ো সিঙ্গার' বলে দাবি করতেন। 'বিশারদ' উপাধিও পেলেন ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয় থেকে। তার পর রাজানুগ্রহ লাভ করে রেডিয়োর কেন্দ্রীয় সংগীতবিভাগে প্রডিউসারের পদে ডেপুটেশনে এলেন। কঠিন একটা দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর কাঁধে। গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে শুনছেন এবং প্রতিটি গানের পাশে বি-মাইনাস, সি-প্লাস, অনুপযুক্ত, এই-সব মন্তব্য লিখছেন। কোন্‌ শিল্পীদের গান? উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ— এই-সব দেশ-বরেণ্য শিল্পীদের। 'বি'-র উপর মন্তব্য কেউ পেলেন না। আর

উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর ঠুংরি গানের উপর মন্তব্য সি-প্লাসই বেশি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে এই-সব মন্তব্য-সহ একটি তালিকা প্রস্তুত হল এবং সেই তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হল কেন্দ্রে কেন্দ্রে। যিনি রেকর্ড বাজিয়ে শুনছিলেন তাঁর মূল জায়গায় কোনো গলদ লক্ষ করি নি। ঈস্‌থেটিক্‌স্‌-এর অতটা উঁচু হয়তো নাগালের বাইরে ছিল। তবে এইরকম মন্তব্যের কারণটা কী? আমার ধারণায়, একটা চাপানো মতবাদ সংগীত সম্বন্ধে। কৃত্রিম একটা নীতিবাদে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেতার-মন্ত্রক শ্রোতার চরিত্র সংশোধন এবং নৈতিক মানের উন্নতি সাধনের ব্রত গ্রহণ করল। প্রেম, বিরহ, মিলনের গানে শ্রোতার চরিত্র নষ্ট হবে, তাই বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের ঠুংরির উপরও 'সি' মন্তব্য দেওয়া হল। সাধারণত সংগীতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করার আগে কোনো গ্রামো-ফোন কোম্পানি কোনো উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পীর খেয়াল বা ঠুংরি গান রেকর্ড করে না। গ্রামোফোন রেকর্ডে যাঁদের খেয়াল, ঠুংরি শুনি তাঁরা তো সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। খেয়ালের লিরিক ততটা শ্রোতার মন আকর্ষণ করে না। আর ঠুংরির রসে আপ্লুত রসিক শ্রোতার অভিভাবক হওয়ার প্রয়োজনটাই কি বেতার-কর্তৃপক্ষের? কিন্তু ডক্টর কেশকরের নেতৃত্বে বেতারমন্ত্রক খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল শ্রোতার চরিত্রবিষয়ে।

ছবির গান শুনলেও মনে কাম ভাব জাগবে। স্বাধীন ভারতের নরনারীর চরিত্র কলুষিত হবে। তাই এ-সব অপবিত্র গান বন্ধ হোক। ঠিক বন্ধ হল না, তবে পরিমাণটা অনেক কমে গেল। এত কমিয়ে দেওয়া হল যে দেশের শতকরা নব্বুই ভাগ শ্রোতা রেডিয়ো সিলোন-এর ভক্ত হয়ে গেলেন। পানের দোকানে, খাবারের দোকানে, এবং প্রায় প্রতিটি বাড়ির রেডিয়ো সেটে সিলোন রেডিয়োর গান শোনা যেত সে সময়টায়। এ বিষয়ে একটা সমীক্ষা

চালানো হল। দেখা গেল প্রতি দশটি বাড়ির নটিতে বেশির ভাগ সময় সিলোন রেডিয়ো শোনা হয়। আর ১০ নং বাড়ির রেডিয়ো-যন্ত্রটি খারাপ। এটা রেডিয়োর একটা কালের ইতিহাস। সিনেমার গানকে নিম্নমানের গান আখ্যা দেওয়ায় অনেক প্রডিউসার রেডিয়োর সঙ্গে চুক্তি নাকচ করে দিলেন। এদিকে ফিল্মের গান বাজাবার জন্য রেডিয়োর উপর প্রচণ্ড জনমতের চাপ এসে পড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে আবার সিনেমার গানের পরিমাণ বাড়িয়ে আগের মতো করা হল। কিন্তু নূতন নূতন ছবির গান বাজাবার সুযোগ কোথায়? হিন্দিগান বোম্বাই স্টেশনে বাছাই হবে, বাংলা ছবির গান কলকাতায়, তামিল গান মাদ্রাজে। ছবি বের হলে রেকর্ড কেনা হবে, আর সে রেকর্ড কেনার আগে টাকার অনুমোদন নিতে হবে। বাজার থেকে কেনা যাবে না। গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে লিস্ট পাঠাতে হবে। ছ মাসের পর সে-সব রেকর্ড এল। প্রডিউসার রেকর্ড বাজিয়ে শুনবেন এবং মন্তব্যসহ লিস্ট তৈরি করবেন। কিছু কিছু রেকর্ড অনুপযুক্ত বিবেচনায় বাদ হয়ে যাবে। সাইক্লো-স্টাইলে এই তালিকা যখন কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাবে তখন সে রেকর্ড পানের দোকান, বিয়েবাড়ি, পুজা প্যাণ্ডেলের লাউডস্পীকারে বেজে অনেক পুরনো হয়ে গেল। এই-সব রেকর্ডের জন্য শ্রোতার আর আগ্রহ থাকবে কেন? আর, এই ছবির গান শুনে অনুমোদন করার প্রয়োজন কি? কি অধিকারই বা ছিল রেডিয়োর? ফিল্ম্ সেনসর বোর্ড আছে না কেন্দ্রে এবং অঞ্চলে? এই বোর্ড অনেক উচ্চতর অধিকার সম্পন্ন। গান-সহ সম্পূর্ণ ছবিটিকে বোর্ডের সদস্যগণ অনুমোদন করেন। তা হলে ছবির গানের বাছাই-এর প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু তা হচ্ছিল অনভিজ্ঞ সবজান্তা মন্ত্রীরই নির্দেশক্রমে। কালটা ১৯৫২-৬২।

ফিল্ম্ মিউজিক কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে

বাধ্য হলেও বেতারমন্ত্রক কিন্তু শ্রোতাদের নৈতিক আদর্শ উন্নয়নের দায়িত্বটা এড়াতে চাইলেন না। সচ্চরিত্র গীতিকার ধরে ধরে সৎসংগীত লেখাবার জন্য চেষ্টা হতে লাগল। বড়ো বড়ো স্টেশনে লাইট মিউজিক ইউনিট রাতারাতি স্থাপন করা হল। নির্দেশ দেওয়া হল গানের সুরে চপল-চঞ্চল কিছু না থাকে। নিজস্ব রেকর্ড তৈরি করার একটা প্ল্যাণ্টও বসানো হল দিল্লীতে। বিভিন্ন স্টেশনের লাইট মিউজিক ইউনিট-এর গান এই প্ল্যাণ্ট থেকে বের হতে থাকল। কিছু কিছু গান নিশ্চয়ই ভালো হল। কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানির মানে পৌঁছাল কোথায়? আর ফিল্‌মের গানের তুলনায়, বিশেষত হিন্দি ছবির গানের তুলনায় রেডিয়োর সুগম-সংগীত অনেক নিচু মানের, সেটা প্রতিপন্ন হয়ে গেল। রেডিয়োতে দক্ষিণা সামান্য, যন্ত্রীসংখ্যা সীমিত। আর লতা, আশা, রফি, মান্নার মতো শিল্পী কোথায় এবং এস. ডি বর্মণ, নৌশাদ, ও. পি. নায়ার, সলিল চৌধুরীর মতো সুরকারও ছিল না রেডিয়োর। কাজেই এই পরিকল্পনা দ্বারাও শ্রোতার মন জয় করা গেল না। প্রসেসিং প্ল্যাণ্টটি বিক্রি করে দেওয়া হল। বি. বি. সি-র নিজস্ব রেকর্ড তৈরি করার প্ল্যাণ্ট আছে। কথিকা, ফিচার, এ-সবের রেকর্ডিংই করা হয়। বলা হয় বি. বি. সি ট্রানস্‌ক্রিপশন্‌ সার্ভিস রেকর্ডিং। ভালো ভালো কথিকা, ফিচার-এর রেকর্ডিং আমরাও কিনেছি বি. বি. সি. থেকে—প্রোগ্রাম হিসাবে অনবদ্য। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর নিজস্ব রেকর্ডের মধ্যে কথিকা বা ফিচার একেবারেই ছিল না। সে চেষ্টাও হয় নি কখনো। বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ হয়ে গেল প্ল্যাণ্টের পেছনে। কিছুকালের মধ্যে উঠেও গেল। এদিকে শ্রোতা-সাধারণ তখনো সিলোন রেডিয়োর অনুষ্ঠানই বেশি শুনত। লাইট মিউজিক ইউনিট-এর তৈরি গান শ্রোতার মনকে সিলোন রেডিয়ো থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হল না। তাই আর-একটি নূতন অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হল জনপ্রিয়তা

অর্জনের প্রয়াসে। নাম দেওয়া হল অল ইণ্ডিয়া ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম। পরে নামটি পরিবর্তিত হল 'বিবিধ ভারতী'তে। ঢালাও ব্যবহার করার ব্যবস্থা হল ছবির গান এবং গীত গজলের গ্রামোফোন রেকর্ডের। এই প্রয়াসটি খুবই সার্থক হল। শ্রোতারা নিজের দেশের রেডিয়োতে পছন্দমত অনুষ্ঠান শুনতে পেলে আর বিদেশের দিকে তাকাবে কেন? পরবর্তী কালে বিবিধ ভারতীর অন্তর্ভুক্ত হল বিজ্ঞাপন কার্যক্রম। আর বিজ্ঞাপন থেকে কোটি কোটি টাকা আয় হতে লাগল।

আমার বাড়ির পাশে বিখ্যাত সাধক পীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা। তার কাছেই সমাধি আছে শাজাহান-দুহিতা জাহানারার। এই সমাধির উপর কিন্তু কোনো আস্তরণ নেই। কবরের উপর লেখা:

বগায়ের সবজ্ না পোশদ কসে মজারে মরা
কে করব-পোষে গরিবাঁ হামিন্ গিয়া বস্ অস্ত।

'তৃণগুচ্ছ ভিন্ন আমার সমাধির উপর কোনো আস্তরণ করো না। এই তৃণগুচ্ছই অবনমিতার সমাধির আস্তরণ হোক'— ইতি সুফী চিস্তি শিষ্যা, শাজাহান-দুহিতা জাহানারা, ক্ষণভঙ্গুর জাহানারা, বিনীতা জাহানারা— জিলকদা, ১০৯২ হিজরী (জুলাই ১৬৮০ খৃস্টাব্দ)

প্রায়ই যেতাম ঐদিকে বেড়াতে। পীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় অনেক দূর থেকে ভক্তরা আসতেন প্রার্থনা জানাতে। মুঘল শাহজাদীর অতি সাধারণ মানুষের মতো দীন সমাধিও তো কম আকর্ষণের নয়। পার্থিব ঐশ্বর্যের কোনো চিহ্নই রাখতে বারণ করলেন রাজনন্দিনী তাঁর সমাধির উপর। বার বার গিয়েছি পীরের দরগায়, জাহানারার সমাধিতে। এক প্রত্যূষে দরগার পাশ দিয়ে যেতে যেতে থেমে গেলাম। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠের আর্তি শোনা যাচ্ছে ভিতরে। জুতো খুলে ভিতরে ঢুকলাম। মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক মুদিত-নয়নে একটি মাদুরের উপর বসে খোলা গলায় গাইছেন। একেবারে ধ্যানমগ্ন মূর্তি। উর্দু ভালো বুঝতে পারি না,

কিন্তু নিজামুদ্দিন নামটা বার বার উচ্চারিত হচ্ছে এই আকুল প্রার্থনায়। উপলব্ধি করতে পারছি পীর নিজামুদ্দিনের উদ্দেশে নিবেদিত হচ্ছে অন্তরের ব্যাকুল আবেদন। প্রভাতী একটি রাগের উপর ধ্বনিত হচ্ছে কথাগুলি। অনেকক্ষণ পর চোখ মেলে তাকালেন। দুই চোখের কোণে জল। মানুষটি একটু কৃশ, অবিন্যস্ত সাদা-কালো চুল। পোশাকেও অযত্নের চিহ্ন। কিন্তু চেহারাটি সম্ভ্রান্ত। আমি বললাম যে খুব সুন্দর আওয়াজ এবং দীর্ঘদিনের রিয়াজ না থাকলে একটি রাগের কাঠামোর উপর এমন সুরেলা ধ্বনি তো বের হয় না। ম্লান হাসলেন তিনি।

কিছুটা সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'ভাই, আমি তো গাইতে পারি বলে বোদ্ধা শ্রোতারা বলতেন। তালিমও পেয়েছি ভালো। বড়ো চাকরিও করতাম। কিন্তু আজ খোদা নারাজ আমার উপর, সব কেড়ে নিয়েছেন। আমি আজ নিঃস্ব।'

চাপা কান্নায় গলার আওয়াজটা ভাঙা। ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। এমন যাঁর গাইবার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর অন্তত সংগীতের পেশা অবলম্বনে আর্থিক সুরাহা খানিকটা হয়ে যেতে পারে। ভাবলাম গভীর কোনো দুঃখ মনকে, দেহকে করেছে নিস্তেজ। আমি বললাম যে আমার 'গরিবখানা' পাশেই, এবং চা-পানের জন্য পায়ের ধুলো দিলে খুবই খুশি হব। সানন্দে গ্রহণ করলেন আহ্বান। অভিজাত আদব-কায়দা, কথাবার্তায় উচ্চশিক্ষার ছাপ। তবে মানুষটি এমন ভগ্নহৃদয় কেন! নিজে না বললে জিজ্ঞাসাও করা যায় না কিছু।

চা-পানের পর বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্তে নিজের নামটি বললেন। জানালেন যে বাড়ি হাইদ্রাবাদে। তিন-চার দিন আগে দিল্লী এসে পীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় ধরণা দিয়েছেন। গভীর ভক্তি পীর সাহেবের প্রতি। কৃপালাভে বঞ্চিত হবেন না বলে বিশ্বাস

আছে। আবার আসতে অনুরোধ করে গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলে আদাব জানিয়ে কোথায় কাজ করি বললাম। শোনামাত্র আমায় জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। কি হল বুঝতে পারছি না। কেন এই কান্না? ফিরিয়ে নিয়ে এলাম আবার বসবার ঘরে।

একটু বসে, শান্ত হয়ে শুরু করলেন নিজের কাহিনী। বললেন আশ্চর্য যোগাযোগ, তিনিও যে রেডিয়োরই লোক, তবে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর নন। নিজামের রাজ্যে হাইদ্রাবাদ কেন্দ্রে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টরের পদে যখন কাজ করতেন তখন 'পুলিস অ্যাক্শন'-এর পর মহামান্য নিজামের রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। নিজাম রাজ্যে দুটি রেডিয়ো স্টেশন তখন— একটি রাজধানী হাইদ্রাবাদে, অন্যটি অওরঙ্গাবাদে। ভারত সরকার হাইদ্রাবাদ কেন্দ্র অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সঙ্গে যুক্ত করল এবং অপরটি বন্ধ করে দিল। নিজাম রেডিয়োর সব কর্মীদের অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে নিয়ে এসে প্রায় ঠিক সেই পদেই বহাল করা হল। মন্দ ভাগ্য এই রোশন আলির। তিনি বাদ পড়ে গেলেন, অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে তাঁর স্থান হল না। একটি মাত্র ব্যতিক্রম। কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল ব্যর্থ হল। মামলা লড়েও ব্যর্থ হলেন। ইতিমধ্যে চার বছর বেকার। পরিবার বিপন্ন। সামনে শুধু অন্ধকার। তাই পীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় তিন দিনের প্রতিশয়ের পর রেডিয়োর কর্তৃপক্ষের কাছে আরজি পেশ করবেন মানবিকতার দাবিতে পুনর্নিয়োগের জন্য।

নির্বাক হয়ে গেলাম এই ভদ্রলোকটির ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী শুনে। জিজ্ঞাসা করলাম রেডিয়োতে গাইছেন কিনা। জানালেন যে বি-হাই শ্রেণীর উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পী, ফি ষাট টাকা এবং মাত্র কয়েকদিন আগে হাইদ্রাবাদে কেন্দ্রে গান করেছেন। সেই ফি-এর সঙ্গে সামান্য টাকা ধার করে দিল্লী চলে এসেছেন। এখন ভরসা

শুধু পীর সাহেবের কৃপা। নিজের গানের আলোচনায় বললেন যে গত চার বছর জীবনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তাতে চর্চা একেবারে বন্ধই প্রায়। আমি আশ্বাস দিলাম যে তিন-চার দিনের মধ্যে এক্‌স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিসে ওঁর একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব। ডেপুটি ডিরেক্টর মিস্টার তাহের অফিসে আমায় বললেন যে রোশন আলি ভালো শিল্পী ছিলেন একদা। চাকরিও গেল, সংগীতও গেল। জীবনের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত এই মানুষটি। এই তাহের সাহেবের অধীনেই কাজ করতেন রোশন আলি হাইদ্রাবাদ রেডিয়োতে। মিস্টার তাহের ছিলেন নিজাম স্টেট্‌ রেডিয়োর ডিরেক্টর জেনারেল। রেডিয়োর প্রোগ্রামে রোশন আলি বেশ ভালো গাইলেন। অতটুকু ভালো আমি আশা করি নি এই দেহে-মনে-বিধ্বস্ত মানুষটির কাছে। খেয়াল এবং ঠুংরি দুটিই অনবদ্য— জাতশিল্পী।

সব চেয়ে আনন্দের কথা যে কয়েক মাসের মধ্যেই ভারত সরকার রোশন আলিকে রেডিয়োতে বহাল করল পূর্বপদে এবং নিজাম স্টেটের চাকরির ধারাবাহিকতাও মেনে নিল। একটি মানুষের আর্থিক দুর্গতির অবসান হল। রোশন আলি ফিরে পেলেন হারানো পদমর্যাদা। স্মরণ করে নিতে পারি স্বাধীনতালাভের সময় অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর ছিল মাত্র ছটি স্টেশন— দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ এবং ত্রিচিনাপল্লী। আর, দেশীয় রাজ্যগুলিতে রেডিয়ো স্টেশন ছিল মহীশূর, বরোদা, হাইদ্রাবাদ, অওরঙ্গাবাদ এবং ত্রিবান্দ্রমে। ক্রমে দেশীয় রাজ্যগুলির সব কেন্দ্রই অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর আওতায় নিয়ে আসা হল সমস্ত কর্মী-সহ। দেশীয় রাজ্যের বেতনের হার ছিল অনেক কম। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে আসার পর ঐ কর্মীদের অনেক আর্থিক লাভ হল। সরকারের উদারতা সন্দেহ নেই। কিন্তু যে বাইশজন অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর প্রোগ্রাম

অ্যাসিস্ট্যান্টকে ছাঁটাই করা হল বিনা অপরাধে ১৯৫৩ সনে, তাঁদের প্রতি সরকার কোনো প্রকার করুণা প্রদর্শন করল না।

এক্স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিসের প্রোগ্রামে বিভিন্ন রাজ্যের লোকগীতি প্রচার করা হত। সারা দেশের নানা অঞ্চলের পল্লীগীতি আমরা সংগ্রহ করতাম। কিন্তু শুধু পল্লীর গান বাজালেই চলবে না, সে গানটির ভাবার্থ, পল্লীজীবনের কোন্‌ বিশেষ পালা-পার্বণে গাওয়া হয় সেই গান, যে পরিবেশে গাঁয়ের মানুষ এই গানের মধ্য দিয়ে তার আনন্দ, ব্যথা-বেদনা, বিরহ-মিলনের প্রাণের কথাটি প্রকাশ করে সেই চিত্রটিও তুলে ধরতে হবে বহির্বিশ্বের শ্রোতার কাছে। এ-সব তথ্য, বিবরণও সংগ্রহ করতে হবে গান রেকর্ড করার সঙ্গে সঙ্গে। টেপ্‌ লাইব্রেরিতে পাঞ্জাবের লোকসংগীতের ভাণ্ডার পুরনো হয়ে গেছে বাজিয়ে বাজিয়ে। নূতন সংযোজনের প্রয়োজন বোধ করলাম। তাই যেতে হল জলন্ধর স্টেশনে। ব্যবস্থা আগেই করা ছিল। রেকর্ডিং-এর সমস্ত রকম সুবিধেই পেলাম। বাঙালি স্টেশন ডিরেক্টর দিলীপকুমার সেনগুপ্ত আমার পূর্বপরিচিত। অতিশয় সজ্জন মানুষ। জলন্ধর কেন্দ্রের মিউজিক প্রডিউসারও যে বাঙালি, নলিনী ভট্টাচার্য, কলকাতার শিল্পীদের সুপরিচিত পণ্টুদা। প্রায় ত্রিশজন শিল্পীর গান রেকর্ড করলাম এক সপ্তাহ ধরে। শুনলাম পাঞ্জাবের আঞ্চলিক সংগীতের বৈচিত্র্য। আর প্রাচুর্যও কত! কত বিভিন্ন ধরন, বিভিন্ন মেজাজের গান।

শিখদের ভক্তিগীতি 'শব্‌দ্‌' শ্রীগুরু গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত গান। কলকাতায়ও শিখ গুরুদ্বারে গেলে এ গান শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমুন্দ সিং রাগীর মতো শিল্পীর কণ্ঠে এ গান শোনার আলাদা আনন্দ আছে। এই শিল্পীর গাওয়া শব্‌দ্‌ এবং সেইসঙ্গে তাঁর পার্টির গাওয়া শব্‌দ্‌ বেশ কয়েকটি রেকর্ড করে নিলাম। একেবারেই লোকগীতি নয় কিন্তু। প্রতিটি 'শব্‌দ্‌' কোনো একটি রাগে গাওয়া

হয়। বাঙালি-কবি জয়দেব-রচিত দুটি পদও শিখদের শ্রীগুরু গ্রন্থ বা গ্রন্থ-সাহেবে স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে একটি যোগমার্গের পদ। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উদ্ধার করেছেন যে গান-দুটি গুর্জরি ও মারু রাগে গেয়।

গিদ্ধা মেয়েদের গান। মিলিতকণ্ঠে হাতে তালি বাজিয়ে মেয়েরা গায় সেই গান। প্রাণোচ্ছল, হাস্যকৌতুকভরা এই গানের একটা ভিন্ন স্বাদ আছে। উৎসবে, বিয়ে উপলক্ষে আমার গ্রামের বাড়িতেও শুনেছি এরকম গান। একটি গানের কলি যে আজও সময়ের সাগর পার হয়ে স্মৃতিতে ভেসে উঠছে। বিয়ের রাতে কনেকে চন্দনে, তিলক-কুঙ্কুমে, নানা আভরণে সাজিয়ে চীনাংশুক পরিয়ে দিচ্ছেন প্রতিবেশিনীরা। তাঁদের একজন গেয়ে উঠলেন :

'সাজ গো ধনি মেমের বেশে, আসবে নাগর কুঞ্জেতে,
আসবে নাগর, করবে পাগল, নিয়ে যাবে সঙ্গেতে।'

আরো কয়েকটি কণ্ঠ যোগ দিল। সবারই জানা গান। যাঁরা গাইতে পারলেন না, তাঁরা হাতে হাতে তাল দিলেন। আমার সে দেশই আর নেই, সেই গানও আর শুনতে পাই না। গিদ্ধা গানের শিল্পীরা আমায় বললেন যে মেয়েরা গিদ্ধা গান গাইতে গাইতে নাচেও। সেটা দেখবার সুযোগ পেলাম না।

টপ্পে আর-এক প্রকারের অতি প্রাণমাতোয়ারা গান। নারী-পুরুষের যুগল কণ্ঠে কবির লড়াই-এর মতো গান। প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিল মেয়েটি। যথাযথ উত্তর দিয়ে পাল্টা প্রশ্নের জবাব চাইল পুরুষ। গানে গানে লড়াই, কেউ হারবে না। অতি উপভোগ্য গাঁয়ের মাটির গান। টপ্পেকে শোরি মিঞা প্রবর্তিত টপ্পার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণই নেই। শুধু 'এ'-কার 'আ'-কারের কমবেশি নয়, কাঠামো এবং প্রকৃতিতেও রাতদিনের তফাত। এর পরও আছে আর-একটি অতি-প্রচলিত গান, যার নাম ঢোলক-গীত। প্রেম

বিরহ মিলনের অতি সাদামাটা সুরের গান। বৈশিষ্ট্য শুধু ঢোলকটি। ঢোলক থাকতেই হবে। বাজবে দ্রুতছন্দে, গানও গাওয়া হয় দ্রুতছন্দেই। ঢোলক নামে ড্রামটি পুব অঞ্চলে নেই, দুই বাংলায় নেই, নেই আসামেও। আর পূর্বভারতের অন্যত্র ভারতের সংগীতের ধারাটিই তো প্রবহমান নয়। তবে কলকাতার মানুষ ঢোলকটি দেখেছেন হিজড়েদের গানের সঙ্গে বা রাজস্থানের সার্কাস দলে যারা রাস্তায় রাস্তায় নানারকম খেলা দেখিয়ে বেড়ায়।

পাঞ্জাবের লোকসংগীত সবই দ্রুততালে গাওয়া হয়। আর তালছাড়া যে অসাধারণ ভাটিয়ালি গান একদা পূর্ববঙ্গে শুনেছি, ভাটি গাঙে নাও ভাসিয়ে বৈঠায় হাত রেখে মাঝি গান ধরত 'আমার গহিন গাঙের নাইয়া'— আর সে গান শুনে বাপের বাড়ি যাবার বাসনায় ব্যকুল এক বালিকাবধূর করুণ মিনতি—

'তোরা কেডা যাস্ রে ভাটি গাঙ বাইয়া।
আমার বাপেরে কইস্ নাইয়র নিত আইয়া।'

ঐরকম কোনো নাইয়ার গান, কোনো নদীর গান এই পঞ্চনদের দেশে শুনতে পেলাম না। তবে আছে তাদের পল্লীগাথার ঐতিহ্য— কাহিনী-সংগীত অপূর্ব রোমান্টিকতায় মণ্ডিত। আমাদের ময়মনসিংহগীতিকার কাজলরেখা, মহুয়া, মদিনা, লীলা, চন্দ্রাবতীর কাহিনীর মতো প্রণয় এবং বিরহের অতি করুণ উপাখ্যান, রূপকথার মায়াঞ্জনমাখা, পাঞ্জাবের ভাণ্ডারে রয়েছে অনেক। কিন্তু তার মধ্যে হীররঞ্জা, ছছি-পুন্নু, এবং ছহ্নু-মহিওয়ালের কাহিনীগুলি পাঞ্জাবের মানুষের কাছে পেয়েছে এপিক্-এর মর্যাদা। আবার এই ত্রয়ীর মধ্যে হীর-রঞ্জার গল্পটিই সমগ্র পাঞ্জাববাসীর মনের গভীরে একটি মন্দিরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এমন-কি, নাগর-জীবনে লালিত মানুষের হৃদয়ও হীর-রঞ্জার গান শুনে অভিভূত, বিহ্বল হয়ে ওঠে। কাহিনীটির করুণ বেদনা আমার মনকেও ছুঁয়ে গেল।

তক্ত-হাজারা গাঁয়ের তরুণ রঞ্ঝার ভুবন-আলো-করা রূপ। বাঁশি বাজিয়ে বালকৃষ্ণের মতো মাঠের গো-মহিষদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। মা-বাবা আদর করে ডাকত ধিদা। মা-বাবার মৃত্যুর পর বড়ো দুই ভাই ওকে বঞ্চিত করল। মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রঞ্ঝা। সুখে, আদরে লালিত রঞ্ঝার জীবন-সংগ্রামের কোনো প্রস্তুতি নেই। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে দিন যায়। অনেক জায়গা ঘুরে তার পর সাঁতরে শতদ্রু নদ পার হয়ে চলে গেল। সামনে এক অতি সুন্দর উদ্যান। সেখানে পঞ্চপীরের আশীর্বাদ লাভ করল রঞ্ঝা। ওকে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ থাকতে বললেন পঞ্চপীর। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে রঞ্ঝা তো অবাক। কোথায় পঞ্চপীর, কোথায়ই বা সে উদ্যান! রঞ্ঝা এখন নিজেকে দেখতে পেল অতি মনোরম এক রাজোদ্যানে। অদূরে সখীপরিবৃতা পরমাসুন্দরী এক তরুণী। এ কোথায় এল রঞ্ঝা! কি করেই বা এল! এই সুন্দরী কন্যাই বা কে! ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল রঞ্ঝা। সখীরা এসে আশ্বাস দিয়ে নিয়ে গেল রঞ্ঝাকে সেই কন্যার কাছে।

অপলক দুজনেই দেখছে দুজনকে। রূপ দেখে যেন আশ মেটে না। সখীদের কাছে রঞ্ঝা জানল হীর-এর নামটি। রঞ্ঝাও হীরের কাছে নাম এবং জীবনের ব্যর্থতার কথা খুলে বলল। আদরের কন্যা হীরের আবদারে পিতা মাহর-চুলক রঞ্ঝাকে মোষ-পালকের কাজে নিয়োগ করল। অদূরে বেলা নামে ছোটো এক দ্বীপে রঞ্ঝা মোষ চড়িয়ে বেড়ায় আর আপন মনে বাঁশি বাজায়। মোষ-পালক রঞ্ঝার কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের অছিলায় পিতার কাছে অনুমতি নিয়ে হীরও আসে বেলা দ্বীপে। সারাটি বেলা কেটে যায় প্রেমগুঞ্জনে। এই প্রেমের কথা বাপের কানেও পৌঁছায়। খোঁড়া মাতুল কাইদুকে গোপনে পাঠিয়ে সমস্ত খবর সংগ্রহ করলেন হীরের বাবা। জোর করে মেয়েকে আনিয়ে নিলেন। মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন এমন-কি,

গাঁয়ের কাজি পর্যন্ত হীরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে রাখাল-ছেলে রঞ্জার সঙ্গে বিয়ে সম্ভব নয়। হীর যে শিশু বয়সেই খেরা নামে ধনীপুত্রের সঙ্গে বিয়েতে বাগদত্তা। হীর কিন্তু রঞ্জার প্রতি প্রেমের নিষ্ঠায় অবিচল। করুণ গানেই প্রকাশ পেল হীরের গভীর মর্ম-বেদনা।

জলন্ধর স্টেশনের স্টুডিয়োর এককোণে বসে রেকর্ডিং-এর ফাঁকে ফাঁকে শ্রীমতী জগজিত কউর এই প্রেমোপাখ্যান আমায় শোনাচ্ছিলেন। তাঁর আঁখি ছলছল। হীরের বেদনাবিহ্বল একটি গানের ইংরেজি অনুবাদ দিলেন শ্রীমতী জগজিত আমার হাতে। মূল গানটিও তিনিই গাইলেন।

He is my soldier, yea more
My chosen Knight is he !
Him madly, madly I adore
His life is life of me.

If Ranjha seek the battlefield
To fight against the foe,
O, I will be his sheltering shield
On me shall fall the blow !

Could I in Mecca's sacred place
E'er hope to bow my head,
If I from Ranjha turned my face
Or Khera loved instead ?

জানি না কি করে শ্রীমতী জগজিত সংগ্রহ করেছিলেন পাদরি Rev. Charles Swynnerton-এর এই অনুবাদ। রেকর্ডিং শেষে শ্রীমতী জগজিত উপাখ্যান শেষ করলেন। কেউ শুনল না অনুনয়-বিনয়, হীরের বক্ষফাটা কাতর ক্রন্দন। তাকে জোর করে তোলা হল

পালকিতে খেরার গৃহে পাঠাবার জন্য। কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। বাহকরা পালকি ওঠাতে পারছে না কোনোমতেই। ইতি-মধ্যেই রঞ্জাও এসে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে আকাশপথে আর-একটি পালকি নেমে এল। দেবদূতেরা দুটি পালকিতে হীর এবং রঞ্জাকে নিয়ে গেলেন বেহেশ্‌ত্‌-এ। পার্থিব জীবনে মিলন আর তাদের হল না।

হীর-রঞ্জার কাহিনী এগিয়েছে গানে গানে। আর, হীর এবং রঞ্জার গানগুলিতে প্রেমিক হৃদয়ের অনন্তকালের আকুতি। চারণকবি গ্রামে-নগরে হীর-রঞ্জার গানগুলি গেয়ে বেড়াতেন। আশা সিং মস্তানা কি এই চারণকবিদেরই উত্তরসূরী? হীর-রঞ্জার গান আশা সিং মস্তানা শুধু দেশের মানুষকেই শোনান নি, বিদেশী শ্রোতার শ্রবণ-মনকেও মুগ্ধ করেছেন। এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর নাম, পরিবেশ, মুসলমানী। কিন্তু হীরের এই বলিষ্ঠ প্রণয় কি পর্দাপ্রথার অন্তরালে সম্ভব? পাদরি Rev. Charles Swynnerton মনে করেন যে মুসলিম বিজয়ের অনেক অনেক আগে পুরুষপুর বা তক্ষশিলার নিকটবর্তী অঞ্চলে, সিন্ধু-শতদ্রুর তীরে এই কাহিনীর জন্ম। পরে শুধু মুসলমানী পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হীর-রঞ্জা, ছহ্নি-পুন্নু এবং ছহ্নু-মহিওয়ালের কাহিনীতে ইহজীবনে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ঘটছে না। মিলন হয় জীবনের পরপারে। খুশবন্ত সিং বলেন যে প্রেমের এ পরিণতির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী সাহিত্যিক ভাই বীর সিং-এর লেখায় এবং কবিতায়।

একজন বিশাল শিখ জোয়ান ফৌজ-এ গেলেন না, হকি স্টিক্ হাতে নিলেন না, বসলেন না স্টিয়ারিং-এ, পরিবর্তে হাতে তুলে নিলেন তানপুরা জীবনের সাধনা হিসেবে এবং তাও উচ্চাঙ্গ সংগীতের। এমনটা খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। সত্যি বলতে কি জলন্ধর কেন্দ্রের এই শিল্পীটির খেয়াল শোনবার আগে আমি কোনো শিখ

পুরুষ বা নারীর কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনি নি। অতি সুরেলা পৌরুষ কণ্ঠ সোহন সিং-এর। পেয়েছেন ভালো তালিম উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে। গান শুনলাম এই শিল্পীর, শুনে খুব ভালো লাগল। জানলাম তিনি রেডিয়োর 'এ' শ্রেণীর শিল্পী এবং জলন্ধর কেন্দ্রের স্টাফ আর্টিস্ট। এক ঘণ্টার খেয়াল গান রেকর্ড করলাম এই শিল্পীর। লোকসংগীতের রেকর্ডিং-এর সঙ্গে উপরি পাওনা। দিল্লীতে ফিরে এসে ডেপুটি চীফ প্রডিউসারকে সোহন সিং-এর গান শোনালাম। এই শিল্পীর গান পরে ন্যাশনল্ প্রোগ্রামেও শুনলাম।

একদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডেপুটি চীফ প্রডিউসার অব মিউজিক সুরেশ চক্রবর্তী খুব গুরুগম্ভীরভাবে এসে বসলেন অফিসে আমার ঘরে। মুখের ভাব দেখে মনে হল একটা কঠিন কাজের দায়িত্বভার এসে পড়েছে ওঁর ওপর। কিন্তু বলছেন না কিছুই। পুরনো মরচেপড়া ছোটো একটা টিনের বাক্স থেকে বিড়ি বের করে অগ্নি-সংযোগ করলেন। চুপ করে থেকে একটা সাস্‌পেন্স তৈরি করে নিতে সক্ষম হলেন। টেলিফোন তুলে মঙ্গারামের ক্যান্টিনে চা-এর আদেশও দিলেন। তখনো কিছু বলছেন না। চা এলে নীরবে চা বানিয়ে এক কাপ আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। চা-এর পর আবার একটি বিড়ি ধরালেন। সেটিও কয়েক টানে নিঃশেষিত হল। আর তো চুপ করে থাকতে পারছেন না। কপট গাম্ভীর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছে গেছেন।

হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, কিছু বলছেন না কেন?'

আমি এবার হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল কিছু একটা বলার দায়িত্ব নিয়েই আপনি এসেছেন। আপনি কিছুই বলছেন না অথচ উলটো কিছু না বলার জন্য আমার কৈফিয়ত চাইছেন। বেশ তো মজার ব্যাপার।'

একটু হাসি দেখা গেল সুরেশদার মুখে। চুপি চুপি বললেন যে

কয়েক দিনের মধ্যেই আমি একটা সুখবর আশা করতে পারি। আমার এবং দিল্লী কেন্দ্রের এইচ. এল. সেহ্‌গলের নাম আউট-অব-টার্ন প্রমোশনের জন্য মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই অনুমোদন এসে যাবে। তিনি ঘোড়ার মুখ থেকে শুনেছেন এ কথা এবং তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন আমায় জানাতে। কোনো মন্তব্য করলাম না। এখন আমাব ডিপার্টমেণ্টকে আমি যতটা জানি সুরেশদা ততটা কি করে জানবেন? মাঝে অনেক দিন রেডিয়োর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না সুরেশদার। তবু মনের কোণে একটা আশা নিয়েই বাড়ি ফিরলাম সেদিন। পরদিন অফিসে এসে একটু কানাঘুষা শুনেছি এ বিষয়ে। কিন্তু কিছুদিন পর সুরেশদাই ভগ্নদূতের মতন এসে সংবাদ দিলেন যে ব্যাপারটা ফাইল চাপা পড়েছে।

চাকুরির ব্যাপারে এমন আশা-নিরাশার কত ব্যাপার ঘটে থাকে। কিন্তু কিছুকাল পর যে আঘাত পেলাম তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। পাসপোর্ট করা হয়েছে, প্যাসেজ বুক হয়েছে, লণ্ডনে আমার ভাইপো ছোট্ট একটা আস্তানাও ঠিক করে ফেলেছে। ভাইপোর আনন্দ যে অন্তত দু-তিন বছর কাকীমার হাতের রান্না খেতে পারবে। বি. বি. সি-তে বাংলা প্রোগ্রামের দায়িত্বে আমার যাওয়ার কথা সহজেই পাকাপাকি হয়েছিল এজন্য যে ভারতে বি. বি. সি.-র প্রতিনিধি আমার কাছে বেশ কিছুদিন ভারতীয় সংগীত বিষয়ে পাঠ নিচ্ছিলেন। আমার ডিপার্টমেণ্ট আমার যাওয়ার সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাও হল না। এবারের প্রতিবন্ধক অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো এবং বি. বি. সি.-র মধ্যে একটা আকস্মিক মনোমালিন্য। চাকরি ছেড়ে চলে যেতে পারতাম। দু-একজন এমন উপদেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিন বছর পর ফিরে তো আসতেই হত। তখন অ-ঠাঁই জলে পড়ে যেতাম। যেতে পারলে

খুব ভালো হত এজন্য যে কানের চিকিৎসাটা ঐ দেশে ভালোভাবে করানো যেত।

ব্যাপারটা শুনে শুভানুধ্যায়ী ক'জন বন্ধু এলেন বাড়িতে এক ছুটির দিনে। আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে জীবনটাই সামনে পড়ে রয়েছে, বিদেশ যাত্রার কত সুযোগ আসবে পরে। বন্ধুদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে আমার স্কুলের হেডপণ্ডিত স্যার-এর গল্পটা শোনালাম ওঁদের। বাংলা স্যার সেদিন অনুপস্থিত। হেড স্যার রাউণ্ডে বেরিয়ে দেখতে পেলেন অষ্টম শ্রেণীর ছেলেরা খুব গোলমাল করছে। এটা বাংলা স্যারের ক্লাস ছিল। হেড স্যারকে দেখেই আমরা চুপ করে গিয়েছিলাম। কিন্তু অভিজ্ঞ লোক, বুঝতে পারলেন তাঁর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল আবার শুরু হবে। তিনি ফিরে গেলেন, একটু পরেই বিমর্ষবদনে আমাদের ক্লাসে ঢুকলেন হেডপণ্ডিত স্যার। তাঁর বিশ্রামের ঘণ্টা ছিল এ সময়টা। কিন্তু হেড স্যারের অনুরোধে এই বাংলা ক্লাস নিতে এসেছেন। স্বাভাবিক কারণেই মেজাজ খারাপ। মুখে রাজ্যের বিরক্তি। বাংলা বই খুলে একটি ছেলেকে পড়তে বললেন।

ছেলেটি প্রবন্ধের প্রথম লাইন পড়তে লাগল, 'অধ্যবসায় এবং কঠিন শ্রমব্যতিরেকে জীবনে উন্নতিলাভ করা যায় না।'

হেডপণ্ডিত স্যার থামিয়ে দিলেন ছেলেটিকে। পাশের ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'তুমি এবার মাইনে (মানে) বল।'

সেই ছেলে বলে, 'স্যার, এই তো প্রথম লাইন পড়া হল। এখনই কি অর্থ বলব ?'

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ, 'বেঞ্চের উপর, বেঞ্চের উপর।' এবার স্যারের তর্জনী আমার দিকে।

দাঁড়িয়ে উঠে ধীরে ধীরে শুরু করলাম, 'লেখক এই ছত্রে প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন যে জীবনে উন্নতি লাভ করিতে—'

আর এগোতে দিলেন না হেডপণ্ডিত স্যার। প্রশ্ন করলেন, 'উন্নতি শব্দের মাইনে কি?'

বললাম, 'শ্রীবৃদ্ধি।'

আমার মুখ থেকে বের হতে-না-হতেই আদেশ হল 'বেঞ্চের উপর'। মন্তব্য করলেন যে সরল অর্থ বলার মুরদ নেই।

হতবুদ্ধি হয়ে বেঞ্চের উপর উঠতে উঠতে বললাম, 'ইংরেজিতে বলতে পারি "প্রস্‌প্যারিটি"।'

এবার রোষকষায়িত নেত্রে স্যার বললেন, 'কি, বাংলা শব্দের ইংরেজি মাইনে?' সগর্জন আদেশ, 'নীল ডাউন, নীল ডাউন।'

আমাদের কালে স্কুলে 'নীল ডাউন' বহু ব্যবহারে আর ইংরেজি শব্দ ছিল না। তাই হেডপণ্ডিত স্যার আমার ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের অপরাধে বাংলা নীল ডাউন এই আদেশটি দ্বারা শাস্তি দিলেন। ক্লাসের কেউ কি আর বলতে পারল উন্নতি শব্দের মাইনে? কেউ না। সব ছেলে হয় বেঞ্চের উপর, নয় নীল ডাউন অবস্থায়। একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

পেছন থেকে একটি ছেলে বলে উঠল, 'হেড স্যার আসছেন।'

অমনি তটস্থ হয়ে হেডপণ্ডিত স্যার আমাদের 'বইসে' পড়তে বললেন। সবাই বসলে পর আমি মনে সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করলাম উন্নতি শব্দের কি অর্থ হবে।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'বইলের দল, কিস্‌সু জানে না।' বুঝতে পারলাম বয়েল কথাটাই 'বইল' হয়েছে।

বলতে লাগলেন, 'উন্নতি শব্দের কোনো মাইনে নেই। উন্নতি মাইনে উন্নতি।' দ্বিতীয় উন্নতিতে একটু জোর দিলেন।

আবার শুরু করলেন, 'মনে রাইখবা উন্নতি মাইনে উন্নতি, কারো কারো হয়, কারো কারো হয় না। আমার দিকে চাইয়া ছ্যাখ, আমার হয় নাই।'

স্যারের চোখে-মুখে ক্রোধের ভাবটা আর নেই, একটা দীনতা ফুটে উঠেছে। 'আমার হয় নাই' কথাটায় যে মার-খাওয়া জীবনের হাহাকার মিশে ছিল সেটা তখন বুঝতে পারি নি। উপলব্ধি করতে পারি নি হেডপণ্ডিত স্যারের ব্যর্থতার গভীরতা। আদ্য, মধ্য, উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাস করেছিলেন। তার উপর বিদ্যার্ণব, বিদ্যা-বাচস্পতি উপাধিও অর্জন করলেন। সামান্য বেতনের টাকায় বড়ো একটি পরিবারের ভার আর বইতে পারছিলেন না। ছাত্র পড়িয়ে টাকা নিতেন না। সে আমলে ঐ রেওয়াজটা ছিলও না। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সম্পুর্ণ পরাজিত মানুষটি। আর সেদিন হয়তো ঘরে চালও বাড়ন্ত ছিল। তাই মেজাজ ছিল রুক্ষ। কিন্তু উন্নতি শব্দের ব্যাখ্যাটি ছিল একেবারে অভ্রান্ত। উন্নতি শব্দের এর চেয়ে ভালো অর্থবহ আর কিছু তো হতে পারে না।

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'আমারও হয় নাই।'

কোনো মন্তব্য করলেন না বন্ধুরা। একটা বিষণ্ণ স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে।

হতে হতে হল না, পর পর দুবার ঘটল। মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমন কয়েকজন আনন্দময় মানুষের আগমন ঘটল যে তাঁদের সান্নিধ্যে মনের অবসাদ কেটে গেল। গোঁসাইজি এলেন কলকাতা থেকে। সংগীতের সাধনা তাঁর কাছে আনন্দলোকে অভিযাত্রা। গোঁসাইজি গান করাকে বলেন আনন্দ করা। এটা তাঁর পরিভাষা। শুধু গানেই যে আনন্দ পরিবেশন করছেন তা নয়, কথাবার্তায়, গল্পে সব সময় একটা সুখময় পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। তাই তিনি সুখেন্দু। নামকরণটা সার্থক হয়েছিল।

প্রসন্ন হাসিমুখে ঘরে ঢুকেই সম্ভাষণ করলেন, 'সকলে আনন্দে আছেন তো?'

আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'একটু চায়ের আনন্দ হোক।'

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রশান্ত চেহারা। দেহটি যে-কোনো বাঙালি যুবকের ঈর্ষার বস্তু। প্রথম যৌবনটা বন্দীনিবাসে কাটালেও যখন বের হয়ে এলেন মনে হল গুরুগৃহ থেকে ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা নিয়ে গৃহে ফিরলেন। সতেজ, দীপ্তিময় তারুণ্য। বন্দীনিবাসের কালটা ব্যায়াম, সংগীতের অনুশীলন এবং পড়াশোনায় কাটালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাটাও পাস করলেন। বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সংগীতের সাধনাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন। উচ্চতর শিক্ষালাভ করলেন আচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর কাছে। সুখেন্দু গোস্বামীর আগমনে খুশি হলাম দারুণ।

চায়ে চুমুক দিয়েই বলে উঠলেন গোঁসাইজি, 'অতি উৎকৃষ্ট কারিগর চায়ের।'

এই 'চায়ের কারিগর' কথাটি শুনে ঘরের সবাই হেসে উঠলেন। বুঝতে পারলেন যে মানুষটি রসিক, আনন্দময়। কতকাল আগে থেকে চিনি সুখেন্দুবাবুকে। প্রথম পরিচয়ের কথাই বলি।

কলকাতাবাসী আমার জেলার লোকেরা একটি বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। উদ্যোক্তারা আমায় এসে ধরলেন শৈল দেবীকে এই অনুষ্ঠানে গাইতে রাজী করিয়ে দিতে। দায়িত্বটা নিলাম এবং আশ্বাসও দিলাম যে শৈল দেবী গাইবেন নিশ্চয়ই। প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসেবে শৈল দেবী তখন কলকাতায় খুবই জনপ্রিয়। একই গুরুর কাছে গানের পাঠ নিয়েছি আমরা। কিন্তু গান শিখতে বসে শৈলবালার সামনে গলা খুলতে সংকোচ বোধ করেছি। অতি সাধারণ কাজ অসাধারণ হয়ে বের হয় শৈলবালার গলা থেকে। কণ্ঠের এমন একটা ঐশ্বর্য সমস্ত জীবনেই কম শুনেছি। গুরু সমরেন্দ্র পালের সব চেয়ে প্রিয়শিষ্যা। কিন্তু কিশোরী শৈলবালার বিয়ে হয়ে গেল। পর পর দুটি কন্যার জননী হলেন। কিন্তু গান থামল না। স্বামীর সঙ্গে দুটি কন্যাকে নিয়ে পাড়ি দিলেন কলকাতায়। শিয়ালদা

স্টেশন থেকে সোজা চলে এলেন আচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে।, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। ভীষ্মদেব বাড়ি নেই। ভীষ্মজননী দয়াময়ী। শিশু দুটির দুধের এবং স্বামী-স্ত্রীর আহারের ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে ভীষ্মদেব বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে সবই শুনলেন। দু দিনের রেলযাত্রার ক্লান্তি নিয়েও বসে গেলেন শৈল দেবী আচার্যদেবকে গান শোনাতে। শুনে প্রসন্নচিত্তে রাজী হলেন গান শেখাতে ভীষ্মদেব। আবার সেদিনই বিকেলে শৈল দেবী উপস্থিত হলেন এক নম্বর গারস্টিন প্লেসে, রেডিয়ো স্টেশনে, নৃপেন-বাবুর কাছে। জহুরী রতন চেনে। নৃপেনবাবু গান শুনলেন এবং সেদিনই কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে গান গাইলেন শৈল দেবী। কিছুদিনের মধ্যেই সুরসাগর হিমাংশু দত্তর সুরে রেকর্ড করলেন, 'রাতের ময়ূর ছড়াল যে পাখা আকাশের নীল গায়', 'শুধু কাঙালের মতো চেয়েছিনু তার'। ব্যস্, যশ চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি যখন ১৯৪৪ সনের গোড়ায় চাকরির খোঁজে কলকাতায় এলাম শৈল দেবী তখন খ্যাতির শিখরে। শৈলপতি শচীনবাবু প্রায়ই এসে আমার খোঁজ-খবর নিতেন। খুবই প্রীতির সম্পর্ক। শৈল দেবীর রেডিয়োর প্রোগ্রামের আগে এসে জানিয়ে যেতেন শচীনবাবু। বলতেন, 'আমাদের প্রোগ্রাম আছে।' হ্যাঁ, 'আমাদের প্রোগ্রাম'ই বলতেন। অস্বাভাবিক মনে হত না। স্ত্রীর কীর্তিতে গৌরববোধে একাত্ম হয়ে বহুবচনের ব্যবহার। এমনটা আরো শুনেছি। স্নেহপরায়ণ বড়ো ভাই ছোটো বোনের অনুষ্ঠানকে নিজের অনুষ্ঠানই মনে করতেন। বলতেন, 'আমি মঞ্চে উঠে কোনো দিকে তাকাই না। গান শেষ করে শ্রোতাদের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিই।' তা, যাই হোক, শৈল দেবী নিজদেশের লোকদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে গাইতে সম্মত হলেন না। জানালেন আগের বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এঁদের সঙ্গে যে

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা যায় না। ভীষণ বিব্রত বোধ করলাম আমি। কথা দিয়েছি উদ্যোক্তাদের, একজন ভালো শিল্পীর ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু তেমন জানাশোনা নেই। কি করি এখন! সুখেন্দু গোস্বামীর তখন দারুণ নাম। মনে পড়ল আমার আত্মীয় নির্মল ভট্টাচার্যের বন্ধু তিনি। নির্মলদার কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে গেলাম সদানন্দ রোডে সুখেন্দুবাবুর বাড়িতে।

রবিবারের সকাল। গান গাইছেন সুখেন্দুবাবু আর তন্ময় হয়ে সামনে বসে শুনছেন সুন্দরী এক যুবতী, যেন একজন গাইছেন খুলিয়া গলা, আর জন মনে মনে। কিন্তু কে এই যুবতী? নিতান্ত সাদাসিধে পোশাকেও অতি সম্ভ্রান্ত। মুখখানি চেনা চেনা। কৈশোরের ক্ষীণ স্মৃতি উঁকি দিচ্ছে। গান থামলে চিঠিখানি দিয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করলাম সুখেন্দুবাবুর কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন তিনি। দক্ষিণার তো প্রশ্নই নেই। তিনি অন্য জেলার সন্তান। কিন্তু আমার মুখ রক্ষা করলেন আমার মুখের কাতর ভাবটা লক্ষ করেই হয়তো। কিন্তু সামনে বসে এ যুবতী কে! একবারও চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না আমার দিকে। সামনের কাউকেই দেখছেন না, দৃষ্টি অনেক দূরে। কিন্তু আমি কি চিনতে পেরেছি! সেই কিশোরীর মুখের আদলই তো এই যুবতীর মুখে। জিজ্ঞাসা করব, কি করব না, এ দ্বিধা। আবার গান শুরু হলে না-হয় শোনবার জন্য আরো কিছুক্ষণ থেকে যেতে পারি। আমার কাজ তো সমাধা হয়েছে। গান থেমে গেছে, আর থাকাটাও শোভন দেখাচ্ছে না। কিন্তু এখন আমি নিঃসংশয় যে এই যুবতী দিগম্বরীতলারই মেয়ে, এবং সেই দুই কিশোরীরই একজনের যুবতীরূপ দেখতে পাচ্ছি।

মনে সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললাম, 'আপনি ভাই কিছু মনে করবেন না, মনে হচ্ছে আমার শহরেরই মেয়ে।'

মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনাকে দেখেও একটু একটু মনে পড়ছে

ছেলেবেলার চেহারাটা।' একটু হেসে বললেন, 'এতদিন পরও আমাকে দেখে চিনতে পেরেছেন, মনে রেখেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ।'

বললাম, 'মনে রাখব না, সে কি কথা? মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে দুইটি কিশোরী বিদেশীরাজের প্রতিনিধি জেলা-শাসকের বাংলোতে গিয়ে প্রকাশ্য দিনের আলোয় তাঁকে মৃত্যুলোকে পার করে দিল সে কথা ভুলে যাব সেই শহরের ছেলে হয়ে? শান্তি-সুনীতির সেই বীরত্বের কাহিনী সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল। ভারতের ঘরে ঘরেই নাম দুটি পরিচিত। সেই দুই কন্যার একজনকে, সুনীতি চৌধুরীকে, মনে থাকবে না?'

আমার কথা শুনে খুশি হয়েছিলেন সুনীতি চৌধুরী।

সুখেন্দুবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে সদ্য কারাবাস থেকে মুক্ত আমার শহরের মেয়ে সুনীতি চৌধুরীর সঙ্গেও অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল সুখেন্দুবাবুর বাড়িতে। দিনটির কথা তাই স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। খেয়াল, ঠুংরি ছাড়াও সে সময় রাগ-প্রধান বাংলা গান গাইতেন সুখেন্দুবাবু। কর্ণাটীরাগ সিংহেন্দ্রমধ্যমে সুর-করা একটি বাংলা গান, 'কে গো বাজালে বাঁশরী' খুব চমৎকার গাইতেন তিনি। বিদ্যাপতির পদ 'পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে' গেয়ে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে দিতেন। 'গভীর বিরহেই মাঝে মাঝে বিরহের বেলা কাটানোর জন্য আকাশকুসুম চয়নের প্রয়োজন হয়। রাধাও ভাবছেন যে একদিন হয়তো সে আসবে। যেদিন আসবে সেদিন আমার দেহ হবে তার পূজার মন্দির।' পুরুষ হয়েও রাধার মনের ভাবটি সুন্দর প্রকাশ করতেন শিল্পী। কত গভীর অনুভব। যেমন সংগীতে নিবেদিত-প্রাণ শিল্পী তেমনি আদর্শগুরু সুখেন্দুবাবু। গানের 'গুপ্ত শিক্ষক' অর্থাৎ প্রাইভেট টিউটর সম্পর্কে কত কথাই তো শোনা যায়। কিন্তু সুখেন্দুবাবুর মতন ধার্মিক চরিত্রবান গুরু খুবই বিরল। এই মানুষটিকে পেয়ে আনন্দে ভরে গেল হৃদয়।

গানে মোর ইন্দ্রধনু— আসাধারণ কিন্নরী কণ্ঠের গান শুনছি। রাতভর ইন্দ্রসভায় গান পরিবেশন করছেন দেব-গায়িকারা। রাতের বিভিন্ন যামে বিভিন্ন রাগের গান। সভার এক কোণে বসে বিভোর হয়ে শুনছি সে গান। সকলের শেষে রাতের শেষ প্রহরে আসরে এলেন প্রধান গায়িকা। শুরু করলেন— গানে মোর ইন্দ্রধনু। কি অপূর্ব সে গান! কিন্তু মধুর স্বপ্ন ভেঙে গেল কপালে কোমল করস্পর্শে। ঘুম ভেঙেছে। জড়িমা যায় নি। শুনতে পেলাম গিন্নীর কণ্ঠ, 'ওঠ এবার, চা প্রস্তুত।' কিন্তু তখনো যে শুনতে পাচ্ছি সেই গান— গানে মোর ইন্দ্রধনু। শান্ত উষায়, নগরের বাইরে নির্জন যমুনাতীরে আমারই গৃহে অনির্বচনীয় সে গান। সুখস্বপ্নে সংগীতের যে সুধা পান করছিলাম জেগেও সে গানই শুনছি। ভালো করে চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম স্বপ্নের সে দেব-গায়িকা মানুষী মূর্তিতে আমার সামনে।

বললাম, 'গান থামাস নে। গেয়ে চল, এ আনন্দের ক্ষণটা শেষ হতে দিস নে।' তানপুরার তারে মৃদু আঙুলের ছোঁয়ায় গেয়ে গেলেন পর পর, 'ওগো মোর গীতিময়', 'ওরে বিজন রাতের পাখি', 'মানুষের মনে ভোর হল আজ'।

গান থামিয়ে সুধাকণ্ঠী বললেন, 'চা যে জল হয়ে গেল।'

চায়ের কাপ বদলে দিয়ে নিজেও এসে বসলেন আমার স্ত্রী। তিনি জানালেন অনেকক্ষণ ধরে রিয়াজ করছিলেন শিল্পী এবং ওঁরই অনুরোধে শিল্পীর নিজেরই ছবির গান, 'গানে মোর ইন্দ্রধনু' গাইছিলেন এবং সে গানটি শোনাবার জন্যই আমার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা হচ্ছিল। স্বপ্নেদেখা কাহিনীটা বললাম ওঁদের কাছে। শিল্পীর মুখে প্রসন্ন হাসি। যতক্ষণ গাইছিলেন কথা ও সুরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এই শ্যামলী মেয়ের মুখে ফুটেছিল স্বর্গীয় আভা, অনুভাবে রঞ্জিত। গান গাইবারই জন্য জন্ম এই মেয়ের। কি নিষ্ঠা

অনুশীলনে! মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য এসেছেন দিল্লীতে। কিন্তু রিয়াজের বিরাম নেই। সুমধুর আওয়াজ কণ্ঠসংগীতের প্রথম দাবি। কিন্তু তার উপরও চাই গভীর সংবেদ এবং সেটা প্রকাশ করার শক্তি। এই তিনটি গুণের অপরূপ মিলন ঘটেছে যে শিল্পীর মধ্যে তাঁরই নাম সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। দিল্লীতে এসেছেন রেডিয়ো সংগীত সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ সংগীত গাইতে। খেয়াল, ঠুংরি এবং আধুনিক বাংলা গানের ত্রিবেণীসংগম সন্ধ্যার গানে। তাই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় অনন্যা। খেয়ালের চর্চায় গলা ভারী হয়ে যায়, হয়ে যায় আধুনিক গানের অনুপযোগী— সে ধারণাটা ভুল প্রমাণ করে দিলেন প্রায় চার দশকের সংগীত পরিবেশনে। রিয়াজের পদ্ধতিটা জানতে হয়। বকৃরি তান, যাকে আমি বলি 'ছাগী' তান, সে তান রিয়াজ করলে গলাটা শুধু ভারী হয় না, আওয়াজটাও অজ পশুরই মতো হতে বাধ্য। সন্ধ্যার গান যেমন ভালো, মানুষটিও তেমনি মধুর। এমন মানুষ যে পরিবেশটাই মধুময় করে তোলেন।

যে গানে আমার প্রাণ কাঁদে সে গান কি করে পেলেন শিল্পী সে কথাটা কখনো ভেবে দেখি নি আমি। মোনালিসার ঠোঁটের মোহন হাসিটি ফুটিয়ে তুললেন যে শিল্পী তুলির সূক্ষ্ম আঁচড়ে তাঁর দীর্ঘ অনিদ্র রজনীর ধ্যানের ইতিহাস আমি জানি নি। একটি কবিতার জন্ম হল কেমন করে তাও ভাবি নি আমি। আর্টিস্ট-এর ওআর্কশপে কখনো উঁকি দিই নি। কি করে জানব কত নিষ্ঠা আর শ্রম রয়েছে এই ক্রিয়াসিদ্ধির অন্তরালে! আমি সাধারণ মানুষ, ভোরে বাজারে যাই। মাছ সবজি হলুদ জিরে মরিচ কিনে আনি, যাই অফিসে এবং সন্ধ্যায় ফিরে এসে খানিক বিশ্রামের পর রাত্রির আহার শেষে ঘুমিয়ে পড়ি।

এক রাত্রির শেষ প্রহরে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল এবং শিল্পীর সাধনার জগতের খানিকটা যেন দেখতে পেলাম এক পলক। পাশের

কামরায় বিদ্যুৎগতিতে 'পালটার' রিয়াজ চলছে সেতারে। কি স্বচ্ছন্দ অঙ্গুলি সঞ্চালন এবং কি পরিচ্ছন্নভাবে ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিটি স্বর এই অসম্ভব দ্রুতলয়েও। নিস্তব্ধ রাত্রি, বিশ্বচরাচর গভীর ঘুমে অচেতন। শ্রবণের আর এর চেয়ে বেশি তৃপ্তি কি হতে পারে! আমার মন কল্পনার পাখায় উড়ে চলে। স্বরগুলি যেন মূর্ত হয়ে সুশৃঙ্খল বিচিত্র ছন্দে নেচে চলেছে। কি যে আনন্দ উপভোগ করছি! সুরের সে ঝংকার এক সময় থেমে গেল। কিছুক্ষণ পর ভেতরের আঙিনায় চেয়ার টানার শব্দ শুনতে পেলাম। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি গায়ে মোটা লেপ জড়িয়ে শিল্পী খোলা আকাশের নীচে বসে আছেন। উঠোনের আলো জ্বালিয়ে দেখলাম কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। ডেকে নিয়ে এলাম ঘরে। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হয়ে যেতে পারে। জানুআরির রাত্রিশেষে তাপমাত্রা হিমাঙ্ক ছুঁই-ছুঁই।

নিখিল রিয়াজ শুরু করেছিলেন রাত্রির আহারের পর দশটা সাড়ে দশটায়। এখন ভোর হতে বাকি নেই বেশি। প্রতিটি শিল্পীর সিদ্ধিলাভের মূলে রয়েছে এই কঠোর অনুশীলন। এর তো কোনো বিকল্প নেই। আচার্য আলাউদ্দিন খাঁর গৃহে নিয়মনিষ্ঠ দীর্ঘ শিক্ষা-লাভের পর সংগীতই জীবনের ব্রত। রেডিয়োতে প্রথম বাজালেন অতি সম্মানের ন্যাশনল্ প্রোগ্রামে। এই জন্যই এ যাত্রা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লীতে আগমন। ভালো শিল্পীকেই ন্যাশনল্ প্রোগ্রামে ডাকা হয়। কিন্তু ন্যাশনল্ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করলেই একজন বড়ো শিল্পী হয়ে গেলেন না। রেডিয়ো একটি সরকারি সংস্থা। সংগীতের পারদর্শিতা ছাড়াও ক্বচিৎ অন্যতর কারণও থাকতে পারে শিল্পী নির্বাচনের পেছনে। তবে সেক্ষেত্রে সুকৌশলে অনুষ্ঠানের ঘোষণায় সেটা যেন বুঝিয়ে দেয় রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ। যেমন এক কণ্ঠশিল্পীর ন্যাশনল্ প্রোগ্রামের সময় করা হয়েছিল। তিনিও রেডিয়োতে প্রথম গাইলেন একেবারে ন্যাশনল্ প্রোগ্রামে। কিন্তু

ঘোষণায় বলা হল যে তিনি বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। ব্যস, বোদ্ধা শ্রোতা বুঝে গেলেন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর অনুষ্ঠানে বলা হয় না তিনি বিরাট প্রতিষ্ঠানের বিরাট ইঞ্জিনিয়ার। বলার প্রয়োজনই নেই। সরোদের তারে প্রথম টোকাতেই বুঝিয়ে দিলেন এলেম কতটা। মোট কথা ডিরেক্টরই হোন আর ইঞ্জিনিয়ারই হোন সংগীতের ক্ষেত্রে সেটা কোনো কৌলিন্যই দাবি করতে পারে না। আর সেই দাবিতে কোনো প্রোগ্রাম পাওয়াও উচিত নয়। কিন্তু নিখিল ন্যাশনল্ প্রোগ্রামের অতি সুযোগ্য শিল্পী। পরিণত বয়সে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠদের অন্যতম বলেই স্বীকৃতি পেলেন। পদ্মশ্রী খেতাবেও সম্মানিত হলেন। এমন হাসি-ঠাট্টা-গল্পবাজ মানুষও তো বেশি দেখি নি।

শিশুদের একটা খেলনা বাঁশি গভীর রাতে বাজছে আমার বাড়ির দরজায়। কিছুদিন আগেই খেলনা বাঁশি বাজার থেকে কিনে এনেছিল আমার শিশুকন্যা রুমি। সারাদিন বাজিয়ে বাজিয়ে কান আমাদের ঝালাপালা করে দিয়েছিল। ঘুম ভেঙে রুমি কাঁদতে শুরু করল এই বলে যে ওর বাঁশি কেউ নিয়ে নিয়েছে এবং বাজাচ্ছে আমাদেরই বাইরের দরজায়। খেলনা বাঁশির আওয়াজে এবং রুমির কান্নায় সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে সেই বাঁশি একটানা বেজেই চলেছে। আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলে দেখি বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে রাধিকামোহন মৈত্র, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং আর-এক বন্ধু দেবী মজুমদারও রয়েছেন সঙ্গে। বারান্দায় সরোদের বাক্স এবং তবলা-বাঁয়ার ব্যাগটি রাখা।

রুমি ছুটে এসে রাধুবাবুর হাত থেকে বাঁশিটি ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি আমার বাঁশি কেন নিয়েছ ?'

যন্ত্রের উপস্থিতিতে বুঝতে পারলাম যে একটি অসাধারণ সংগীত-মুখর রজনী উপহার দিলেন আমায় সংগীতের দেবী। শিল্পীর মনে

জেগেছে সুর, প্রকাশের তাড়নায় ব্যাকুল। তাই ওয়াই. এম. সি. এ. থেকে চলে এসেছেন আমার বাড়িতে। এমন একটা মেজাজে শিল্পীকে পাওয়া মস্ত সৌভাগ্য। এর উপর জ্ঞান'দার সহযোগিতা যেন হবে সোনায় সোহাগা। কোনো কোলাহল নেই, নিস্তব্ধ রাত্রি। সংগীতের অতি অনুকুল পরিবেশ। প্রাণ ঢেলে দিয়ে বাজালেন রাধুবাবু। এমন বাজনা জীবনে বেশিদিন শুনি নি। দুঃখ হয়, রেকর্ড করে রাখা সম্ভব হয় নি। সে রাতের বাজনা চিরকাল মনে রাখার মতন। সে শোনাটাও যে একান্ত নিবিড়, সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে। সেদিন শিল্পীর মনটাও কত প্রসন্ন ছিল খেলনা বাঁশি বাজানোতেই বোঝা যায়। বহুবার বহু জায়গায় অতি সুন্দর পরিবেশে রাধুবাবু আমায় বাজনা শুনিয়েছেন একান্তে। কিন্তু এই রাতের বাজনাই আমার স্মৃতিতে জেগে আছে, মনে হচ্ছে ওটাই ওঁর সব চেয়ে ভালো বাজনা শুনেছি। রাধুবাবুর বাজনা বুদ্ধিদীপ্ত। পারিবারিক ঐতিহ্যও রয়েছে সংগীতে। রাধুবাবুর মাতৃদেবী বীণা বাজাতেন, রীতিমত তালিমী বাজনা। কোথাও পড়েছি তিনি এবং শ্রীমতী লীলা দেশাই-এর মাতাঠাকুরাণী একই গুরুর কাছে বীণার তালিম পেয়েছেন। বিদ্বান এই মানুষটির সংগীতেও বৈদগ্ধ। পরিচ্ছন্ন বিন্যাস, সুপরিকল্পিত বিস্তার। প্রতিবার রাধুবাবুর বাজনা শুনে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে তিনি কি আরো একটু কিছু দিতে পারতেন? রসের আরো গভীরে পৌঁছে দিতে পারতেন আমায়? আমার ধারণা, যে সহজাত শক্তি ছিল তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি রাধুবাবুর আর্টে।

সেদিন রাত্রিতে রাধুবাবুর সরোদের সঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের তবলা-সংগত অবিস্মরণীয় একটি অভিজ্ঞতা। এই দুটি মানুষের মধ্যে যেমন গভীর সখ্য বাজনাতেও তেমন প্রিয়সখা ভাব দেখলাম। একে অন্যের কল্যাণ কামনায় ব্যগ্র। দুটি যন্ত্রের মিলনের আকুতি

দেখলাম। পেশাদার তবলিয়ার মতন চমকসৃষ্টির কোনো প্রয়াস নেই। কিন্তু সংগীতের যে কি গভীর অনুভূতি, কত বড়ো বোদ্ধা রূপকার জ্ঞানদাদা সেটা উপলব্ধি করলাম এই রাতের বাজনায়। তবলায় যে কি বিশাল পাণ্ডিত্য তাঁর সেটা বুঝতে পারি শিষ্যমণ্ডলীর দিকে যখন তাকাই। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য, গুরু তিনি। কানাই দত্ত, শ্যামল বোস, শংকর ঘোষ এই-সব শিষ্যদের খ্যাতি ভারতজোড়া।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ একজন শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক সেটা তো আংশিক পরিচয় মাত্র। বর্তমান কালে সংগীত নিয়ে এত ভাবনা আর কোনো মানুষের মধ্যে দেখি নি। সংগীত নিয়ে আলোচনা করবার জন্যও আর দ্বিতীয় মানুষটি নেই। কত যে শুনেছেন তারও ইয়ত্তা নেই। উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, আলি আকবর খাঁ, রবিশংকর তাঁরই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন কলকাতায় এলে। কণ্ঠসংগীতেও পাণ্ডিত্যের অভাব কোথায়? প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা মিত্র, তনিমা ঠাকুর জ্ঞানবাবুরই ছাত্রী। অবহেলিত হারমোনিয়ম যন্ত্রটিকে কৌলিন্যের আসরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতেও তাঁর অবদানটা কম নয়। উৎকৃষ্ট সুরকারও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। সমস্ত অস্তিত্বটাই সংগীতের জন্য। সংগীত জগতের এই অসামান্য ব্যক্তি জ্ঞান'দাকে খুব কাছে থেকে দেখতে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল সে রাতে। তার পর এক-সঙ্গেই কাজ করবার সুযোগ হল কয়েক বছর। কথা বলাটাও যে একটা আর্ট। প্রথম শ্রেণীর টেবিল-টকার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। উইট, হিউমার-এর ছোঁয়ায় বাচনভঙ্গিটি অনবদ্য। আর কত বড়ো রসিক মানুষ! তবলা-বাঁয়াতে সেদিন রাত্রে বাজালেন একটি ছড়া। মুখে বলার সঙ্গে হাতের আঙুলগুলিও চলতে লাগল— নগেনের গিন্নির দাঁত কন্‌কন্ / মাড়ি টন্‌টন্ / মাথা ঘোরে / ইত্যাদি। এবার মুখে বলা থামিয়ে দিয়ে শুধু তবলা-বাঁয়াতে ছড়াটি বাজালেন। যে ধ্বনি

নিঃসৃত হল তা চোখ বুজে শুনে মনে হল যে ছড়াটি তবলা-বাঁয়ায় পুরোপুরি বাঙ্ময় হল। শুধু রসিক মনেরই পরিচয় পেলাম না, ধ্বনি বের করবার কতটা দক্ষতা সেটাও উপলব্ধি করলাম। দাঁত কন্‌কন্‌-করা নগেনের গিন্নির কাতর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

আমায় গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে গেলেন ভীমসেন যোশীও। অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ভীমসেন। ওঁর মেজাজটা খুব ভালো ছিল। কফি খেতে খেতে কলকাতার গল্প হচ্ছিল। বলছিলেন যে এই মরসুমে কলকাতায় অনেকগুলি জলসায় গাইবার ডাক এসেছিল এবং প্রাপ্তিযোগটাও ভালোই ছিল। কলকাতার শ্রোতার কাছ থেকে খুবই তারিফ পেয়েছেন। কথায় কথায় কলকাতায় যুবাবয়সের অভিজ্ঞতার সম্পর্কে বললেন। তেমন গাইতে পারছেন না তখনো। কিন্তু মনটা চঞ্চল এবং ঐ বয়সে যা হয়, শেখবার চেয়ে শোনাবার আগ্রহ বেশি। লোকের মুখে শুনেছেন কলকাতায় গানের খুব চর্চা আছে এবং শিল্পীর বড়ো কদর। তাই অতি সামান্য টাকার ব্যবস্থা করে এসে গেলেন কলকাতায়। কিন্তু এসে পড়লেন অথৈ জলে। হাতের টাকা শেষ। এরূপ বিপন্ন অবস্থায় আর-এক সংগীতপাগল মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিছুকাল রইলেন পাহাড়ী সান্যাল মশায়ের সঙ্গে। এ-সব গল্প যখন হচ্ছিল তখন প্রকাশ ওয়াধেরাও বসেছিলেন আমার রুমে। প্রকাশ ভীমসেনকে অনুরোধ করলেন ঘরোয়াভাবে একদিন গান শোনাতে। প্রকাশ নিজে একজন কৃতী শিল্পী এবং দিল্লীর টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার সংগীত-সমালোচক। তাঁর অনুরোধটা ফেলতে পারলেন না ভীমসেন। ঠিক হল যে পরদিন সন্ধ্যায় গান হবে আমার গৃহে।

এমন বিদগ্ধ শ্রোতার সামনে গেয়েও যে সুখ। সুরেশ চক্রবর্ত্তী, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত চৌধুরী, দেবেন্দ্র মুর্দ্ধেশ্বর, প্রকাশ

ওয়াখেরা—এঁরা রয়েছেন শ্রোতাদের মধ্যে। বোম্বাই-এর পি. এল. দেশপাণ্ডে সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজালেন। নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চের প্রযোজক হিসেবে পি. এল. দেশপাণ্ডে এক বিখ্যাত ব্যক্তি। আকাশ-বাণীর নাটকের তদানীন্তন ডেপুটি চীফ প্রডিউসার। হারমোনিয়মের উপর তাঁর এত দখল সেটা না শুনলে বিশ্বাস করতাম না। তবলা সংগত করলেন শান্তারাম। এমন সুন্দর যন্ত্রসহযোগিতা এবং সামনে রয়েছেন অতি বোদ্ধা শ্রোতা। তাই ভীমসেন অনুপ্রাণিত হয়ে গাইলেন। আমি ভীমসেন-এর অ্যাডমায়ারার। আমার কলকাতার বাড়িতেও ভীমসেন আমায় গান শুনিয়েছেন। সংগীতের ভক্ত সাধক এই শিল্পী। স্বরবিন্যাসে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। একটি একটি করে স্বরের ইট গেঁথে রাগের ইমারত গড়ে তুলছেন সুনিপুণ দক্ষতায়। সব চেয়ে মুনশীয়ানার পরিচয় সা-তে পৌঁছনোর কায়দায়। ছুঁই-ছুঁই করেও ফিরে আসছেন বার বার। মনে হল এইবার দাঁড়িয়ে পড়বেন সা-র উপর। কিন্তু না, এড়িয়ে চলে গেলেন এক ধাপ উপরে। আবার শিল্পী ধাপে ধাপে ফিরে এলেন নীচের স্বরগুলিতে। সমস্ত শ্রুতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা সা-তে বিলীন হয়ে যাবার। এদিকে শ্রোতার মনও ব্যাকুল হয়ে সা-কে স্পর্শ করতে চাইছে। কিন্তু তা হতে দিচ্ছেন কোথায় শিল্পী? শ্রোতার আগ্রহ যখন তুঙ্গে পৌঁছল তখনই শিল্পী সা-তে নিজেকে সমর্পণ করে একাত্ম হয়ে গেলেন স্বরের সঙ্গে। মনে আছে একবার আমি নিজেও ভীমসেনের কাছে আকুতি জানিয়েছিলাম সা-তে পৌঁছে যাবার জন্য। চিৎকার করে বলে উঠেছিলাম, 'আর পারছি না, সা লাগাও।' উদাত্তকণ্ঠে শিল্পী যখন সা-তে পৌঁছলেন তখন অনির্বচনীয় একটা আনন্দের মুহূর্ত।

এক্স্‌ট্যারনল্ সার্ভিসে বাংলা কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় না। ক্বচিৎ বিশেষ উপলক্ষে রবীন্দ্রসংগীত বা বাংলা লোকগীতি প্রচার করা হলেও বাংলা নাটক, কথিকার কোনো অনুষ্ঠান নেই।

কিন্তু মজার ব্যাপার কলকাতার দুই অসামান্য নাটকের শিল্পী একস্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিসে বাংলা নাটকের ডায়লগ বলে রেডিয়োতে প্রথম শিল্পী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। এর আগে কলকাতা বেতারে কোনো নাট্যানুষ্ঠানে এই দুই শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন নি। অন্যভাবে বললে ঠিক বলা হয় কথাটা— এঁদের কলকাতা বেতার থেকে ডাকা হয় নি, এঁরাও অডিশনের প্রার্থী হন নি। একটা অপূর্ব মঞ্চ নাটকের অভিনয় উপলক্ষ করে আমরা এই দুই অভিনেতা অভিনেত্রীকে পেয়ে গেলাম।

১৯৫৫ সনের মার্চের গোড়ায় সপ্রু হাউস মঞ্চে বিভিন্ন ভাষার নাটকের একটা সমারোহ আয়োজিত হল। কলকাতা থেকে এল বহুরূপী গোষ্ঠী। ছ-সাত বছর কলকাতায় যাই নি। ওদের নাটকও দেখি নি। কিন্তু এই গোষ্ঠীর খ্যাতি দিল্লীতে এসেও পৌঁচেছে। স্ত্রীকে নিয়ে দেখতে গেলাম তাদের 'ছেঁড়া-তার' নাটকের অভিনয়। নাটক দেখছি না, নাটকীয়তা নেই। উচ্চ-গ্রামের সংলাপ নেই। ক্ষুধা, অন্নাভাব, দারিদ্র্যের চরম দুর্দশার হাহাকারের মধ্যে আমি যেন অসহায় একটি মানুষ। নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললাম। জীবনে নাটক দেখে এমন অভিভূত হই নি আগে। কণ্ঠের স্বর বুকে বসে গেছে, দেহও ভারী হয়েছে। নাটক শেষে আসন ছেড়ে উঠতে পারছি না। ঘুমোতে পারলাম না সে রাতে। সারাটা রাত চরিত্র-গুলি আমায় তাড়িয়ে মারল।

পরদিন অফিসে গিয়ে প্রথমেই দেখা করলাম ডিরেক্টর মিস্‌ মাসানীর সঙ্গে। বললাম গত সন্ধ্যার নাটকের অভিজ্ঞতার কথা। তিনিও দেখেছেন জানালেন এবং ভাষার বাধা সত্ত্বেও দারুণ ভালো লেগেছে ওঁর। একটি প্রস্তাব রাখলাম যে রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকের একটি-দুটি দৃশ্য শম্ভু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্রকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে নিয়ে যথাযথ ব্যাখ্যাসহ আমরা বিদেশী শ্রোতার কাছেও

পরিবেশন করতে পারি। মিস্ মাসানী বললেন কিছুক্ষণ পর আমায় টেলিফোন করে জানাবেন।

আমার রুমে ফিরে এসে দেখি সৈয়দ জাফরি বসে আছেন। ছোটোখাটো মানুষটি, অসাধারণ স্মার্ট। আমাদের ইংরেজি ঘোষক। দিল্লীর থিয়েটার জগতের একটি বিশেষ পরিচিত মানুষ। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন 'ছেঁড়া-তার' কিরকম লাগলো। পাল্টা ওঁর অভিমত জানতে চাইলে সৈয়দ জাফরি বললেন যে নাটকের প্রযোজনা এবং অভিনয়ের একটা নূতন ভাবনার সন্ধান পেয়েছেন। তিনি জানালেন যে আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল জগদীশ মাথুরও এই নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। সৈয়দ জাফরিকে বললাম মিত্র-দম্পতীকে রেডিয়োতে প্রোগ্রাম দেবার আইডিয়াটা। ওঁদের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে সৈয়দ জাফরি স্টুডিয়োতে চলে গেলেন।

মিস্ মাসানী ফোনে আমার প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। বললেন এই শিল্পীরা রাজী হলে আগামীকালই রেকর্ডিং হবে। নাটকের সর্বোচ্চ ফি উভয়কেই দেওয়া হবে। কলকাতা স্টেশনের অনুমতির দরকার নেই, পরে জানিয়ে দিলেই হবে। কলকাতার অনুমতির দরকার নেই শুনে বুঝতে পারলাম যে অনুমতিটা অনেক উচ্চতর মহল থেকেই এসেছে। দিল্লীর মডার্ন স্কুলের গেস্ট হাউসে শম্ভুবাবুদের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করলাম। ঠিক পরদিনই রেকর্ডিংটা হল না। থিয়েটার-পাগল সরোজ মুস্তাফির সঙ্গে তাজ-মহল দেখতে গেলেন এঁরা। পরের দিন এঁদের অভিনয় রেকর্ড করা হল এবং প্রচার করা হল বিদেশী শ্রোতার কাছে। দুই বড়ো শিল্পীকে পেয়ে রেডিয়োর নাটকের বিভাগ সমৃদ্ধ হল।

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে এসে যায়। বেতারের নাটক কিন্তু মঞ্চের নট-নটীর কাছে খুব একটা বিশেষ পরিচিত ক্ষেত্র নয়। একটা

আর্ট-ফর্ম হিসেবে নাটককেও রেডিয়ো গ্রহণ করেছে। কিন্তু অতি সীমিত গণ্ডির মধ্যে নাটককে আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে রেডিয়ো-মাধ্যমের ভিতর। মনে পড়ে রেডিয়োর চাকরির ইন্টারভিউ-এর সময় নির্বাচক-মণ্ডলীর একজন প্রশ্ন করেছিলেন বেতার, মঞ্চ, এবং ফিল্ম-এর সিনারিয়ো-র পার্থক্য বুঝতে পারি কিনা। প্রথমটা কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, পরে মনে সাহস সঞ্চয় করে উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম।

বললাম, 'বেতারে শুধু শুনতেই পাই।'

এটুকু বলার পরই দেখলাম ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায় মাথা নাড়ছেন। আরো একটু সাহস এল মনে।

তার পর বললাম, 'মঞ্চে শুনতে পাই, দেখতেও পাই। সিনেমায় শুনতে পাই, দেখতে পাই এবং ঘটনাস্থলেও উপস্থিত হই।'

ভয়ে ভয়ে বললেও উত্তরটা মোটামুটি ঠিকই হয়েছিল মনে হল। আর কোনো প্রশ্নবাণ আমার প্রতি ছোড়েন নি কেউ। রেহাই পেয়ে বাঁচলাম।

রেডিয়ো-নাটকের এই যে সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ চোখের সামনে নাটকের চরিত্রগুলিকে দেখতে না পাওয়া, সেটা একটা দারুণ অভাব। পাত্রপাত্রীর মুখের চোখের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না সুন্দর সুন্দর মানুষগুলিকে, রূপসী নায়িকার দেহের লাবণ্যও উপভোগ করতে পারল না আমার চোখ। 'এ' মার্কা মঞ্চ নাটকের সে রকম বিশেষ কোনো দৃশ্যও চোখের সামনে ভেসে ওঠে না বেতার-নাটকে। তার উপরও যেহেতু শ্রবণের জন্য বেতার-নাটক, আর-একটা বড়ো রকমের অসুবিধাও রয়েছে এই নাটকের প্রযোজনায়। মেয়েদের গলার আওয়াজে খুব পার্থক্য থাকে না। তিন-চারটি মাত্র স্ত্রী চরিত্র থাকলেও শুধু গলা শুনে আলাদা আলাদা করে চিনে নেওয়াটা সহজ হয় না। তাই বেতার-নাটকের আর-একটা লিমি-টেশন হল যে এতে বেশি চরিত্র থাকতে পারবে না। কর্ণার্জুনের

মতো নাটক রেডিয়োতে প্রযোজনা করা সম্ভব হবে না। প্রিয়বান্ধবীর মতো বই রেডিয়োর জন্য আইডিয়াল। অভিনেতার দিক থেকেও একটা আবেগময় জোরালো সভঙ্গি সংলাপ আউড়ে দর্শক-শ্রোতার কাছ থেকে হাততালি আদায় করে নেবার কোনো সুযোগ নেই বেতার-নাটকে। মৃত সৈনিক বা কথা বলে না এমন কোনো ভূমিকাও নেই এই নাটকে। মেক্ আপ-এর চমৎকারিত্বে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার উপর কোনো প্রভাব বিস্তারেরও উপায় নেই রেডিয়োতে। সিন্-সিনারির ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেই বেতার-নাটকে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের মতন একাধিক দৃশ্যও একই সঙ্গে উপস্থাপনা সম্ভব নয়।

এত-সব লিমিটেশন থাকা সত্ত্বেও কিন্তু রেডিয়ো আবিষ্কারের দিনটি থেকে এই দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাবার পরও, বেতার-নাটক চলছে এবং মনে হয় চলবে অনন্তকাল। টেলিভিশন ফিল্মকে কোণঠাসা করতে পারলেও বেতারের নাটক কিন্তু বিপন্ন হয় নি। অথচ বেতার-নাটকের প্রযোজকের হাতে আছে মাত্র দুটি জিনিস—ডায়লগ এবং সাউণ্ড ইফেক্ট। এই দুটি উপকরণ মাত্র সম্বল করে নাটক বেঁচে আছে এখনো। প্রধানত ডায়লগ বা কথায় কথায় এগিয়ে চলবে গল্প। অ্যাক্‌শন দৃষ্টিগোচর নয়, তাই কথার মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলতে হবে পরিবেশ। তরুণ-তরুণী বেলা-শেষে নির্জন নদীতীরে পাশাপাশি এসে বসল বালির উপর। পশ্চিম গগনে সূর্য ডুবছে সিঁদুরে মেঘের আড়ালে। পেছনে ঝাউ গাছের পাতার ফাঁকে বয়ে চলেছে মৃদু-মন্দ পবন। ওপারের গাছগুলির উপর সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে, বাড়িঘর আবছা আবছা দেখায়। পুব আকাশে আসন্ন পূর্ণিমার চাঁদও উঠেছে। শ্রীমতীর চরণ ধুয়ে নিচ্ছে স্রোতের জল। মাঝগাঙে একটি জেলে-ডিঙিও ধীর গতিতে বৈঠার টানে উজান চলে যায়। এই পূর্ণ দৃশ্যটি কথোপকথনের মধ্য দিয়েই শ্রোতার মনে পৌঁছে দিতে হবে।

এর পর পাশাপাশি বসে শুরু হল বিশ্রম্ভালাপ অতি মৃদু স্বরে। ছেলেটির অনুরোধে মেয়ে গুন গুন করে গাইছে রবীন্দ্রসংগীত। এদিকে এত কাছাকাছি বসা যুবক-যুবতীর দিকে তাকিয়ে মাঝির মনটাও মোচড় দিয়ে উঠল এবং মাঝি মাঝদরিয়ায় গান ধরল, 'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতাম পারি না।' মাঝির গান এবং ওপারের প্রতিধ্বনিও ভেসে এল যুবক-যুবতীর কানে। এই নিভৃত প্রেম-গুঞ্জন, গুনগুন গান, মাঝির ভাটিয়ালি এবং তার প্রতিধ্বনি, রেডিয়োর স্টুডিয়োতে এগুলি রেকর্ড করা নেহাতই মামুলী কাজ। শব্দ-সংযোগ যে আরো কত গভীর অনুভবের সৃষ্টি করতে পারে! কুলুকুলু স্রোতের শব্দ, দাঁড়টানার আওয়াজ, গাছের পাতার ফাঁকে বাতাসের নিঃসরণ, এই শব্দগুলি তো তৈরি করাই থাকে লাইব্রেরিতে। দূর গ্রামে দেবালয়ে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি এবং ওপার গাঁয়ের কুলবধূর উলুধ্বনি, আর পাখিদের কুলায় ফেরার কাকলি ঘনায়মান সন্ধ্যার পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলবে কত সহজে।

গুনগুন গান থেমেছে, কথাও থেমেছে যুবক-যুবতীর। ক্ষণিকের নীরবতা, কিন্তু মাত্র এক দুই সেকেণ্ডের নীরবতায় শ্রোতার মন কত-না কল্পনার জাল বুনছে এই প্রেমিক-যুগলকে নিয়ে। এই ক্ষণিক নীরবতার মুহূর্তে রেডিয়োর সামনে বসে থাকা দুই সখী দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। এঁরা কি আর বুঝতে পারছেন না? রেডিয়ো-নাটকে সাইলেন্স প্রয়োগ-নৈপুণ্যে অতিশয় কল্পনামুখর হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া উপযুক্ত সংগীতের ব্যবহারও একটি মুহূর্তকে শ্রোতার অনুভূতির গভীরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

রেডিয়োর আয়ত্তে আর-একটি বিশেষ উপকরণ— রেডিয়োর মাইক ক্ষীণতম শব্দকেও গ্রহণ করতে পারে। তরুণ-তরুণীর এই-যে মৃদু প্রেমালাপ সেটা রেডিয়োর মাইকে খুবই স্বাভাবিক। ভালো-বাসার কথা কেউ তো আর চিৎকার করে বলে না। বৃহৎ প্রেক্ষা-

গৃহের শেষপ্রান্তে 'আমি তোমায় ভালোবাসি', অনুরাগে রঞ্জিত এই কথাটি পৌঁছে দেওয়া সহজ নয়। সোহাগ, আদর, চুম্বন, লোকচক্ষুর সামনে করতে পারি কি? ভালোবাসি কথাটি তৃতীয় কানে পৌঁছতে পারে তেমন জোরে কখনো বলি কি? সহজ স্বাভাবিক ভাবে তা পারা যায় বলে আমার মনে হয় না। মঞ্চের পাত্র-পাত্রীর ভালো-বাসাটা কেমন যেন কৃত্রিম মনে হয়। চুপিচুপি কথা বলা, অতি মৃদু প্রেমগুঞ্জন— এগুলি সুন্দরভাবে রূপায়ণ সম্ভব রেডিয়োতে। একটা কথা আছে— you can kiss the microphone। মাইকের ধর্মটা একবার জেনে নিতে পারলে প্রণয়ের রূপায়ণ পাত্র-পাত্রীর পক্ষে অনেক সহজ রেডিয়োতে। এদিকে নদীর পারে বালির উপর বসে ঘনিয়ে আসা নির্জন অন্ধকারে প্রণয়ীযুগল যখন নিবিড় প্রেম-বিহ্বলতায় মগ্ন সেই অবসরে চুপি চুপি গাছের আড়ালে আড়ালে চোরের মতো পুলিসের ছদ্মবেশে দুই দুর্বৃত্ত এসে উপস্থিত ওদের সামনে। ধ্বনির নিপুণ প্রয়োগে অতি সুষ্ঠুভাবে এই চিত্রটি তুলে ধরা যায় শ্রোতার কানে। শ্রোতা কান দিয়ে শোনেন, মন দিয়ে দেখেন।

রেডিয়োর নাটক শ্রোতার ইমাজিনেশনের উপর অনেকটা ছেড়ে দেয়। এই যে নাটক শুরু হল নির্জন নদীতীরে তরুণ-তরুণীকে নিয়ে একে মুখ্যত সহজ, সরল ছোটো ছোটো সংলাপের উপর এগিয়ে চলতে হবে। পরিবেশ তৈরি করবে ধ্বনির প্রয়োগ, কখনো-বা সংগীতের, গল্পকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রযোজকের সজাগ দৃষ্টি থাকবে গতি যেন কখনো মন্থর না হয়, মুহূর্তের জন্য শ্রোতার মনো-যোগ নষ্ট না হয়ে যায়। রেডিয়োর নাটক ওঅ্যার্ড এবং সাউণ্ড-এর ব্যাপার। সেই কারণেই মঞ্চের নাটক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সংলাপের ভাষা এবং ট্রিটমেণ্টও অন্যরকম। মঞ্চ-সফল একটি নাটককে সরাসরি রেডিয়োতে প্রচার করা যায় না। এমন মঞ্চ-নাটককে কখনো যদি নিতেই হয় তবে তার শরীরটা বেতারের প্রয়োজনীয়তা

অনুযায়ী ঢালাই করে সাজিয়ে নিতে হবে। এই adaptation-এর কাজটি বেশ কঠিন। নাট্যকার এবং প্রযোজকের মিলিত চেষ্টায়ই শুধু হওয়া সম্ভব। বেতারের নাটকের জন্য এক লেখকগোষ্ঠী তৈরি হবে এমনটা আশা করতে পারি না এদেশে যেখানে মঞ্চের জন্যই ভালো নাটকের অভাব। তবু সারা দেশের রেডিয়োর ভাষা যদি একটিমাত্র হত তা হলেও না-হয় শুধু নাটকের জন্যই এক লেখকগোষ্ঠী আকৃষ্ট হত। বাংলা ভাষা আর ক'টি বেতারকেন্দ্রের! তাই ভালো নাটক লিখতে এগিয়ে আসছেন না শক্তিমান লেখক। মস্ত সমস্যা। প্রযোজনার সমস্যাও অনেক। বেতার-নাটক নিয়ে বিশেষ একটা ভাবনা হয়েছে কখনো তার নিদর্শন নেই এদেশে। ইমেরিটাস আর্টিস্ট হিসেবে রেডিয়োতে নিয়োগ করা হয়েছিল হারীন চট্টো-পাধ্যায়, ফিরাক গোরখপুরীকে। রেডিয়ো ফিচারের বিষয়ে ইমেরিটাস আর্টিস্ট মেল্‌ভিল ডিমেলোর যতটা অবদান, পূর্বোক্তদের কোনো বিষয়েই কিছু অবদান আছে কিনা আমার জানা নেই। হয়তো আছে। কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রে এসেছেন ইমেরিটাস আর্টিস্ট পদে মঞ্চের এক অসামান্য অভিনেত্রী। যিনি মঞ্চকে জানেন ভালো করে আর রেডিয়োকেও জানেন অনেককাল ধরে তাঁর কাছেই তো আশা করব বেশি। আমি তৃপ্তি মিত্রের কথা বলছি।

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বেই একটি মানুষের পূর্ণতা। যে-কোনো একটির অভাবই জীবনের ভারসাম্যকে একেবারে তছনছ করে দিতে পারে। আমার দ্বিতীয়টি গেল, পুরোপুরিই চলে গেল। কৈশোর থেকে রীতিমত ব্যয়ামপুষ্ট দেহ, এই শাস্তির কি কারণ বুঝতে পারলাম না। চিকিৎসকরাও কোনো কারণ বলতে পারলেন না, ভালো হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থাও করতে পারলেন না, আর কোনো চিকিৎসা জানা আছে কিনা সেটাও জানালেন না। তবে টাকা নিলেন মুঠো মুঠো। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি,

আয়ুর্বেদীয়, য়ুনানী— সর্বপ্রকার চিকিৎসকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরলাম এবং টাকা দিলাম। চিকিৎসা জানেন না বলে টাকা নেবেন না সেরকম এথিকস্ চিকিৎসকের মধ্যে নেই। রাগ করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া বন্ধ করলাম। আমার দুধওয়ালার সুপারিশ মতো পীরের মন্ত্রপূত জলপড়াতেও কোনো উপকার হল না। আমার ঘরের কাজে সাহায্যকারী কালুরাম এবার অসাধারণ এক কবচের ব্যবস্থা করল, ব্যবহারে অব্যর্থ ফললাভ। নামটাও কম বড়ো মাপের নয়। আড়াইশোবধী কবচ, আড়াইশো বিভিন্ন প্রকার জীবের পুং অঙ্গের রসে জারিত করা, তাও ধারণ করলাম। কোনো ফল নেই। তার পর দিল্লীর বিখ্যাত সানাইবাদক ওমরাও সিং বাড়িতে এসে আমার স্ত্রীকে বিশেষ করে বলে গেলেন যে রাত্রে শোবার আগে কয়েক ফোঁটা সরাব কানে ঢেলে দিতে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখা যাবে যে সব সেরে গেছে। 'দ্রব্যের' একটি ছোটো বোতল রেখেও গেলেন। ওঁর পরিবারে যে-কোনো অসুখে এটাই একমাত্র ওষুধ। সস্নেহ আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও ওমরাও সিং-এর বিধানটি মেনে নিতে পারলাম না। কান গেল, চিকিৎসায় সামান্য যা-কিছু সঞ্চয় এবং স্ত্রীর গহনা— তাও গেল। কি যে দুঃসহ গ্লানি। প্রথমটায় মন একেবারে ভেঙেই গিয়েছিল। আস্তে আস্তে মন শক্ত করে ভগবানের মার হিসেবেই গ্রহণ করলাম। আবার দশ বছর বাদে পুরোপুরি ফিরে পেলাম যখন শ্রবণশক্তি তখনো ভগবানের দান বলেই প্রণাম জানালাম।

প্রায় বিনা নোটিশেই এল এই বধিরতা। স্টুডিয়োতে রেকর্ড করছিলাম কলকাতারই এক তরুণী শিল্পী মালবিকার গান। সদ্য তখন রায় থেকে কাননে রূপান্তরিত হয়েছে পদবীটা। সব রেকর্ডিং-এর সময় স্টুডিয়োতে যেতে পারি না। কিন্তু নিজেই গেলাম এই রেকর্ডিং করতে, কারণ এ. কানন আমার বড়ো অন্তরঙ্গ। বিয়ের মাত্র

কয়েকদিন পরই রেকর্ডিং করতে এসেছেন মালবিকা। অবাঙালি দক্ষিণের এই ছেলেকে বিয়ে করাতে কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য, বিরুদ্ধ সমালোচনা যে শুনতে হয় নি মালবিকাকে এমন নয়। আমি বললাম মালবিকাকে যে কাননের মতো হৃদয়বান ছেলে জীবনে বেশি দেখি নি। এ কথায় মালবিকার মুখে একটা উজ্জ্বল আভা দেখেছিলাম কি? কথাটি ওঁর মনে গভীর ছাপ রেখেছিল, কারণ তখন এই স্বল্পভাষী লাজুক মেয়ে কিছু না বললেও পঁচিশ বছর বাদে আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তখন কি বলেছিলাম।

মালবিকার গান ভালো করে শুনব বলেই নিজে রেকর্ড করতে এলাম স্টুডিয়োতে। মালবিকা এবং মীরা চট্টোপাধ্যায় (পরে বন্দ্যোপাধ্যায়) বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে অল্প বয়সে ন্যাশনল্ প্রোগ্রাম এবং রেডিয়ো সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। মালবিকার গান শুনে ভালো লাগল, পরিচ্ছন্ন গাওয়া। রাগরূপ অতি বিশুদ্ধ। খুব যত্ন করে শিখিয়েছেন পিতৃদেব রবীন্দ্রলাল রায়। তিনি তখন দিল্লী ইউনিভার্সিটির সংগীতবিভাগের প্রফেসর এবং ডীন। একটা শুচি-স্নিগ্ধতা মালবিকার গানে, যেটা পরিস্ফুট তাঁর চেহারাতেও। যেন দেবমন্দিরে বসে গান শুনছি। কিন্তু রেকর্ডিং চলার সময় কিছুক্ষণ পর পরই স্পীকারের লেভেল বাড়াতে হচ্ছে। রেকর্ডিং যখন শেষ হল দেখলাম স্পীকারের লেভেল নর্মালের চেয়ে অনেক বেশি। অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে তার কাছে অসহনীয় উঁচু মনে হত। ভীষণ অসহায় বোধ করলাম। চলে গেলাম ডিরেক্টরের ঘরে। বললাম কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তিনি আমায় শান্ত হয়ে বসে বিশ্রাম করতে বললেন। তার পর সব্‌দর্‌জং হাসপাতালের E. N. T. বিভাগের কর্তাকে টেলিফোন করে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে দিলেন। কত যে কাটা-চেরা হল তার ইতিহাস এখানে নয়। বছর-খানেক চিকিৎসার পর যখন মনে হল কিছু হবার নয় তখন সিদ্ধান্ত নিলাম

যে-চর্চাটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম কাজের চাপে পড়ে, সেটা আবার শুরু করব।

সুদূর কলকাতা থেকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের উপহার একটি তানপুরা নিয়ে এলেন এ. কানন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয় করিয়ে দিলেন অতি অল্পব্যয়ে উৎকৃষ্ট স্কেল চেঞ্জ হারমোনিয়ম। আর অতি অল্প দক্ষিণার বিনিময়ে বাড়ি এসে গান শেখাতে রাজী হলেন উস্তাদ নাসির আহ্‌মেদ খাঁ। এই গুরুর কৃপালাভ ঘটেছে একটানা চার বছর। খাঁ সাহেব বয়সে ছোটো, অমায়িক স্বভাব, একেবারে গান-পাগল মানুষ। উস্তাদ চাঁদ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, উস্তাদ উসমান খাঁর পুত্র। গৃহেই তালিম পেয়েছেন, বাইরে যাবার দরকার হয় নি গান শিখতে। তবে তাঁর খেয়ালগানে যে অঙ্গটিকে তিনি নিজের গায়কীতে প্রাধান্য দিলেন সেটা কিন্তু তাঁদের পরিবারের বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর তানের গতি ছিল খুব এবং সুন্দর সুন্দর নকশার তান করতেন অবলীলায়। কিন্তু তানটাই তো গান নয়, অলংকার মাত্র। বেশি তানের ভারে রাগের শরীরটা জবুথবু হয়ে যায়, স্বাভাবিক সৌন্দর্যও নষ্ট হয়। স্থায়ী স্বরের রিয়াজ না করে শুধু তানবাজি করলে আওয়াজ তার কমনীয়তা হারিয়ে ফেলে সেটা দেখেছি আমার উস্তাদের মধ্যে। খাঁ সাহেবকে ভীষণ ভালোবাসি। মানুষটি এত সরল। কিন্তু গুরুর কাছে আমার ধারণাটা নিবেদন করি কী ভাবে! কণ্ঠসংগীতের প্রথম দাবি বিশুদ্ধ নির্মল আওয়াজ। এমন কোনো কসরতের দরকার কি যাতে আওয়াজটাই খারাপ হয়ে যায়? আওয়াজ গেল তো গানের রইল কি!

এই সময়, অর্থাৎ যখন শুনতে পেতাম না ভালো, খুবই অসুবিধা হত কাজ করতে। কিন্তু উপরে নীচে যাঁদের সঙ্গে আমার কর্মজীবন তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি আন্তরিক সহানুভূতি এবং সুবিবেচনা। স্টুডিয়োতে ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুগণ আমার কাজে অনেক সাহায্য করেছেন।

আমার ইউনিটে ছিলেন উমা বাসুদেব। চারুদর্শিনী প্রিয়ংবদা এই মেয়ে আমার হয়ে বিরাট এক্স্ট্যারনল্ সার্ভিসের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। রাজেশ্বরী দত্তর ভ্রাতুষ্পুত্রী এই মেয়ের কত খ্যাতিই হয়েছে পরে লেখিকা হিসেবে। উমার সঙ্গে রেকর্ড লাইব্রেরিয়ান কানাই মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতাও ছিল খুব। এঁরা দুজনে যতটা সম্ভব মিউজিক ইউনিটের কাজে আমার ঝামেলা-বঞ্ঝাট কমাবার চেষ্টা করতেন। আই. সি. এস. দুহিতা, বিদেশে শিক্ষা-প্রাপ্তা ইংরেজি ঘোষিকা শান্তি পাইও কি কম সাহায্য করেছেন? এ. এল. মৈনী, রণবীর ভোরা, ইক্‌বাল মালিক, কে. গণেশন— এঁদের মতন অফিসাররা আমার পাশে না থাকলে হয়তো আমায় চাকরিই ছেড়ে দিতে হত। প্রবাসে, শক্ত মাটির দেশে যে নরম হৃদয়ের স্নেহ পেয়েছি তাতে অভিভূত হয়ে গেছি। স্নায়ুর চাপেও ভুগেছি তখন। প্রায়ই প্রকাশ ওয়াধেরা বাড়িতে এসে মধুর বাঁশি বাজিয়ে আমার মনটাকে শান্ত করে দিতেন। আসতেন দেবেন্দ্র মুর্ধেশ্বরও মাঝে মাঝে। দেবেন্দ্র পান্নালাল ঘোষের জামাতা, কোঙ্কণের ছেলে, কিন্তু বাংলা বলেন খুব সুন্দর, যেন মাতৃভাষা। অতি ভদ্র, বিনয়ী, বন্ধু-বৎসল। দেবেন্দ্র পান্নাবাবুর সুযোগ্য শিষ্য। পান্নালাল ঘোষের কাছেও ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছি অনেক। নিজে পরম ধার্মিক, আমাকেও সর্বদা ধর্মচিন্তা এবং প্রার্থনা করতে বলতেন।

রবিশংকরের বিদায়ের পর পান্নাবাবু আকাশবাণী বাদ্যবৃন্দের পরিচালক নিযুক্ত হন। উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ বিয়েবাড়ির সানাইকে কৌলিন্যের মঞ্চে বসিয়ে রাগসংগীত রূপায়ণের একটি প্রধান যন্ত্রে পরিণত করলেন। ঠিক তেমনি পান্নাবাবুও বাঁশিকে বীণা সরোদ সেতারের পাশে সমপঙ্‌ক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাঁশিতে রাগের সমস্ত অঙ্গ বজায় রেখে বিলম্বিত গৎ বাজানো যায়— পান্নাবাবু তা দেখালেন। রাখালিয়া বাঁশি উন্নীত হল একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্রে।

তালিমও পেলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্য আলাউদ্দিন খাঁর কাছে। পান্নাবাবু বাঁশি বাজালেন বলেই প্রতিভাবান শিল্পীরা বাঁশির দিকে এগিয়ে এলেন। আমরা পেলাম দেবেন্দ্র মুর্ধেশ্বর, বিজয় রাঘব রাও, প্রকাশ ওয়াধেরা এবং বিশেষ করে হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার মতন শিল্পীদের। হরিপ্রসাদ তো একটি বিস্ময়। তাবড় তাবড় সেতার-সরোদ বাজিয়ের সঙ্গে বসিয়ে দিন-না। দেখবেন টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেছেন। হরিপ্রসাদের ফুঁ-এর উপর যে নিয়ন্ত্রণ সেটা উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁকেই মনে করিয়ে দেয়। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানটা যত গভীর হরিপ্রসাদের বাঁশির ধ্বনি প্রায় সেরকমই গভীর। ওঁর বাঁশি শুনে তো কান্না চেপে রাখতে পারি না। আলা-উদ্দিন দুহিতা অন্নপূর্ণার কাছে তালিম পেয়ে হরিপ্রসাদের রাগ বিস্তার, বিন্যাস অনবদ্য। রোডিয়োর কটক কেন্দ্রের এক অখ্যাত স্টাফ আর্টিস্ট-এর মধ্যে এমন গুণ ছিল খুব বেশি মানুষ সেটা জানত না। আমাদের তারকদার সুযোগ্য পুত্র কলকাতা কেন্দ্রের অলক-নাথ দে-ও কম না। লঘু-সংগীতে অলক বোধ হয় ভারতের সব চেয়েই ভালো।

বাঁশির এই-সব শিল্পীদের প্রেরণার উৎস কিন্তু পান্নালাল ঘোষ। এই বিরাট শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হল একটা মনোরম কাব্যময় পরিবেশে, পূর্ণ চাঁদের আলোয় তাজমহলের নীচে। মাসটা এপ্রিল, ১৯৪৬ সন। তখনো রেডিয়োতে ঢুকি নি। দিল্লীতেই আছি। পান্নাবাবু এসেছেন বোম্বাই থেকে দিল্লী বেতার-কেন্দ্রে প্রোগ্রামের জন্য। ওঁর বাঁশি-বাজনা শুনলাম রেডিয়োতে। শিল্পীকে তখনো দেখি নি, চিনি নি। আগে কি জানতাম সস্ত্রীক আমি যেদিন আগ্রায় যাব তাজমহল দেখতে সেদিন পান্নাবাবুও যাবেন স্ত্রী, কন্যা এবং ভাই নিখিলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে! আমার পরম সৌভাগ্য, ব্যাপারটা তাই ঘটে গেল। পূর্ণিমার রাত, প্রেমের সমাধি মন্দিরের নীচে বসে

বাঁশি-হাতে পান্নাবাবু, পাশে বিখ্যাত প্লেব্যাক-শিল্পী পান্নাবাবুর স্ত্রী পারুল। এই পবিবেশটাই সংগীতময়। তার উপর পান্নাবাবুর বাঁশিতে যদি বেজে ওঠে বিরহের সুর তা হলে কি হয় সেটা বলার নয়, অনুভবের।

এই সময় যে মানুষটি অগ্রজের মতো আমায় সর্বক্ষণ সান্ত্বনা দিয়েছেন, বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব জীবনটাকে ব্যর্থ করতে পারে না, সর্বদা উপদেশ দিয়েছেন হতাশার শিকার না হতে, সেই পরম-সুহৃদ হলেন স্বর্গত সুরেশ চক্রবর্তী। সংগীতের এক মহাপণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের জন্য সমস্ত ভারতে সম্মানিত ব্যক্তি। শুধু সংগীত কেন— প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস এবং ভারতীয় দর্শনে গভীর জ্ঞান। যথার্থ বিদ্বান, আদর্শবান তেজস্বী পুরুষ। দুর্নীতির সঙ্গে আপস করেন নি কোনোদিন। রেডিয়োর জন্ম থেকেই প্রায় আছেন এই সংস্থায়। এক কালে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সক্রিয় সভ্য ছিলেন শুনেছি। কিছুকাল কারাবাসেও ছিলেন। কিন্তু পুলিস কিছুই প্রমাণ করতে পারে নি ওঁর বিরুদ্ধে। আমি প্রথমে ঢাকা বেতার-কেন্দ্রে প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ পদে ওঁকে দেখি। প্যান্ট-কোট টাই কখনো ব্যবহার করেন নি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে কলকাতায় প্রডিউসারের পদ গ্রহণ করলেন এবং তার পর দিল্লীতে ডেপুটি চীফ প্রডিউসারের পদে এলেন। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। মাথার চুল ঘন কৃষ্ণ। না, রঙ লাগাতেন না। বয়সটা তখন ষাটের উপরে, দেখাত অনেক কম। ইন্‌সিওরেন্সের দালাল বাড়িতে ঘোরাঘুরি করছেন একটি পলিসি বিক্রি করার আশায়।

একদিন দুপুরের বিরতির সময় আমার ঘরে বসে আছেন সুরেশদা। একজন এজেন্ট খুঁজে খুঁজে এলেন আমার ঘরে এবং সুরেশদাকে পাকড়াও করলেন। ইন্‌সিওরেন্সের উপকারিতা সম্পর্কে

খুব বোঝালেন। বিপদের সময় এর প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন। চুপ করে থেকে এজেন্ট ভদ্রলোকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন অনেকক্ষণ। তার পর গম্ভীরভাবে সুরেশদা বললেন, 'এত করে যখন বলছেন তখন একটা পলিসি নিয়েই নিই।' অনুমোদনের জন্য আমার দিকে তাকালেন। এজেন্ট প্রপোজ্যাল ফর্ম বের করে নিজেই ভর্তি করতে লাগলেন। তার পর বয়সের ঘরে এসে বর্তমানের ঠিক বয়সটা জিজ্ঞাসা করলেন। নির্বিকার সুরেশদা দিন, মাস এবং জন্মসনটা বললেন মাথার উপর চলন্ত পাখাটার দিকে চেয়ে। এজেন্টের হাত থেকে কলমটা নীচে পড়ে গেল। আমিও হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

সূক্ষ্ম কৌতুকরসবোধ ছিল সুরেশদার। কাজেকর্মে ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। এই মানুষটি প্রায় প্রতি রবিবার সারাটা দিন কাটাতেন আমার বাড়িতে। উনি এলে খুব ভালো লাগত আমাদের। মনে হত পরমাত্মীয় একজন যাঁর সান্নিধ্যে সব মুশকিল আসান হয়ে যায়। আমার দুই শিশুকন্যা সুরেশদার ভক্ত। ছবি এঁকে দিতেন ওদের জন্য, মুখে মুখে ছড়া বানাতেন। কোনো কোনোদিন একটু সংগীতের শিক্ষাও আমি নিয়ে নিতাম। গান গেয়ে শ্রোতাকে মুগ্ধ করবার শক্তি ছিল না সুরেশদার, বাজাতেন এস্রাজ। কিন্তু শেখাতে পারতেন চমৎকার। নন্দকোশ রাগ আমি সুরেশদার কাছেই প্রথম শুনি। আমাকে শিখিয়েও দিয়েছিলেন। এই রাগ চিন্ময় লাহিড়ি একবার ন্যাশনল্ প্রোগ্রামেও গেয়েছেন। রাগটি সুরেশদারই সৃষ্টি। বছর-তিনেক দিল্লীতে সুরেশদার কাছাকাছি থেকেছি। এটা একটা পবিত্র সৎসঙ্গ।

সুরেশদার সঙ্গে আর-একজন ডেপুটি চীফ প্রডিউসার ছিলেন—নরেন্দ্র শুক্ল। হস্তরেখা বিচার করতে পারতেন ভালো এ সুবাদে উপরমহলে পরিচয় ছিল। অনেকেই তো এ-সবে বিশ্বাস করে

থাকেন। লাঞ্চব্রেকের সময় মাঝে-মধ্যে ঠাকুর জয়দেব সিং, নরেন্দ্র শুক্ল এবং সুরেশদা— এই তিনজনই কিছুক্ষণের জন্য আমার ঘরে এসে বসতেন। অমল হোমও কোনো কোনোদিন এ আড্ডায় অংশ নিতেন। অসাধারণ মিউনিসিপ্যাল গেজেট সম্পাদনা করে যিনি অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন একদা, রবীন্দ্রনাথের কাছের সেই মানুষটি রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিকল্পনার উপদেষ্টা রূপে সাময়িকভাবে রেডিয়োতে নিযুক্ত হয়েছেন।

একদিন এঁদের উপস্থিতিতে এক অলোচনা শুরু হল রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রূপান্তর প্রসঙ্গে। মূল সুরটি থাকবে অপরিবর্তিত, কিন্তু লিরিক নানা ভাষায় অনূদিত হবে। এই সিদ্ধান্তই নিয়েছে রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ। আমি সন্দেহ প্রকাশ করলাম যে অনুবাদে মূল লিরিকের ভাবার্থ যথাযথ ধরে রাখা সম্ভব হলেও অনূদিত লিরিক শ্রোতার চোখের সামনে না থাকলে অন্তত রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব হৃদয়ংগম করা সহজ নয়। তা ছাড়া কিছু কথা আছে যার সঙ্গে সুরের হয়েছে রাজযোটক। ভাষান্তরে সেই কথাটি না থাকলে সুরেরও মিলন হবে না। নিবেদন করলাম, 'কোন্ বলরামের আমি চেলা' অনুবাদে, 'কোন্ বলরামকা ম্যয় হু চেলা' গাইলে মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যাবে? এরকম আরো পঙ্‌ক্তি আছে যার অনুবাদ সহজ নয় ছন্দ মাত্রা বজায় রেখে। ছন্দ মাত্রা ধরে রাখতে না পারলে সঠিক সুরও রাখা যাবে না। তা ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের একটা আলাদা সংযম আছে, আছে একান্ত নিজস্ব স্টাইল। বহুদিনের সনিষ্ঠ শিক্ষা এবং অনুশীলনেই শুধু সে শক্তি আয়ত্ত করা যায়। বাঙালি আধুনিক শিল্পীর কণ্ঠেই কোনো কোনো সময় রবীন্দ্রসংগীত আর রবীন্দ্রসংগীত থাকে না। বিখ্যাত গজল গাইয়ের কণ্ঠে উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত রবীন্দ্রসংগীতে কি সেই বৈশিষ্ট্য অবিকৃত থাকবে? ওঁদের কাছে বললাম যে একবার শিলং-এ আমার বাড়িতে

কলকাতার মাস্তান গামা আমায় গান শোনালেন। কয়েকটি ঠুংরি এবং গজল গেয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের তারিফ লাভ করে সুন্দরী মহিলাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হামি রবীন্দ্রসংগীত ভি গাইতে পারে।' গাইলেনও 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী।' বাপ রে, সে কি অসম্ভব রবীন্দ্রসংগীত! 'স'-এর উচ্চারণ 'হ'-এর মতোই করলেন। কিন্তু 'সপোনচারিণীতে' হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢেলে কত-না সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখালেন। কখনো ভুলতে পারি কি সে রবীন্দ্রসংগীত?

অবাঙালি কেন গাইতে পারবেন না রবীন্দ্রসংগীত? তবে রাজেশ্বরী বাসুদেব বা বিজয়া আম্মার মতো দীর্ঘ অনুশীলন করতে হবে। সুতরাং বললাম যে এই দুরূহ কাজে রবীন্দ্রসংগীতকে বিকৃত না করে মূল গানটিকে ঘোষণায় উপযুক্ত ব্যাখ্যাসহ অবাঙালি শ্রোতার কাছে নিবেদন করলেই ভালো হবে। শ্রোতারা মূল রবীন্দ্রসংগীত কি জিনিস সেটাও শোনবার সুযোগ পাবেন। শ্রোতারা ভিন্নভাষী হলেও ভারতেরই লোক। তাই মূল রবীন্দ্রসংগীত উপভোগ করতে খুব একটা কষ্ট হবে না। মনে হল ভাষান্তরের সিদ্ধান্তটা অমল হোমের রেডিয়োর কাজে যোগ দেওয়ার আগেই কর্তৃপক্ষ নিয়ে নিয়েছিল। জানি না এবিষয়ে বিশ্বভারতীর মতামত বা রবীন্দ্র-সংগীতের বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হয়েছিল কিনা। রেডিয়োর বিভিন্ন কেন্দ্রে অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীতকে অনুবাদ করে ভালো ভালো শিল্পী দিয়ে গাওয়ানো হল। খরচ হল লাখ লাখ টাকা। কিন্তু শতবার্ষিকী বছরটি পার হবার পর এই গানগুলি আর কোনো কেন্দ্র থেকে শোনা গেল না। এই হিন্দি-উর্দু-মারাঠি-তামিল-তেলেগু রবীন্দ্রসংগীতের আর্টিস্টিক মূল্য কিছুমাত্র যদি থাকত তা হলে এই গানগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে যেত না।

আমি উস্তাদ সালামত আলি খাঁকে তন্ময় হয়ে লতা মঙ্গেশকরের

গ্রামোফোন রেকর্ড শুনতে দেখেছি। সেদিন এ. কানন, মালবিকা, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গোলাম মুস্তাফা খাঁ এবং আরো অনেক খেয়াল গাইয়েকে সুরের নেশায় বিভোর হয়ে মেহ্‌দী হাসানের গজল শুনতে দেখেছি রবীন্দ্রসদনে। কিছুকাল আগে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' গেয়ে মুগ্ধ করে দিলেন আমায়। রেডিয়োতে শুনে অসাধারণ ভালো লাগল গোষ্ঠগোপাল দাসের পল্লীগীতি। অথচ সারা জীবন আমি রাগসংগীতের পেছনে ছুটেছি। গাওয়া যদি ভালো হয়, কণ্ঠে সুর এবং হৃদয়ে ভাব যদি থাকে তবে যে-কোনো ধারার সংগীত আমায় আকর্ষণ করে। ব্যতিক্রমটাও দেখেছি।

সংগীতের ব্যাপারে কারো কারো মধ্যে একটা মানসিক নিশ্চলতা আছে। একটা শুচিবাই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখেছি যাঁদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া গান নেই। শ্রুতির বিচারে যার গান বেসুরো, গত পনেরো বছরে একবারও গলা দিয়ে শুদ্ধ শ্রুতি বের হয় নি, রেডিয়ো গ্রামোফোন যাকে বর্জন করেছে একযুগেরও আগে, তেমন অ-সুর লোকের রবীন্দ্রসংগীতের প্রশংসায়ও বলিষ্ঠ কলমটি তুলে ধরেন বিশিষ্ট লেখক। তাতে ক্ষতি হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতেরই। রবীন্দ্র-সংগীত তো অনন্তকালেরই। তবে উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, উস্তাদ আমির খাঁ, রবিশংকর, আলি আকবর খাঁ— এই-সব মহান শিল্পীরা কি করেন সেটাও তো জানতে বুঝতে হবে। আর বাঙালির একান্ত নিজস্ব সংগীত কীর্তন শুনলেও ক্ষতি কি? শুধু রবীন্দ্রসংগীত শোনার পরই আর কিছু শুনব না বললে নিজেকেই বঞ্চনা করা হয়। আর রবীন্দ্রসংগীত তো সংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত। রবিশংকর, আলি আকবর খাঁ কি বাজাচ্ছেন বোঝবার চেষ্টা করলে সংগীত সম্পর্কে কিছুটা বোধ জন্মায় এবং তখন রবীন্দ্রসংগীতের বোধিতেও উত্তরণ ঘটে। রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যগুণেই যাঁরা থেমে গেলেন তাঁরা একটু ভুল করলেন। কাব্যময়তা কবিতার ধর্ম। কবিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি

আর্ট ফর্ম। রবীন্দ্রসংগীত যেহেতু সংগীত, তার দাবি যে আর-একটু বেশি। 'গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো— বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।' কবি তো নিজেও রাগ-রাগিণীর চর্চা করতেন। সূর্যাস্তের সময় গঙ্গার বুকে জ্যোতিদাদার বেহালা-বাজনার সঙ্গে 'পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া' পৌঁছতেন তখন যে অসংখ্য রাগ-পরিক্রমা হয়ে গেছে পূরবী থেকে বেহাগ পর্যন্ত। আমি রবীন্দ্রসংগীত-ভক্ত হয়ে এটুকু জানতে চাইব না?

আমি এক ক্লাসিক্যাল দাদাকে জানি যিনি আধুনিক গানের সময় কানে তুলো গুঁজে দেন। ডিরেক্টরেটের সংগীত বিভাগেও ক্লাসিক্যাল গানে মোহাচ্ছন্ন মানসিকতার এক মাতব্বর ব্যক্তিকে সেদিন আবিষ্কার করলাম আমার ঘরেই। সুরেশদাকে একটা স্ক্রিপ্‌ট্ পড়ে শোনাচ্ছিলাম। লঘুসংগীতের উপর উদাহরণ সহযোগে তৈরি-করা একটি অনুষ্ঠান পাঠাতে হবে ভারতের বাইরে বিদেশী রেডিয়ো স্টেশনে। দ্বিতীয় চীফ প্রডিউসার নরেন্দ্র শুক্লও এসে বসলেন। মাঝামাঝি জায়গা থেকে তিনি শুনছেন। সর্বশেষ লঘুসংগীতের গানটি লতা মঙ্গেশকরের। এঁর সম্পর্কে স্ক্রিপ্‌টে বলা হয়েছে যে ইনিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ লঘুসংগীত শিল্পী। পড়া শেষ হতে-না-হতেই নরেন্দ্র শুক্ল মন্তব্য করলেন তিনি লতাকে শিল্পীই মনে করেন না। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! মন্তব্যটি এল রেডিয়োরই ডেপুটি চীফ প্রডিউসারের মুখ থেকে। বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকটির আধুনিক গান সম্পর্কে অত্যন্ত শুচিবাই, এক রকম ব্যাধিই। আমিও সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, 'চুপ, চুপ, আস্তে বলুন, দেওয়ালেরও কান

আছে। কেউ শুনতে পেলে আপনার চাকরি তো যাবেই, আমাদেরও যাবে।' ভীষণ রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন তিনি। রেডিয়োর মতো প্রতিষ্ঠানে, যেখানে সর্বপ্রকারের সংগীতই শ্রোতাদের শোনানো হয়, সেখানে এই মানুষটি মিসফিট নন? তা আমার উপর খুব চটে গিয়েছিলেন। আগেই বলেছি হাত দেখতে পারেন ভালো। সেজন্য উঁচু-মহলে খুব যাতায়াত ছিল। তিনি কপাল দেখেও ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন শুনেছি। সুরেশদাকে বলেছিলেন যে আমার স্থানপরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ করেছেন কপালে।

রেডিয়োর এক্স্ট্যারনল্ সার্ভিস যেন একটি ছোটোখাটো বিশ্ব— mini world। প্রতিদিন কাজ করতে হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষদের মধ্যে। চেহারা, পোশাক, ভাষার বৈচিত্র্য কত! ফ্রান্স্, মিশর, ইরান, আরব, আফগান, আফ্রিকার সোয়াহিলি, তিব্বত, চীন, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া— সব দেশগুলির মানুষ কাজ করছেন এখানে। পুব-পশ্চিমের মিলন এই এক্স্ট্যারনল্ সার্ভিসে। ফরাসী সার্ভিসে ম্যাদাম গাঙ্গুলি (মিস সিম্কি) ছাড়াও ছিলেন আর-এক অতি সম্ভ্রান্ত বিদুষী মহিলা। প্রৌঢ় দেহেও যৌবনের অসামান্যা সুন্দরীকে খুঁজে পাবে সন্ধানী চোখ। চলায়-বলায় সুরুচিসম্পন্না। বড়ো ঘরেরই মেয়ে, এদেশে এসেছিলেন বড়ো এক ভারতীয় শিল্পপতিকে জীবনসঙ্গী করে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য পরিয়ে দিলেন, ভারতের মাটিতে পা দিয়েই দেখলেন সেই মানুষটি আগেই বিবাহিত। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু একদা যাঁকে ভালোবেসেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও উচ্চারণ করলেন না। নিষ্ঠুর নিয়তিকে মেনে নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালেন। অর্থ, গাড়ি, বাড়ি, কিছুই নিতে রাজী হলেন না সেই শিল্পপতির কাছ থেকে। দেশে ফিরে যাবেন কি করে? বিদেশে রাজার ঘরণী হয়ে যাচ্ছেন বলে মা-বাবা প্রিয়-পরিজন

ছেড়ে চলে এসেছেন। কথাটাও অসত্য ছিল না। সেই শিল্পপতি মস্ত বড়ো একটা বিজনেস্ এম্পায়ারের মালিক। কিন্তু মহিলাটি এখন ফিরবেন আর কোন্ মুখ নিয়ে। তাই দেশে ফেরাও আর হল না। ভাগ্যহীনা নারী ভারতের মাটিতেই পড়ে রইলেন। অন্য পুরুষের দিকেও জীবনে চোখ তুলে তাকালেন না। কাহিনী শুনছিলাম এক বান্ধবীর মুখে। মনে হচ্ছিল এ যেন অতীত যুগের ভারতেরই কোনো মহীয়সী নারীর আত্মত্যাগের করুণ ইতিহাস শুনছি। সেই ফরাসী মহিলার কাছে আমি অস্তিবাদের ব্যাখ্যা শুনছি, জেনেছি আর্টের ইম্প্রেসনিজ্‌ম, স্যুরীঅ্যালিজ্‌ম্, কিউবিজ্‌ম্-এর পার্থক্যের কথা। এই বিদেশিনীর ভারতপ্রীতিও আমায় মুগ্ধ করেছে। কি যে মিষ্টি স্বভাবের মানুষ! হাসিটি মুখে লেগেই থাকত। ওঁকে দেখলেই আমার মনটা বেদনায় ভরে যেত। স্বামী পেলেন না, সন্তান পেলেন না, ঘরও হল না, নিজের দেশ থেকেও স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিলেন। কি নিঃসঙ্গ জীবন!

তিব্বতী স্বামী-স্ত্রীকে দেখে তন্ত্র-মন্ত্রযানী লামা-ধর্ম ও কৃষ্টির কথা কখনো মনে হত না। পাশ্চাত্য পোশাক, মহিলাটি ফ্রক পরেন. স্বামী প্যান্ট-কোট-টাই। ওদিকে খাঁটি দুই ফরাসী নারী পরেন একেবারে বাঙালির শাড়ি। তিব্বতী দম্পতি ইংরেজিও বলতে পারতেন। দালাই লামা, পাঞ্চেন লামা এবং ওঁদের সহচর অনুচরদের দেখেছি প্রায় একমাস খুব কাছে থেকে। ওঁরা দিল্লীতে এসেছিলেন ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে। প্রতিদিন গিয়েছি ওঁদের মন্ত্রপাঠ রেকর্ড করতে। মনে হয়েছে তিব্বতের মানুষেরা বেশভূষায়, মুখের আদলে, ধর্মাচরণে অজানা এক ভুবনের মানুষ। ফোনেটিক্‌স্-এর দিক থেকেও আমার বোধের অগম্য ছিল সে-সব মন্ত্রোচ্চারণ। ভেবেছি চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে পৃথিবীর ছাতের অধিবাসীদের কি করেই বা এত সহজে জানতে বুঝতে পারব।

আমাদের মাঝের ব্যবধান যে দুস্তর, যদিও জানি রাজা শশাঙ্কের পরবর্তীকালে পর্বত থেকে নেমে এসে বাঙালিদের পিটিয়েছিল কয়েকবারই। তবে থাকে নি তো নীচে। তাই একেবারে অজানা মানুষ। কিন্তু এক্স্ট্র্যারনল্ সার্ভিসের এই তিব্বতী দম্পতি একেবারে আধুনিক। খুব কাছের মানুষই মনে হয়েছে, কোনো অসুবিধে নেই স্বামী-স্ত্রীকে জানতে বুঝতে। মানুষ দুজনকে খুবই সরল মনে হয়েছে। মুখের হাসিও শিশুর মতো সরল। এই দুজন অবশ্য তিব্বতের বাইরেই থেকেছেন। পড়াশুনা করেছেন মিশনারী স্কুলে। তিব্বতী ভাষা এবং সংস্কৃতিতে পাণ্ডিত্য ছিল নিশ্চয়ই, না হলে এই চাকরি আর কি করে পেলেন। অল্পবয়সী এই স্বামী-স্ত্রীকে দেখে কে বলবে নিষিদ্ধ দেশের মানুষ এঁরা? ঠাট্টা ইয়ার্কি গল্পে গুজবে যে-কোনো পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবেন এঁরা। পরে তিব্বতী লামাদের দেখেছি অন্য আর-এক রেডিয়ো স্টেশনে, দেখেছি গ্যাংটকেও। কিন্তু সে তুলনায় এক্স্ট্র্যারনল্ সার্ভিসের স্বামী-স্ত্রীকে বলা যেতে পারে সিটিজেন অব দি ওয়ার্লড্। এই দুই নারীপুরুষ কোনো কিছুতেই যে-কোনো সভ্যদেশের নাগরিক থেকে পেছনে পড়ে নেই। অতি অমায়িক স্বভাবের মানুষ-দুটিকে কি করে ভুলব!

মিসেস ভট্টাচার্য যে বাঙালি-কন্যা নন সে কথা জেনেছি অনেক-দিন পর। শাড়ি-পরা, হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর, বাংলা-ভাষিণী ভটচাজ-গিন্নীকে অভারতীয় মনে করার কি কোনো কারণ থাকতে পারে? বাংলা উচ্চারণ নির্ভুল, চেহারাতে অবাঙালি ছাপ নেই। গায়ের রঙটা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, যেটা সাধারণ বাঙালি মেয়েরই রঙ। যখন জেনে গেলাম বাঙালি তো ননই, এমন-কি ভারতীয়ও নন, তখন লক্ষ্য করেছি কথা বলেন ধীরগতিতে, একটু টেনে টেনে। আমি ভেবেছি শান্ত স্বভাবের বাঙালি মেয়েটি হয়তো ধীরে ধীরে

কথা বলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম যে বিদেশী ভাষা বলে তিনি সাবধানে আস্তে আস্তে কথা বলেন। বাঙালি যে নন সেটা নিজেই হঠাৎ একদিন প্রকাশ করে ফেললেন।

বললেন, 'আপনাদের দেশে, দিল্লীর বাঙালি সমাজে বড়ো পরনিন্দা পরচর্চা হয়।'

আমার প্রশ্ন, 'কি বললেন, আমাদের দেশ ? এটা তো আপনারও দেশ। পরচর্চায় বাঙালির আনন্দ সে কথা সবাই জানি এবং এই নিয়ে নূতন করে আর আলোচনা করে লাভ কি হবে ?'

আমার কথা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। খানিকটা চুপ করে থেকে মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, 'আমার পদবীটা দেখে বোধ হয় ধরতে পারেন নি যে আমি এ দেশের মেয়ে নই। বোধ হয় মনে করেছেন বাইরে গিয়ে আমি ইন্দোনেশীয় ভাষাটা শিখে এসেছি। তা নয়, আমি ইন্দোনেশিয়ারই মেয়ে। জাকার্তায় এক বাঙালি ছেলের প্রণয়ে পড়ে গেলাম এবং তাঁকে বিয়ে করলাম। স্বামী ভদ্রলোকটি দারুণ ভালো। তিনিই যত্ন করে তাঁর মাতৃভাষাটা আমায় শেখালেন।'

একটু হেসে বললেন, 'আমার ভাষাটা তিনি কিন্তু শিখলেন না। বাড়িতে সারাদিন নিজের ভাষায় কথা বলতে পারি না। বাইরেও কি সে সুযোগ বেশি আছে ? এক্স্‌ট্র্যারনল্‌ সার্ভিস এবং ইন্দোনেশীয় রাজদূতের দপ্তরে সামান্য কয়েকজন আমার দেশের মানুষ রয়েছেন। স্বামীর বাঙালি বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি যাই, ওঁরা সস্ত্রীক আসেন। কিন্তু মেয়েরা আমার ত্রুটিই যেন কেবল দেখতে পান।'

ভদ্রমহিলার মনটা সামান্য বিষণ্ণ দেখলাম। বললাম, 'আপনি বিদেশিনী বলেই ওঁদের হয়তো কিছুটা বা কুণ্ঠা, ঠিক সহজ হতে পারছেন না। আপনি সরল মনে ওঁদের গ্রহণ করুন, দেখবেন সকলে না হলেও অন্তত কয়েকজন খুবই আপন মানুষ হয়ে যাবেন।'

মনের বিষণ্ণতাটা আস্তে আস্তে কেটে গেলে মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, 'জানেন, ইন্দোনেশিয়াবাসী হলেও আমরা কিন্তু মুসলমান নই। ঠিক ভারতের হিন্দুদের মতো না হলেও আমরা মোটামুটি হিন্দুই। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজা না হলেও কালীপূজা দশেরার মতো ধর্মানুষ্ঠান আমাদেরও আছে। আমাদের পূর্বপুরুষ ভারত থেকেই গিয়েছেন কয়েক শতাব্দী আগে।'

মিসেস ভট্টাচার্যের মুখে পুরনো ইতিহাস শুনে খুশি হয়েছিলাম। সত্যি বিদুষী মেয়ে।

তিনি বলতে লাগলেন, 'চোল রাজাদের আমলেই বহির্বিশ্বে অভিযান চলেছিল বেশি। এই বংশের সব চেয়ে পরাক্রমশালী রাজা রাজেন্দ্র চোলের যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্র পেরিয়ে বলি সুমাত্রা-দ্বীপের কিছু অংশ অধিকার করে নেয়। এই রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকাল ১০১৮ থেকে ১০৪২ সন। এর পরেও দক্ষিণ উপকূল থেকে অভিযাত্রীদল সমুদ্রের বুকে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে জাভায় সুমাত্রায় বলিদ্বীপে। ঐ-সব জায়গায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার মানুষ আছে, আদি দেশ যাদের ভারত। সবাই তো হিন্দু। বহুশত বর্ষের পরও হিন্দুয়ানিটা মুছে যায় নি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভাষাটি কি?'

তিনি বললেন, 'নিজেদের মধ্যে তামিল-তেলুগু-ওড়িয়ার একটা জগাখিচুড়ি এখনো কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে আছে। তবে আমরা সবাই ইন্দোনেশীয় ভাষা শিখে নিয়েছি। ওটাই এখন আমাদের ভাষা।'

মিসেস ভট্টাচার্য বললেন যে তিনি বলিদ্বীপের মেয়ে। আশ্চর্য হয়ে বলিদ্বীপের এক কন্যার কাছে সে দেশের হিন্দুসমাজের কাহিনী শুনছি। মুসলিম ইরান দেশের মুষ্টিমেয় জরথুষ্ট্র-ধর্মাবলম্বী ইরানীদের কাহিনীর মতো। মিসেস ভট্টাচার্যের কাছে আরো জানলাম

সেখানে অনেক গ্রাম আছে পুরোপুরি ভারত থেকে আসা হিন্দুদের। দৈনন্দিন জীবনে প্রায় ভারতীয় রীতিনীতিই চলে আসছে। গ্রামে আছে একটা পুজোবাড়ি। পূজাপার্বণ উপলক্ষে সেখানে মিলিত হয় গ্রামের সব লোক। সর্বজনীন পূজার মতন। নাচ-গানের ধারাতেও ভারতীয় ট্র্যাডিশন সুস্পষ্ট। তবে যে দেশে এত দীর্ঘ দিনের বাস সে দেশের আচার-ব্যবহার স্বভাবতই এসে যায় জীবনে। আদি বাসভূমি ভারত হলেও ইন্দোনেশিয়াই এখন তাদের মাতৃভূমি, স্বদেশ। তাই মিসেস ভট্টাচার্যের মন কাঁদে বলিদ্বীপের সেই ছোট্ট গ্রামটির জন্য— তাঁর জন্মভূমি, যেখানে কেটেছে শৈশব, বাল্য, কৈশোর।

আমি কলকাতার চায়নাটাউনে কদাপি যাই নি। চীনা দাঁতের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাই নি। সুদক্ষ চীনা কারিগরের কাছ থেকে জুতো কিনি নি। চীনা লণ্ড্রিতে জামাকাপড় ধোলাই করাই নি। আর চীন দেশেও যাই নি। মোদ্দা কথা, এদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা একটুও নেই। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছর একই ছাতের নীচে এক্স্‌ট্যারনল্ সার্ভিসে খোদ চীন দেশ থেকে আগত সাত-আটটি নারী-পুরুষের সঙ্গে প্রতিদিন অফিসে কাজ করার পরও কিঞ্চিৎ জেনেছি এদের সম্পর্কে, এমন দাবি করতে পারি না। মুখের তালা বন্ধ প্রায় প্রতিটি মানুষের। মূক মানুষের নিঃশব্দ চলা, কাজ করা, আসা-যাওয়া দেখতে পাই রোজ। চীনের দুই মুখ্য ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়— কয়ু এবং ক্যান্টনিজ ভাষায়। যা অতি সামান্য বলার কওয়ার থাকে সে কাজটি করেন সুপারভাইজার। দুটি সার্ভিসের একজন সুপারভাইজার। ঐ দেশের কোনো-একটি মানুষের মুখেও কখনো হাসি দেখেছি মনে পড়ে না। ঠিক সময় মতো অফিসে এসে যথানিয়মে কাজ করে যাচ্ছেন প্রত্যেকে, মাথা গুঁজে, মুখ বন্ধ করে। ধূমপান করতে দেখি নি কাউকে, চা-পান করতেও নয়। কাজের

সময় চা, সিগারেট পান করে অযথা সময় নষ্ট করা যায় না এমনই ডিসিপ্লিন। সদ্য-বিবাহিত তরুণ-তরুণী স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে কাজ করছেন। অলক্ষে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দেখেছি চোখে চোখে কথাও নেই দুজনায়, মুখের কথা তো দূরে থাকুক। অনেক চেষ্টা করেও মেয়েটির চোখে আমার চোখ রাখতে পারি নি কোনোদিন। তাকাবেই না আমার দিকে। কি দারুণ সুন্দরী, কিন্তু পাষাণে তৈরি যেন।

হঠাৎ একদিন শুনলাম দুজনার মাঝে বিচ্ছেদ। সেকি! মাত্র সেদিন বিয়ে হয়েছে, এত তাড়াতাড়ি বিচ্ছেদ কেন? কিন্তু আগের মতনই সেই পাশাপাশি বসে কাজ করা। দুটি মানুষেরই মুখ ভাব-লেশহীন। জীবনের নিষ্ঠুরতম ঘটনা, কিন্তু তার কোনো প্রকাশ নেই পাশাপাশি দুটি মুখে। সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন কেমন মানুষ এরা? আমার প্রিয়বান্ধবী বাঙালি-কন্যার কণ্ঠ শোনা যায় প্রতিদিনই রেডিয়োতে। তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেল আমার সহকর্মী পাঞ্জাবী স্বামীর সঙ্গে। অফিসেই কত কাঁদাকাটি, হৈচৈ, ঝগড়াঝাটি! কিন্তু এই চীনা-দম্পতিকে দেখলে এত যে অঘটন ঘটল দুজনের মধ্যে বোঝা যায় কি? মনে হয় এঁরা আমার অপরিচিত এক দুনিয়ার মানুষ। স্বদেশে কি রকম জানি না, বিদেশে মুখ দেখে মনের কথা বোঝা অসম্ভব।

প্রতিবেশী বর্মী নারীপুরুষ হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল। সবার সঙ্গে আন্তরিক মেলামেশা, কোনো গুমর নেই মনে, কাছের মানুষ। ইরানের পুরুষ সুদর্শন। ইরানের কোনো নারী ছিল না আমাদের এখানে। কিন্তু পুরুষের গায়ের রঙ চাঁদের মতো স্নিগ্ধ, মাথার চুল ঘন চিকন কালো। আফগানীর মতো দীর্ঘদেহী নয়। অতি শিষ্ট আচরণ ইরানী তরুণের, মুখের হাসি যেন চাঁদের হাসি। তুলনায় আফ্রিকার দুই সোয়াহিলি যুবকের গায়ের রঙে অমাবস্যার কালিমা।

কিন্তু অতি উজ্জ্বল মুখের হাসি, উজ্জ্বলতর দাঁতের পাটি। এত মিষ্টি স্বভাবের যে সহজেই মায়া পড়ে যায় তুজনের উপর। বেঁটেও নয়, লম্বাও নয়, পাতলা চেহারার তুই সোয়াহিলি যুবক সবারই প্রিয়। এক্স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিসে কাজ করার সুযোগে বিভিন্ন দেশের কয়েক-জন মানুষকে দেখলাম। দেখলামই শুধু, অন্তরঙ্গভাবে জানলাম কি ? বিশ্বদর্শন হল না বটে, কিন্তু দেখলাম কাছ থেকে, সামান্য কিছু জানলাম। সেটাই কি কম সৌভাগ্যের কথা!

মধুরেণ সমাপয়েৎ। দিল্লী যেন মধুর সংগীত বিতরণ করেই আমায় বিদায় জানালো। কয়েক দিনের মধ্যেই চার্জ বুঝিয়ে দেব। বদলির নির্দেশ এসেছে। ফিরে যাব কলকাতায় বহুদিন বাদে। মনটা প্রসন্ন নিজের দেশে যাব বলে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন উপস্থিত হলেন অতি অপ্রত্যাশিতভাবে বিরাট তুই কণ্ঠ-শিল্পী। হিন্দুস্থানী সংগীতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ-শিল্পী, পাকিস্তানের বিখ্যাত ভ্রাতৃদ্বয় উস্তাদ নাজাকত আলি খাঁ এবং সহোদর উস্তাদ সালামত আলি খাঁ। এই পরদেশী তুই মহান শিল্পীকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাব বুঝতে না পেরে শুধু হাতজোড় করেই রইলাম। ওঁরা আসন গ্রহণ করে বললেন যে কলকাতার বাদল ধরচৌধুরী বিশেষভাবে ওঁদের অনুরোধ করেছেন আমাকে একটু গান শোনাবার জন্য। শুনে প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেলাম।

ঘাবড়ে যাবার কারণটা খুলেই বলি। বাদল বিয়ে করেছে আমার বন্ধু শিলং-এর ডাক্তার বিমল দের কন্যা শিশিরকণাকে। কিছুদিন আগে বাদল-শিশিরকণা দিল্লীতে এসে কয়েকদিন ছিল আমার বাড়িতে। সেই সময় কথায় কথায় বাদল একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করল উস্তাদ নাজাকত আলি, সালামত আলি খাঁর যুগল-বন্দী গান শুনেছি কিনা। উত্তরে বলেছিলাম যে প্রায় তিন বছর আগে কনস্টিটিউশন ক্লাবে তুই ভাইয়ের গান শুনেছি এবং ছোটো

ভাইয়ের তান অসম্ভব দ্রুত হওয়া সত্ত্বেও সে গানে আমার মন ভরে নি। কথা হচ্ছিল আমার ঘরে বসে। বাইরের কেউ ছিলেন না বলেই খোলাখুলিভাবে আমার মত ব্যক্ত করেছিলাম। এই দুই শিল্পী বিদেশী এবং এঁরা বছরে একবার এই দেশে আসেন। আমার মন্তব্য এই শিল্পীদের কানে পৌঁছবার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

আমার মন্তব্য শুনে বাদল কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল দেখলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জানাল যে প্রায় প্রতি বছরই খাঁ সাহেবরা কলকাতায় এসে শীতের সময়টায় ওরই বাড়িতে থাকেন। সে সময় এই দুই ভাইয়ের গান শোনার প্রচুর সুযোগ হয় বাদল এবং শিশিরের। এই শিল্পীদ্বয় সম্পর্কে বাদল-শিশিরকণা দুজনেরই ধারণা খুব উঁচু। বাদল নিজে সুন্দর গাইতে পারে, বহুদিন গানের শিক্ষালাভ করেছে গুরুর কাছে, আর শিশিকণার খ্যাতি সর্বভারতে। তাদের ধারণার সঙ্গে আমার মত মিলল না দেখে বাদল বলল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দুই ভাইয়ের গান আমায় ভালো করে শোনাবার ব্যবস্থা করবে। তাই খাঁ সাহেবরা যখন এসে গান শোনা-বেন বললেন তখন আমার আগেকার মন্তব্যের কথা মনে পড়ল এবং ভয় হল যে কথাটি হয়তো খাঁ সাহেবদের কানে পৌঁছে গিয়ে থাকবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভাবলাম বাদল-শিশির কখনো এমন কাজ করবে না। তবে মনে হল আমার মন্তব্যের কথা স্মরণে রেখেই এরা খাঁ সাহেবদের বিশেষ অনুরোধ করেছে আমায় গান শোনাতে।

খাঁ সাহেবরা বললেন যে পরদিন ওঁরা গাইবেন পাকিস্তান হাই-কমিশন আয়োজিত বিশেষ এক অনুষ্ঠানে এবং শিল্পীদের অতিথি হিসেবে আমাকে যেতেই হবে। শুধু ভালো গান শোনবার সুযোগই নয়, এ যে মস্ত বড়ো সম্মানও। পাকিস্তান হাই-কমিশন থেকে এক-জন এসে আমন্ত্রণ-লিপি দিয়ে গেলেন।

সেদিনের আসরে প্রথমে গাইলেন লতাফত খাঁ নামে পাকিস্তানের এক শিল্পী। তানের প্রাধান্য, রাগ-রূপায়ণের কোনো বালাই নেই, কেবল স্কিল-এর প্রদর্শন। তার উপরও সান্ধ্য আসরে গাইলেন সকালের রাগ। দক্ষিণী সংগীতে রাগের কোনো সময় নেই। কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে সময় মেনেই চলা হয়। গানের শেষে শিল্পী এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন চিনতে পারি কিনা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে মনে পড়ল ১৯৪৬ সনে কলকাতা কেন্দ্রে মিউজিক স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন। কিন্তু চেহারার কত পরিবর্তন হয়েছে। আগের পাতলা চেহারার পায়জামা পাঞ্জাবি পরা যুবকটি কোট-প্যান্ট-টাই পরে এক প্রৌঢ় অফিসারের বেশে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। অনেকদিন পরে দেখে ভালো লাগল। দাঙ্গার সময় কলকাতা ছেড়ে লাহোর চলে গিয়েছিলেন, আর আসেন নি। পাঞ্জাবেরই লোক তিনি।

এবার মঞ্চে এলেন উস্তাদ আমানত আলি এবং ছোটো ভাই উস্তাদ ফতেহ্ আলি। ভারি সুন্দর গাইলেন দরবারি কানাড়া রাগ যুগলবন্দী। উস্তাদ আমানত আলির দারুণ সুন্দর খোলা আওয়াজ। কোনো চঞ্চলতা নেই গানে। মানুষটিও রূপবান। ছোটো ভাইয়ের তানের দিকেই লক্ষ। জিবের অবস্থানটাও ঠিক নয়। তানের সময় জিব দিয়ে তালব্য 'শ' বানাচ্ছেন, সেজন্য আওয়াজের সমতাও থাকছে না। কিন্তু অতি দ্রুত তানের গতি। খেয়াল গানের পর উস্তাদ আমানত আলি হারমোনিয়মটি কোলের উপর টেনে নিয়ে নিজে বাজিয়ে গাইলেন পূরব ঠুংরি। সাধারণত পাঞ্জাবের শিল্পী পূরব ঠুংরি গান না। তিনি গাইলেন একাই এবং আসর মাত করে দিলেন। গান থামার পরও রেশ রয়ে গেল অনেকক্ষণ।

সামান্য বিরতির পর গাইতে এলেন উস্তাদ নাজাকত আলি খাঁ এবং উস্তাদ সালামত আলি খাঁ। রাগের নির্বাচনেই অভিজ্ঞ শিল্পীর মুনশিয়ানা লক্ষ করলাম। দরবারি কানাড়ার পর মালকোশই তো

ঠিক নির্বাচন। শিল্পীদের সুগভীর রাগের ধ্যান, রসমধুর বিন্যাস। অল্প সময়ের মধ্যে, শুধু মন্দ্র সপ্তকের মা, দা, ণি-র মধ্যেই, রাগমূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল এবং ভুলে গেলাম আগের শিল্পীদের গানের কথা। লয় এত ঢিমে হতে পারে সেটা আমার হিসেবের বাইরে। ছোটো ভাই সালামত খাঁর গলায় কাশ্মিরী শালের চিকন কারুকার্য, তানের নকশা সুচারু এবং গতি বিদ্যুতের মতো। কণ্ঠ-শিল্পীর কাছে ছন্দের এত বৈচিত্র্যও আশা করি নি। দু ঘণ্টার মতন গাইলেন এই রাগ। তার পর ঠুংরি। পশ্চিম দেশের অনেক আমন্ত্রিত শ্রোতা ছিলেন আসরে। তাঁদের উপস্থিতি লক্ষ করে সালামত সাহেব পাশ্চাত্য সংগীতের কম্‌বিনেশন আচমকা লাগিয়ে দিচ্ছেন, বেখাপ্পা লাগছে না। পাশ্চাত্য শ্রোতাদের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বড়ো ভালো লাগল দুই ভাইয়ের গান। উস্তাদ আল্লাদিতার তবলা সংগতে এমন একটা সংযম এবং পরিমিতি ছিল যা কণ্ঠ-শিল্পীর মনোযোগের বিঘ্ন ঘটায় নি। প্রাণ ভরে গেল গান শুনে।

তা হলে আগে যখন গান শুনেছি ভালো লাগে নি কেন? সেবার গেয়েছিলেন একটি মিশ্র রাগ। কেদারা এবং পুরিয়া— এই দুই রাগ মিলিয়ে। আমার ধারণায় সেই মিশ্রণ সুষ্ঠু হয় নি এবং তাই সে রাগ শুনে আমার মনে অশান্তি হয়েছিল। পরে শুনেছি কলকাতায়ও এই রাগ শুনে রসিক শ্রোতা সুরেশ চক্রবর্তী রাগটির নাম দিয়েছিলেন কেদুরিয়া। নিঃসন্দেহে যথার্থ নামকরণ। পরবর্তীকালে বাদল-শিশিরকণার কলকাতার বাড়িতে একান্তভাবে খাঁ সাহেবদের গান আরো কতবার শুনেছি এবং শুনে মুগ্ধ হয়েছি। সংগীতের অসাধারণ রূপকার।

৪

কলকাতায় ফিরে এলাম দীর্ঘ তেরো বছর পর। এক নম্বর গারস্টিন প্লেসে নয়, ময়দানের উত্তর-পুব কোণে নিজেদের নূতন বাড়িতে। তবে গারস্টিন প্লেসের সে মেজাজটা যেন নেই এই বাড়িতে। তবু নিজেদের বাড়ি, অনেক বেশি জায়গা এবং স্টুডিয়োর সংখ্যাও অনেক বেশি। পুরনো বাড়ির জন্য একটা মমতা ছিল মনে। কিন্তু এ বাড়ির চেহারাটাই অনেক অভিজাত। দক্ষিণের জানলায় দাঁড়িয়ে বিখ্যাত ইডেনের ক্রিকেট মাঠ দেখতে পাচ্ছি। পুবের বারান্দা ময়দানের উপর। উত্তরের জানলা খুলছে বিধানসভার ডালিয়া বাগানের উপর। আর পশ্চিমের জানলা খুলে ইডেন উদ্যানের উপর গঙ্গার বুকে সূর্যাস্ত দেখতে পাই। সমস্ত কলকাতায় এমন একটা মনোরম পরিবেশ কম। কয়েকদিনের মধ্যেই এই নূতন বাড়ির সঙ্গে আমার লভ্ অ্যাফেয়ার শুরু হয়ে গেল।

ভালো লাগল স্টেশন ডিরেক্টর মানুষটিকেও। সজ্জন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। পশ্চিম পাঞ্জাবের লায়ালপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এই বি. এস. আনন্দ্। দেশবিভাগের ঠিক আগে সপরিবার ছুটিতে গিয়েছিলেন ডালহৌসি পাহাড়ে বেড়াতে। তখন ভাবেন নি একেবারে ছেড়ে আসতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও একস্‌চেঞ্জ অব পপুলেশন তো কোনো শর্ত ছিল না। কিন্তু ডালহৌসিতে বসেই খবর পেলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দলে দলে মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে রওয়ানা হয়েছে ভারতের পথে। একা তিনি ছুটে গেলেন লায়ালপুরে।

এসে দেখলেন ইতিমধ্যেই কলেজের বাড়িটি ভারত-অভিমুখী যাত্রীদের শরণার্থী শিবির হয়ে গেছে। সংলগ্ন নিজের বাসগৃহটি হয়েছে একটি হাসপাতাল, যাতে ওষুধপত্রের কোনো ব্যবস্থাই প্রায় নেই। অগণিত হিন্দু শিখের ভিড় এই শরণার্থী শিবিরে এবং প্রতিদিন দলে দলে আরো লোক আসছেই। আহারের ব্যবস্থা নেই, পানীয় জল নেই, চারি দিকে আবর্জনার স্তূপ। সর্বত্র অনশন-ক্লিষ্ট অসুস্থ নরনারী। অভুক্ত, দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় ক্লান্ত মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছে। কোলের বাচ্চাটির মুখে তাই মায়ের পেচ্ছাব-ভেজানো নেকড়া গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এদের বাড়ি গিয়েছে, ধনসম্পদ লুট হয়েছে। প্রাণটুকু শুধু নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু এমন কি কেউ আছে যে কোনো-না-কোনো আপন-জনকে— স্ত্রীকে, কন্যাকে, বোনকে না খুইয়ে আসতে পেরেছে? কয়েকটা দিন এই সাংঘাতিক শিবিরে ঘুরে ঘুরে বি. এস. আনন্দ্ শুনলেন কত করুণ কাহিনী।

সম্ভ্রান্ত চেহারার এক প্রৌঢ়কে দেখলেন পাশে এক উজ্জ্বল কিশোরকে নিয়ে সারাদিন বসে থাকেন শিবিরের প্রান্তে এক কোণে। মুখে কথা নেই, ক্ষুধাতৃষ্ণাও ভুলে গেছেন যেন। অতি কষ্টে উদ্ধার করলেন বি. এস. আনন্দ্ সেই প্রৌঢ়ের মর্মান্তিক হাহাকারের কথা। ছোটো এক শহরের বড়ো ডাক্তার ছিলেন এই প্রৌঢ়। খুবই সুখী পরিবার, স্বামী স্ত্রী এক কন্যা এক পুত্র। কন্যাটি অষ্টাদশী। ছেলে বছর দুই বয়সে ছোটো। ভেবেছিলেন ডাক্তার বলে রেহাই পেয়ে যাবেন। সেরকম আশ্বাসও পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি। গভীর রাত্রে উন্মত্ত জনতা বাইরের গেট ভেঙে ঢুকে পড়ল। আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। নিজের প্রাণের ভয়ে ভীত হলেন না ডাক্তার, পুত্রের জন্যও নয়। বেটাছেলে লড়াই করে প্রাণ দেবে। কিন্তু স্ত্রী কন্যা পড়বে দুর্বৃত্তের হাতে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। নীচের সিঁড়ির দরজা ভাঙার শব্দ হচ্ছে। এখনই এসে পড়বে পিশাচবাহিনী। সিদ্ধান্ত নিতে আর এক মুহূর্ত দেরি হল না। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে উঠে এলেন ছাতে। অসহায় স্বামী, অসহায় পিতা, বুকফাটা আর্তস্বরে গুরুর নাম করে আলিঙ্গনবদ্ধ স্ত্রী-কন্যার বুকে বসিয়ে দিলেন উন্মুক্ত কৃপাণ। বীভৎস সেই দৃশ্য দেখে দুর্বৃত্তরা ভীত ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল।

সেই শরণার্থী শিবিরে ভয়ংকর সব নৃশংসতার কাহিনী শুনলেন বি. এস. আনন্দ্। কিছুদিন পর লায়ালপুর ছেড়ে চলে এলেন। যোগ দিলেন রেডিয়োতে। প্রফেশনাল ব্রডকাস্টার নন তিনি। কিন্তু সুপণ্ডিত, সজ্জন ব্যক্তি। এমন স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করার সুখ আছে। তিনি আমায় দিলেন পাশ্চাত্য সংগীত এবং ছোটো ছোটো আরো কিছু প্রোগ্রামের দায়িত্ব। আমার মতো কালা মানুষের পক্ষে খুব ভালো হল; পাশ্চাত্য সংগীতের শিল্পীরা বড়ো দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতেন না। কিন্তু মাস-খানেক পরই দিল্লী থেকে বদলি হয়ে এলেন রণেন্দ্র আচার্য অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টরের পদে। তিনি এসেই আমায় সংগীত বিভাগের দায়িত্ব নিতে বললেন। হাতজোড় করে বললাম যে ছোটো কথা কানে নিই না, তাই আমার পক্ষে এত শিল্পী নিয়ে কাজ করার অসুবিধা আছে। আমার অসুবিধার কথাটা বুঝলেন তিনি। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে মজদুরমণ্ডলী, গল্পদাদুর আসর, শিশুমহল এবং কলিং অল্ চিলড্রেন-এর দায়িত্ব নিতে হল সংগীত বিভাগের পরিবর্তে।

রণেন্দ্র আচার্য খুবই বিচক্ষণ অফিসার। অডিশন সম্পর্কে কিছু দুর্নীতির কথা তাঁর কানে পৌঁছে থাকবে। সেই সময় সংগীত বিভাগে চারজন মিউজিক প্রডিউসার। প্রায় প্রতিজনেরই গানের স্কুল ছিল এক বা একাধিক। ছাত্রছাত্রীদের অডিশনের ব্যাপারে ঈষৎ দুর্বলতা থাকবেই। রণেন্দ্র আচার্য সেরকমই ভাবলেন।

বিজ্ঞাপন দিয়ে গানের স্কুল খুলে অঢেল টাকা রোজগার করাটা ভালো নজরে দেখলেন না রণেন্দ্র আচার্য। আমার প্রতি নির্দেশ দিলেন বালক-বালিকাদের অডিশন নেবার। ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার। অডিশন নেবার দায়িত্ব হাত থেকে চলে গেল বলে আমার শত্রুই হয়ে গেলেন। আমার যে হাত ছিল না এ ব্যবস্থায় সেটা বুঝতে পারলেন না।

আরো একটি ঝামেলা ঘটে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। আমার পরিচিত এক যুবক গীতি-আলেখ্য লিখে জমা দিল সংগীত বিভাগে। গৃহীত হয়েছে কিনা খবর পেল না, নামঞ্জুর হয়ে তার কাছে ফিরেও গেল না সেই গীতি-আলেখ্য। মাস দুই বাদে আমায় এসে জানাল সে যুবক যে তার লেখা গীতি-আলেখ্যটি কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচার হয়ে গেছে গতকাল রাত্রে। খুশি হয়ে অভিনন্দন জানালাম তাকে। সেই যুবক কিন্তু আমার অভিনন্দন গ্রহণ করল না, বেজার মুখে জানাল যে লেখক হিসেবে তার নাম না বলে বলা হয়েছে মিউজিক প্রডিউসারের নাম। মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। একের অসততার ফলে একটা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যুবককে যে প্রমাণ করতে পারবে কিনা এত বড়ো একটা অভিযোগ? কিছু না বলে পকেট থেকে একটি ছোটো খাতা বের করে আমার টেবিলে ফেলে দিয়ে যুবকটি বলল যে প্রচারিত গীতি-আলেখ্যটির সঙ্গে প্রতি অক্ষরে মিলে যাবে এই স্ক্রিপ্‌ট্‌। হাতের লেখা মিলিয়ে নিতেও বিনীত অনুরোধ জানাল। যুবকটিকে বসিয়ে মিষ্টি কথায় বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে অনবধানতাবশত। এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করে কি হবে? চা-বিস্কুট-স্ন্যাক্‌স্‌ খেয়ে বিদায় নিল সেই যুবক। প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে যে তার কোনো লেখা যদি ভালো বিবেচিত হয় তবে তাড়াতাড়ি প্রচার করা হবে।

কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি জোগাবার লোকের অভাব নেই। সেই যুবককে কেউ উস্‌কানি দিয়ে পাঠিয়ে দিল স্টেশন ডিরেক্টরের কাছে। অনুসন্ধানে সহজেই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। কটকে বদলির নির্দেশ পেলেন সেই প্রডিউসার। কিন্তু গেলেন না কটকে, চাকরি ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন বাদে বাড়ির সামনে থেকে বিরাট সংগীত-বিদ্যায়তনের সাইনবোর্ডটিও খসে পড়ল, কারণ চাকরি না থাকলে ছাত্রছাত্রীর ভিড় হবে কেন?

সেই প্রডিউসারের জায়গায় এলেন বোম্বাই কেন্দ্র থেকে বদলি হয়ে মিস্টার কনেতকর। কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রে এসে তিনি প্রডিউসারের পদে ইস্তফা দিলেন। ছিলেন তিনি প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ্‌। এরকম কয়েকজন প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ্‌কে প্রডিউসার পদ দেওয়া হয়েছিল যার জন্য বেতনের উপর মাসিক পঞ্চাশ টাকার অনুদান পাওয়া যেত। কনেতকর এই মাসিক পঞ্চাশ টাকা ছেড়ে দিলেন, কারণ সামনে একটা আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ১৯৬২ সনের নির্বাচনে ডক্টর কেশকর হেরে গেলেন। এর আগে দশ বছর তিনি বেতার-এর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। সেই দশটি বছর প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ্‌দের চাকরি-জীবনের একটা দুঃসময় ছিল। ডক্টর কেশকরের বিদায়ের পর পদোন্নতির দীর্ঘদিনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। কনেতকর আমাদের চেয়ে সিনিয়র ছিলেন এবং পদোন্নতির সুযোগটা তাঁর কাছে আগে আসার কথা এবং এসেছিলও। কঠোর পরিশ্রমী এবং সংগীতে পণ্ডিত কনেতকরের আগমনে সংগীত বিভাগে একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার হল লক্ষ করলাম।

তালগুড় সপ্তাহ, মাছি-মারা সপ্তাহ, বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ, পরিবার-পরিকল্পনা সপ্তাহ— এমন নানা রকম সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয় ভারত সরকারের নির্দেশে। মন্ত্রীমহোদয়গণ এসে উদ্‌বোধন করেন এই-সব সপ্তাহ যথাযথ আড়ম্বরের সঙ্গে। দেখাদেখি রেডিয়োর কর্তৃপক্ষও

স্টেশনগুলিকে রেডিয়ো সপ্তাহ পালনের আদেশ দিলেন। এক্স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিসে কাজ করেছি অনেকগুলি বছর। সেখানে সপ্তাহ-টপ্তাহের কোনো ব্যাপার ছিল না। কলকাতায় এসে রেডিয়ো সপ্তাহের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী তৈরি করার কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু রেডিয়ো উইক-এর তাৎপর্য সম্যক্‌ উপলব্ধি করতে পারলাম না। বছরের সাতটি দিন ভালো অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে হবে শ্রোতাদের কাছে আর বাকি দিনগুলিতে যেমন-তেমন করে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেই চলবে? রেডিয়ো সপ্তাহে কোনো মঞ্চে বা প্রেক্ষাগৃহে বিশিষ্ট শিল্পীর সংগীতানুষ্ঠান আমন্ত্রিত শ্রোতার সামনে নিবেদন করা হত। মঞ্চে যাওয়াটাও রেডিয়োর পক্ষে অধর্ম। কোনো বেতার-নাটক অবশ্য মঞ্চে প্রযোজনা করে নি কলকাতা কেন্দ্র সে সময়। শুধু একবার মাত্র দেখেছি রবীন্দ্রসদন মঞ্চে কলকাতা রেডিয়োর একটি যাত্রাভিনয়। রেডিয়োর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কপালকুণ্ডলার একটি দৃশ্যের যাত্রারূপ। বেতার-নাটককে স্টুডিয়োর অন্তঃপুর থেকে বাইরে টেনে এনে বে-আব্রু করার প্রথম প্রয়াস।

ঐ সময় কলকাতা রেডিয়োতে বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কাজ করতেন। লীলা মজুমদার স্পোকেন ওয়ার্ড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রডিউসার এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র 'সাহিত্য শলাকর'। শলাকর শব্দটা হিন্দি থেকে এসেছে। শলাকর মানে উপদেষ্টা। সংগীত শলাকর, সাহিত্য শলাকর এইরকম কিছু পদ ছিল রেডিয়োতে সেই সময়। শলাকরের প্রতিদিন রেডিয়োতে উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না, পার্ট-টাইম চাকরি। বিশেষ দরকারে গাড়ি পাঠিয়ে আনানো হত। প্রেমেনদা কিন্তু বেশিদিন রইলেন না। ডক্টর হুমায়ুন কবীরের নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিলেন। সরকার থেকে মাইনে পাচ্ছেন, রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা মানা। তাই প্রেমেনদাকে চলে যেতে হল। শলাকর পার্ট-টাইম চাকরি করেন বলে তাঁর লেখা

গল্প, কথিকা, নাটক রেডিয়োতে প্রচার করা হলে নিয়ম অনুযায়ী দক্ষিণা দিতে হত। লীলা মজুমদারের চাকরি পুরো সময়ের। তাঁকে প্রতিদিনই অফিসে না এসে উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যে লীলাদির প্রতিষ্ঠার কথা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ইংরেজিও খুব ভালো জানতেন। আমাদের ইংরেজি অভিধান খুলবার প্রয়োজন হত না, লীলাদিকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করলেই শব্দটির ঠিক মানে বলে দিতেন। পড়াশোনা করেছেন প্রচুর। কাজে অনেক সাহায্য পেয়েছি। অসময়ে বন্ধুত্বের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ইন্দিরাদিকে চেনে না এমন শিশু এ দেশে নেই। শিশুমহলের পরিচালিকা ইন্দিরা দেবী। মধুর স্বভাবের জন্য মানুষটিকে আমরা যেমন ভালোবেসেছি, শিশুদের ভালোবাসা পেয়েছেন আরো বেশি। প্রতিদিন কত যে চিঠি আসত ওঁর কাছে শিশুদের কচি হাতের লেখায়! অল্প হলেও মিষ্টি করে জবাব দিতেন প্রত্যেক চিঠির। মাইকের সামনে এমন সাবলীল স্বচ্ছন্দতা খুব কমই দেখেছি। কি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা নিজের অনুষ্ঠানের জন্য! শিশুশিল্পীদের দিয়ে বার বার রিহার্সাল করিয়েছেন। অডিশনের সময়ও উপস্থিত থেকেছেন। সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন রেডিয়োকে সমর্পণ করা। আজীবনের সেবা দিয়েছেন রেডিয়োকে। প্রতিদানে সিলেক্‌শন গ্রেড আর্টিস্ট-এর সম্মান পেয়েছেন পরবর্তীকালে। শিশুদের অনুষ্ঠান পরিচালনার অতিরিক্ত যথানিয়মে ঘোষণার কাজও করতে হয়েছে। কাজে অনীহা ছিল না। একদিনও বলতে শুনি নি আজ আমি বড়ো ব্যস্ত। যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে ইন্দিরাদি সকলের আগে এসে গেছেন। এমন একটি নির্বিরোধ মানুষও রেডিয়োতে দেখি নি। কেউ ইন্দিরাদির উপর রাগ করেছেন বা ইন্দিরাদি কারুর উপর রাগ হয়েছেন এমনটা শুনি নি কখনো। ইন্দিরাদি সত্যিই মিষ্টি, হাসি-ছাড়া দেখি নি ওঁকে, সত্যিই 'ত্থাখন-হাসি' মেয়ে।

গল্পদাদুর আসর পরিচালনা করতেন জয়ন্ত চৌধুরী। রেডিয়োর প্রতি ছিল আন্তরিক ভালোবাসা। বালক-বালিকাদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় ছিলেন জয়ন্তবাবু। বালক-বালিকাদের কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার জন্য ওঁকে অনেক পড়াশোনাও করতে হত। এর উপরও জয়ন্তবাবুকে নিয়ম মতো ঘোষকের কাজ করতে হত। এমন নির্ভরযোগ্য ঘোষকও খুব বেশি ছিল না সেদিনে। যে-কোনো অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ওঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকা যেত।

একবার ফুটবলের রাজা গোষ্ঠ পালের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা হল গল্পদাদুর আসরে। ছেলেমেয়েদের এই অনুষ্ঠানটি দারুণ ভালো লেগেছিল এবং আবার শোনাবার জন্য এদের কাছ থেকে অনুরোধ আসতে লাগল। তাই মাস-চারেক পর আবার প্রচারের ব্যবস্থা করা হল। রেকর্ডিংটি রেখে দেওয়া হয়েছিল। এক রবিবারের গল্পদাদুর আসরে এই রেকর্ডিং আবার বাজানো হবে। আমি অফিসে যাই নি বন্ধের দিন বলে। প্রোগ্রাম শুরু হবার ঠিক চার-পাঁচ মিনিট আগে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। এই সাক্ষাৎকারে এক জায়গায় প্রশ্নের উত্তরে গোষ্ঠবাবু বলেছেন যে দল-বদল করাটা তিনি ঘৃণা করেন এবং সুদীর্ঘ খেলার জীবনে এই কাজ করেন নি। এত বড়ো খেলোয়াড়ের নিজস্ব মত এটা। নিজের কথা বলেছেন, নিজের আদর্শের কথা। দল-বদল করার জন্য কাউকে আক্রমণ করেন নি।

প্রথমবার এই সাক্ষাৎকার প্রচার হবার পর আমার কানে এসে-ছিল যে হামেশা দল-বদলকারী খেলোয়াড়রা গোষ্ঠবাবুর মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। আমি ভাবলাম এইবার এই কথাটি বাদ দিলেই ভালো হয়। কিন্তু এখন এই মন্তব্যটি বাদ দিয়ে অন্য টেপে রেকর্ড করার আর সময় নেই। বাড়ি থেকে জয়ন্তবাবুকে টেলিফোন করে বললাম

ঐ মন্তব্যটি না থাকাই ভালো। ঠিক সময় মতো ফেডার নামিয়ে নিলেন জয়ন্তবাবু। মন্তব্যটি উড়ে গেল কিন্তু প্রচারের সময় কোনো অসংগতি লক্ষ করলাম না। জয়ন্তবাবুও ঠিক একবার মাত্রই চার মাস পূর্বে এই সাক্ষাৎকারের রেকর্ডিং শুনেছিলেন। নীতির দিক থেকে গোষ্ঠবাবুর মন্তব্যটি বাদ দেওয়া উচিত হয় নি আমার। এজন্য নিজেকে ক্ষমা করি নি কোনোদিন। গোষ্ঠবাবুর মত নিয়ে বিতর্ক হলে হত! এটা তো তাঁরই নিজস্ব মতামত। কিন্তু আমি বলছিলাম জয়ন্তবাবুর নৈপুণ্যের কথা। আমার নিজের ধারণায় এই জয়ন্ত-বাবুদের মতন সমর্পিতপ্রাণ কর্মী-জাতটাই আস্তে আস্তে কমে আসছে পৃথিবীতে। চরিত্রবান আদর্শনিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু চলে গেলেন ভয়েস অব অ্যামেরিকায়।

আর-একজন অতি পরিচ্ছন্ন মানুষ দীপনারায়ণ মিঠৌলিয়া নীরবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যেতেন। হিন্দি প্রোগ্রামের প্রডিউ-সার তিনি, মজদুর-মণ্ডলীর হিন্দি বিভাগটাও দেখতেন। নিজের কাজের প্রতি কি আন্তরিক দরদ দেখেছি এই মানুষটির মধ্যে। সাহায্যের হাতটি সর্বদাই বাড়িয়ে রাখতেন। মুখে হাসি নেই এমনটা কখনো দেখি নি।

পাশ্চাত্য সংগীতের প্রডিউসার (বর্তমানে ডেপুটি চীফ প্রডিউ-সার) বুলবুল সরকারের মন্দ চিন্তা করারই শক্তি নাই, মন্দ কাজ করবে কী ভাবে? এমন কয়েকজন এখনো আছেন বলেই রেডিয়ো নামের প্রতিষ্ঠানটি এখনো ধসে পড়ে নি। বাঙালি মেয়ে বুলবুল পাশ্চাত্য সংগীতে সুপণ্ডিত। ইংরেজিও জানেন, বলেন, লেখেন ভালো। ইংরেজিতে নোট লিখে সব সময় বুলবুলকে দেখিয়ে নিয়েছি। বুলবুল কিন্তু মহা ব্যস্ত সর্বদা, নিশ্বাস ফেলার সময় নেই, কাজও শেষ হচ্ছে না। শেষ হবে কি করে? ভীষণ খুঁতখুঁতে। তার উপর ঘোষক বরুণ হালদার সর্বদা খুনসুড়ি করছেন, মুখে তাঁর দুষ্টু

হাসি। সাধনা দত্ত এসে অ্যানাউন্সারের ডিউটি চার্টে ভুল ধরিয়ে দিলেন। বুলবুল ব্যতিব্যস্ত। বুলবুলের অবস্থা দেখে বরুণ এবং সাধনা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। তার পর তিন জনই এসে গেলেন আমার কাছে। একই রুমে কাজ করি আমরা। অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সাধনা চা তৈরি করলেন, বুলবুল টিফিনবক্‌স্ বের করলেন। টিফিন খাবার সময় পান নি বুলবুল সারাদিন। বরুণ নিঃশব্দে চা-পান করে স্টুডিয়োতে চলে গেলেন। সাধনারও দিনের কাজ শেষ, বাড়ির পথে রওয়ানা হলেন। কোনো সমস্যা নেই, ডিউটি চার্ট বদল করার দরকার হল না। পাশ্চাত্য সংগীত বিভাগের পরিবেশটাই ছিল খুব সুস্থ এবং সুভদ্র। এঁদের সঙ্গে কাজ করাটা ছিল আনন্দের।

উত্তর এবং উত্তর-পুব সীমান্তে ভারত-চীন সংঘর্ষের ফলে আমাদের উপর কাজের চাপ খুব বেড়ে গেল। চীনের ভারতবিদ্বেষী প্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের জবাবটাও জোরালো হওয়া চাই। তাই নূতন অনুষ্ঠান-সূচী তৈরি করতে হচ্ছে। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চীনাদের নীতিহীনতা, পঞ্চশীলে অনাস্থা, প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা, এ-সব প্রচার হতে থাকল। 'জয়যাত্রা' নামে আর-এক অনুষ্ঠানে ভারতের প্রস্তুতি-পর্বের কথা সজোরে উচ্চারিত হল। কিন্তু বলার কথা তো বেশি পাই না। কি বলব জয়যাত্রার কথা? 'আর-একবার মেরেই দেখ, তা হলে দেখিয়ে দেব', এই কথা বলা যায় কি? আমাদের বীর জোয়ানেরা কোথাও দাঁড়াতে পেরেছে এমন সংবাদ পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি না। প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে, মাথার পাগড়ি খুলে গিয়ে নিশান হয়ে বাতাসে উড়ছে, এমন খবরই তো পাচ্ছি। সেনাপতিই যখন রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন না তখন জোয়ানরা বা কি করবে? আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি প্রোগ্রাম বানাতে গিয়ে।

মাঝে মাঝে অবশ্য এর মধ্যেই আনন্দের খোরাকও কিছু কিছু

পাওয়া যেত। এক স্পেশ্যাল অডিয়েন্স প্রোগ্রামের পরিচালিকা আর কিছু ভেবে না পেয়ে লিখলেন যে চীনারা এক অদ্ভুত প্রাণী, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। স্ক্রিপ্‌ট্‌ ভেট্‌ করতে গিয়ে এই মন্তব্য চোখে পড়ল। ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলাম পূর্ববঙ্গের কথা বুঝতে পারেন কিনা। বললেন, না, জানা নেই। কি আর করি! বুঝিয়ে বললাম যে চীনারা ঢাল, তলোয়ার ছাড়াই যদি ইয়ে করে আমাদের একেবারে পানিতে ছেড়ে দিতে পারে তখন আর ওদের অদ্ভুত প্রাণী না বলে উপায় কি? বুঝলেন তিনি এবং স্ক্রিপ্‌ট্‌ থেকে পঙ্‌ক্তিটি বাদ দিলেন।

দিল্লীর কর্তৃপক্ষের একটি নির্দেশ আরো অসুবিধা সৃষ্টি করল আমাদের। দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের নবপ্রেরণায় উজ্জীবিত করার অভিপ্রায়ে ইতিহাসের পাতা থেকে অতীত বীরত্বের কাহিনী সংগ্রহ করে প্রচারের নির্দেশ এল। খুবই মুশকিলে পড়লাম। ইতিহাসের বই ঘাঁটা শুরু হল। কিন্তু কই, কোথায় বীরত্বের কথা? পুরুরাজার আলেকজাণ্ডার-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কাহিনী ছাড়া আর তো কিছু পাচ্ছি না! কোনো বিদেশী আক্রমণের মোকাবিলা করে নি তো ভারত কখনো। ভয় পেয়ে কেবল পিছু হটেছে। প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা সাহসের সঙ্গে আর্যদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এমন কথা কোথায় লেখা? নিজেদের অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শক-হুনদল, পাঠান-মুঘল কেউ বাধা পায় নি। এসেছে তো পায়ে-চলা পাহাড়ী পথে। এদিকে পূর্বপ্রান্তে তিব্বতীরাও বাঙালিদের কয়েকবার দারুণ মার মারল গোপালদেব রাজা নির্বাচিত হবার আগে। পর্তুগীজ দস্যুরা গাঁয়ে ঢুকে বউ-ঝি ধরে নিয়ে গেছে, আর পুরুষেরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে ভয়ে। নেতাজী খামকাই হিটলারের উপর রাগ করেছিলেন ভারতবাসীদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে। কোটি কোটি ভারতের মানুষের উপর মুষ্টিমেয়

ইংরেজবণিক রাজত্ব করছে দেখে ইংরেজবিদ্বেষী বীর হিটলার বললেন না যে ভারতের মানুষ একেবারে অপদার্থ! তবে হ্যাঁ, আছে কিছু কিছু বীরত্ব আত্মত্যাগের গাথা, রাজস্থানের গাঁয়ের পথে পল্লী চারণ-কবি যা এখনো হয়তো গেয়ে বেড়ান। কিন্তু হিন্দুমুসলমানের দেশে সেগুলি কি রেডিয়োতে বলার? বললে বিভেদের সৃষ্টি হবে না?

তবে সেসময় অনেকগুলি দেশভক্তির গান রেকর্ড করা হল। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মরণপণ শপথ গানগুলিতে উচ্চারিত হল। একটি গান তো খুবই জনপ্রিয় হয়ে গেল। 'শপথ নিলাম, শপথ নিলাম, এই করিনু পণ'— গোপাল দাশগুপ্ত লিখলেন এবং সুর দিলেন সে গানে; গাইলেন সতীনাথ এবং উৎপলা। ইদানীংকালে বার বারই যখন বাইরের শত্রু আঘাত হানবার চেষ্টা করেছে তখন এইরকম গান প্রচার করা হয়েছে প্রত্যেক বেতার-কেন্দ্র থেকে। ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বরে এবং ১৯৭১ সনের ডিসেম্বরেও প্রতিটি রেডিয়ো স্টেশন থেকে এরকম দেশভক্তির গান জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। সংকট-কালে রেডিয়োর অবদান অসাধারণ। জোয়ানরা যুদ্ধ করে রণাঙ্গনে। কিন্তু দেশের মানুষের মনে সাহস ও উদ্দীপনা জাগাবার গুরুভার গ্রহণ করে রেডিয়ো। বিদেশী অপপ্রচারকে অসত্য বলে প্রমাণিত করে দেশে এবং দেশের বাইরে ভারতের সত্যনিষ্ঠ আদর্শকে তুলে ধরবার দায়িত্বও রেডিয়োর ওপর। খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করে এসেছে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো। এদিকে চীনের প্রচারযন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। উঁচু পর্বতের উপরে হাজার কিলোওয়াটের ট্রান্‌স্‌মিটার বসিয়েছে চীন। সাগরের বুকে আমাদের ছোটো ছোটো দ্বীপগুলিতে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কোনো ট্রান্‌স্‌মিটারই নেই। বিদেশী রেডিয়োর অপপ্রচার সেখানে বিনা বাধায় আমাদের মানুষদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই ভেবে সরকার তাড়াতাড়ি

পোর্টব্লেয়ারে বেতার-কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল। আমাকেও যেতে হল সেখানে। যাওয়াটা পারিবারিক অসুবিধা সৃষ্টি করল সন্দেহ নেই। কিন্তু না গেলে এমন একটা মনোরম দেশ যে অদেখা রয়ে যেত।



বিকেল পাঁচটা, ১২ই মার্চ ১৯৫৭ সন। এইমাত্র আমাদের ছোটো জাহাজ এম. ভি. আন্দামান স্যাণ্ডহেড্ পার হয়ে কপিল মুনির আশ্রম বাঁ দিকে রেখে সমুদ্রের বুকে পড়ল। স্যাণ্ডহেড্ কেন বলে? হয়তো গঙ্গার এই মোহানায় স্রোতের টানে অনেক বালি এসে জমে। জাহাজকে তাই অতি সাবধানে ধীর গতিতে এগোতে হয়। সমুদ্র-তরঙ্গের দোলা লাগে জাহাজের গায়ে। ক্যাবিন থেকে বের হয়ে দেখি সামনে অনন্তবিস্তৃত জলরাশি। পুরীর সমুদ্র দেখেছি আমি আগে, প্রচণ্ড ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করেছি। কিন্তু এই সাগর পেরিয়ে যেতে হবে আমায়, সাগরের বুকে দীর্ঘ যাত্রা, এটা একটা ভিন্নতর অনুভূতি, পুরীর সমুদ্র দেখে আগে যা হয় নি। খিদিরপুর ডক থেকে সাগরসঙ্গমে আসতে চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। পাসপোর্ট লাগে নি, কিন্তু ইন্টারন্যাশনল্ হেল্থ্ সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে। চলেছি আমার দেশেরই মহাসিন্ধুতে বিন্দুর মতো একটি দ্বীপে।

জাহাজে উঠেছি আগের দিন বেলা তিনটেয়। সরকারের জরুরি নির্দেশে কালাপানি যাত্রায় আমার স্ত্রী-কন্যা যেতে পারবে না। কন্যাসমা শিশিরকণা ধরচৌধুরী এবং আমার স্ত্রী দুই কন্যা নিয়ে বিদায় জানাতে এসেছেন জাহাজের ক্যাবিনে। ক্যাবিন দেখে খুশি হলেন আমার স্ত্রী। নাই-বা হবেন কেন? জাঁক-জমকের তো অভাব নেই। ক্যাবিনের বাইরে লেখা স্টেটরুম দুই নম্বর। আরে বাপ রে! একেবারে স্টেটরুম এবং দুই নম্বর! এক নম্বর রিজার্ভ করা থাকে

চীফ কমিশনার বা মন্ত্রীমহোদয়দের জন্য। তার পরের ক্যাবিনই অর্থাৎ দুই নম্বর স্টেটরুম আমার জন্য নির্ধারিত হওয়ায় মনে মনে আমি নিজেও গর্ব বোধ করছিলাম। কিন্তু পরে শুনেছিলাম ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক। বেতনের হার অনুযায়ী এই সরকারি জাহাজের ক্যাবিন দেওয়ার ব্যবস্থা। মাসিক বেতনের উপর শতকরা ৩৩⅓ ভাগ স্পেশ্যাল পে'র টাকাটা যোগ করে দেখা হল কোন্ যাত্রীর মাইনে কত। সেই অনুযায়ী ক্যাবিন দেওয়া হয়। আরো বিচিত্র ব্যাপার জানলাম পরে। তিন নম্বর ক্যাবিনটা দুই নম্বরের চাইতে ভালো। সমুদ্রের বড়ো বড়ো লাইনার-এর তুলনায় এটা তো খেলনা জাহাজ। আর যাত্রীরাও প্রায় সবই আন্দামান সরকারের মধ্যম শ্রেণীর করণিক। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে সরকারি বে-সরকারি ভি. আই. পি. বড়ো একটা যান-টান না। পোর্টব্লেয়ার ট্যুরিজম্-এর ম্যাপেরও বাইরে।

জাহাজে ওঠার আধঘণ্টা পর একটি ঘন্টি বাজিয়ে দেওয়া হল। জাহাজ পর্যন্ত বিদায় জানাতে প্রিয়-পরিজন আত্মীয়বন্ধু যাঁরা এসেছেন তাঁদের নেমে যাবার সংকেত। স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছি না সাহস করে। অন্তত দুই বছরের বিচ্ছেদ। লোকচক্ষুর সামনে নিজেই দুর্বল না হয়ে পড়ি।

ঠিক বিদায়ের ক্ষণে স্ত্রী বললেন, 'আমার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছ না কেন?'

মুখ তুলে চেয়ে দেখি বেদনা ঢাকবার চূড়ান্ত প্রয়াসের হাসি। কিন্তু তাঁর চোখ থেকে কয়েকটি বিন্দু ঝরে পড়ল নীচে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম তৎক্ষণাৎ।

বললাম, 'বাড়ি যাও, ভালো থেকো, এবার মেয়ে-দুটির দায়িত্ব তোমার একার।'

এর বেশি বলতে গেলে কান্নাভরা আওয়াজ বের হবে কণ্ঠ

থেকে। গ্যাংওয়ে বেয়ে ওঁদের নীচে নেমে যাওয়াটাও দেখতে সাহস পেলাম না। মুখ ফিরিয়ে রাখলাম।

বিদায় জানাতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই নেমে যাবার পর ভাবলাম এখনই বুঝি জাহাজ ছাড়বে। মন বিষণ্ণ, মাথাও ধরেছে। কিন্তু তখনো নোঙর তোলার কোনো লক্ষণই নেই। খোঁজ নিলাম, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারছেন না। ক্যাবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছি নিশ্চয়। বাইরে কিছুটা বচসার গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। হাতঘড়িতে দেখি রাত প্রায় ন'টা। বের হয়ে এলাম। স্টুয়ার্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে প্রায় সাত-আট জন যাত্রী কথা বলছেন। সবাই প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। স্টুয়ার্ড বেচারার বিপন্ন অবস্থা। সমস্যাটা বুঝতে খুব কষ্ট হল না। এই ক'জন যাত্রী ডাইনিং রুমে গিয়ে জানতে পারলেন যে তাঁদের জন্য রাত্রে কোনো খাবারের বন্দোবস্ত করা হয় নি। তার কারণটা এই যে এই ক'জন যাত্রীর কাছ থেকে চারদিনের যাত্রার খাবারের জন্য অগ্রিম টাকা পাওয়া যায় নি। যাত্রীরা বলছেন যে টাকা আগেই দিতে হবে সে কথা ওঁরা জানতেন না। তাঁদের দাবি, জাহাজে ওঠার পরই কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল যাত্রীদের এ বিষয়ে অবহিত করা। এ লাইনে এঁরা প্রথম যাচ্ছেন, সুতরাং অগ্রিম খাবারের টাকা দেবার নিয়মটার কথা কি করে জানবেন? সচেতন হলাম যে আমিও অগ্রিম টাকা জমা দিই নি আহারের জন্য। স্টুয়ার্ড ত্রুটি স্বীকার করলেন। কিন্তু এখন নিরুপায়, কিচেন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে চাপে পড়ে রুটি, মাখন, স্ন্যাক্‌স্ এবং ফলটলের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলেন। জানতে পারলাম এই ক'জন যাত্রী সবাই রেডিয়োর কর্মচারী, আমার সহকর্মী। কাজেই ব্যাপারটা সহজেই মিটিয়ে দিলাম। খুব ভালো লাগল জেনে যে এ ক'জন

সহযাত্রীকে সহকর্মীরূপে পাব নির্বাসনের দেশ পোর্টব্লেয়ারে।

আন্দামান যাবার ব্যাপারে কোথায় কি করতে হয় কিছুই জানতাম না আমরা। রেডিয়োর কর্তৃপক্ষও বিশেষ কিছু জানতেন মনে হল না। বদলির নির্দেশ পাওয়ার পর কলকাতার অফিস আমাকে দু হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিল ভাড়া-বাবদ। কিন্তু পরে দেখা গেল সরকারি কর্মচারীর টিকিট কেনবার প্রশ্নই ওঠে না যাওয়াটা সরকারি প্রয়োজনে হলে। তখন এই লাইনে দুটি জাহাজ— এম. ভি. আন্দামান এবং এম. ভি. নিকোবর চলাচল করত। অপারেশন-এর ভার ছিল শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার উপর। কিন্তু সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আন্দামান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হাতে। বুকিং-এর জন্য আবেদন করতে হবে আন্দামান সরকারের কাছে পোর্ট-ব্লেয়ারে। ওরাই অনুমোদন করবে যাত্রীর তালিকা। ক্যাবিন অথবা বাঙ্কের নম্বর প্রত্যেক যাত্রীর নামের পাশে লিখে দিয়ে অনু-মোদিত তালিকাটি পাঠিয়ে দেবে স্ট্র্যাণ্ড রোডে শিপিং কর্পোরেশনের দপ্তরে। যাত্রী যদি সরকারি কর্মচারী হন তবে তাঁর ডিপার্টমেণ্ট থেকে আন্দামান সরকার পরে ভাড়ার টাকা আদায় করে নেবে।

আমার টিকিট কেনার ব্যাপারে একটু মজাই হয়েছিল। গিয়েছিলাম বিখ্যাত এক ট্র্যাভেল এজেন্সীর অফিসে। পোর্টব্লেয়ার নাম শুনে কাউণ্টারের ক্লার্কটি বেশ কয়েকটি লিস্ট-এর উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। না, নামটি নেই কোনো লিস্টে। অগত্যা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন সব চেয়ে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম। বললাম হাওড়া। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে ক্লার্ক ভদ্রলোক। হেসে ফেলে বললাম যে ঠিক আছে। এ বিষয়ে যে এদের সাহায্য পাওয়া যাবে না বুঝতেই পারলাম। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

জাহাজ কিন্তু সমস্ত রাত্রি খিদিরপুর ডকের আবদ্ধ জলায় এবং

ঘিঞ্জি পরিবেশে দাঁড়িয়েই রইল। সারাটা রাত ভ্যাপসা গরমে কষ্ট পেলাম ক্যাবিনের ভিতর। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ মন্থর গতিতে চলতে শুরু করল একটি কৃত্রিম অপরিসর খাল দিয়ে। খালটি জাহাজের চেয়ে প্রস্থে সামান্যই বেশি। ভয় হচ্ছে জাহাজের কোনো ধার খালের বাঁধানো দেওয়ালে কখন লেগে যায়! চার-পাঁচ মিনিট চলবার পরই সামনে একটি লক্-গেট। এবার যে খালটিতে জাহাজ ভাসছে তার জল দ্রুত বের করে দেওয়া হচ্ছে। টের পাচ্ছি জাহাজ ক্রমে নীচে নামছে। লক্-গেটের ওপারের খালের জলসীমার সমমানে এনে লক্-গেট খুলে দেওয়া হলে জাহাজ আবার এগিয়ে চলল। এরকম তিনটি লক্-গেট পার হয়ে জাহাজ নামল গঙ্গার বুকে। এই লক্-গেটগুলি রাখার প্রয়োজনীয়তা এজন্য যে কৃত্রিম খিদিরপুর ডকের জলের উচ্চতা নদীর জলের উচ্চতার চেয়ে অনেক বেশি। তাই লক্-গেটের সাহায্যে খালের জল কমিয়ে নিয়ে জাহাজকে নদীর জলে নামিয়ে দেওয়া হয়।

জাহাজ গঙ্গার বুকে আসার পর দেখলাম আমাদের কাছাকাছি আরো তিনটি মালবাহী জাহাজ সাগরপাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। এবার পাইলট হাতে একটি চোঙা নিয়ে এসে উঠলেন আমাদের জাহাজে। সময়টা বর্ষাকাল নয়। নদীর বুকে অনেক জায়গায় বালি জমেছে, অগভীর জল। পাইলট তাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন আমাদের জাহাজটিকে। পরের জাহাজগুলো মহাজনের চলার পথে আমাদের পিছু পিছু আসছে। মাঝে মাঝে পাইলট চোঙায় মুখ লাগিয়ে পেছনের জাহাজগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছেন। যেতে যেতে দেখলাম নদীর মধ্যেই দু-একটি জাহাজ বালির চরায় আটকে পড়ে আছে। এদের আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। কলকাতার গঙ্গায় তাই পাইলট ছাড়া বড়ো জাহাজ চলাচল করে না। সমুদ্রের বুকে আমাদের জাহাজ এবং সঙ্গের মালবাহী জাহাজগুলোকে নির্বিঘ্নে

পৌঁছে দিয়ে স্যাণ্ডহেডে অপেক্ষমান জাহাজগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবেন পাইলট কলকাতা বন্দরে।

১৯৬২ সনে চীনা আক্রমণে ভারত বিপর্যস্ত। উত্তর-পুব কোণে বমডিলার পতন ঘটেছে জানতে পারলাম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বেতার ভাষণে। তার পরই সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা, ইমার্জেন্সী ঘোষণা করা হল। এই ইমার্জেন্সীর শিকার হয়েই আমি বদলি হয়ে চললাম পোর্টব্লেয়ারে। সেখানে তড়িঘড়ি রেডিয়োর একটি কেন্দ্র খোলার নির্দেশ হয়েছে। বদলির নির্দেশ শুধু আমার একার নয়, আমার পদে বদলির তালিকায় আরো দুজন বাঙালি সন্তানের নাম ছিল। চতুর্থ জন ছিলেন এক হিন্দিভাষী অফিসার। সেই দুজন বাঙালি অফিসার হলেন সরল গুহ এবং বিমান ঘোষ। এই বদলির আদেশে লেখা ছিল যে দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন বদলির ব্যাপারে কোনো কর্মচারীর ওজর-আপত্তি করা চলবে না, কোনো কারণেই বদলির আদেশ রদ করা হবে না এবং সরকার কোনো কর্মচারীর আবেদনে কর্ণপাত করবে না। নিশ্চয়ই। দেশের এমন একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যখন হাজার বীর সৈনিক দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন এবং চীনাদের মারটা ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠায় সেনানায়ক রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে অসি ছেড়ে লেখনী ধারণ করে না-বলা-কাহিনী লেখবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন বদলির আদেশ-প্রাপ্ত কর্মচারীর আবেদন-নিবেদন বিবেচনা করবার ফুরসত কোথায় বিপন্ন সরকারের? আর দেশের স্বার্থে অসামরিক কর্মচারী সামান্য কষ্ট স্বীকার করে বদলির আদেশ গ্রহণ করবে সেটা ন্যায্য কারণেই সরকার দাবি করতে পারে। আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করলাম সরকারের এই মনোভাবকে। দু-একজন খুবই প্রভাবশালী আত্মীয় আমার শারীরিক অসুবিধার জন্য এই বদলি বন্ধ করার প্রয়াসে উঁচু মহলে কথা বলবেন মনস্থ করায় আমি প্রবল আপত্তি তুললাম। কারণ,

আমার শারীরিক অসুবিধার কথা কর্তৃপক্ষ জানে না এমন নয়। দ্বিতীয়ত, ভারতের যে-কোনো জায়গায় বদলি করা হতে পারে সেটা এই চাকরির প্রথম শর্ত। সে জন্য এই বদলি রদ করার চেষ্টা ঠিক হবে না বলে আমি শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়দের এ ব্যাপারে বিরত থাকতে বললাম। তাই আমি চললাম পোর্টব্লেয়ারে। কিন্তু ভাগ্যবান সরল গুহ এবং বিমান ঘোষকে যেতে হল না। যে কারণেই হোক তাঁদের সম্পর্কে বদলির আদেশ কার্যকর করা হল না। সুতরাং ইমার্জেন্সী উপলক্ষে সরকারের বড়ো বড়ো হুমকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রমাণিত হল সরকার বাইরের প্রভাবে সিদ্ধান্ত বদলায়, দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় এবং সকল কর্মচারীর প্রতি সমদৃষ্টিতে বিশ্বাস করে না। এটা তো নগ্ন অসাধুতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সরকারের নির্মম অবিবেচনার কথা আরো কি কি ছিল দেখা যাক। ঐ বদলির আদেশে বলা হল কোনো কর্মচারীকে তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না পোর্টব্লেয়ারে। তা হলে দুটি সংসার হল। ফ্যামিলিকে দেশে রেখে যেতে হবে, বাড়ি ভাড়া দিতে হবে এবং সংসারের যাবতীয় খরচ প্রায় আগের মতোই থাকবে। নূতন জায়গায় বদলি হয়ে সেই কর্মচারীকে নিজের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দু জায়গার খরচা চালানো হবে কি উপায়ে? এই বদলির আদেশে বিচ্ছেদ-ভাতা বা separation allowance-এরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

আরো একটি প্রশ্ন আছে। বয়সে নবীন, স্বল্পকাল আগে বিবাহিত এক সহকর্মীর কথা বলছি। পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছনোর প্রায় মাস-খানেকের মধ্যেই ছুটির এক দরখাস্ত নিয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে আমায় এসে অনুরোধ করলেন সহকর্মী এবং বললেন যে আমি একটু চেষ্টা করলেই ছুটি মঞ্জুর হয়ে যাবে। চুপি চুপি আমায় জানালেন যে

অসিধারাব্রত পালনে তো অভ্যস্ত ছিলেন না, দেশে না গিয়ে পারছেন না। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীন ভারতের শাসনভার যাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হল তাঁরা দিল্লীতে আইভরি টাওয়ারে সুখে বাস করতে লাগলেন। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাববার মানসিকতাই অনেকে হারিয়ে ফেললেন। একটা ক্রাইসিস্ অব ক্যারেক্টরই সৃষ্টি হয়ে গেল। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মন্ত্রীরাই। ন্যায়নীতির কণ্ঠরোধ হল। দুয়ারে দাঁড়িয়ে মাৎস্যন্যায়, সেটাও দেখতে পেলেন না।

ভিক্টর হিউগো যখন নির্জন দ্বীপে স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণ করলেন, একজন ওঁকে প্রশ্ন করেছিলেন এই দীর্ঘকালটা কি করে কাটাবেন তিনি। উত্তরে হিউগো বলেছিলেন যে সমুদ্র দর্শন করেই কাটিয়ে দেবেন। সত্যি, সমুদ্রের রূপবৈচিত্র্যের অন্ত নেই। অতি প্রত্যুষে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখেছি পুব আকাশে ঘূর্ণায়মান একটি সোনার থালা হঠাৎ লাফ দিয়ে জল থেকে উঠে গেল। বেশিক্ষণ উজ্জ্বল থালার দিকে তাকাবার শক্তি নেই চোখের। পশ্চিম দিকে আকাশ যেখানে মিলেছে সাগরের বুকে, দেখেছি সূর্যের অস্তাচল-গমনের অপূর্ব দৃশ্য। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় দেখেছি একই সময় চন্দ্রের উদয় এবং সূর্য ডুবে যাবার দৃশ্য পুবে পশ্চিমে। জাহাজের ডেক থেকে দেখেছি গভীর নিশীথে জলের আয়নায় লক্ষ তারার প্রতিবিম্ব। প্রভাতে দেখেছি নিস্তরঙ্গ বিশাল সাগরের বুকের অতি মৃদু উত্থান-পতনের দোলা। কিন্তু এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভিক্টর হিউগোর মতো সমুদ্র দেখে দীর্ঘ সময় কাটাতে পারব না আমি। ময়নামতি, কোটবাড়ি, সোনামোড়া, লুসাই হিল, খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়, নাগা পাহাড়, ঘাট এবং হিমালয়ের আকর্ষণ আমার কাছে অনেক বেশি। আমি মাটির মানুষ, মাটির সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদ আমার সহ্য হয় না। সমুদ্রকে বড়ো জনহীন মনে হয়। সমুদ্রের প্রাণী চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। কয়েকটি সী-গাল্ দেখে পাখি দেখার সাধ আমার

মেটে না। জলের নীচের অনন্ত রহস্য আমার দৃষ্টিগোচর নয়। এই চারদিনের দেখাতেই সমুদ্র যেন ফুরিয়ে গেল আমার কাছে। হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, কখন মাটি দেখব আবার

১৬ই মার্চ সকালবেলায় ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে দেখি আমাদের জাহাজ ছোটো ছোটো দ্বীপের জটলার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে। খুশি হল মনটা। বেলা দশটা নাগাদ ভিড়ল জাহাজ পোর্টব্লেয়ারের চ্যাথাম জেটিতে। কলকাতা বন্দর থেকে সাতশো মাইলেরও বেশি যাত্রায় এ জাহাজ সময় নিয়েছে চারদিনেরও বেশি। মাঝে আর কোনো জায়গায় থামা নেই। জেট-এর যুগে শামুকের গতি। এই গতির যুগে মানুষ এতটা সময় নষ্ট করতে পারে কি? তাই পৃথিবীর বড়ো বড়ো লাইনারগুলি অচল হয়ে গেছে।

চ্যাথাম জেটিতে নারী-পুরুষের অসম্ভব ভিড়। এঁরা কি সবাই যাত্রীদের—যাঁর যাঁর আপনজনকে এগিয়ে নিতে এসেছেন? প্রথম শ্রেণীর প্রায় অনেক যাত্রীর সঙ্গেই এই ক'দিনে পরিচয় হয়েছে। অধিকাংশই এই প্রথম আসছেন পোর্টব্লেয়ারে, আমারই মতো, পরিচিত কেউ নেই যাঁর এই শহরে। এই নির্বান্ধব দেশে কে আসবে এগিয়ে নিতে আবাহন করে? আর এখানে যাঁদের আপনজন আছেন তাঁদের এগিয়ে নিতে যাত্রী-প্রতি তিন জনও যদি এসে থাকেন, তবু তো এই বিরাট জনসমাবেশের হিসেব পাওয়া যায় না। তা হলে কারণটা কি? একটু পরেই এখানকার রেডিয়োর নবনিযুক্ত স্টেশন ডিরেক্টর এস. এ. ঠাকুর ব্যাপারটা আমায় বুঝিয়ে বললেন। তিনি সপ্তাহ তিন আগে আকাশপথে পোর্টব্লেয়ার এসেছেন। 'আকাশপথে' কথাটি শুনে সেদিনের পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে বিমান-যোগাযোগ ব্যবস্থার পুরো চিত্রটি পাওয়া যায় না। নভেম্বর থেকে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত সপ্তাহে একটি মাত্র ডাকোটা বিমান যাত্রী নিয়ে কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার যেত প্রতি শনিবার। পোর্ট-

ব্লেয়ার থেকে যাত্রী নিয়ে সেই বিমান পরদিন সকালে কলকাতায় ফিরে আসত। ব্যস, বাকি সময়টা বিমান-চলাচল বন্ধ। সমুদ্রের উপর আবহাওয়া বিমান যাত্রার পক্ষে নিরাপদ নয়।

এস. এ. ঠাকুর আমায় বললেন যে এখানে জাহাজ আসার দিনটা একটা উৎসবের দিন। অফিস বন্ধ থাকলে তো কথাই নেই, খোলা থাকলেও প্রায় সব সরকারি কর্মচারী অফিস ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ-ঘাটে চলে আসেন। নূতন মানুষ কে এল দেখার কৌতূহল তো আছেই, এর উপরও কি কি খাদ্যসামগ্রী, তরিতরকারি এল তার খবর নিতেও সবাই এসে পড়লেন। আলু, পটল, টম্যাটো, কপি কি পরিমাণ এল এই জাহাজে তার একটা হদিস পাওয়া যাবে সেই আশায়ও অনেকে এলেন। এ-সব সবজি পোর্টব্লেয়ারে হয় না। আরো এলেন বড়ো বড়ো দোকানের প্রতিনিধিরা। দেখতে এলেন নূতন ক'জন অফিসার এলেন এ জাহাজে যাঁরা হবেন সেই-সব দোকানের প্রস্‌পেক্‌টিভ্‌ বাঁধা খদ্দের। খোঁজখবর নিয়ে পর দিনই দোকানের প্রতিনিধিগণ সেই অফিসারদের দপ্তরে হাজির হবেন। অনুরোধ করবেন তাঁদেরই দোকান থেকে মাসের বাজার করে নিতে। দাম যে-কোনো এক সময় দিলেই চলবে। 'ধারে বিক্রি নেই' এমন কথাটি পোর্টব্লেয়ারে কেউ শুনতে পাবে না।

ধারে বিক্রির ভয়ই বা কোথায়? রাতারাতি ট্রেনে, মোটরে এই শহর থেকে পাওনা টাকা না মিটিয়ে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। চার দিকেই সমুদ্র। যেতে হবে সেই জাহাজে তিন সপ্তাহে মাত্র একবার যেটি যাবে কলকাতায় বা মাদ্রাজে। আর কে কে যাবে সেই জাহাজে সেই যাত্রীর তালিকা অনেক আগেই ঝুলিয়ে দেওয়া হবে চীফ কমিশনারের দপ্তরের নোটিস বোর্ডে। এই ব্যবসায়ীরা কেউ রাজস্থানের নয় কিন্তু। আন্দামানে রাজস্থান তার বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয় নি। সব ক'টি ব্যবসায়ী তামিল-

নাদুর। আর-এক সিন্ধি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে। তাদের নিজস্ব জাহাজও আছে। শুনেছি নিকোবরের সবটারই মালিক এই প্রতিষ্ঠান।

ইংরেজি পোর্ট শব্দটির মানে বন্দর। কিন্তু পোর্টব্লেয়ারকে কি বন্দরের মর্যাদা দেওয়া যায়? আন্দামান এবং নিকোবর নামে দুইটি জাহাজ ছাড়া আর কোনো জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে ভিড়ে না। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের যাত্রীবাহী বা মালবাহী জাহাজ এখানে আসে না। কোনো দেশের সঙ্গে পোর্টব্লেয়ারের বাণিজ্যিক যোগাযোগ নেই। তবে এই গালভরা নামটি কেন হল? কানা ছেলের নাম পদ্মপলাশলোচন। কিন্তু পোর্টের ঠাট বজায় রাখা হয়েছে। একজন হারবার-মাস্টার আছেন, আরো আছেন একজন ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার।

পোর্টব্লেয়ারকে সত্যিকারের প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় বলা যেতে পারে। সমুদ্র থেকে জাহাজ এসে একটি খাঁড়িতে ঢোকে। জল খুবই গভীর। এই খাঁড়ির তীরেই চ্যাথাম জেটি। সমুদ্রের মতো প্রচণ্ড তরঙ্গ নেই ঝড়ের সময়। তুফানের সময় জাহাজের অতি নিরাপদ আশ্রয় এই খাঁড়ি। জাহাজে আমাদের সহযাত্রী তিনটি হাতিও ছিল। এরাও নূতন চাকরি পেয়ে কলকাতা বন্দর থেকে রওয়ানা হয়েছে। সত্যিই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার নিয়েই এরা এসেছে বনবিভাগের কর্মচারী হিসেবে। বনবিভাগের প্রবীণ তিনটি হাতি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌছনর পর অবসর গ্রহণ করেছে। দু বছরের এক্স্‌টেন্‌শন পেয়েছিল। কিন্তু এখন খুবই ক্লান্ত। দেহ আর চলে না। আন্দামান সরকারকে প্রণাম জানাই ওদের বদান্যতার জন্য। রিটায়ার্ড হাতি তিনটিকে যথাবিধি পেন্‌শন্‌ দেওয়া হবে আমৃত্যু। সারাজীবনের বিশ্বস্ত রাজসেবার এই পুরস্কার।

জাহাজ থেকে হাতিগুলিকে বিরাট ক্রেনের সাহায্যে ডাঙায় নামিয়ে নেওয়ার দৃশ্যটা দেখছিলাম, এমন সময় স্টেশন ডিরেক্টর এস.

এ. ঠাকুর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্টলেশন ইঞ্জিনিয়ার প্রিয়ভূষণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার দিকে এক বিরলকেশ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ঠাকুর সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন যে তিনি এখানকার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার নৃসিংহ গুপ্ত। নমস্কার বিনিময়ের পর মিস্টার গুপ্ত একটি অপ্রত্যাশিত অনুরোধ নিবেদন করলেন। এই প্রথম পরিচয়, কিন্তু অতি আপনজনের মতো তাঁর গৃহে মধ্যাহ্ন-ভোজনের আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। অবাক হয়ে মানুষটির দিয়ে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তাঁর সহৃদয়তা দেখে মনে মনে আশ্বস্ত বোধ করলাম এই ভেবে যে একেবারে জলে পড়ি নি। সময় মতো হাজির হব তাঁর গৃহে এই কথা বলে বিদায় নিলাম।

ঠাকুর সাহেব যে আস্তানায় আমায় আনলেন তা দেখে মুষড়ে পড়লাম। শুধু একটি ঘর, কোনো তক্তপোশ নেই, টেবিল নেই, চেয়ার নেই, ফার্নিচারহীন একটি নিরাভরণ গৃহ। ঠাকুব সাহেব ঘরে ঢোকেন নি, বোধ হয় এই করুণ অবস্থাটা ওঁর জানা ছিল না। বলে গেলেন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে অফিসে গেলেই চলবে। কিন্তু বিশ্রাম নেব কি ভাবে, বসবারই ব্যবস্থা নেই। আমার ট্রাঙ্কের উপরই বসে পড়লাম এবং পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলাম। এখানে খাবার ব্যবস্থা নেই। এজমালি টয়লেট এবং জল আনাতে হবে বাইরে থেকে লোক দিয়ে। মনস্থির করলাম যে আজই একটা ভালো হোটেলে চলে যাব। ইতিমধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের একজন পিওন এসে জানাল যে আহারের সময় হয়েছে। তার সঙ্গে চলে এলাম গুপ্ত সাহেবের বাড়িতে। খেতে খেতে গুপ্ত সাহেবের কাছে পোর্টব্লেয়ারে থাকা-খাওয়ার সমস্যাটি শুনলাম। এখানে কোনো হোটেলই নেই। মাত্র দুটি সরকারি অতিথি-গৃহ আছে যা সব সময়ই প্রায় ভরতি হয়ে আছে রাজকর্মচারী

দ্বারা। আমাদের ঠাকুর সাহেব এবং প্রিয়ভূষণ ভট্টাচার্য কোনোক্রমে জায়গা পেয়েছেন সরকারি অতিথি-গৃহে। এখন কোথাও আর জায়গা নেই। সুতরাং ব্যাচেলার কোয়ার্টারে আমার থাকার ব্যবস্থা। খাওয়া-শেষে গুপ্ত সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিসের পথে বের হলাম।

একটি পুরনো দোতলা কাঠের বাড়িকে সংস্কার করে উপরের ঘরগুলিকে স্টুডিয়ো এবং নীচের গুলিকে অফিসে রূপান্তরিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। মিস্টার ভট্টাচার্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন কাজ কতটা এগিয়েছে। একটি মাত্রই স্টুডিয়ো হবে। আর থাকবে রেকর্ড/টেপ বাজাবার এবং ঘোষকের জন্য আর-একটি স্টুডিয়ো। কনট্রোলরুমও উপরেই থাকবে। খুবই সামান্য আয়োজন। এই বাংলোর যেটি ছিল রান্নাঘর সেখানে এক কিলোওয়াট শক্তির ট্রান্স্মিটার বসাবার কাজও চলছে। ট্রান্স্মিটার-মাস্টও এই বাড়ির চত্বরের পুবদক্ষিণ কোণে খাড়া করা হয়েছে। এ-সব দেখেশুনে এবার স্টেশন ডিরেক্টরের ঘরে বসলাম প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনার জন্য। তিনি বললেন যে স্টেশনের মূল ভাষা হবে হিন্দি। বাংলা ও মালয়ালম ভাষাতেও সপ্তাহে আধঘণ্টা করে প্রোগ্রাম হবে। সংগীত, নাটক এ-সবের জন্য যোগ্য শিল্পী পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে প্রাথমিক সার্ভে করে নিতে হবে। দিল্লীর নির্দেশ যে সকাল দুপুর এবং রাত্রি এই তিনটি অধিবেশনই চালু করতে হবে শুরু থেকে। অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত নানা সমস্যার কথা আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

এদিকে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা নেই। শোবার ব্যবস্থা আজকের মতো মেঝেতেই করতে হবে। খাবার অন্বেষণে ডাউনটাউনে আবেরডিন-এ গেলাম। একেবারে পাশ্চাত্য নাম এই বাজার এলাকাটির। বড়ো বড়ো দোকানপাট রয়েছে। একটি চা-এর স্টলে

ঢুকে চা চাইলাম। মনে হল সব চেয়ে ভালো স্টল। প্রথমবার পেয়ালায় চুমুক দিয়ে দ্বিতীয়বার এই কার্যটি করতে সাহস পেলাম না। দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম। ভালো রুটি পাওয়া গেল। মাখনের কৌটোও কিনে নিলাম। কিন্তু পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই আমার ঘরে। তুটি ডাব কিনলাম। ঘরে বালব্ আছে কি না লক্ষ করে দেখি নি। কিনে নিলাম তুটি। এইভাবে রাত্রির জন্য তৈরি হয়ে একটি ট্যাক্সিতে ফিরলাম আস্তানায়।

আন্দামানে প্রথম রজনী। মেঝেতেই বিছানা পেতে শুয়েছিলাম। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল। ঘাড়ের নীচে সুড়সুড়ি, ঠিক সুড়সুড়ি নয়, যেন অসংখ্য কাঁটা দিয়ে আস্তে আস্তে আঁচড়ে দিচ্ছে। কাঁটা দিয়ে উঠল সারাটা গা। লাফ দিয়ে উঠে বাতি জ্বালালাম। শিয়রের বালিশ সরিয়ে যে প্রাণীটিকে দেখতে পেলাম তাতে ভয়ে শিউরে উঠলাম। প্রায় সাত-আট ইঞ্চি লম্বা, আধ ইঞ্চির উপর চওড়া একটা অতিকায় তেঁতুলে বিছে জাতীয় প্রাণী, পুব বাংলায় বলে চেলা। রঙটা আগুনের মতো। কামড় দিলে মৃত্যুর তুয়ারে পৌঁছে যেতাম। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সম্বিৎ ফিরে এল প্রাণীটির নড়াচড়া শুরু হতে। পালিয়ে যেতে পারবে না। মেঝে তো একেবারে পরিষ্কার। একে মারতেই হবে। বিছানা থেকে সরে যেতে দিলাম। জুতোর আঘাতে এটাকে আধমরা করে একটি খালি সিগারেটের টিনে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলাম। পাহাড়ী অঞ্চলে বড়ো বিছে দেখেছি এর আগেও। কিন্তু এরকম ভয়ংকর চেহারার এত বড়ো বিছে দেখা দূরে থাকুক কল্পনাও করতে পারি না। সারা রাত বিছানার উপর বসে একটির পর একটি সিগারেট খেতে খেতে কাটিয়ে দিলাম। চোখের ঘুম উধাও হয়ে গেল।

পরদিন অফিসে গেলাম সকাল সাড়ে আটটায়। আন্দামানে অফিসের সময় সকাল সাড়ে আটটা থেকে তুপুর বারোটা, এক ঘণ্টা

বিরতির পর বিকেল চারটে অবধি। দিল্লীর অনুমতিক্রমে আমাদের অফিসেও এই নিয়ম চালু করা হল। অফিসে গিয়ে ঠাকুর সাহেবের কামরায় ঢুকে দেখি তিনি টেবিলের উপর দণ্ডায়মান। বাক্‌রহিত অবস্থায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন নীচের ট্রের দিকে। দেখি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমে অচেতন একটি সাপ। ঘরে ঢুকে ওটাকে দেখেই প্রাণভয়ে টেবিলের উপর উঠে গেলেন ঠাকুর সাহেব। আমাকে দেখে সাহস এবং বাক্‌শক্তি ছুটোই যুগপৎ ফিরে এল। সবাইকে চিৎকার করে ডাকলেন। মিস্ত্রিরা এসে সাপটিকে মারল।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাকুর সাহেব চেয়ারে বসলেন। আমার হাতে সিগারেটের টিন দেখে একটি সিগারেট চাইলেন। টিনের ভিতর প্রাণীটির নড়াচড়া টের পাচ্ছিলাম। সন্তর্পণে টিনের মুখটি খুলে ধরলাম ঠাকুর সাহেবের সামনে। চেয়ার থেকে লাফ মেরে উঠে গেলেন ঠাকুর সাহেব। পাশে বসা ভট্টচাজমশায় বললেন, 'a dangerous thing।' রাত্রের ঘটনাটি বললাম। একজন মিস্ত্রি মৃত সাপটির পাশে বিছেটিকে টিন থেকে বের করে রাখল। কিছু কিছু চলাফেরা করতে পারে তখনো। মিস্ত্রি বলল যে পোর্টব্লেয়ারের মানুষ সাপের চেয়েও এই প্রাণীটিকে ভয় করে বেশি। কামড়ালে মৃত্যু না হলেও সাত-আট দিন হাসপাতালবাস অবধারিত। একটি-ছুটি ক্ষেত্রে মৃত্যুর খবরও শোনা গেছে। এবার স্টেশন ডিরেক্টর জানালেন যে আন্দামানে এই প্রাণীটিকে বলে কানখাজোড়া, ইংরেজি নাম centipede। এরা বিছানার নীচে, জুতোর ভিতর, চেয়ারের গদীর নীচে লুকিয়ে থাকে। জামার ভিতরেও বিশ্রাম নেয়। পোর্ট-ব্লেয়ারে জামা-জুতো খুব ভালো করে না ঝেড়ে পরতে নেই।

বাঙালিদের একটা লাইব্রেরি আছে। সন্ধেয় গেলাম লাইব্রেরিতে। বইয়ের স্টক মোটামুটি মন্দ নয়। প্রায় সব বাঙালি লেখকদের বই আছে, এমন-কি, আধুনিকতম বইটি পর্যন্ত। আছে সামান্য সংখ্যক

ইংরেজি পুস্তকও। কলকাতা থেকে এত দূরে, সাগরের ওপারে এমনটি আশা করি নি। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল। অতি ভদ্র বিনীত ব্যবহার। জানতে পারলাম বাঙালিদের ক্লাবেরই সংশ্লিষ্ট এই লাইব্রেরি, অতুল-স্মৃতি পাঠাগার। এই ক্লাবেরই একটি মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ আছে। পোর্টব্লেয়ারে যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই হলেই আয়োজিত হয়। ওঁদের কাছে শুনলাম এই বাঙালি ক্লাবের প্রাণপুরুষ হলেন মিস্টার স্যাণ্ডেল, সান্যালেরই অপভ্রংশ।

গেলাম স্যাণ্ডেল সাহেবের বাড়ি সে রাত্রেই। উজ্জ্বল গৌরকান্তি, সুদেহী, সুদর্শন স্যাণ্ডেল সাহেব খুবই ভদ্রতার সঙ্গে এনে বসালেন ড্রইংরুমে। মানুষটি এমন যে দেখলেই ভালো লেগে যায়। পরিচয় হল মিসেস স্যাণ্ডেলের সঙ্গেও। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, মুখের হাসিটি কৃত্রিম নয়। চায়ের কাপ আমার হাতে দিয়ে বললেন যে রাত্রের আহার এখানে না করলে আমায় এ বাড়ি থেকে যেতেই দেওয়া হবে না। ভাবলাম ভাগ্য প্রসন্ন, আজ রাত্রে আহার জুটবে। মিস্টার স্যাণ্ডেল ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার। সুন্দর সুবৃহৎ বাংলোতে বাস করেন। জানতে চাইলাম লাইব্রেরির অতুল-স্মৃতি নামটা কোন্ মহাজনের স্মরণে রাখা হল। মিহিরকুমার স্যাণ্ডেল বললেন একটি করুণ কাহিনী।

অতুল চট্টোপাধ্যায় খুব একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না পোর্টব্লেয়ারে। কিন্তু অতি সজ্জন সহৃদয় মানুষ। প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য বাঙালি সমাজে ছিলেন খুব জনপ্রিয়। চাকরি করতেন ট্রেজারি অফিসার পদে। সাধারণ লোক বলত 'তেরজুরি' বাবু। ব্রিটিশের আমল থেকেই ছিলেন। মাঝে প্রায় তিন বছর আন্দামান যখন জাপানের দখলে ছিল তখনো অতুলবাবু ট্রেজারি অফিসারই ছিলেন। এক প্রত্যুষে ওঁকে মৃত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

দৃশ্যটি ছিল অত্যন্ত বীভৎস। ধড় থেকে মুণ্ড প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। অকৃতদার অতুলবাবু একাই থাকতেন। সেই সময়টায়, জাপানী অক্যুপেশনের দিনে বাঙালি প্রায় ছিলই না পোর্টব্লেয়ারে। ভয়েও লোকজন বেশি বের হত না ঘর থেকে। মৃতদেহটির ঠিক হিন্দু-প্রথায় সংকার হয়েছিল কি না সে কথা বলতে পারলেন না মিস্টার স্যাণ্ডেল। তিনি এখানে এসেছেন ১৯৪৫ সনের নভেম্বরে মিত্রশক্তিদ্বারা আন্দামান পুনরধিকারের পরে পরেই। এ-সব কথা তিনি এখানে এসে শুনেছেন এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে, যাদের বলা হয় 'লোক্যাল'। এই অতুলবাবুর স্মৃতির সম্মানে লাইব্রেরির নাম হল। এক প্রবাসী বাঙালির অনাত্মীয় পরিবেশে মর্মন্তুদ অপঘাত মৃত্যুর কাহিনী শুনে বেদনাবোধ হলেও সান্ত্বনা এই ভেবে যে পোর্টব্লেয়ারের পরবর্তীকালের বাঙালিরা এই শহরের অতীতের এই মানুষটিকে ভুলে যায় নি।

'লোক্যাল' কথাটির তাৎপর্য জানতে চাইলে স্যাণ্ডেল-গৃহিণী শ্রীমতী স্মৃতিকণা বললেন যে এই নামটি খুবই ইন্টারেস্টিং এবং মূল ভূখণ্ড থেকে এখানে চাকরি নিয়ে আসা মানুষদের কণ্ঠে শোনা যায় বেশি। লোক্যাল বলা হয় তাদেরই যারা এখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করছে। কোনো পরিবারের এটা মাত্র দ্বিতীয় পুরুষ চলছে, কারো-বা তৃতীয়। বিলেত-ফেরত শিক্ষিতা মহিলা স্যাণ্ডেল-ভার্যা শোনাতে লাগলেন এই দ্বীপের বসতির অসামান্য কাহিনী : পোর্ট-ব্লেয়ারের সেলুলার জেলের কুখ্যাতির কথা কারো অজানা নয়। ভারতের বহু বিপ্লবীকে এ জেলের নির্জন কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এক-একজনের জন্য এক-একটি অতি ছোটো পায়রার খোপ। এই জেলে বন্দী ছিলেন বীর সাভারকার, বারীণ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত। আরো কতশত রাজদ্রোহীকে শাস্তি দিয়ে দ্বীপান্তর পাঠিয়েছে ব্রিটিশ সরকার এই জেলে। এই জেলের পত্তন হয়েছিল

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে। রাজদ্রোহী ছাড়াও সারা-জীবন কারাবাসের শাস্তিপ্রাপ্ত নিষ্ঠুর অপরাধীদেরও কয়েদ রাখা হত পোর্টব্লেয়ার জেলে। এদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোক ছিল। ছিল স্ত্রীলোকও, যদিও সংখ্যায় অনেক কম। সব প্রদেশেরই স্ত্রী-পুরুষ ছিল এই জেলে।

একটু থেমে, মুচকি হেসে শ্রীমতী স্যাণ্ডেল বললেন যে এক সুদর্শন বাঙালি ছেলেও ছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পড়েছেন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পঞ্চানন ঘোষালের লেখা রক্তনদীধারা?' মাথা নেড়ে জানালাম পড়েছি।

বলে চললেন শ্রীমতী স্যাণ্ডেল: সেই পাগলাহত্যা মামলার খোকা গুণ্ডার দোসর গোপী চক্রবর্তীও রয়েছে এদের মধ্যে। খোকা গুণ্ডার ফাঁসি হল, গোপী চক্রবর্তীর শাস্তি হল যাবজ্জীবনের কারাবাস। একে পাঠানো হল পোর্টব্লেয়ারের জেলে। এই-সব কয়েদীদের দূরে আলাদা করে রাখা হত রাজদ্রোহীদের কাছ থেকে। কয়েক বছর জেলের ভিতরে রাখার পর এদের দিনের বেলায় ছেড়ে দেওয়া হত বাইরে রাস্তাঘাট বানাবার কাজে। সাধারণত কেউ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত না। পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? চার দিকেই সমুদ্র। শ্রীমতী স্যাণ্ডেল বললেন যে একবার একটি লোক দিনের শেষে জেলের গেটে ফিরে এল না। তিনদিন পর অনাহারক্লিষ্ট অবসন্ন দেহে কয়েদীটি ফিরে এল। আন্দামানের জঙ্গলে মানুষের খাদ্য বা পানীয় কিছুই পাওয়া যায় না। মিষ্টিজল নেই শহরের বাইরে। লোকটা নারকেল গাছেও চড়তে জানত না। জেলে ফিরে এলেই খেয়ে প্রাণরক্ষা হবে, তাই ফিরে এল।

এর পর যা বলতে শুরু করলেন শ্রীমতী স্যাণ্ডেল সেটা যেন রূপ-কথার গল্প।

এক সময় ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা হল যে অস্ট্রেলিয়ার মতো

এখানেও একটা নূতন বসতি স্থাপন করে। একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট করতে শুরু করল জেল-কর্তৃপক্ষ। জেলের কয়েদীদের মধ্যে যাদের কাজ এবং আচরণ সন্তোষজনক এমন কয়েকজন যুবা কয়েদীকে ডেকে তাদের বোঝানো হল যে কারাবাসের শেষে দেশে ফিরে গেলে সমাজে আর স্থান হবে না। সুতরাং এরা যদি এখানে থাকতে চায় সরকার এদের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করে জেলের বাইরে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেবে, এমন-কি, বিয়ের ব্যবস্থাও। এটা তো হাতে আকাশের চাঁদ পাবার মতন। সবাই লুফে নিল প্রস্তাবটি, স্ত্রীলোকেরাও। একটু মিষ্টি হেসে শ্রীমতী স্যাণ্ডেল রসমধুর করে বলতে লাগলেন: এক মঙ্গল প্রভাতে যুবা কয়েদীদের লাইন করে দাঁড় করানো হল ছায়াঘেরা এক নির্জন জায়গায়। সেখানে নিয়ে যাওয়া হল সন্তান ধারণযোগ্যা স্ত্রী-কয়েদীদের। সংখ্যায় এরা পুরুষদের তুলনায় নিতান্তই কম। এই মেয়েদের বলা হল নিজ নিজ জীবন-সঙ্গীকে বেছে নিতে এই পুরুষদের মধ্য থেকে। এ যেন বহু কন্যার জন্য আয়োজিত বিরাট এক স্বয়ম্বর সভা। একটু গম্ভীর হয়ে শ্রীমতী স্যাণ্ডেল বলে চললেন: এ মেয়েদের সামনে জীবনের আর-একটি চরম মুহূর্ত। চোখ মেলে ভালো করে চেয়ে কি দেখতে পেরেছিল সেই লোকটিকে! সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একটি মানুষের কণ্ঠে পরিয়ে দিল বরমাল্য নিজেকে পুরোপুরি ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে। সব মেয়েদেরই এটি দ্বিতীয় বারের বিয়ে। ওদিকে ভাগ্য যাদের প্রসন্ন সেই পুরুষদের কণ্ঠে পড়ল বরমাল্য। বাকিরা বিষণ্ণমনে ফিরে গেল। এই-সব দম্পতিদের একমাস সময় দেওয়া হল একসঙ্গে বাস করার। বোঝাবুঝি যদি না হল এই সময়ের মধ্যে তবে নূতন করে আবার পতিনির্বাচন। তার আর প্রয়োজন হয় নি। একমাস পর আইন অনুযায়ী বিয়ে হল। হয়তো হিন্দু স্বামী পেল মুসলমান স্ত্রী, মুসলমান স্বামীর ঘরে এল হিন্দু স্ত্রী। ভাষাটাও হয়তো তাদের ভিন্ন। কাহিনী

শেষ করে শ্রীমতী স্যাণ্ডেল বললেন যে এইভাবে হল একটি নূতন মানববসতির পত্তন। এদেরই সন্তান-সন্ততিদের বলা হয় লোক্যাল। আর যে জায়গাটায় স্বামী নির্বাচন হয়েছিল প্রথমবার তার নামই হয়ে গেল শাদিপুর।

এমন বাস্তব পরিকথা শুনতে শুনতে রাত যে অনেকটা হয়ে গিয়েছে খেয়ালই ছিল না।

মিস্টার স্যাণ্ডেল শ্রীমতী স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কাহিনী প্রায় ঠিকই আছে। তবে মেয়েরা সাধারণত যেমন ঠোঁটে, মুখে সামান্য হলেও একটু রঙ মাখেন তোমার বলাতেও একটু রঙের ছোপ লেগেছে। আজ এখানেই থাক্, রাত হয়েছে, এবার খাবার ব্যবস্থা হোক।'

খাবার পর আমার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন স্যাণ্ডেল সাহেব নিজের গাড়িতে। ফিরে যাবার আগে বললেন যে দণ্ডিত নারী-পুরুষদের বিবাহের বিষয়ে আরো সবিশদ বলার প্রয়োজন আছে। সেটা বলা হবে আগামী কাল রাতে ওঁরই গৃহে। কাল রাত্রির আহারও ওখানেই করতে হবে এই অনুরোধ করে শুভরাত্রি জানালেন।

পরদিন রবিবার। সকালবেলা যেতে হবে পি. ডাব্‌লিউ. ডি.-র প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুধীন গুপ্ত মশায়ের বাড়ি। আগে থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা ছিল। চীফ ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে পদটির নাম প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার কেন হল বুঝতে পারি নি। সুধীন গুপ্ত মশায়কে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে যখন বললাম যে কষ্ট করে আমার সঙ্গে একটু জোরেই কথা বলতে হবে তখন ওঁর মুখে আন্তরিক সহানুভূতির ভাবটা দেখে মনে হল যে মানুষটি বড়ো হৃদয়বান। তিনি জানালেন কথাটা ওঁর অজানা নয়। কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের ডিরেক্টর চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে আমার শ্রবণ-

শক্তি কম। অনুরোধ করেছেন সুধীনবাবুকে যেন এই বিদেশ বিভুঁয়ে আমার একটু খোঁজখবর রাখেন। স্মিত হেসে সুধীনবাবু আমায় আশ্বাস দিলেন যে সে দায়িত্বটা তিনি গ্রহণ করেছেন বলে কলকাতা কেন্দ্রের ডিরেক্টরকে লিখে জানিয়ে দিয়েছেন।

খবরটা আমায় একটু বিস্মিত করল। কলকাতা কেন্দ্রের ডিরেক্টর বি. কে. নান্দী (নন্দীকে ইংরাজিতে Nundee লিখতেন) যে স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে আমার বিষয়ে সুধীনবাবুকে লিখবেন এমন কথাটা কখনো ভাবতে পারি নি। বি. কে. নান্দী খুব সুবেশ পুরুষ, চলাফেরায় একেবারে সাহেব। নীচে যারা কাজ করে তাদের কাছে হৃদ্যতা প্রকাশ করেন না। এই মানুষটির বুকের ভিতরে কোনো নরম জায়গা আছে কেউ কখনো সেটা দেখতে পায় নি অফিসে। আমিও খুব কম সময়ই তাঁর অধীনে কাজ করেছি। এই ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মানুষকে সবটা চিনতে পারি দাবি করাটা কত ভুল! মানুষের হৃদয়টা বিরাট একটা অজানা মহাদেশ। কতটুকু আর দেখা যায় বাইরে থেকে!

মিসেস গুপ্ত এলেন, শ্রীমতী প্রতিভা গুপ্ত। এত বড়ো অফিসারের স্ত্রী, কিন্তু চাল-বোল নেই। বিদুষী, স্নেহময়ী। কথা বলে বুঝলাম লেখাপড়ায় অনেকটা সময় কাটান। লিখলেনও বই আন্দামান নিয়েই। বড়ো ভালো লাগল গুপ্ত-দম্পতিকে। রেডিয়োর কাজে সর্ব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর নিঃসঙ্গ এই কালা মানুষটিকে কত যে ভালোবাসলেন সে কথা তো এখানে নয়।

সেদিন সন্ধ্যায় মিস্টার স্যাণ্ডেলের বাংলোতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমাকেই শোনাবার উদ্দেশ্যে। শ্রীমতী স্মৃতিকণা বললেন যে পোর্টব্লেয়ারের প্রায় সব শিল্পীই উপস্থিত। চার-পাঁচজন গান গাইলেন। বাঁশি বাজালেন করাতকলের ম্যানেজার মিস্টার ভট্টাচার্য। এক ভদ্রলোক এস্রাজও

বাজালেন। তবলা সংগত করলেন পি. ডাব্লিউ. ডি.-র এক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। শুনছিলাম এবং বেতারের মানের নিরিখে এঁদের সংগীত বিচার করছিলাম মনে মনে। এঁরা সবাই মূল ভারত ভূখণ্ড থেকে চাকরি নিয়ে এখানে এসেছেন। এঁদের মধ্যে শুধু এক মহিলা শিল্পী এলাবাহাদ বেতার-কেন্দ্র থেকে নিয়মিত গান গেয়েছেন আগে। মিস্টার স্যাণ্ডেলকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে সংগীত বা অন্যান্য চারুকলার কৃষ্টি এখনো গড়ে ওঠে নি। বাঙালি যাঁরা এখানে রয়েছেন অনেকদিন তাঁদের মধ্যেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে গান-বাজনার চর্চা বেশি নেই। একটু বড়ো হলেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য পাঠানো হয় মেইনল্যাণ্ডে। ছেলেমেয়েরা শুধু ছুটির সময় বছরে মাত্র দুবার এসে মা-বাবার কাছে থেকে যায়। অতএব গান শিখবেই বা কারা? সে সন্ধ্যায় গান-বাজনার শেষে হিসেব করে দেখলাম যে মাত্র একজন শিল্পীই, সেই এলাহাবাদ কেন্দ্রের আর্টিস্ট, তৃপ্তি সান্যাল যার নাম, রেডিয়োর নির্দিষ্ট মানের উপযোগী। তা হলে রেডিয়ো চলবে কী ভাবে! চা-জলখাবারের পর শিল্পীরা বিদায় নিলেন। আমি রয়ে গেলাম রাত্রির আহারের জন্য এবং বিশেষ করে লোক্যালদের বিবাহের আদিপর্বের ইতিহাস শোনবার আশায়।

খেতে খেতে মিস্টার স্যাণ্ডেল বলতে শুরু করলেন: জেলে বন্দী অপরাধীকে বর হিসেবে বিবেচিত হবার আগে অন্তত দশটি বছর কঠোর শাস্তি এবং চূড়ান্ত নিয়মশৃঙ্খলার অগ্নি-পরীক্ষায় পাস করতে হল। প্রথম ছ মাস নির্জন কারাবাস, পরের আঠারো মাস কঠোর শ্রমের ব্যারাক-বাস। তার পরের তিন বছর দিনের বেলা জেলের বাইরে রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজ করা এবং দিনান্তে পুনরায় কারাগারে প্রবেশ। এভাবে পাঁচটি বছর পার হবার পর জেলের ভিতরে বা বাইরে অন্য বন্দীদের কাজের তদারকি বা অফিসারদের গৃহে কাজ

করতে হত। বিনিময়ে মাসিক সামান্য বেতন দেওয়া হত এদের। এমন চলত আরো পাঁচ বছর। মোট এই দশ বছরে লোকটির কাজ-কর্ম সন্তোষজনক বিবেচিত হলে তাকে সেল্‌ফ্‌-সাপোর্টার বা স্বাবলম্বী হবার সার্টিফিকেট দেওয়া হত।

একটু থেমে মিস্টার স্যাণ্ডেল বলতে লাগলেন: আন্দামান জেলের বন্দীদের মধ্যে সেল্‌ফ্‌-সাপোর্টার বলে যে শ্রেণীবিভাগটি ছিল তেমনটা বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ছিল না। এদের শহর থেকে কিছুটা দূরে ছোটোখাটো গ্রামে মোটামুটি স্বাধীনভাবে থাকতে দেওয়া হত। অধিকাংশই চাষাবাদে জীবিকাসংস্থানের ব্যবস্থা করতে লাগল। উৎপন্ন শস্য, শাক-সবজি আন্দামান সরকার ন্যায্য মূল্যে কিনে নিত। জেলে অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা যারা লাভ করল তারা সেই দিয়েই রোজগার করত। সরকারি সাহায্যও পাওয়া যেত। এদের মধ্যে যাদের বিয়ে করে ঘর-সংসার করার ইচ্ছে হত তারা সরকারের কাছে স্ত্রীর জন্য আবেদন জানাত। নির্দিষ্ট দিনে একটি ঘরে বিবাহে ইচ্ছুক এবং সন্তান-ধারণের উপযুক্ত নারী কয়েদীদের নিয়ে আসা হত। বিয়ে করতে চায় এমন সেল্‌ফ্‌-সাপোর্টারদের তুলনায় নারী কয়েদীর সংখ্যা নেহাতই কম। ১৮৯৭ সনে দেখা গেল পুরুষ সেল্‌ফ্‌-সাপোর্টার ২৪৫০ জন, মেয়ে মাত্র ৩৬৩। মেয়ে কম থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনটা অর্থাৎ স্ত্রী বেছে নেবার দায়িত্বটা পুরুষদেরই দেওয়া হত আবেদনকারীর অগ্রাধিকার অনুযায়ী। কারণও অবশ্য ছিল। পুরুষকেই তো করে খেটে খেতে হবে, তাই তারই দাবিটা মানা হল।

স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে স্যাণ্ডেল সাহেব বললেন, 'এটাকে ঠিক স্বয়ম্বর সভা বলা যায় কি?' মিস্টার স্যাণ্ডেলের মুখে একটু দুষ্টুমির হাসি।

আবার বলতে শুরু করলেন তিনি: বিয়ে কিন্তু হল হিন্দুতে

হিন্দুতে যদিও নারায়ণ-শিলা বা পুরোহিত ছিল না। ওদিকে মুসলমান পুরুষ বিয়ে করল সেই ধর্মেরই এক নারীকে। কিন্তু মুসলমান স্ত্রীলোকটি যদি তালাক পেয়ে না থাকে স্বামীর কাছ থেকে এবং দেশে তার স্বামী জীবিত থাকে তবে সেই স্ত্রীলোকের বিয়ে করারই অধিকার নেই।

গিন্নির দিকে চেয়ে স্যাণ্ডেল সাহেব বললেন, 'তুমি যে আগে বলেছিলে যে স্বামী এবং স্ত্রীর ধর্ম এক নাও হতে পারে এমন কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু পরে এই নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে আশঙ্কা করে ব্রিটিশ সরকার এটা বন্ধ করে দিল।'

আমার দিকে চেয়ে স্যাণ্ডেল সাহেব আবার বলতে শুরু করলেন : গোড়ার ইতিহাস আর-একটু রয়ে গেল। প্রথমে পঁচিশজন হিন্দু বাঙালি কয়েদীর পরিবারকে এখানে পুনর্বসতির জন্য আনাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় ধর্মহানির ভয়ে একজন হিন্দু স্ত্রীও আসতে রাজী হল না।

কথাটা শুনে একটু আনমনা হয়ে গেলাম দেখে স্যাণ্ডেল সাহেব থামলেন। জিজ্ঞাসা করলেন কি ভাবছি।

বললাম, 'যে-দেশে স্ত্রীরা "সতী" হত, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেত, তারা জীবিত স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে এল না সেটা ভাবতে অবাক লাগে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্যাণ্ডেল সাহেব মন্তব্য করলেন যে হয়তো স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার উপযুক্ত শিক্ষাই ছিল না সেই স্ত্রীলোকদের এবং পারিবারিক, সামাজিক বাধাও ছিল প্রচণ্ড কালাপানি যাত্রাব পথে।

আবার বলতে শুরু করলেন : ১৮৬০ সালে বাংলার জেল থেকে পঁয়ত্রিশজন স্ত্রীলোক কয়েদীকে আনানো হল। এরা এলে পর বেশ কিছু বিয়ে হল। বিবাহিত পুরুষটিকে সেল্‌ফ্‌-সাপোর্টারের

মর্যাদা দেওয়া হল কারাবাসের সময়টা উপেক্ষা করেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে। কিন্তু একটা মহাসমস্যা দেখা দিল। এমন অনেকে ছিল যারা আজীবন দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিত হয় নি। আট-দশ-বারো বছরের জেল হয়েছে। এখানে এসে বিবাহ করার সুবাদে প্রায় মুক্ত মানুষের মতো বাস করতে লাগল এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাবাসের পর সম্পূর্ণ মুক্ত হল। তার এখন দেশে ফিরে যাবার স্বাধীনতা আছে। দেশে গিয়ে বাড়িঘরের বন্দোবস্ত করে অল্প সময়ের মধ্যেই স্ত্রী-কন্যা-পুত্রকে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি গেল। কিন্তু ফিরে আর এল না। পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকটি যদি নিঃসন্তান হয় তবে আর-একজন স্বামী পেতে তার খুব অসুবিধে হল না। কিন্তু অন্যের ছেলেমেয়ে-সহ একটি স্ত্রীলোককে সহজে আর কেউ তো বিয়ে করতে চায় না, ভোগ করার আপত্তি না থাকলেও। কাজেই স্ত্রীলোক-ঘটিত অনাচার হতে লাগল এবং মারামারি খুনোখুনিও। সরকার তখন আইন করে দিল যে আন্দামানে আজীবন বাস করতে না চাইলে বিয়ে করতে দেওয়া হবে না। সুতরাং যারা বিয়ে করল তারা এখানেই রয়ে গেল।

স্যাণ্ডেল সাহেব বললেন যে এদেরই দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষকে এখানে দেখতে পাচ্ছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে সেল্‌ফ্-সাপোর্টাররা পুরোপুরি মুক্তিলাভ করল কখন্?

তিনি জানালেন যে আজীবন দ্বীপান্তরবাসের দণ্ড নিয়ে যারা এসেছে তাদেরকে বিশ বা পঁচিশ বছর পর মুক্তি দেওয়া হল। কিন্তু তাদের সন্তানরা মুক্তশিশু হয়েই জন্মলাভ করল, আর এই ছেলে-মেয়েদের বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থাও করল সরকার।

স্যাণ্ডেল সাহেব বললেন যে এই বিবাহিত কয়েদীদের বসতি একটু দূরে দূরেই করা হল। সরকারি কর্মচারী বা বহিরাগত

ব্যবসায়ীদের থেকে বেশ দূরে। শহর থেকে দূরে বসতিগুলি হল উইম্বারলিগঞ্জ, ভাইপার আইল্যাণ্ড ইত্যাদি। ছোটো রস দ্বীপে থাকতেন ইংরেজ অফিসাররা। আর হাড্ড্ নামে জায়গাটিতে ভারতীয়রা। মোট কথা, কয়েদী-বসতিগুলিকে একটু আলাদা করে রাখাই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল।

অপূর্ব কাহিনী শুনলাম এক মানব-বসতি পত্তনের। আমারই দেশের, আমার বাড়ির খুব কাছের নারীপুরুষ, যাদের জীবনের প্রায় সব কিছুই শেষ হয়ে গিয়েছিল— ব্যর্থ, হতভাগ্য সমাজ-পরিত্যক্ত হয়ে যাদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হত— তারাই নূতন করে ঘর বাঁধল সাধ, আশা, ভালোবাসা বুকে নিয়ে এবং ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে গেল এক নব প্রজন্মের স্রষ্টারূপে। রক্তের দোষ বাজে কথা। দৃষ্টান্ত অস্ট্রেলিয়া। পণ্ডিতের ছেলেকে মূর্খ হতে দেখেছি, যেমন উল্টোটাও। কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের এক প্রবীণ শিল্পী যৌবনে হঠাৎ খুন করে বসলেন নিজেরই এক আত্মীয়কে। কারাবাসের আগে ও পরে এমন একটি সুভদ্র মানুষ জীবনে কমই দেখেছি। হঠাৎ উত্তেজনার মুহূর্তে বুদ্ধিনাশ ঘটে। সামাজিক পরিবেশ বাধ্য করে পাপে লিপ্ত হতে অনেক ক্ষেত্রে। পুলিসে ছুঁলে আঠারো-দ্বিগুণে ছত্রিশ ঘা। আন্দামান বন্দীদের বিরুদ্ধে ক'টা জাল কেস ছিল কে বলবে সে কথা! আমার খাবারে, ওষুধে যে ভেজাল মেশায় আর তারই কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে লোক নির্বাচনে দাঁড়ায় তাদের দুজনের থেকেও আন্দামানের জেলের মানুষগুলি বেশি অপরাধী? তাদের উত্তরপুরুষের জন্য রইল আমার কল্যাণকামনা।

পরদিন অফিসে ডিরেক্টর ঠাকুর সাহেবের কাছে আগের রাত্রে স্যাণ্ডেলদের গৃহে গান শোনার অভিজ্ঞতা বললাম। তিনি বুঝতে পারলেন যে রেডিয়োর উপযুক্ত মানের শিল্পী এখানে পাওয়া যাবে না। সাময়িক কুশাভাবে কঞ্চিদ্বারা কাজ চালিয়ে নিতে হবে এই

সিদ্ধান্তই নেওয়া হল। স্থানীয় শিল্পীদের উৎসাহ দেবার জন্য কিছুটা নিচু মানের শিল্পীদেরও বাধ্য হয়ে প্রোগ্রাম দিতে হবে। এখানে সংগীতে পাণ্ডিত্য আছে এমন ব্যক্তি একজনও নেই। তাই বাইরে থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে অডিশন বোর্ড গঠন করাও সম্ভব নয়। এবং স্থানীয় শিল্পীর মান সর্বভারতীয় মানের চেয়ে যেহেতু নীচে সেজন্য রেডিয়োর নির্দিষ্ট ফি-স্কেলের মধ্যেও এখানকার শিল্পীদের আনা যাবে না। সুতরাং এখানে অডিশন পাস-করা শিল্পী অন্য কেন্দ্র থেকে প্রোগ্রামও দাবি করতে পারবেন না। মেইনল্যাণ্ডের নিয়ম হল যে যে-কোনো রেডিয়ো স্টেশন থেকে অডিশন পাস করলেই হল। প্রতিটি কেন্দ্রের শিল্পীতালিকা অন্য-সব কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতার শিল্পী যদি দিল্লীতে বদলি হয়ে যান তবে নূতন করে সেখানে অডিশন পাস করার প্রয়োজন নেই। শিল্পীর নাম, শ্রেণী, ফি, এবং কি গান করেন সে-সব তথ্য দিল্লী কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আন্দামানের শিল্পীকে ন্যায্য কারণেই সে সুবিধা দেওয়া যেতে পারে না। সেদিনই সমস্ত বিষয় সবিশদ ব্যাখ্যা করে দিল্লীর কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হল। কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রস্তাব অনুমোদন করল। এইভাবে পোর্টব্লেয়ারে একটা আলাদা শিল্পীগোষ্ঠী তৈরি হল।

পোর্টব্লেয়ারে সে সময়ে একটি মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি। মাস্টারমশায়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। কিন্তু মনে হল সপ্তাহে একটির বেশি কথিকা প্রচার করা যাবে না। ক'জনই বা শিক্ষক। মাঝে মাঝে বাংলা নাটকের আয়োজন করেন বাঙালিরা। অভিনেতা হয়তো পাওয়া যাবে সামান্য কয়েকজন, কিন্তু নাটক লেখবার উপযুক্ত লেখকের নিতান্তই অভাব। গানের জন্য কয়েকজন শিল্পী পাওয়া গেলেও গীতিকার নেই। লিরিক যদি আনিয়েও নেওয়া হয় অন্য কেন্দ্র থেকে, সুরকার পাব কোথায়?

শিল্পীদের সঙ্গে যন্ত্র-সহযোগিতা করার লোকই বা পাওয়া যাবে কোথায়? সাগরের ওপারে কালাপানি পার হয়ে কোনো যন্ত্রশিল্পী মেইনল্যাণ্ড থেকে এখানে আসবে না। কি করে প্রোগ্রাম তৈরি করা যাবে সে বিষয়ে প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকল। আমাদের বিপন্ন অসহায় অবস্থা। বোঝা গেল গ্রামোফোন রেকর্ড এবং অন্য বেতার-কেন্দ্র থেকে টেপ করা সংগীতের উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে। আমাদের সঙিন অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখলাম বিভিন্ন কেন্দ্রের কাছে। নাটকের রেকর্ডিংও চাইলাম।

কিন্তু চিঠি পাবে তাড়াতাড়ি কি করে? দুটি মাত্র জাহাজ। নিকোবর নামে জাহাজটি খারাপ হয়ে মেরামতের জন্য পড়ে রইল ডকে। একবার তো চিঠি পেলাম প্রায় চল্লিশ দিন পর। সুতরাং তাড়াতাড়ি রেকর্ডিং পাওয়াও সম্ভব হবে না। এদিকে তাড়াতাড়ি স্টেশন চালু করার জন্য ঘন ঘন তাগিদ আসতে লাগল দিল্লী থেকে টেলিগ্রামে। ন্যায্য অজুহাত দেখিয়ে আমরা যতই চেষ্টা করি পিছিয়ে দিতে দিল্লীর কর্তারা ততই তাগিদ দিচ্ছেন রেডিয়ো চালু করার একটা দিন ঠিক করতে। এদিকে আমাদের প্রস্তুতি বিশেষ নেই। কিছুটা সময় কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম খানিকটা টেকনি-ক্যাল সমস্যা নিয়ে দিল্লী থেকে সংবাদ রিলে করার ব্যাপারে। যে-সব ফ্রিকোয়্যান্সিতে ইংরেজি, হিন্দি বুলেটিন দিল্লী থেকে প্রচার করা হয় তা এখানকার গ্রাহকযন্ত্রে সুস্পষ্ট ধরা যায় না। সে কথা দিল্লীতে জানিয়ে দিল আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। দিল্লী থেকে নির্দেশ এল বুলেটিনগুলি বিভিন্ন সময়ে রেকর্ড করে পাঠাতে। পরের জাহাজে এই রেকর্ডিং দিল্লীতে পাঠানো হল। এটা পাঠিয়ে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। অন্তত এক মাসের সময় পাওয়া যাবে।

পোর্টব্লেয়ার কেন্দ্রের জন্য একটি বিশেষ ফ্রিকোয়্যান্সিতে সংবাদ

প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিল দিল্লীর কর্তৃপক্ষ। একটা আলাদা ট্রান্স্‌মিটার থেকে সংবাদ 'বীম্‌' করা হবে পোর্টব্লেয়ার রেডিয়ো স্টেশনের জন্য। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে ছ সপ্তাহ সময় পেয়ে গেলাম আমরা। মোটামুটি একটি প্রোগ্রামের খসড়া তৈরি করে আমরাও জানিয়ে দিলাম যে জুন মাসের দুই তারিখ একটি শুভদিন এবং ঐদিনই বিকেল পাঁচটায় স্টেশন চালু করা হবে। প্রতিদিন তিনটি অধিবেশন। সকালে ছ'টা থেকে ন'টা, দুপুর বারোটা থেকে আড়াইটে, বিকেল পাঁচটা থেকে দশটা এবং শনিবার ন্যাশনল্‌ প্রোগ্রাম অব্‌ মিউজিক-এর জন্য রাত এগারোটা অবধি।

এবারে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে বসে গেলাম। আমার সহকর্মীরা স্টেশন ডিরেক্টরকে বললেন যে আমন্ত্রিত শ্রোতাদের সামনে মঞ্চে একটি হিন্দি এবং একটি বাংলা নাটক পরিবেশন করলেই ভালো হয়। দেখলাম যে ডিরেক্টরও সেটাই অনুমোদন করলেন। যে মিটিং-এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল আমি সেখানে উপস্থিত থেকেও সম্পূর্ণ নীরব রয়ে গেলাম। একটি কথাও বললাম না।

চুপ করে আছি দেখে ঠাকুর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন কিছু বলছি না কেন ?

নিবেদন করলাম যে আমি নিরুপায়, এমন অধর্মের কথায় আমি সায় দিতে পারি না।

বিরক্ত হয়ে ঠাকুর সাহেব জানতে চাইলেন আমার কথার অর্থ কি।

বললাম যে মঞ্চে যাওয়াটাই আমাদের পক্ষে অধর্মের কাজ, মঞ্চে কিছু পরিবেশন করা রেডিয়োর 'স্বধর্ম' নয়, মঞ্চ সম্পর্কে আমাদের কিছু ট্রেনিংও নেই, নেই অভিজ্ঞতাও। তা ছাড়া নাটকের জন্য ভালো শিল্পী পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এমন অবস্থায় আমাদের

মঞ্চে নাটক পরিবেশন করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত হবে না।

আমার মতামতটা কেউ যেন গ্রহণ করলেন না। তাকিয়ে দেখলাম সহকর্মীদের চোখে পরিহাসের ভাব। মুখ দেখে ঠাকুর সাহেবের মনের ভাবটা ঠিক বুঝতে পারলাম কি!

তিনি কিছু বললেন না দেখে নিবেদন করলাম যে ডিরেক্টরের আদেশ শিরোধার্য। তিনি যা বলবেন তাই হবে। তবে যেটা রেডিয়োর পক্ষে উচিত নয় তা যদি উল্লেখ না করি তা হলে কর্তব্যের ত্রুটি হবে।

কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ভাবে নেওয়া হল না। আমার কথাগুলি কি ঠাকুর সাহেব ভাবছেন? কি জানি! মনে একটা অশান্তি নিয়ে আস্তানায় ফিরলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা নভেল পড়বার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বার বারই একটা কথা মনে উঁকি দিচ্ছিল যে স্টেশন ডিরেক্টর হয়তো-বা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমার এত কথা বলার দরকার ছিল কি! রাত প্রায় দশটা, কড়ানাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি যে ঠাকুর সাহেব এবং শ্রীমতী ঠাকুর। একটু অবাক হয়েই দুজনকে ডেকে ঘরে এনে বসালাম। শ্রীমতী ঠাকুরের হাতে মস্ত বড়ো একটি ফ্লাস্ক্।

বললেন, 'এই রাতে তোমার আস্তানায় চা বা কফি আশা করতে পারি না। ঘরের গৃহিণীই নেই, এখানে কি করে আর এ-সব আশা করব। তাই এক ফ্লাস্ক্ভর্তি কফি নিয়ে এসেছি জোর আড্ডা করব বলে।'

গুজরাটের এই মহিলাটি প্রায়ই ওঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন। শুধু স্টেশন ডিরেক্টরেরই সস্ত্রীক এখানে আসার অনুমতি ছিল। সেটা ভেবেও বোধ হয় এই সহৃদয় মহিলা বাড়িতে এটা-ওটা করে খাওয়াতেন। খুবই বিদুষী। আগে রেডিয়োতেই কাজ

করতেন, তাই সহজভাবে মিশতেন আমাদের সঙ্গে। বাঙালির প্রতি একটা প্রসন্ন মনোভাব লক্ষ করেছি দুজনের মধ্যেই। বাঙালির সংগীত, সাহিত্য, চারুকলা -প্রীতি খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এঁরা। ওঁরা দুজনেই বলতেন যে দীর্ঘ ভৌগোলিক ব্যবধান সত্ত্বেও বাঙালি ও গুজরাটি এই দুই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে অনেক কিছু মিল দেখা যায়। পুরুষের ধুতি-পরা, মেয়েদের শাড়ি-পরার স্টাইল অনেকটা একরকম। বাঙালি মেয়ের কোমল মধুর কল্যাণী-শ্রী গুজরাটি মেয়ের মধ্যেও দেখতে পাব বলেছিলেন শ্রীমতী ঠাকুর। প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক আড্ডা করে ওঁরা উঠলেন। যাবার আগে ঠাকুর সাহেব বললেন যে, মঞ্চে নাটক-ফাটক আমাদের পরিবেশন করাটা উচিত হবে না। এ-ব্যাপারে আমার বলিষ্ঠ মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। উপর-অলা খুশি জেনে আমার মনটাও প্রফুল্ল হয়ে গেল।

উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চেই যেতে হল আমাদের। ডক্টর কেশকরের আমল থেকে বিশেষ বিশেষ বেতার অনুষ্ঠান আমন্ত্রিত শ্রোতার সামনে পরিবেশন করার একটা ট্র্যাডিশন চালু হয়ে গেল। এটাকে বন্ধ করা সহজ হবে না। কিন্তু পোর্টব্লেয়ার কেন্দ্রের উদ্‌বোধন উপলক্ষে মঞ্চে নাটক প্রযোজনার প্রস্তাবটা নাকচ হয়ে গেল। স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে কণ্ঠ-সংগীতের ব্যবস্থাই করলাম আমরা। একক সংগীতের প্রশ্নই ওঠে না : প্রোগ্রাম কিন্তু ভালো উৎরে গেল। শ্রোতাদের অজস্র অভিনন্দন পেলাম। একটা জিনিস এদের বিস্ময়ের উদ্রেক করল। পর পর আটটি কোরাস গানের মাঝে শুধু অনুষ্ঠান সম্পর্কে পনেরো সেকেণ্ডের ঘোষণা। ব্যস, আর কোনো কালক্ষেপ নেই পরের গানটির জন্য। পর্দা যে একবার উঠল অনুষ্ঠানের শুরুতে সেটা নামল অনুষ্ঠানের শেষে। মঞ্চের উপর এই যে সংগঠন এটা এখানকার শ্রোতাদের কাছে একেবারে নূতন জিনিস। চীফ কমিশনার মিস্টার বি. এন. মহেশ্বরী নিজে মঞ্চে এসে

আমাদের সুখ্যাতি করে গেলেন। নিতান্ত সাধারণ শিল্পী নিয়ে কত যে রিহার্সাল করতে হয়েছিল, কি অমানুষিক খাটুনি গিয়েছে এর পেছনে এটা আর চীফ কমিশনারকে কি করে বলি! শিল্পীরাও খুবই সহযোগিতা করলেন। আর সক্রিয় সাহায্য করলেন মিহির-কুমার স্যাণ্ডেল। মঞ্চের জন্য দক্ষিণা নিল না বাঙালিদের ক্লাব। আর যে শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করলেন এঁরা তো অডিশন পাস-করা শিল্পী নন। কিন্তু বহু কষ্ট স্বীকার করে বার বার রিহার্সালে এসেছেন। একটা স্পেশ্যাল ফি প্রত্যেক শিল্পীর জন্যই ধার্য করা হল। এবং অনুষ্ঠানের শেষেই যখন হাতে চেক পেয়ে গেলেন তাতেও কম অবাক হলেন না শিল্পীরা। রেডিয়ো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। শিল্পীদের যে বিল করে টাকা আদায় করতে হয় না রেডিয়ো থেকে সেটাও তো নূতন কথা এখানের শিল্পীদের কাছে।

রেডিয়োর ঘোষক-ঘোষিকা আমরা স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্য থেকেই পেয়ে গেলাম। একটি নারীকণ্ঠ তো খুব ভালো পাওয়া গেল। পরিষ্কার উচ্চারণ, আওয়াজও খুব সুন্দর। নাম সায়রা বেগম। মেয়েটি বুদ্ধিমতী এবং কাজে বেশ নিষ্ঠা। মদন সিংহ নামে ছেলেটিও খুব ভালো। মদনের কাকা খুব মানী লোক, পার্লামেন্টের সদস্য, রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত। নির্বাচনটা তখনো এখানে হচ্ছিল না। সিলভেরাজ নামে আরো এক ঘোষকও কাজের ছেলে। পদবী থেকেই বোঝা যায় আদিবাস ছিল কেরালাতে। কিন্তু এখন হিন্দিটাই মাতৃভাষা। এই তিন ঘোষক-ঘোষিকাই নির্ভরযোগ্য দেখলাম। বেশ চটপট কাজ শিখে নিলেন। পরে মদন সিংহকে লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে শিখবার যে আগ্রহ এবং কাজে যে নিষ্ঠা ও উৎসাহ দেখেছি তাতে আমরা খুব নিশ্চিন্ত হলাম। রেডিয়ো হল 'ভয়েস অব দি নেশন', আর ঘোষক হল সেই রেডিয়োর ভয়েস। ঘোষকের অসামান্য দায়িত্ব। রেডিয়োকে

জনপ্রিয় করার কাজে ঘোষকের অবদান কম নয়। মোটামুটি ভালো ঘোষক-ঘোষিকাই পেয়ে গেলাম পোর্টব্লেয়ারে।

একটি রেডিয়োর অনুষ্ঠান-সূচী রেডিয়োর বিভিন্ন প্রোগ্রাম জ্যার্নলে ছাপা হয় নির্দিষ্ট দিনের অনেক আগে। শ্রোতা সেই জ্যার্নল পড়ে (যেমন বেতার জগৎ) তাঁর প্রিয় শিল্পীর গান কবে কখন্ হবে জানতে পারেন। কিন্তু পোর্টব্লেয়ার কেন্দ্রের প্রোগ্রাম কোন্ জ্যার্নলে ছাপা হবে ? আকাশবাণী বা বেতার জগৎ— যাতে ইংরেজি ও বাংলায় অনুষ্ঠান-সূচী ছাপা হয়ে বের হয়— সেগুলি পোর্টব্লেয়ারে আসতে আসতে সপ্তাহ বা পক্ষটাই শেষ হয়ে যায়। এখানে কোনো দৈনিক পত্রিকা নেই। সপ্তাহে মাত্র চার পৃষ্ঠার একটি সরকারি সমাচার প্রকাশিত হয়। প্রকাশক আন্দামান সরকার। আর মাঝে মাঝে চার পৃষ্ঠারই একটি সাইক্লোস্টাইল্ড্ পত্র বের করেন কে. আর. গণেশ নামে এক ব্যক্তি। এর কোনোটাতেই আমাদের দৈনিক অনুষ্ঠান ছেপে বের হবার জায়গা নেই। তাই শ্রোতাদের একটু অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু নূতন কেন্দ্র খোলা হয়েছে, শুনতে পাচ্ছেন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গান, শ্রোতাদের খুবই আগ্রহ লক্ষ করলাম। সংবাদ শুনতে পাচ্ছেন শ্রোতারা তিনবেলা। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল। সরকারও তাই চাইছিলেন। প্রসঙ্গত বলে নিই যে এই কে. আর. গণেশ, যিনি সাইক্লোস্টাইল্ড্ পত্রিকা বের করতেন, তিনি পরবর্তীকালে ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন।

কলকাতা থেকে একটি রেডিয়ো স্টেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী সব বাদ্যযন্ত্র ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে। যন্ত্র আছে, কিন্তু যন্ত্রী কই ? অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনাও নেই। শুধু আমার কাজ বাড়ল। প্রতিদিন একবার করে সবগুলি যন্ত্র ঠিক আছে কিনা দেখতে হত। না, ঝাড়পোঁছের দরকার নেই। ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই,

বছরে একবার মুছিয়ে নিলেই যথেষ্ট। যন্ত্রীর অভাবে লঘু-সংগীতের ব্যবস্থা করা গেল না। কিন্তু বাংলা লোকগীতের শিল্পী পাওয়া গেল কয়েকজন। নিজেরা দোতারা বাজিয়ে গাইলেন, পুব বাংলার লোকগীত। শুধু দোতারা বাজনার সঙ্গে পল্লীগীতি ভালোই লাগল। গাঁয়ে গাঁয়ে তো এইভাবেই গাওয়া হত। বড়ো বড়ো রেডিয়ো স্টেশনে নামী পল্লীগীতির শিল্পীরা অনেক যন্ত্র নিয়ে গান করেন। এই 'গানাদার'দের গানে গাঁয়ের মাটির গন্ধটাই খুঁজে পাই নে। পল্লীগীতির সঙ্গে হারমনাইজেশনের প্রয়াসও দেখতে পাই। কিন্তু পোর্টব্লেয়ারে তবলা বাজাবার লোকও ছিল না, বাঁশি বাজাবার লোকও না স্টাফে। তবু শুধু দোতারার সঙ্গে সেই গান আমার চোখের সামনে একটি শান্ত ছায়া-সুশীতল গাঁয়ের ছবি তুলে ধরল। পরে এই কথা শ্রীমান অমর পালকে বলেছিলাম। অমর গানের সঙ্গে এক গাদা যন্ত্র আর নিচ্ছিলেন না।

পোর্টব্লেয়ারে যাঁরা হিন্দি ভাষী এবং মোটামুটি লঘু হিন্দি গান গাইবার উপযুক্ত তাঁদের জন্য একটা অভিনব ব্যবস্থা করা হল। ভালো হিন্দি কবিতা সুরে আবৃত্তি করানো হল এঁদের দিয়ে। যেমন উর্দু মুশায়েরা বা হিন্দি কবি সম্মেলনে কবিরা গানের মতোই নিজেদের কবিতা আবৃত্তি করেন, অনেকটা সেরকম। অনুষ্ঠানের নামকরণ হল 'দ্বীপোঁকে কলাকার'। এইভাবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হল। তবে শিল্পীরা সামান্য দক্ষিণা পেলেন এই আর কি! এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং কবিও অংশ গ্রহণ করতেন মাঝে-মধ্যে। এই কবিদের একজন দুমকার ত্রিবেণীপ্রসাদ ঝা। সুন্দর কবিতা লিখতেন। পোর্টব্লেয়ারের এক স্কুল-শিক্ষক তিনি। সর্বদা মানুষের ভালো করার জন্য ব্যস্ত। হাসিখুশি মানুষ, একটু ভাবপ্রবণ, সামান্য কারণেই চোখের জল বেরিয়ে যায় এবং সে সময় কবিতাও অনর্গল মুখ থেকে বেরয়। ত্রিবেণীপ্রসাদ সর্বদা কাগজ-কলম পকেটে রাখেন এই

প্রেরণাময় মুহূর্তগুলির জন্য।

রেডিয়ো স্টেশন চালু হবার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এইবার পোর্টব্লেয়ার শহরটার সঙ্গে একটু ভালো করে পরিচয় লাভের চেষ্টা করতে লাগলাম। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখলাম। ঐ-যে খাড়ির ওপারের উঁচু পাহাড়গুলি তার প্রত্যেকটির একটা নাম আছে। কতটুকু উঁচু তাও জেনে নিলাম। পাহাড়ে, জঙ্গলে কোনো বন্যপ্রাণী নেই। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, বাইসন কিছুই নেই, তবে আছে হরিণ। জঙ্গলে তো আছেই অসংখ্য, অনেকের বাড়িতেও দেখেছি। এরা এই জঙ্গলে জন্মায় নি। কয়েক জোড়াকে আনা হয়েছিল মেইনল্যাণ্ড থেকে। এদের উপর মা-ষষ্ঠীর খুব কৃপা।

পোর্টব্লেয়ারের যে-কোনো জায়গাই এক-একটা বিউটি স্পট, দূরে যাবার দরকার নেই। হাড্ডুতে দাঁড়িয়ে সূর্য ওঠার দৃশ্য দেখলে আর টাইগার হিলে যাবার কথা মনে পড়বে না। খাড়ির ওপারের নারকেলকুঞ্জ আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। মিষ্টিজলের লেকের চার ধারটা ঘুরে এলে মনে হবে প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য আপনার চোখ উপভোগ করে নিয়েছে। পাহাড়কে ঘিরে রয়েছে সমুদ্র, দুই সুন্দরের মহামিলন এখানে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন জাগল মনে কে এই মনোরম স্থানটিকে আবিষ্কার করেছেন, এই নামটিই বা কোথা থেকে এল ! আর কেনই-বা মূল ভূখণ্ড থেকে এত দূরে এমন একটা অদ্ভুত কয়েদখানা করবার দরকার পড়ল। ইতিহাসের পাতা ওলটাতে লাগলাম। দেখা যায় ইংরেজের স্বভাবই এই যে এঁরা দণ্ডিত অপরাধীকে দেশ থেকে অনেক দূরে রাখবার চেষ্টা করে। ইংল্যাণ্ড থেকে অপরাধীদের সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দিত এককালে। ভারতে ইংরেজ বণিক যখন ছলে এবং বলে রাজত্ব করার অধিকার দখল করে নিল তখন থেকেই এরা মাতৃভূমি থেকে অপরাধীদের অনেক দূরে সরিয়ে রাখার কথা

ভাবল। সব চেয়ে আগে ইংরেজরা একটা কয়েদখানা স্থাপন করল সুমাত্রা দ্বীপে। তার পর এটাকে নিয়ে আসে পেনাং-এ। মালাক্কা, সিঙ্গাপুর, আরাকান এবং তেনেসেরিমেও এমনধারা বন্দীশালা তৈরি করা হল। আন্দামানেও একটি বন্দীশালা তৈরি হল চ্যাথাম দ্বীপে ১৭৮৯ সনে। নাম দেওয়া হল পোর্ট কর্ণওয়ালিশ। কিন্তু এখানে নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব হল, বহু লোক মরে গেল। তাই এই কয়েদীনিবাস উঠিয়ে দেওয়া হয় ১৭৯৬ সনে।

কিন্তু ইংরেজরা আবার একটা দারুণ প্রয়োজন বোধ করল এমন একটা কয়েদখানার সিপাহী বিদ্রোহের পর। বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে যারা ধরা পড়ল তাদের মধ্যে মাতব্বরদের দেশের ভিতরে রাখাটা নিরাপদ বোধ করল না ইংরেজরা। নূতন করে কারাগার স্থাপন করা হল আরো খানিকটা দক্ষিণে ১৮৫৮ সনে। আগের বার বন্দীনিবাস স্থাপনের সময় এই দ্বীপগুলির জরিপ করেছিলেন নৌ-বিভাগের লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ আর্চিবল্‌ড্‌ ব্লেয়ার। এই ব্লেয়ার সাহেবের স্মৃতিতে নূতন জায়গার নাম রাখা হল পোর্টব্লেয়ার। প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহের বন্দীদের পাঠানো হল এখানে। তার পর ওয়াহিবি বিদ্রোহীদেরও নিয়ে আসা হল। কিছু-সংখ্যক ইংরেজ-বিরোধী বর্মীদেরও আনা হল। পরে আস্তে আস্তে খুনের দায়ে বা জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত লোকদেরও আনা হল। এদের মধ্যে খুবই বিপজ্জনক অপরাধীদের একেবারে আলাদা রাখার জন্য তৈরি করা হল সেলুলার জেল বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

কিন্তু সেলুলার জেল কুখ্যাতি অর্জন করল যখন আলিপুর বোমা মামলায় দণ্ডিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবীদের এই নির্জন সংকীর্ণ কক্ষগুলিতে পোরা হল। তার পর থেকে খুনী বা নৃশংস অপরাধে দণ্ডিত লোকদের পরিবর্তে দেশের সকল প্রান্তের বিপ্লবীদের দিয়েই এই অতি ছোটো নির্জন ঘরগুলি ভরতি করা হত। কি যে

অমানুষিক কষ্ট দেওয়া হত সে বিবরণ তো অজানা নয়। তাঁদের অপরাধ তাঁরা দেশকে ভালোবাসতেন। আমারই স্বাধীনতার জন্য কতজন প্রাণ দিলেন নির্জন কারাবাসে। কত উল্লাসকরের জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। তাই আন্দামান থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এর নাম দিয়েছিলেন 'মুক্তিতীর্থ'। নেতাজী নাম দিয়েছিলেন 'শহীদদ্বীপ'। হ্যাঁ, নেতাজীর পায়ের ধুলোয় ধন্য হয়েছিল পোর্টব্লেয়ার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে জাপান আন্দামান দখল করে নিয়েছিল ১৯৪২ সনের ২৩শে মার্চ। এদিকে নেতাজী জর্মনী থেকে সিঙ্গাপুর গিয়ে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করলেন। জাপান আজাদ হিন্দ সরকারকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। এমন-কি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ১৯৪৩ সনের নভেম্বরের ছ তারিখ ঘোষণা করলেন যে জাপান সরকার আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর সেই সিদ্ধান্তের ফলেই নেতাজী এখানে এসে স্বাধীন ভারতের মাটিতে পা রাখলেন ইংরেজি ১৯৪৩ সনের শেষ দিনটিতে। ১৯৪২ সনের ২৩শে মার্চ থেকে ১৯৪৫-এর আগস্টের মাঝামাঝি অবধি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধীনে ছিল। শুনেছি জাপানীরা এসেই জেলের সব কয়েদীদের মুক্তি দিয়ে দিল। এর বেশ কিছুকাল আগেই অবশ্য ইংরেজ সরকারই বিপ্লবী বন্দীদের পোর্টব্লেয়ারের সেলুলার জেল থেকে ভারতে স্থানান্তরিত করে নেয়। ১৯৪৫-এর ১৬ আগস্ট ইংরেজরা আন্দামান পুনরধিকার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দীনিবাসটিও উঠিয়ে দেয়। একটা চূড়ান্ত বর্বরতার পরিচ্ছেদের উপর যবনিকা পতন।

এতদিন পরে গিয়েও কিন্তু আমি জাপানী দখলের কিছু কিছু নিদর্শন দেখতে পেলাম। বেশি দূরে যেতে হয় নি। অফিসে আমার

কামরার দক্ষিণের জানলার পাশেই সিমেণ্টের বেদীর উপর বসানো রয়েছে বিরাট এক কামান। মুখ রয়েছে পুব দিকে। তার কয়েক ফুট দূরে মস্ত গভীর এক সুরঙ্গ। সিঁড়ি নেমে গিয়েছে অনেক নীচে। কয়েক ধাপ নেমেছিও সেই সিঁড়ি বেয়ে। বেশি নীচে যেতে সাহস পাই নি সাপের ভয়ে। আমাদের অফিস-বাড়িটা একটা বড়ো টিলার উপর। উপরটা সমান করে নিয়ে এই বাংলো তৈরি করা হয়েছিল। পুবের সমুদ্র সবটা দেখা যায়। শত্রুর জাহাজ এই দিকেই আসতে পারে। পশ্চিমে খাড়ি, যুদ্ধ-জাহাজ আসবে না সেই খাড়ির জলে। সুতরাং এই কামানের মুখ পুব দিকে ফেরানো। লোকের মুখে শুনতে পেলাম পাশের সুরঙ্গের ভিতর গোলা-বারুদের স্তূপ ছিল। আমার মনে হল না এই বিরাট কামানের নলের মুখে একটি গোলাও বেরিয়েছিল আগুয়ান ইংরেজ যুদ্ধ-জাহাজের দিকে। মাত্র দুইটি বোমা পড়েছিল জাপানীদের মাতৃভূমিতে। মারাত্মক বোমা। এমন নৃশংস বিধ্বংসী মারণাস্ত্র ইতিপূর্বে মানুষের লড়াইয়ে কখনো ব্যবহৃত হয় নি। লক্ষ লক্ষ মানুষ বলি হল ঐ দুটি বোমায়। সারা পৃথিবী স্তব্ধ হতবাক্ হয়ে গেল। পরাজয় মেনে নিল জাপান। এই কামানটির নলের ভিতর চোখ রেখে দেখেছি কিছু নেই। কিন্তু সুরঙ্গের ভিতরে কিছু আছে কি এখনো? মুখে কোনো ঢাকনা ছিল না। এতদিনের বৃষ্টিতে ভিজে কিছু কি আর থাকতে পারে! তবু ভয় গেল না। লেখা হল চীফ কমিশনারের কাছে। কিন্তু পুলিস বিভাগে বিশেষজ্ঞ ছিল না। আন্দামানে আর্মি বা নেভির কোনো ইউনিট নেই। সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই সময় নৌ-বিভাগের কয়েকজন অফিসার এলেন এখানে সার্ভে করার জন্য। তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে এই কামান উঠিয়ে নেওয়া হল। এবং সুরঙ্গের মুখও বালি ঢুকিয়ে বন্ধ করা হল। আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম।

রোজই আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পাই একটা ছোটো ফেরীজাহাজ প্রচণ্ড ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শামুকের গতিতে চলতে চলতে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যায় এবং ঘণ্টা-দুই বাদে ঐ পথেই ফিরে আসে। শুনলাম খাড়ির ওপারের বসতিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এই জাহাজটা। এই জাহাজে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়! ঠাকুর সাহেবকে এই আইডিয়া বলাতে তিনি লুফে নিলেন। এক রবিবার সকালে বেরিয়ে পড়লাম আমরা— ঠাকুর সাহেব, শ্রীমতী ঠাকুর এবং আমি। ম্যারিন দপ্তরের ঘাট থেকে টিকিট কিনে আমরা তিনজন জাহাজে উঠে পড়লাম। প্রথম স্টপ চ্যাথাম জেটি, প্রায় একমাইল পথ। তিন-চার মিনিট থেমে আবার চলল জাহাজ। এইবার ভিড়ল উইম্‌বারলিগঞ্জের ঘাটে। এই বসতির নাম শুনেছি আগে, এইবার দেখলাম। এখানে অনেক লোকের নামা-ওঠা লক্ষ করে শ্রীমতী ঠাকুর কারণটা জিজ্ঞাসা করলেন। এবার পুরনো ইতিহাস আউড়ে বললাম যে এখানে বেশ বড়ো একটা বসতি গড়ে উঠেছে। জেলবন্দী যাদের বিয়ে করতে দেওয়া হয়েছিল তাদের এটা একটা প্রধান বসতি। এখানে এখন পোস্ট অফিস আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে, দোকানপাটও বসে গেছে। উইম্‌বারলিগঞ্জ এখন ছোটোখাটো একটি টাউনশিপ। জাহাজ থামল বেশ কিছুক্ষণ। তার পরের স্টেশন হোপটাউন জেটি। উপরে নজর করে শ্রীমতী ঠাকুর বললেন, 'ঐ পাহাড়টা বেশ উঁচু, না?' উত্তরে জানালাম যে এই পাহাড়ের উচ্চতা ১১৯৬ ফুট। পাহাড়-চূড়ায় ছোটো একটা ক্যাবিনও রয়েছে। ওটা দেখিয়ে বললাম যে ওখানে এক সময় একটা স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করার পরিকল্পনা ছিল সরকারের। পাহাড়টির নাম মাউণ্ট হ্যারিয়েট। উপর থেকে চার দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। গোটা আন্দামানে পাহাড়ের ঐ উপরটাতেই সব চেয়ে শীতল আবহাওয়া। তাই ওখানে স্বাস্থ্যনিবাসের

জায়গাটি কেমন হবে স্বচক্ষে দেখতে এলেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো। আন্দামানের ব্যাপারে ওঁর খুব আগ্রহ ছিল।

সেদিনটা ছিল ১৮৭২ সনের ৮ই ফেব্রুআরি। ইংরেজের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে দিনটা বড়ো অমঙ্গলের। সস্ত্রীক লর্ড মেয়ো বিরাট জাহাজ থেকে নেমে পাহাড়ের উপরে উঠে চার দিকটা ভালো করে দেখলেন। বোধ হয় পরিবেশটা পছন্দও করলেন। এদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় বিকেল সোয়া পাঁচটা নাগাদ পাহাড় থেকে নেমে তিনি জাহাজে ওঠবার জন্য পা বাড়িয়েছেন এমন সময় একটা পাশবিক চিৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু দেখবার-বোঝবার আগেই বাঘের মতো লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানল দুবার অতি তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে। একেবারে চরম আঘাত, মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই। সিকিউরিটি স্টাফ বাধা দেবার সুযোগই পেল না। অতর্কিতে ঘটে গেল ব্যাপার। আর এই নির্জন দ্বীপে তেমন বিপজ্জনক কোনো-কিছু ঘটতে পারে তেমন আশঙ্কাও তো কিছু ছিল না।

আততায়ী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে নি। নামটা জানা গেল, শের আলি। আফগান সীমান্তের পথী নামে এক গাঁয়ের লোক। পাঞ্জাব মাউন্টেড পুলিসে ভর্তি হয়েছিল। পেশোয়ারের কাছে এক পারিবারিক শত্রুকে খুন করার ফলে দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হয়ে পোর্ট-ব্লেয়ার সেলুলার জেলে এসেছিল ১৮৬৯ সনে। জেলে বাসকালে তার আচরণ ছিল অতিশয় সন্তোষজনক। তাই জেলের কড়াকড়ি তার বেলায় একটু শিথিল করে জেলের বাইরে হোপটাউনে বিবাহিত কয়েদী বসতিতে নাপিতের কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাকে।

এই হত্যার পর জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে শের আলি জবাব দিয়েছিল, 'খোদা-নে হুকুম দিয়া। কই আদমী নহী', মেরে শরিক

খোদা হ্যায়।'

বিচারে প্রাণদণ্ড হল। মার্চের এগারো তারিখ ভাইপার আইল্যাণ্ডে ফাঁসি হয়ে গেল তার।

মাউন্ট হ্যারিয়েটে স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করার প্রস্তাবটা বাতিল হয়ে গেল। হবে না? বৃটিশ সরকারই বিব্রত হয়ে গেল। লোকটা কেন খুন করল তার সঠিক কারণটাও বুঝতে পারল না। সন্দেহ করা হয় ওয়াহিবি আন্দোলনে জড়িত ছিল। কিন্তু তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু এটা একটা বড়ো লজ্জার, কলঙ্কের ব্যাপার। ঘটনার খুব প্রচারও হতে দেওয়া হল না।

কাহিনী শুনে শ্রী এবং শ্রীমতী ঠাকুর কেউ কোনো মন্তব্য করলেন না। চুপ করে রইলেন। মনে মনে বোধ হয় ভাবছিলেন এমন অসম্ভব কি করে ঘটে।

আমাদের ফেরীজাহাজ হোপটাউন জেটি ছেড়ে ফিরে এল ম্যারিন অফিস জেটিতে।

বাংলা কথিকার জন্য কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তির খোঁজ করছিলাম। এখানে সবাই তো প্রায় সরকারি কর্মচারী। এই গণ্ডির বাইরে কাউকে পাওয়া যাবে কি না সে সম্ভাবনার কথা ভাবছিলাম। অতুল-স্মৃতি পাঠাগারে এক ভদ্রলোকের কথা শুনলাম যে তিনি পণ্ডিত লোক। রেফিউজি হয়ে পুব বাংলা থেকে এখানে এসে চাষ-আবাদ করছেন এখন। নাম বিনয় চক্রবর্তী। পোর্টব্লেয়ার থেকে কয়েক মাইল দূরে এক রেফিউজিদের গাঁয়ে থাকেন। খুব কৌতূহল হল, বিশেষত চাষ-আবাদ করছেন জেনে। লেখাপড়া জানা পণ্ডিত মানুষ, অথচ হাতের কাছে করার কিছু না পেয়ে সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই কৃষিকাজে লেগে গেলেন সেটা তো মস্ত মানসিক বলিষ্ঠতার কথা। মানুষটিকে দেখবার খুবই ইচ্ছা হল।

এক রবিবার রওয়ানা হলাম বিনয় চক্রবর্তীর বাড়ির উদ্দেশে।

শহরের বাইরেও পাকা বাঁধানো সড়ক মাইলের পর মাইল। গাড়ি চলার কোনো অসুবিধা নেই। জেলের কয়েদীদের দিয়ে এ-সব রাস্তাঘাট তৈরি করানো হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে-চলা রাস্তা কিছুটা পার হয়ে বিনয়বাবুর বাড়ি। দুটি গোরুর পেছনে হলধর একটি লোক জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছি। বিনয়বাবুর কাছে যাচ্ছি শুনে লাঙল থেকে গরু-দুটি খুলে দিয়ে, ধুতি হাঁটুর নীচে নামিয়ে কাছে এসে নমস্কার জানিয়ে বললেন যে ওঁরই নাম বিনয় চক্রবর্তী। গায়ে ফতুয়া, কিন্তু পরিচ্ছন্ন, ধুতিটিও তাই। নাক তীক্ষ্ণ, চোখের দৃষ্টি প্রসন্ন, উজ্জ্বল, একহারা চেহারা, ঋজু দেহ। বয়স কত হবে? মনে হল নিশ্চয়ই ষাটের কাছাকাছি। দেখেই ভালো লেগে গেল মানুষটিকে। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়ে এলেন আমায় নিজের বাড়িতে। না, বাড়িঘরের শ্রী নেই। কিন্তু দীনতা নেই, মালিন্য নেই। বাইরের ঘরে তক্তপোশের উপরে বসলাম। হাত-পা ধুয়ে এসে বিনয়বাবু আমার সঙ্গে গল্পে বসে গেলেন। বেশ সচ্ছল এবং সুখী মনে হল। জানালেন যে কাজের লোক একেবারেই পাওয়া যায় না। তাই নিজের হাতেই সব করতে হয়। শাক-সবজির বাগান এবং সামান্য একটু চাষের কাজে ছেলে-দুটিও হাত লাগায় বাড়িতে থাকলে। ওরাও লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হয়েছে। মেয়েও দুটো পাস দিয়েছে। নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে আসা মানুষটির মনের গভীরে কোনো দুঃখ আছে কি না জানি না, থাকলেও বাইরে প্রকাশ নেই। হেডমাস্টার ছিলেন পুব বাংলার এক গাঁয়ের স্কুলের। কিন্তু এখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পাবার তো আর সুযোগ হবে না। দুঃখ করে লাভটা কি হবে এখন? এটা বিনয়বাবুর আপন মনে কথা বলা। কিন্তু বিনয়বাবুর সে ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়েছিল আমার পোর্টব্লেয়ারে থাকা কালেই। বাঙালিরা রবীন্দ্র বিদ্যালয় নামে একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করল বাংলাভাষার

মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিনয়বাবু প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। বিনয়বাবুর বাড়িতে বসে অনেক কথাবার্তা হল। ওঁর কাছে জানতে পারলাম যে পুব বাংলার বাস্তুহারা মানুষগুলি এখানে এসে মোটামুটি সুখেই আছে। বিনয়বাবুকে রেডিয়োতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলাম। তিনিই পোর্টব্লেয়ার কেন্দ্র থেকে বাংলায় প্রথম কথিকা পাঠ করলেন। সহজ, কথ্য ভাষা, যুক্তিনির্ভর বিন্যাস।

সেদিন বিনয়বাবুর গ্রামটা সবটা ঘুরে দেখবার সুযোগ হল না। কিন্তু ভীষণ আগ্রহ হল পুব বাংলার রেফিউজি মানুষগুলি এখানে কেমন আছে সেটা নিজের চোখে দেখার। বেশি অপেক্ষা করতে হল না। পূজা এগিয়ে এল। মহাসপ্তমীর রাত্রে স্যাণ্ডেল সাহেব খবর পাঠালেন সারা রাত্রির জন্য তৈরি হয়ে নিতে। আমায় নিয়ে যাবেন বাঙালিদের গাঁয়ে পুজো দেখাতে। একটি মোটর ভ্যানে উঠলাম রাত্রির খাওয়া সেরে। মিসেস স্যাণ্ডেল এবং কয়েকজন নারী-পুরুষও আছেন। মেয়েদের সবারই হাতে একটি ফ্লাস্ক্। বুঝতে পারলাম চা বা কফি রয়েছে সারা রাত্রির জন্য। যে গ্রামটিতে এলাম সেটা প্রায় মাইল দশেক দূরে। পূজামণ্ডপের সামনে গাড়ি থামল। অনেক লোকের ভিড়। একজন মাতব্বর-গোছের লোক এসে বললেন যে নিজেরাই মূর্তি বানিয়েছে। কারিগর দিয়ে বানালে অনেক টাকা পড়ে সেজন্য নিজেরাই তৈরি করেছে। মূর্তি গড়ার শিক্ষা অবশ্য কারুর নেই। নেই যে সেটা প্রতিমার আকৃতি দেখেই বুঝেছি। তবু উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব নেই ওদের। যেমন-তেমন করে হোক মূর্তি বানাতেই হবে। আর এবার পূজার ভারও পড়েছে এই গাঁয়েরই উপর।

পূজার এই নিয়মটাও একটু অভিনব। গ্রামগুলি ছোটো ছোটো, এক গাঁয়ে খুব বেশি লোকের বাস নেই। দুর্গাপূজার মতো ব্যয়বহুল

আয়োজন এক গাঁয়ের লোকের সাধ্যে কুলোয় না। কাজেই আশে-পাশের তিন-চার গাঁয়ের মানুষ একত্র মিলিত হয়ে পূজার ব্যবস্থা করে। পূজার দিনগুলিতে অন্য গাঁয়ের মানুষেরা এই গাঁয়ে এসে গেল। ওদের জন্য বিরাট চালাঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশের গ্রামগুলির সব মানুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা উৎসবের দিনগুলিতে এখানে থাকবে, খাবে, ঘুমোবে। পরের বছর অন্য এক গ্রামে হবে পূজার অনুষ্ঠান।

এখানকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থায় ওঁরা সন্তুষ্ট কি না জানতে চাইলে সেই মাতব্বর লোকটি জানালেন যে মোটামুটি ভালোই সব কিছু। জলবায়ু প্রায় পুব বাংলারই মতো। অভাব-অনটন নেই। সকলেই সামান্য চাষ-আবাদের ওপরও কিছু-না-কিছু একটা করে খেটে খাচ্ছে। অসুখ-বিসুখ নেই। খুব ভালো লাগল শুনে। এই লোকটি জানালেন পোর্টব্লেয়ারের আশেপাশে বাঙালি গ্রাম বেশি নেই। অন্যান্য দ্বীপে আরো বহু বাঙালির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। মোটের উপর খেয়ে বেঁচে আছে সবাই। তবে একটা দুঃখ আছে। ছেলেপিলের লেখাপড়াটা বাংলা ভাষার পরিবর্তে হিন্দিতে করতে হয়। সরকারের এটাই নীতি। এটা একটা মস্ত সমস্যা। দণ্ডকারণ্যেও তাই দেখেছি। তবে পোর্টব্লেয়ারের বাঙালিরা চাঁদা তুলে রবীন্দ্র বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। পূজার উদ্যোক্তারা আমাদের সবাইকেই খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। মণ্ডা প্রসাদ দিলেন সবার হাতে। একটু চায়ের ব্যবস্থাও হল আমাদের জন্য। মেয়েদের হাতে চা-কফি-ভরতি ফ্লাস্‌ক্ রয়েছে, তবু ওঁদের আন্তরিকতা দেখে আপত্তি করলাম না আমরা। চা-পানের পর উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েক মাইল দূরে আর-একটি গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

মধ্যরাত পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সেই গ্রামের মণ্ডপে একটা থমথমে ভাব। শক্ত-সমর্থ বেটাছেলেরা মালকোঁচা মেরে লাঠি-

হাতে দাঁড়িয়ে আছে অজানা শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায়। মেয়েরা, শিশুরা কেউ বাইরে নেই, সব ঘরের ভিতর। আমরা গিয়ে পৌঁছতে ওদের সাহস বাড়ল। ভয়ের কারণটা শুনলাম। এদেরই একজনের কিছুক্ষণ আগে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে জঙ্গলে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু দরকারী কাজটা পুরোপুরি সারতে পারে নি। দৌড়ে পালিয়ে এসেছে জংলী এক জারোয়াকে দেখে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয়েছিল কিনা কে জানে! এসে সবাইকে বলেছে। জোয়ান পুরুষরা তাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত। স্যাণ্ডেল সাহেব আমায় বললেন যে সত্যিই যদি জংলী আদিম জারোয়া লোকটিকে দেখে থাকে তা হলে ভয়ের কারণ আছে। জারোয়ারা অতি হিংস্র আদিম মানবগোষ্ঠী। সভ্য আধুনিক মানুষকে ভয় পায় এবং সুযোগ পেলেই অতর্কিতে দূর থেকে তীর ছুঁড়ে মারে। তীরের মুখে বিষ মাখানো। গায়ে বিঁধলে মৃত্যু অনিবার্য। এদের সঙ্গে যোগাযোগের শত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যে জঙ্গলে এদের বাস তার কিনারে নানারকম খাদ্য, নুন এবং অন্য জিনিসপত্র কতবার রাখা হয়েছে। কিন্তু এ-সব নেয় না জারোয়ারা। একবার একটিকে কোনো রকমে ধরা হয়েছিল। কিন্তু না খেয়ে মরে গেল। কোনো-কিছুই মুখে তুলল না। আধুনিক মানুষের উপর ভীষণ অবিশ্বাস। স্যাণ্ডেল সাহেব বললেন যে ঐ জঙ্গলের ওপারে এদের বাস। 'বুশ' পুলিসরা পাহাড়ায় থাকে যাতে বসতির দিকে না আসতে পারে। কিন্তু 'বুশ' পুলিসকে ফাঁকি দেওয়াটা অসম্ভব নয়। আমরা সারাটা রাতই পূজামণ্ডপে রয়ে গেলাম। রাত্রে ফেরা ঠিক হবে না। গ্রাম-বাসীদেরও ভয়টা ঘুচল আমরা থাকাতে। আমাদের সঙ্গে একজন শিল্পী ছিলেন। তৃপ্তি সান্যাল গান গেয়ে আনন্দ দিলেন।

আমি জারোয়া একটি মানুষকেও দেখি নি। কিন্তু তাদেরই প্রতিবেশী খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আর-এক আদিম গোষ্ঠীর মানুষ দেখেছি,

আমারই গৃহে, খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে। সন্ধে হয়েছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছি। ইচ্ছে করেই আলো জ্বালাই নি। বাড়ির সামনে খোলা জায়গাটায়ও কোনো আলো নেই। খোলা জমিটা পার হয়ে বেশ কিছু দূরে সড়ক। হঠাৎ দূরে রাস্তার লাইটপোস্টের আলোতে অস্পষ্ট যেন দেখলাম কেউ হ্যাংগ্যারে একটা বুশ সার্ট ঝুলিয়ে আসছে। আমার ধোবীই হবে ভাবলাম, তার আসার কথা আছে। কি ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। চোখও বোধ হয় বন্ধ হয়েছিল সমুদ্রের ঝিরঝিরে মোলায়েম হাওয়ার পরশে। হঠাৎ চমকে উঠে সামনে দেখছি শূন্যের উপর একটা সাদা জামা ঝুলছে। কিছু বোঝবার আগেই আর-একটি ব্যাপার ঘটে গেল। আমার কাজের লোকটি ট্রের উপর চায়ের সরঞ্জাম বসিয়ে ভিতরের দরজার পর্দা সরিয়ে বারান্দায় পা দিয়েই তার মাতৃভাষা তেলুগুতে বোধ হয় মাগো বাবাগো ব'লে চিৎকার করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রে তার হাত থেকে নীচে পড়ে গেল। তার আর্তনাদ এবং যুগপৎ কাপ, প্লেট, টি-পট্ ভাঙার শব্দ এক হয়ে মিশে গিয়ে এক ভয়ংকর শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হল।

আচমকা ভয় পেলেও সংবিৎ হারাই নি। হাতের পাশে আলোর সুইচ টিপে দিলাম। উজ্জ্বল আলোর নীচে এক অদ্ভুত আকৃতি দেখলাম। একটি মানুষই সামনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। কিন্তু আমার সমস্ত জীবনের দেখার সঙ্গে এ দেখার কোনো মিল নেই। এ আকৃতিটা একেবারেই আমার চেনা নয়। হাতে তীরধনুক নেই। মুখে হাসি, আকারেও খুবই ছোটো। আলোর নীচে এই সন্ধেবেলা ভয়ের কোনো কারণ থাকতে পারে না। পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছি মানুষটিকে। আগন্তুক এই অদ্ভুত মানুষটি আমার ভৃত্যের হঠাৎ ভয় পেয়ে যাওয়া এবং কাপ, প্লেট, পট্ ভাঙার দৃশ্যটিতে খুব কৌতুক

উপভোগ করছে মনে হল। নীচের ভাঙা কাপ-প্লেটের দিকে তাকিয়ে এবং ভৃত্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমায় কিছু বলতে লাগল। এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। ভাষা বুঝব কি, এই ধ্বনিটাও আমার অপরিচিত। মেঝেতে বসে পড়ল মানুষটি। ইঙ্গিতে চেয়ারে বসতে বললাম। উঠে এসে বসল আসন করে চেয়ারের উপর পা তুলে।

চার ফুটের মতো উচ্চতা। মাথার চুল ঘন, কালো, খুব কোঁকড়ানো এবং অতি ছোটো। মনে হল চুল লম্বায় এর চেয়ে বাড়বে না। চুলগুলি মাথার চামড়ার উপর আঠা দিয়ে যেন ঠাসাঠাসি লাগানো। গায়ের রঙ কেমন! আমার অতিথি চেয়ারে বসেই গায়ের সাদা জামাটি খুলে ফেলল। জামাটি মাপে অনেক বড়ো। কিছুক্ষণ আগে দেখা শূন্যে ঝুলন্ত জামার রহস্য পরিষ্কার হল। ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে এমন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের মুখমণ্ডল বা দেহ দৃশ্যমান হতে পারে না। সাদা জামাটি গায়ে না থাকলে দশ-পনেরো গজ দূরেও গভীর অন্ধকারের মধ্যে মানুষটিকে একেবারেই দেখা যাবে না এমনই গায়ের রঙ। প্রায় দিগম্বর পুরুষটির পরনে শুধুমাত্র সরু একটি নেংটি। এই সাদা বুশ সার্টটা কারো কাছ থেকে উপহার পেয়ে থাকবে। প্রমাণ সাইজের জামাটি এই মানুষটির গায়ে ম্যাক্সির মতো লাগছিল। সমস্ত মুখভরা সরল হাসি। কিন্তু কোন্ গোষ্ঠীর এই বিচিত্র মানুষটি! নিশ্চয়ই আন্দামানেরই আদিম জাতি। শহরে এল কোথা থেকে!

এ-সব ভাবছিলাম এমন সময় ঠিক ব্যক্তিটি এসে গেলেন। আমার কবিবন্ধু ত্রিবেণীপ্রসাদ। সন্ধ্যার পর রোজই আসেন আমায় সঙ্গ দিতে। মেঝের উপর ভাঙা কাপ-প্লেট, পট্, ভৃত্যের মুখের ভ্যাবাচাকা ভাব এবং সর্বোপরি আসনে উপবিষ্ট আগন্তুককে দেখে ত্রিবেণীপ্রসাদ ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। আমার কাজের

লোকটিকে মেঝেটা পরিষ্কার করে সব ভাঙা জিনিসপত্র উঠিয়ে নিতে বলে আমার পাশে বসে ত্রিবেণীপ্রসাদ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন এই অতিথির বিষয়ে কিছু জানি কি না। কিছুই জানি না বললাম।

ত্রিবেণীপ্রসাদ জানালেন যে এই মানুষটি ওংগী নামে আদিম গোষ্ঠীর লোক। এদের বাস একটু দূরে, ছোটো একটি দ্বীপে। গতকাল নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সবাইকে জাহাজে করে এখানে আনানো হয়েছে সকলের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য। বছরে এক বা একাধিক বার পোর্টব্লেয়ারে আনানো হয় এই কারণে। জীবনধারাটা পৃথিবীর হাজার হাজার বছর আগেকার। মানসিক কোনো বিকাশ ঘটে নি। আদি জন্ম আন্দামানের দ্বীপেই নাকি অন্য কোথা থেকে এসেছিল এখানে সে কথা সঠিক কে বলবে! তবে কালের গতি এখানে হঠাৎ যেন থেমে গিয়েছিল। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচার লড়াই করার শক্তি এদের নেই আর। এই গোষ্ঠীটাই প্রায় লোপ পাবার পথে। সর্বসাকুল্যে শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ মিলে মাত্র শ-দুই মানুষ বেঁচে আছে। এদের আহারের সমস্যা নেই, সমুদ্র থেকেই মাছ ধরে খায়। হালে আগুনের ব্যবহার শিখেছে। জীবনের চাহিদাও সামান্যই। কিন্তু বাতাসে ভেসে-আসা রোগের জীবাণু সমুদ্র পেরিয়ে ওদের দ্বীপেও এসে যাচ্ছে। অসুখ হলে রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করার ক্ষমতা নেই। জীবনীশক্তি কম। ওদের মধ্যে জন্মের চেয়ে মৃত্যুর হার বেশি। তাই এক্স-রে এবং অন্যান্য পরীক্ষার জন্য মাঝে মাঝে এখানে নিয়ে আসে আন্দামান সরকার। কিছুদিন এখানে রেখে উপযুক্ত চিকিৎসা করানো হয়।

ত্রিবেণীপ্রসাদ যখন ওংগীদের কথা বলছিলেন তখন আমার অতিথি চেয়ার থেকে নেমে ভিতরের দিকের পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভিতরে ঢোকে নি। সভ্য মানুষদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যেন। তাই অন্তঃপুরে যাবার সাহস নেই। কিছুক্ষণ পরই ফিরে

এসে আবার চেয়ারে বসল পা তুলে। আমার হাতের সিগারেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল। একটি সিগারেট ওকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলাম। বেশ আরাম করে ধূমপান করল। চা কিন্তু খেতে চাইল না।

রাত হয়ে যাচ্ছে। ত্রিবেণীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলাম লোকটি নিজের আস্তানায় পথ চিনে ফিরে যেতে পারবে কিনা। দেখলাম ত্রিবেণীপ্রসাদের মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ। আদিম মানুষটির কথা বুঝি না, ওকেও কিছু বোঝাতে পারি না। ঠিক করলাম আমার বাড়ির লোকটির সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমার লোকটি ভয় পেয়ে গেল। অগত্যা ট্যাক্সির জন্য ফোন করলাম। দিল্লীর মতো পোর্টব্লেয়ারেও ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে ফোন করে দিলে চলে আসে ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে এই মানুষটিকে উঠিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বললাম সঠিক আস্তানায় ওকে পৌঁছে দিতে। গাড়িতে উঠে মানুষটি দারুণ খুশি।

নিরীহ, শিশুর মতো সরল এবং শিশুরই মতো অসহায়। ক্রম-বিবর্তনের কোটি স্তর পার হয়ে মানুষের শরীর পেল, দুই পায়ের উপর দাঁড়াতে, চলতে শিখল। কিন্তু থেমে গেল প্রগতি ওখানেই। ভারতের বহু প্রান্তে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করেছি। অনেককে আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান মনে হয়েছে। কিন্তু ওংগীদের কথা আলাদা। কত হাজার বছরের আগের ধাপে এরা রয়েছে সে কথা কে আমায় বলবে!

মহান নেতা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এঁদের মৃত্যুতে দেশে শোকের বন্যা বয়ে যায়। সারা দেশে সরকারিভাবে শোক উদ্‌যাপিত হয়। অফিস-কাছারি ছুটি হয়ে যায়। বন্ধ থাকে দু-তিন দিন। কিন্তু রেডিয়োর লোকের তখন ভীষণভাবে কাজ বেড়ে যায়। মৃত ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে হয়। নেতৃ-স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করে গাড়ি পাঠিয়ে তাঁদের আনিয়ে

ভাষণ রেকর্ড করতে হয়। তার উপরও যেটা সব চেয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে সেটা হল এই যে, সরকার-নির্ধারিত শোকের কালটায়, আগে থেকে সাজানো সমস্ত অনুষ্ঠানই ওলটপালট হয়ে যায়।

শোকের কালটাও প্রায়শ দীর্ঘ তেরো দিন। অনুষ্ঠানে আনন্দোচ্ছল কোনো-কিছু চলবে না। কৌতুক-নাটক বাতিল। হাসির কথিকা বন্ধ করে দিতে হবে। প্রেমের গান বন্ধ, ঠুংরি চলবে না, কীর্তনে অনুরাগ বিরহ মিলনের কথা থাকবে না। লাইব্রেরি খুঁজে বের করতে হবে সমুখে শান্তি পারাবারের গান, ভক্তিগীতি, ঈশ্বরের স্তব-স্তুতির গান। আবার উচ্চাঙ্গ নিম্নাঙ্গ গান বা যন্ত্রসংগীত সব-কিছুতেই তবলা পাখোয়াজ মৃদঙ্গ বর্জন করতে হবে। দৈনিক তিনটি অধিবেশনের প্রোগ্রাম নূতন করে ঢেলে সাজাবার কাজটা সহজ নয়। যে কেন্দ্রে স্টাফ আর্টিস্ট যন্ত্রী নেই ; নাটক, কথিকা, আলোচনার অনুষ্ঠান নেইই প্রায়, এবং অডিশন-পাস-করা বাইরের শিল্পীও নেই, তেমন একটি রেডিয়ো স্টেশন হঠাৎ দেশের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে প্রচণ্ডভাবে ব্যতিব্যস্ত এবং বিপন্ন হবে তাতে সন্দেহ কি? আমাদেরও তাই হল।

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মৃত্যুর কথা বলছি। কোনো প্রস্তুতি চৌষট্টির সাতাশে মে দিনটির জন্য ছিল না। সকালবেলার রেডিয়ো-সংবাদ থেকে তেমন কিছু বুঝতে পারি নি। আর পত্রিকা আসে তিন সপ্তাহের বাসী। আমাদের দুপুরের অধিবেশন শেষ হয়ে গেছে বেলা আড়াইটায়। দিল্লীর নিউজ বুলেটিনে মৃত্যুর খবর ছিল না, দারুণ অসুস্থতার সংবাদ ছিল। রিসিভিং সেণ্টারকে বলা হল দিল্লী মনিটর করতে। ডিউটি ইঞ্জিনিয়ার হয়তো বি. বি. সি.-ও মনিটর করছিলেন। বি. বি. সি. থেকেই প্রথম এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ পেলাম।

হোম মিনিস্ট্রির নির্দেশ ব্যতিরেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো এমন চরম দুঃসংবাদ ঘোষণা করতে পারে না, তাই ঘোষণায় বিলম্ব এবং এ

নিয়ে চরম কেলেঙ্কারি। বি. বি. সি.-র ঘোষণার অনেক পরে দিল্লী থেকে ঘোষণা করা হল। আমরা সে ঘোষণা রেকর্ড করে রাখলাম। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রের শ্রোতাদের জানাবার উপায় নেই, কারণ দুপুরের অধিবেশন তো বন্ধ হয়ে গেছে। স্টেশন ডিরেক্টর চীফ কমিশনারকে ফোনে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু দিল্লীর গৃহ-মন্ত্রক থেকে খবর না পেলে চীফ কমিশনারও সরকারিভাবে ঘোষণা করতে পারবেন না। তা সেটা ওঁর ব্যাপার, আমরা জানিয়ে দিয়ে কর্তব্য পালন করেছি।

কিন্তু প্রোগ্রামের বিষয়ে আমাদের দুরবস্থাটা ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। অন্য কোনো স্টেশন কাছে নেই যেখান থেকে অন্তত কিছু সংগীতানুষ্ঠান রিলে করা যায়। সংবাদ প্রচার করা হয় দিল্লী থেকে বিশেষ ফ্রিক্যোঅ্যান্সিতে 'বীম্' করে। বীম্ না করলে অন্য অনুষ্ঠান তো আমরা এখান থেকে ধরতে পারব না। স্টাফে একজনও যন্ত্রী নেই যাকে একটা সারেঙ্গী বা বেহালা দিয়ে স্টুডিয়োতে বসিয়ে দেওয়া যায়। এদিকে সন্ধ্যার অধিবেশন শুরু হতে ঘণ্টা-দুই মাত্র বাকি।

একটা বুদ্ধি মাথায় এল। লাইব্রেরিয়ানকে ডেকে পাঠিয়ে টেপ রেকর্ডিং-এর তালিকাটি নিয়ে বসলাম। দুটি টেপ পাওয়া গেল আলাপ জোড় ও ঝালার। প্রতিটি আধঘণ্টার। আলাপে কতটা সময় নেওয়া হয়েছে কে জানে! তবে তবলা তো নেই। ঘোষকদের ডেকে পাঠালাম এবং এঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ঠিক করে নিলাম শুধু আজ রাতের অনুষ্ঠান। আলাপ জোড় ঝালার রেকর্ডিং বিশ মিনিট বাজানো যেতে পারে। দ্রুত বাজনা শুরু হবার আগেই আস্তে আস্তে ফেড্-আউট করে দিতে হবে। আর প্রায় প্রতিটি যন্ত্র-সংগীতের রেকর্ডিং-এর শুরুতে পাঁচ-সাত মিনিট আলাপ থাকে, শুধু সেটুকু বাজাতে হবে। ঘোষকদের বললাম যতগুলি পারা যায়

টেপ বাজিয়ে আলাপের সময়টুকু নোট করে নিয়ে টেপ-বক্সের পেছনে লিখে রাখতে। কিন্তু টেপ ডেক্ তো মাত্র দুটি। ঘন ঘন বদলানো খুব অসুবিধার কাজ। তাই আলাপের অংশগুলি আলাদা টেপে রেকর্ড করার ব্যবস্থা করলাম রাতের অধিবেশন-শেষে।

স্টেশন ডিরেক্টর আরো একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন। দিল্লীর এক্স্ট্যারনল্ সার্ভিস থেকে সাউথ ইস্ট এশিয়ার শ্রোতাদের জন্য যে-সব সংগীতানুষ্ঠান প্রচার করা হয় সেগুলি রেকর্ড করার চেষ্টা করা যেতে পারে। ঐ-সব অনুষ্ঠান ঠিক পোর্টব্লেয়ারের দিকে বীম্ না করা হলেও এখান থেকে ধরার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু প্রচারের সময়টা যে ভোররাত্রে। সহৃদয় ঠাকুর সাহেব এই-সব অনুষ্ঠান রেকর্ড করার দায়িত্ব নিলেন নিজেই। অবশ্য ইঞ্জিনিয়ার সহকর্মীর সহযোগিতাও ছিল। স্থানীয় কবিদের দিয়ে বিশেষ ভাবে রচিত কবিতার সুর করে আবৃত্তির ব্যবস্থাও করা হল। ভজনের রেকর্ডিং করলেন তৃপ্তি সান্যাল এবং গান-জানা এক সহকর্মী। স্টেশন ডিরেক্টর অন্য সহকর্মীদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন।

শোকের এই তেরো দিনে আমরা সবাই গলদঘর্ম হয়ে গেলাম। মূল ভূখণ্ডের স্টেশনগুলির কথা মনে করে ঈর্ষা বোধ হল। এই শোকের সময় উপযুক্ত অনুষ্ঠান পরিকল্পনার একটু সময় পেয়ে যায় ঐ-সব কেন্দ্র। বসিয়ে দেওয়া হল স্টাফ আর্টিস্টদের স্টুডিয়োতে যন্ত্রে আলাপ বাজাতে। একঘেয়ে যন্ত্রের করুণ বিরক্তিকর বিলাপ বেজে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বাইরের শিল্পীদেরও ডাকা হয় এই-সব কেন্দ্রে সময়োপযোগী গান গাইবার জন্য। আমাদের সে-সব কোনো সুবিধাই নেই। চরম একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। ভীষণ অসুবিধা হয়েছিল প্রোগ্রাম চালু রাখতে।

এমন বিপর্যয়ে যাতে পড়তে না হয় তার জন্য পরবর্তীকালে

শোকের উপযোগী বহু ঘণ্টার অনুষ্ঠান তৈরি করে স্টেশনগুলির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল দিল্লী থেকে। আর, বিলাপ আর্তনাদের সময়টাও কমিয়ে দেওয়া হল। গানের সঙ্গে অনুচ্চ তবলা সংগতেও আপত্তি রইল না। আগেকার দিনের সেই বিলাপের সংগীতের কালে কোনো শ্রোতাই রেডিয়ো খুলতেন না একমাত্র সংবাদের সময়টুকু ছাড়া।

নিকোবর পোর্টব্লেয়ার থেকে আরো প্রায় একশো মাইল দক্ষিণে। ওখানকার একদল ছেলেমেয়ে এল পোর্টব্লেয়ারে। স্কুলের উঁচু শ্রেণীতে পড়ে। একেবারে আধুনিক, পোশাক-আশাকে চলায়-ফেরায় যাকে বলে 'মড'। মেয়েদের পরিধানে স্কার্ট এবং ব্লাউজ, ছেলেদের পরিচ্ছদ বুশ্‌সার্ট প্যান্ট। স্বাস্থ্য ভালো, প্রাণোচ্ছল, হাসি লেগেই আছে মুখে। কিশোরী মেয়েরা দিল্লী-কলকাতার মেয়েদের চেয়ে একটুও পিছিয়ে নেই। হিন্দি বলতে পারে, মোটামুটি ইংরেজিও। এই ছেলেমেয়ের দলকে ডেকে আনলাম স্টুডিয়োতে। নিকোবরি গান গাইল ছেলেমেয়ে মিলে। ভারতীয় সংগীতের ধারা নয়। সে গান ভালো লাগে নি হয়তো বুঝতে পারি নি বলে। ওরা বলল যে নিকোবরে এক বাঙালি মাস্টারের কাছে রবীন্দ্রসংগীতও শিখেছে কেউ কেউ। শুনলাম, রেকর্ড করলাম না। নিকোবরী গান অনেক রেকর্ড করলাম। গানের জন্য নগদ টাকা পেয়ে ওরা দারুণ খুশি। নিকোবরে যাবার আমার সুযোগ হয় নি। কিন্তু ওখানকার ছেলেমেয়েদের একটা দলকে কিছু সময়ের জন্য দেখবার সুযোগ হল। নিকোবরের ছেলেরা খেলাধুলায়ও ভালো। একবার তো দিল্লী গিয়ে ফুটবল খেলে সুব্রত কাপই জয় করে নিল। এরা কিন্তু কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর সন্তান নয়।

রেডিয়োর ডিরেক্টর জেনারেল পি. সি. চ্যাটার্জিকে পোর্টব্লেয়ার কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন, 'fine for a couple of days।' সদ্য তিনি পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শনের পর কলকাতায়

ফিরেছেন। আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম যে ওখানে দুটি বছর কাটিয়েছি। সমুদ্রের নীল, সবুজ বন আর ঐ দূরে ছোটো ছোটো দ্বীপগুলির দিকে মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে একটা-দুটো মাস তো অনায়াসেই কাটিয়ে দেওয়া যায়। পরে একঘেয়েমি এসেছে সত্য। কিন্তু পোর্টব্লেয়ার না দেখলে ভারতদর্শন যে অপূর্ণ থেকে যায়। সুরেশ বৈদ্য নাম দিয়েছেন **Islands of the marigold sun**। বর্ষাটা বাদ দিয়ে বাকি দিনগুলিতে দ্বীপগুলির উপর সোনাগলা রোদের আবরণ। শীত যেমন নেই প্রচণ্ড গ্রীষ্মও নেই। সমুদ্রের ওপারে আমারই দেশ। আমি দেখব না সে দেশ? থেকেছি, দেখেছি এবং মানুষগুলিকে ভালোবেসেছি। আবার আমার চলার শুরু, এবার আসমুদ্র হিমাচল।



মুন্নু রিনপোচে, শেরিং ওয়াংমো, ইন্‌জুং, ইয়াপচুং কাজি, ইশে পেডং, চিমি আংমো, নামগিয়াল, ফুগু ডোমা— এঁরা এখন আমার সহকর্মী। এমনধারা নাম, পদবী আমার কাছে একেবারে নতুন, হয়তো অনেকের কাছেই। কিন্তু এই নাম-উপাধিধারী মানুষগুলি আমারই দেশের। এই নারী-পুরুষেরা অনেকেই আমার প্রতিবেশী, খুব কাছেরই মানুষ, আমারই রাজ্যের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের। এঁদের নামপদবী যেমন আমার অপরিচিত, এই মানুষগুলির ভাষাও আমার অজানা। অথচ খুব দূরের রাস্তা তো নয় এই পাহাড়ী শহরটি, দার্জিলিং পাহাড়ের কার্সিয়াং, নেপালী উচ্চারণ খুর্সাং।

অচিন এক রূপনগরীতে যেন আমি এলাম। অসাধারণ মিষ্টি চেহারা মেয়েদের। সেটাই প্রথমে চোখে পড়ে কার্সিয়াং-এর রাস্তায়। মেয়েদের গালে আপেলের রঙ, কস্‌মেটিক ব্যবহারের প্রয়োজনই নেই। পোশাকেই-বা কত বৈচিত্র্য।

তিব্বতী, সিকিমি, ভূটানী, নেপালী মানবগোষ্ঠীর এক বর্ণালী জনপদ এই কার্সিয়াং। নারীপুরুষ সবারই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ। মুখের আদল কিন্তু সাধারণ ভারতীয় থেকে আলাদা। পাপাপাশি বাস করলেও এঁদের কৃষ্টি ও ভাষা পৃথক। ধর্মকর্ম ধ্যানধারণা আচার-অনুষ্ঠানেও কিছুটা প্রভেদ আছে। তাই কার্সিয়াং রেডিয়ো থেকে এই-সব বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। ১৯৫৭ সনের ২রা জুন তারিখে এই কেন্দ্রটি খোলা হয় হিমালয়ের প্রত্যন্তবাসী এই নানাভাষার মানবগোষ্ঠীদের জন্য। শুরু হয়েছিল দুই কিলোওয়াট

শক্তিসম্পন্ন একটি শর্টওয়েভ ট্র্যান্স্মিটার দিয়ে। সীমান্ত অঞ্চল বলে পরে বিশ কিলোওয়াট শর্টওয়েভ ট্র্যান্স্মিটার বসানো হয়েছে।

১৯৫৭ সালের এপ্রিলে এখানে বদলি হয়ে এলাম। দেখলাম যে এই কেন্দ্র থেকে মাঝে-মধ্যে বাংলা গান প্রচারিত হলেও বাংলায় কথিকা, আলোচনা, নাটকের প্রোগ্রাম খুবই কম। অথচ পশ্চিমবঙ্গেরই একটি কেন্দ্র। শিলিগুড়িতে কলকাতার অনুষ্ঠান রিলে করার জন্য একটি বিশ কিলোওয়াট মিডিয়মওয়েভ ট্র্যান্স্মিটার বসানো হয় ১৯৫৭ সনের সাত জুলাই। শুধু রিলে করা হবে কলকাতা থেকে। নিজস্ব অনুষ্ঠান প্রচারের কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমি সুপ্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অতি সমৃদ্ধ। রাঢ় অঞ্চল বা কলকাতা-কেন্দ্রিক দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরের বাঙালিরা কম কিসে! কিন্তু তাদের সংগীত সাহিত্য সংস্কৃতি প্রচারের ভালো কোনো সুযোগ হল না বাড়ির কাছেই একটি রেডিয়ো স্টেশন থাকা সত্ত্বেও। একটি কেন্দ্র খোলার আগে সে অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে একটা সার্ভে করার নিয়ম আছে। কার্সিয়াং কেন্দ্র খোলার আগে এই সার্ভে সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু আমার মনে হল উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের উপর অবিচার করা হয়েছিল। পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, কামতাপুরের কত প্রাচীন কাহিনী, জয়পরাজয়ের ইতিহাস মিশে আছে এই উত্তরবঙ্গের মাটিতে। এখানকার মাটির গান ভাওয়াইয়া, চট্‌কা ভাটিয়ালির মতোই প্রাণস্পর্শী। সুতরাং ভাবলাম বাংলা অনুষ্ঠানের সময় একটু বাড়িয়ে দিলে ভালোই হত।

কিন্তু আমার এই ভাবনার কথা বলব কাকে! স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গেই দেখা হবার সুযোগ মিলছে না। অফিসে আসছেন না। ছুটি নেন নি। সই করাবার জন্য কাগজপত্র একজন পিওন ওঁর বাড়িতে নিয়ে যায়। আট-দশ দিন বাদে সই হয়ে ফিরে আসে

সেই কাগজপত্র। কিন্তু আমাদের বিশেষ উৎকণ্ঠার ব্যাপার এই যে ওঁর সইটা আট-দশদিন আগেরই অর্থাৎ যেদিন আমরা পাঠিয়েছিলাম ঠিক সেই দিনের। এই ব্যাক্-ডেটেড্ সই যে আমাদের বিপদে ফেলতে পারে।

খোঁজ নিয়ে জানলাম যে এই বাঙালি অফিসারের পক্ষে অফিসে আসাটা সত্যিই অসুবিধাজনক। একে তো শীতের দেশ, তা থাকেনও একা। এই পাহাড়ী শীতে লেপের নীচে পা গরম হয় না। রাত্রিতে ঘুম হয় না, অনিদ্রায় ভুগছেন। ভোরবেলায় চোখে একটু ঘুম আসে। সেই ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে যায়। অফিসের সময়ও পার হয়ে যায়। স্ত্রীকে আনতে পারছেন না মায়ের অসুবিধা হবে ভেবে। মায়ের সেবার জন্যই রয়ে গেছেন কলকাতার বাড়িতে। মায়ের প্রতি খুব ভক্তি।

অনেকদিন বাদে একদিন এলেন অফিসে দুপুরের পর। গেলাম দেখা করতে সঙ্গে কিছু অফিসের ফাইল নিয়ে আলোচনার জন্য। বললেন যে মার চিঠি পাচ্ছেন না অনেকদিন, দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। মনের এই অবস্থায় কাজ করতে পারা যায় কি ? এদিকে ডিরেক্টর অফিসে এসেছেন শুনে নানা বিভাগ থেকে জরুরি কাগজ-পত্র, ফাইল, রেজিস্টার স্তূপীকৃত হয়ে জমা পড়তে লাগল ওঁর টেবিলের ওপর। এইগুলি দেখে ঘাবড়ে গেলেন না। নিপুণ হাতে পান সাজলেন, একটি আমায় দিলেন, নিজেও মুখে পুরলেন একটি। পানটি অতি আয়াস করে চিবোতে চিবোতে ডি. জি.-র অফিসের ডাক খুলে বিভাগীয় অফিসারদের ডেকে তাঁদের হাতে দিয়ে পরের দিনই জবাব পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে তিনি উঠলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ তা হলে যাওয়া যাক, কি বলেন ?' যেন আমার বলার অপেক্ষায়।

আমাকেও বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'নিশ্চয় স্যার, আজ চলেই যান।'

আগামীকাল সকাল সকাল এসে সব হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। আমি বশংবদের মতো গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। সবসুদ্ধ ঘণ্টাখানেক ছিলেন অফিসে। কিন্তু পরদিন এলেন না, তার পরের দিনও না এবং পর পর অনেকগুলি দিন এলেন না।

অসাধারণ একটি চরিত্র। মানুষটি দারুণ ইণ্টারেস্টিং। ইচ্ছে করলে অসম্ভব ভালো কাজ করতে পারেন। খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, হিউমারও আছে। কিন্তু যে কারণেই হোক কাজে অনীহা, আর আছে অতিমাত্রায় জাড্য। অন্যের কর্মক্ষমতার উপর আস্থা নেই, নেই আত্মপ্রত্যয়। চিঠির ঠিকানা লিখে বার বার পড়ে দেখছেন, এমন-কি, অফিসের পিওন যখন ডাকের চিঠিপত্র পোস্ট করবার জন্য রওয়ানা হয়ে গেল তখন তাকে পিছু ডেকে এনে চিঠির ঠিকানা আবার পড়ে দেখলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্ত্রীকে লেখা পত্রটি চলে গেল ডি. জি.-র কাছে লেখা ব্যক্তিগত চিঠির খামে। মানুষটির মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাচ্ছিলাম। খুব স্টাডি করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বেশিদিন সময় পেলাম না। অন্যত্র চলে গেলেন তিনি।

১৯৫৭-র পাঁচ সেপ্টেম্বর পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করল পাকিস্তান। এদিকে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে আমরা দূরে নই। যুদ্ধের সময় রেডিয়োর কাজ অসম্ভব বেড়ে গেল। নানা রকমের অনুষ্ঠান তৈরি করতে হল। কথিকা, নকশা, আলোচনার মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে ভারতীয় আদর্শ এবং নীতি ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। শ্রোতাদের মনোবল যাতে কখনো ভেঙে না পড়ে সেজন্যও উপযুক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করা হতে লাগল। কিন্তু ভাষা জানি না। ইংরেজিতে নোট তৈরি করে দিচ্ছি তিব্বতী প্রোগ্রামের প্রডিউসার মুনু রিনপোচেকে। যথাসম্ভব হিন্দি বাংলা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তিনি আবার তিব্বতী সিকিমী ভূটানী স্টাফ আর্টিস্টদের কাছে ব্যাখ্যা

করে দিলেন। কতটুকু যে ওঁরা বুঝতে পারলেন ভগবানই জানেন। খাটুনি খুব বেড়ে গেল। অথচ আমাদের অনুষ্ঠান কতটুকু কার্যকর হচ্ছে বুঝবার উপায় নেই। এর উপর আবার রাত্রিতে অফিসে থাকার নির্দেশ দিলেন স্টেশন ডিরেক্টর। তিনি বললেন যে আমাদের একজনকে প্রতি রাত্রে অফিসে শুতে হবে। বিনীতভাবে নিবেদন করলাম যে শোবার কথাটা যেন না থাকে আদেশে। শোবার জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। অফিসে শোয়া যায় না, সে ব্যবস্থা নেই; খাট নেই, বিছানা বালিশ নেই, মশারি নেই। সুতরাং রাত্রে অফিসে থাকাটাকে ওভারনাইট ডিউটি হিসেবেই ধরে নেওয়া হোক। আর অফিসারদের ওভারটাইম অ্যালাউন্সের কোনো প্রশ্ন যখন নেই তখন সে দাবি আমরা করব না। স্টেশন ডিরেক্টর মেনে নিলেন। যে সহকর্মী রইলেন অফিসে প্রথম রাত্রিতে, তাঁর কাছ থেকে শুনলাম পরদিন যে, রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ স্টেশন ডিরেক্টর টেলিফোনে তাঁকে সাবধানতামূলক নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। মাত্র খানিকক্ষণ আগে সেই সহকর্মী চেয়ারে বসেই একটু চোখ বুজেছিলেন।

আমাকে একটি মাত্র রাত্রি অফিসে কাটাতে হল। মস্ত বড়ো ফ্লাস্কে কফি নিয়ে এসেছি। এনেছি আগাথা ক্রিস্টির বই। রাত্রিটা জেগে কাটিয়ে দেব মনস্থ করলাম। একটা বেজে গেল, স্টেশন ডিরেক্টরের টেলিফোন এল না। দুটোও বেজে গেল। চৌকিদারকে টেলিফোনের কাছে বসিয়ে রেখে বাইরে গিয়ে রাত্রির আকাশটা দেখে এলাম। ঘুম তাড়াবার চেষ্টা। ঠিক তিনটের সময় স্টেশন ডিরেক্টরকে ফোন করলাম। গভীর ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠলেন মনে হল। গলার স্বর জড়ানো এবং আতঙ্কভরা। চিৎকার করে উঠলেন, 'কি, কি হয়েছে?' শান্তভাবে বললাম যে কোনো বিপদ হয় নি, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। চৌকিদার এবং সেন্ট্রি ঠিকমতো পাহারায় রত। সব কিছু ঠিক আছে। ওঁকে নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে

পড়তে বললাম। টেলিফোন ক্রেডেলে রাখবার আগে ওঁর অস্ফুট মন্তব্য যেন শুনতে পেলাম, 'রাত তিনটেয় ঘুম ভাঙিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে বলা।' পরদিন ঠিক সময়ে অফিসে এসে প্রোগ্রাম মিটিং-এ এলেন তিনি। আমার দিকে তাকিয়ে যেন একটু অবাক হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ি গিয়েছি কি না। জানালাম যে রাতের ডিউটির পর সকালে বাড়ি ফিরেছি। স্নান এবং প্রাতরাশ সেরে যথাসময়ে অফিসে এসেছি। বললাম যে রাতের ডিউটি হল একটা ইম্যারজেন্সির ব্যাপার। কিন্তু দশটা থেকে পাঁচটা অবধি ডিউটি করা অবশ্যকর্তব্য। যুদ্ধের সময় কাজও বেড়ে গেছে অনেক। তা ছাড়া গৃহমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ প্রবর্তিত 'সদাচারের' সন্ধানী দৃষ্টি রয়েছে সরকারের কর্মীদের উপর, শুধু ছোটোদের উপর নয়, বড়োদের উপরও। সময় মতো অফিসে না এলেই বিপদ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্টেশন ডিরেক্টর বললেন যে রাতে কাউকে আর অফিসে থাকার প্রয়োজন নেই। আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন যে রাতে অফিসে কেউ থাকলে স্টেশন ডিরেক্টরকেও বাড়িতে ঘুমতে দেওয়া হয় না। আমি কিছু না বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলাম। রাত তিনটেয় স্টেশন ডিরেক্টরকে অফিস থেকে ফোন করার ফলেই রাতের ডিউটি থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম আমরা। এ কথা আমি কাউকে বলি নি। কিন্তু চৌকিদার ব্যাপারটা গোপন রাখল না।

কার্সিয়াং পাহাড়ী শহর। বাজার-এলাকার বাইরে বাড়িগুলি বিচ্ছিন্ন, একটা থেকে আর-একটা বেশ দূরে। রাত ন'টার পর সব নিঝুম। আমার বাড়ি অফিস থেকে দু মাইল দূরে প্রায় ছশো ফুট উঁচুতে ডাউহিল পাহাড়ে। বাড়িতে আমার স্ত্রী এবং কিশোরী কন্যা। রাত্রে চোর-ডাকাত পড়লে তাদের চিৎকার শুনতে পাবে এমন বাড়ি নেই কাছাকাছি। কার্সিয়াং কলকাতা নয় যে আপদে-বিপদে

পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীর সাহায্য পাওয়া যাবে। আগের দিনই চোখের সামনে দেখলাম পাকিস্তানী বিমান বাগডোগরা বিমান-বন্দরের উপর বোমা ফেলে গেল। ঘণ্টা-দুই বাদে দিল্লীর সংবাদে জানতে পারলাম যে পাকিস্তানী দুটি বিমানকে ধ্বংস করা হয়েছে বাগডোগরার আকাশে। কিন্তু আমাদের মনে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা তো আছেই। এমন পরিস্থিতিতে অন্য প্রয়োজন না থাকলে অফিস পাহারা দেবার জন্য নিরস্ত্র একজন অফিসারকে সমস্ত রাত্রি রেখে কি হবে? সেই অফিসারকে দিনের বেলা অফিসে বসে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে না? এটাই তো তার কাজ। জরুরি প্রয়োজনে সিকিউরিটি গার্ডের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। তবে প্রয়োজনে সেই-সব গার্ড রেডিয়োর কোনো অফিসারের কাছ থেকে আদেশ নেবে না।

আমার সহকর্মী কে. পি. দে এবং আমি এক কামরাতেই বসি। টেলিফোনটিও এজমালি। এই কিছুদিন আগে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তিনি রেডিয়োর চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। কোনো প্রয়োজনে স্টেশন ডিরেক্টর বাড়ি থেকে ওঁকে টেলিফোন করলে তিনি সংকুচিত হয়েই ফোনে কথার জবাব দেন। সেদিনও স্টেশন ডিরেক্টর যতক্ষণ আমার সঙ্গে ফোনে কথা বললেন কে. পি. দে দাঁড়িয়েই রইলেন, যেন স্টেশন ডিরেক্টর কামরাতে এসেই আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন।

টেলিফোনের কথাবার্তা শেষ হলে কে. পি. দে বললেন, 'আপনার তো ভীষণ সাহস।'

বললাম, 'তাই নাকি! কিন্তু সাহস দেখলেন কোথায়? সর্বক্ষণ তো ভয়ের কথাই বলছিলাম, শুনলেন না। স্টেশন ডিরেক্টরের ব্যাক-ডেটেড সই যে আমার সমূহ বিপদ সৃষ্টি করতে পারে একটি সরকারি দপ্তরে সেই ভয়ের কথাই তো বার বার ওঁর কাছে নিবেদন

করছিলাম।'

কে. পি. দে বললেন, 'শুনলাম কি যেন দশটায় অফিসে আসার কথা বলছিলেন ওঁকে।'

জবাব দিলাম, 'ঠিকই শুনেছেন। উনি বলছিলেন টেলিফোনে কথা বলতে ওঁর ভালো লাগে না, ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তাই আমি সাজেস্ট করছিলাম যে অযথা ছুটিটা নষ্ট না করে দশটা-পাঁচটা অফিস করলে টেলিফোন করার আর প্রয়োজনই হয় না।'

একটু চিন্তিতভাবে কে. পি. দে জানতে চাইলেন এতে আমার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে কি না।

একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম যে ছুটির দরখাস্ত উনি করছেন না অথচ দিনের পর দিন অফিসেও আসছেন না। তিনি জানেন এটা অন্যায় এবং দিল্লীর কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে ওঁরই ক্ষতি হবে। কাজেই ক্ষতি করবার সাহস বা এক্তিয়ারই ওঁর নেই। উল্টো নিজেই তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবেন।

জানি না আমার কথায় কে. পি. দের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। অসততার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে কোনো ক্ষতি হয় না চাকরিতে বা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম।

নূতন স্টেশন ডিরেক্টর আসার আগে চার-পাঁচ মাসের জন্য স্টেশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার জে. এন. রায়। বিচক্ষণ অফিসার এবং দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। বিদেশেও গিয়েছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। দেখলাম অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনেও বেশ অভিজ্ঞ লোক। আবার প্রোগ্রামের ব্যাপারেও বেশ আগ্রহ। সৃজনী চিন্তা আছে। দুয়েকটি পরিকল্পনার কথা বললেন। রূপায়িত হলে শ্রোতাদের ভালো লাগবে মনে হল। এই সময় দিল্লী থেকে হঠাৎ •জোর তাগিদ এল উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতের রেকর্ডিং পাঠাবার

জন্য। লাইব্রেরিতে অনুসন্ধান করে দেখলাম কিছুই নেই।

লোকসংগীতের রেকর্ডিং নেই শুনে নিজেই অগ্রণী হয়ে উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার নেতৃত্বে একটি রেকর্ডিং ইউনিট পাঠাবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করলেন জে. এন. রায়। এ-সবের বিন্দুবিসর্গও প্রথমে জানতে পারি নি। সব ঠিকঠাক করে আমায় বললেন দিনক্ষণ ঠিক করে বেরিয়ে পড়তে। তাই করলাম। গাড়িতে রেকর্ডিং-এর সাজসরঞ্জাম এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন প্রোগ্রামের সহকারীকে নিয়ে দিনহাটা, কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা, ময়নাগুড়ি অঞ্চলে পর পর রেকর্ডিং করলাম। খাঁটি পল্লীর সুর। ভাওয়াইয়া, চটকা গানের অনেক রেকর্ড করে নিলাম, বেশ কয়েক ঘণ্টার রেকর্ডিং। একক এবং মিলিত নারী-পুরুষের গান। মনটা খুব প্রসন্ন হল। অনেক নূতন শিল্পীও আমাদের তালিকাভুক্ত হল। নগদ দক্ষিণা পেয়ে শিল্পীরাও মহাখুশি। উত্তরবঙ্গের অনেকটাও আমার দেখা হয়ে গেল। আট-দশ দিন পর ফিরে এলাম।

ইতিমধ্যে নূতন স্টেশন ডিরেক্টর মিস্টার বিশ্বনাথ এসে কাজে যোগ দিয়েছেন। এই-সব গান একটু ব্যাখ্যাসহ যখন বাজিয়ে শোনালাম তখন স্টেশন ডিরেক্টর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। নিবেদন করলাম যে পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা সবই জে. এন. রায় মহাশয়ের। স্টেশন ডিরেক্টর রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানালেন। সাধারণত একজন স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার নিজ বিভাগের কার্যকলাপের গণ্ডির বাইরে প্রোগ্রাম সম্পর্কে মাথা গলান না। নিজের বিভাগেই হাজারো সমস্যা রয়েছে। তাই প্রোগ্রামের বিষয়ে চিন্তা করার সময়ও পেয়ে ওঠেন না। কিন্তু জে. এন. রায়ের কাছ থেকে প্রোগ্রাম সম্পর্কে অনেক আইডিয়া পেয়েছি, বিজ্ঞান বিষয়ে তো প্রচুর। অনেক দিন আগে এইরকম একজনকে দেখেছি যিনি ইঞ্জিনিয়ার•

ছিলেন শুরুতে। পরে স্টেশন ডিরেক্টর হলেন এবং রিটায়ার করলেন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পদে। তিনি মিস্টার গোপালন।

নূতন স্টেশন ডিরেক্টর মিস্টার বিশ্বনাথ দক্ষিণের তামিলনাড়ুর সন্তান। ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় মিস্টার বিশ্বনাথ প্রকৃতই তাই। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সকলের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক সহযোগিতা পেয়ে গেলেন। বাংলা অনুষ্ঠানের সময় বাড়ানোরও অনুমতি দিলেন। 'গৈরিকা' নামে একটি সাপ্তাহিক আধ ঘণ্টার সাহিত্য-বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হল। কার্সিয়াং পাহাড়ের ঠিক নীচেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, নিকটেই জলপাইগুড়ি কোচ-বিহারের কলেজগুলি। উপরে আছে দার্জিলিং-এর সরকারি কলেজ। তাই উপযুক্ত সুধীজনের অভাব হবে না এই গৈরিকা অনুষ্ঠানের জন্য। গৈরিকা নামটি দিলেন আমার প্রিয় সহকর্মী-বন্ধু সন্তোষ-বিকাশ বড়ুয়া। এ নামের পেছনের ইতিহাসটাও বললেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজবাড়িতে একটি বাংলা পত্রিকার জন্ম হল। এই রাজপরিবারে বাংলা ভাষার খুব চর্চা আছে। এই রাজ-পরিবারের সঙ্গে আছে রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কেশব সেনের পৌত্রী রানী বিনীতা রায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির নাম দিলেন গৈরিকা। নির্দ্বিধায় আমরা এই নামটি নিয়ে নিলাম। রবীন্দ্রনাথের নামকরণটা অনেককাল আগের, পত্রিকাটিও হয়তো আর চালু নেই, আর পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন অন্য দেশে। আমাদের পাহাড়ী বেতার-কেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানের গৈরিকা নাম পরিবেশের সঙ্গে মিল খেয়ে গেল।

নুনু রিনপোচে এবং তাঁর পৌত্রী শেরিং ওয়াংমো লাডাকের অধিবাসী। নুনু রিনপোচে তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি। দীর্ঘকাল লাসায় ছিলেন। তিনি তিব্বতী প্রোগ্রামের প্রডিউসার নিযুক্ত হয়ে এখানে এলেন। অত্যন্ত যোগ্য লোক সন্দেহ

নেই। লাডাক থেকে কার্সিয়াং— অনেক দূর। দূর দেশে নাতনীকে নিয়ে এলেন সঙ্গে করে এবং তিব্বতী ইউনিটে স্টাফ আর্টিস্ট হলেন শেরিং ওয়াংমো। বয়স কত হবে মুন্নু রিনপোচের! আমার সাধ্য নেই ঠিক আন্দাজ করি। পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে এটুকু বলতে পারি। মুনিঋষির মতো চেহারা। মাথার উপর ঝুঁটিবাঁধা কাঁচা-পাকা চুল, গালে খুব পাতলা দাড়ি, চিবুকে কয়েক গাছি অজা-শ্মশ্রু। পাতলা গড়ন, সোজা হাঁটেন তরতরিয়ে। খুব নিষ্ঠা কাজে। সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে ব্যস্ত। ইংরেজি জানেন না, বাংলা জানবেন আশা করব কিভাবে! মোটামুটি হিন্দিতেই কথাবার্তা বলেন, ইংরেজি বাংলা শব্দ কিছু কিছু শিখবার চেষ্টা করছেন। নিশ্চয়ই কোনো যোগ-ব্যায়াম করেন।

তিন বছর কাজ করেছি একসঙ্গে, একদিনের জন্যও রিনপোচেকে অসুস্থ হতে দেখি নি। তবে বর্ষাকালটায় একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। যে দেশে জন্ম এবং শৈশব বাল্য কৈশোর যৌবন কেটেছে সেখানে বৃষ্টি প্রায় হয় না। মুন্নু রিনপোচের কাছে আমি কত ঋণী। লাডাক দেশটার কত গল্প শুনেছি রিনপোচের কাছে। লাডাকের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, লাডাকের বৌদ্ধদের ধর্ম-কর্ম ধ্যান-ধারণার বিষয়ে শুনেছি। বিয়ের ব্যাপারটা অবশ্য শুনেছি শেরিং ওয়াংমোর কাছে। শেরিং ওয়াংমো অতি সুন্দরী মেয়ে। স্লিম্ ফিগার, টিকলো নাক, পাতলা ঠোঁট, আয়ত লোচন, চিকন ভ্রূলতা; ভ্রূবিলাসে বুক কেঁপে ওঠে। দীর্ঘ ছুটি নিয়ে শেরিং দেশে গেলেন বিয়ে করতে। লাডাকে, কিন্নরদেশে পুরুষের সংখ্যার তুলনায় মেয়ে যে অনেক কম। সব ছেলেই কি আর একটি স্ত্রীকে খুঁজে বের করতে পারে? যে পরিবারে তিনটি ভাই আছে তাদের একজন যদি স্ত্রী জোটাতে পারল তবে সেই স্ত্রী হবে ভাইদের দ্রৌপদী-বধূ। কোনো কুন্তী-মায়ের নির্দেশে নয়, এটাই সামাজিক বিধান নারী-

স্বল্পতা সমাধানের প্রয়াসে। প্রায় তিন মাস পর বিয়ে করে শেরিং ফিরে এলেন। বিয়ে হল এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে, শুনেছি ওঁর স্বামীরাও তিন ভাই।

মুন্মু রিনপোচের কাছে পোতালা রাজপ্রাসাদেব ইতিহাসও শুনেছি। তিব্বতী রাজাদের ভারতবিজয়ের কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেছি। তিব্বত-রাজ স্রং-ৎসন-গ্যাম্‌পো এবং তৎ-পৌত্র কি-লি-প-পু দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। এঁদের রাষ্ট্রীয় প্রভাব প্রায় মধ্যভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্যাম্‌পোর আমল থেকে আরম্ভ করে নেপাল তো প্রায় দুশো বছর তিব্বতের অধীনেই ছিল। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিব্বত খুব শক্তিশালী হয়েছিল। তিব্বতে বজ্রযান তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের কথা অনুপুঙ্খ বিবরণে ব্যাখ্যা করেছেন মুন্মু রিনপোচে আমার কাছে।

শুনেছি বিক্রমপুরের বাঙালি সন্তান অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আধ্যাত্মিক সাধনা এবং তিব্বত ভ্রমণের কাহিনী। আনুমানিক ৯৮০ খৃস্টাব্দে গৌড় রাজপরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতা প্রভাবতী। উনিশ বছর বয়সে ওদন্ত-পুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখনই নামকরণ হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। পালরাজ মহীপালের আহ্বানে তিনি বিক্রম-শীল মহাবিহারের মহাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিব্বতের বৌদ্ধরাজা লাহ-লামা-যে-শেষ্‌ দূত পাঠিয়ে দীপঙ্করকে তিব্বতে আসার আমন্ত্রণ করলেন। দীপঙ্কর সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। ঐ বিহারের সর্বাধিনায়কও ছাড়তে চাইলেন না দীপঙ্করকে। কিন্তু পরে যখন তিনি শুনলেন যে তিব্বতের আচার্য বিনয়ধরকে দীপঙ্কর একবার কথা দিয়েছিলেন তখন সর্বাধিনায়ক আচার্য রত্নাকর বাধ্য হয়েই অনুমতি দিলেন তিন বছরের জন্য। কিন্তু আচার্য রত্নাকর তিব্বতের বিনয়ধরকে বলেছিলেন যে অতীশ না থাকলে ভারতবর্ষ

অন্ধকার। নেপালের দুর্গম পথে তিব্বত যাত্রা করলেন দীপঙ্কর। নেপালরাজ অনন্তকীর্তির পুত্র পদ্মপ্রভ দীপঙ্করের নিকট বৌদ্ধধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে তিব্বতের পথে গুরুর অনুগামী হলেন। তিব্বতে রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভ করলেন দীপঙ্কর। সারা দেশ ঘুরে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করলেন। থো-লিং বিহার ছিল তাঁর ধর্মকেন্দ্র। দেশে কিন্তু আর ফিরে এলেন না দীপঙ্কর। তেরো বছর সেখানে থেকে তিয়াত্তর বছর বয়সে আনুমানিক ১০৫৩ খৃস্টাব্দে তিব্বতের মাটিতে দেহরক্ষা করলেন।

রিনপোচের নিকট ইতিহাস শুনতে শুনতে মনটা আমার ফিরে গেল সুদূর অতীতে। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক বৌদ্ধ শ্রমণ পাহাড়ী বন্ধুর বরফঢাকা পথে ধীর পায়ে এগিয়ে চলছেন দীর্ঘ চড়াই-এর দিকে। সামনে পথপ্রদর্শক, পেছনে শিষ্য এবং মালপত্র মাথায় আরো দু-একজন মানুষ। কতদিনে শেষ হবে এই যাত্রা!

রিনপোচের কথায় ফিরে এলাম বর্তমানে। তিনি বললেন দীপঙ্করের কাহিনী বিধৃত আছে ত্যাঙ্গুর নামে তিব্বতী গ্রন্থে। মহাযান-বজ্রযান-মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতে যে বিপুল সংখ্যার সংস্কৃত পুস্তক রচিত হয়েছিল তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই গ্রন্থগুলির কিছু কিছু তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। তিব্বতী লামা বু-তোন এই অনূদিত গ্রন্থগুলির সটীক তালিকা সংকলন করেন। এই তালিকা গ্রন্থেরই নাম ত্যাঙ্গুর। এই গ্রন্থ থেকে নাথধর্ম সম্পর্কেও জানা যায়।

তিব্বতী পাগ-সাম-জোন গ্রন্থেও পাল রাজত্বকালের বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সুম্পা রচিত এই গ্রন্থটিতেও দীপঙ্কর সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। নুমু রিনপোচে বললেন যে উভয় গ্রন্থেই আচার্য শান্তিরক্ষিত এবং তাঁর ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভবের অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বত ভ্রমণ এবং তাঁদের দ্বারা সেখানে বৌদ্ধধর্মের

প্রতিষ্ঠার কথাও উল্লেখ আছে। এবং সেই সময় থেকেই লামা প্রথারও প্রবর্তন হয়। মুনু রিনপোচে তিব্বতী লামা তারনাথের কথাও শোনালেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের বিরাট এক ইতিহাস লিখেছিলেন। পূর্ব-ভারতের প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনায় তারনাথের এই ইতিহাস মহামূল্য একটি আকর গ্রন্থ। মুনু রিনপোচের নিকট দিনের পর দিন তিব্বতের কাহিনী শোনার পর উত্তরের জানলাটা আমার চোখের সামনে খুলে গেল। জানলাম পূর্ব-ভারত এবং তিব্বতের মধ্যে একদা যে মিলনসেতু তৈরি হয়েছিল তার বিস্তারিত ইতিহাস। এই-সব তথ্য ভিত্তি করে কয়েকটি কথিকামালা প্রচারের ব্যবস্থা করলাম তিব্বতী অনুষ্ঠানে। দার্জিলিং কার্সিয়াং-এর তিব্বতীদের জন্য এবং বিশেষ করে তিব্বতবাসী তিব্বতী শ্রোতাদের কাছে এ-সব তথ্যের অত্যন্ত গুরুত্ব আছে। দুটি দেশের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে যে ধর্ম ধারণার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তিব্বতের এই যুগের মানুষের সেটা জানা প্রয়োজন। শিক্ষিত তিব্বতী শ্রোতার কাছে এর একটা আবেদন নিশ্চয়ই থাকবে এবং দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীবন্ধনে সাহায্য করবে।

কার্সিয়াং কেন্দ্রের ভূমিকা যে একটু ভিন্ন প্রকারের হওয়া উচিত, দেশের অন্যান্য বেতার-কেন্দ্রের চেয়ে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেটা আমার মনে হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় নেপালী জনসংখ্যা সর্বাধিক। এখানকার নেপালী অধিবাসী ভারতেরই মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। কিন্তু পাশেই স্বাধীন নেপাল রাষ্ট্র। ভারত নেপালের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্য সময় সময় ঘটেছে। লক্ষ করেছি নেপাল রাষ্ট্রের ভারতবিদ্বেষ তাদের পত্র-পত্রিকায় এবং রেডিয়োর প্রচারে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাবও দেখেছি স্থানীয় নেপালী মানুষদের মধ্যে। এমন ক্ষেত্রে কার্সিয়াং কেন্দ্রকে অন্তত কিছুটা এক্‌স্‌ট্যারনল্‌ সার্ভিসের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত বলে আমার মনে

হয়েছে। ভারতের যেটা বক্তব্য, আন্তর্জাতিক সমস্যায় ভারতের যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সে-সমস্যা সমাধানে ভারতের যে অবদান সেটা ব্যাখ্যা করে দেশের এবং বিদেশের নেপালী শ্রোতাদের কাছে বলার দায়িত্ব নেওয়া উচিত কার্সিয়াং কেন্দ্রের। ভারতের গণতান্ত্রিক চিন্তা, সাধনা, ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির কথা, ভারত-নেপাল সাংস্কৃতিক মৈত্রীর কথা বলার প্রয়োজন আছে।

তিব্বতী, সিকিমী বা ভূটানী প্রোগ্রাম সম্পর্কেও কার্সিয়াং স্টেশনের দায়িত্ব অনুরূপ হওয়া উচিত। ভূটান তো সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়েই পাশে রয়েছে। আর, যে সময়ের কথা লিখছি তখন সিকিমও ভারতের একটি রাজ্য ছিল না। কিন্তু এখানে এসে এই কেন্দ্রের প্রোগ্রাম কম্পোজিশন বা বিন্যাস দেখে আমার মনে হয় নি যে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ বা এই কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কার্সিয়াং কেন্দ্রের বিশেষ ভূমিকার বিষয়ে অবহিত ছিলেন। অথচ তিন-চারটি রাজ্যের সংযোগস্থলে এই কেন্দ্রটি। ট্র্যান্স্‌মিটারও শক্তিশালী শর্টওয়েভ। অথচ প্রোগ্রামে এমন কিছু ছিল না ভারতের ভাব-মূর্তিকে যাতে তুলে ধরা যায়। কজন ভূটানী, তিব্বতী বাস করে স্থায়ীভাবে এই দার্জিলিং জেলায়? তিব্বতীরা বেশির ভাগই রেফিউজি। কিন্তু নেপালী তিব্বতী ভূটানী সিকিমী প্রোগ্রামে তালগুড় সপ্তাহ, রেলওয়ে সপ্তাহ, বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ, পরিবার-পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার হয়ে চলেছে। তালগাছ রেলওয়ে ঐ-সব দেশে নেই। বৃক্ষের অভাবটা তাদের সমস্যা নয়। আর নিদারুণ শীতের দেশে সন্তান-সন্ততিও বেশি হয় না। পর্বত-বাসীগণ পরিবার কল্যাণের ওষুধপত্র বা ডাক্তারি সাহায্যই বা পাবে কোথায়? জনসংখ্যা ঐ দেশগুলির সমস্যা নয়। নূতন স্টেশন ডিরেক্টর এসে এ বিষয়ে মনোযোগ দিলেন। তবে দার্জিলিং জেলার নেপালী অধিবাসীগণ যে ভারতেরই সন্তান সে ভাবটা শ্রোতাদের

মধ্যে জাগিয়ে রাখার বিশেষ দায়িত্ব বোধ হয় অনন্তকালের জন্মই থাকবে কার্সিয়াং কেন্দ্রের।

কার্সিয়াং দেবতাত্মা হিমালয়েরই অংশ। এখানকার মাটি বড়ো পবিত্র আমার কাছে। এখানেই সম্পূর্ণ ফিরে পেলাম আমার শ্রবণ-শক্তি পুরো দশটি বছর পর। এখানে থাকাকালীনই জলপাইগুড়ির বিখ্যাত রায়কত পরিবারের সমরেন্দ্রদেবের আনুকূল্যে যোগাযোগ হল মাদ্রাজের সার্জন ভি. এস. সুব্রহ্মনিয়মের সঙ্গে। তিনি অপারেশন করে শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। আমার নবজন্মলাভ। মাদ্রাজ থেকেই রওয়ানা হলাম দিল্লীতে।

বদলির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ন্যায়সংগত এবং সুনির্দিষ্ট নীতির অভাব বার বার অনুভব করেছি। কিন্তু সে কথা উপর মহলে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে পারি নি। কান ভালো হয়ে যাবার পর কোনো আলোচনায় বসতে অসুবিধা হবে না, তাই চললাম দিল্লীতে কর্তৃপক্ষের কাছে আমার নিবেদন জানাতে। দিল্লীর সুখ্যাত সেতার-শিল্পী অনুজপ্রতিম দেবব্রত চৌধুরী দেখা করতে এলেন। কথায় কথায় দিল্লী আসার উদ্দেশ্যটা বললাম দেবুকে। সঙ্গে সঙ্গে দেবু তথ্য এবং বেতার মন্ত্রকের সেক্রেটারি অশোক মিত্রের নিকট ফোন করলেন। ফোন নামিয়ে রেখে আমাকে পরদিন সকাল ন'টার সময় মিস্টার মিত্রের অফিসে যেতে বললেন। দেবুর 'পাওয়ার' দেখলাম।

পরদিন নর্থ ব্লকে যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। হাতজোড় করে বললাম, যে আমি রেডিয়োতে কাজ করি, এখন কার্সিয়াং কেন্দ্রে রয়েছি। সরকারি কন্‌ভেন্‌শন্‌ অনুযায়ী ডি. জি.-র অনুমতি না নিয়ে সেক্রেটারির কাছে আমার আসার অধিকার নেই। তিনি আমায় বসতে বললেন এবং আশ্বাস দিলেন যে এই আলোচনাটা অফিসিয়াল নয় সেটা তিনি মেনে নিয়েছেন। আমার সমস্যাটা

কি জানতে চাইলেন তিনি। বললাম যে ব্যক্তিগত কিছু নয়। রেডিয়োতে অনেক কেন্দ্র আছে যেখানে যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়া, বাড়ি-ঘর পাওয়া এবং ছেলেমেয়ের পড়াশুনার বিষয়ে খুবই অসুবিধা। তার উপরও অনেক স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জলহাওয়াও খারাপ। বদলি হলে সেখানে পরিবার নিয়ে যাওয়া যায় না, কোনো কোনো জায়গায় পরিবার নিয়ে যেতেও দেওয়া হয় না, যেমন পোর্ট-ব্লেয়ার। কাজেই দুটো সংসারের খরচ বহন করতে হয় সে কর্মচারীকে। নিবেদন করলাম এই অসুবিধাজনক স্টেশনগুলির নাম কর্তৃপক্ষের জানা উচিত এবং ওখানে কতদিন থাকতে হবে সেটাও সেই কর্মচারীর জানা উচিত। দেখলাম মিস্টার মিত্র মাথা নাড়লেন। আমি আবার নিবেদন করলাম যে যাঁদের উপর-মহলে বলার-কইবার লোক আছেন সেই-সব কর্মচারীর ডিফিকাল্ট্ স্টেশনে যেতে হয় না। কিছু মন্তব্য করলেন না মিস্টার মিত্র, একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ভাবলাম এই গম্ভীর হয়ে যাওয়াটা এই সাক্ষাৎকারের দাঁড়ি টানার ইঙ্গিত। নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি আবার আমায় বসতে বলে একটু আশ্বাসের ভঙ্গিতে আমার নিজের কথা বলতে বললেন। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলাম। নিজের কথা বলা তো সহজ নয়, কি করে বলব! তবু তিনি মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে নিবেদন করলাম, 'ভিক্ষা চাই না, কুকুর সামলাও', এটাই প্রার্থনা সরকারের কাছে। কথাটা ব্যাখ্যা করতে বললেন। জানালাম যে গাঁওঘরে এটা একটা চলতি কথা। গৃহস্বামী ভিখিরিকে ভিক্ষে তো দিলেনই না, বাড়ির কুকুরটাকে লেলিয়ে দিলেন ভিক্ষুকের দিকে। প্রাণভয়ে ভিক্ষুক হাতজোড় করে আবেদন করল 'ভিক্ষা চাই না, কুকুর সামলাও'। এইবার সরাসরিই বলে ফেললাম যে আমি সরকারি অবিচারের শিকার হয়েছি। মাত্র দু

বছর কলকাতায় থাকার পরই যেতে হল পোর্টব্লেয়ারে, অথচ আট-দশ বছর কলকাতায় আছেন এমন একাধিক সহকর্মী ছিলেন।

পোর্টব্লেয়ারে আমায় পরিবার নিয়ে যেতে দিল না সরকার, দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট রাখতে হল। অন্য যাঁদের উপর বদলির আদেশ এসেছিল সেটা বাতিল হল হয়তো কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের হয়ে বলার কেউ ছিল বলে। দু বছর বাদে আবার আমায় সমুদ্র থেকে একেবারে হিমালয়ে যেতে হল। কলকাতায় বদলি হলে আমার মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে আবার সমস্যা দেখা দিত না। বললাম সর্বত্র যেতে রাজী আছি বদলির আদেশে। কিন্তু কেউ বদলি হবে আর কেউ কেউ হবে না বা একই কেন্দ্রে মৌরুসী স্বত্ব ভোগ করবে এমনটা তো সরকারের নীতি হওয়া উচিত নয়। দেখলাম মিস্টার মিত্রের মুখটা শক্ত কঠিন দেখাচ্ছে। ভয় হল সেক্রেটারি মহোদয় রাগ করেছেন। কিন্তু তিনি শুধু বললেন যে এ-সব বদলির কাগজপত্র তাঁর কাছে আসে না। তবে 'দেখছি' এটুকু বললেন। আবার নমস্কার এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বের হয়ে এলাম সেক্রেটারির অফিস থেকে। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নিই নি। মিস্টার মিত্র মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন বলে ভালো লাগল। মাস দুই-এর মধ্যেই ডি. জি.-র অফিস থেকে আদেশ বের হল ডিফিকাল্ট্ স্টেশনগুলির তালিকা দিয়ে। আদেশে বলা হল ঐ-সব কেন্দ্রে কাউকে দু বছরের বেশি থাকতে হবে না এবং ঐ-সব কেন্দ্রে কাজ করার পর নিজের পছন্দমতো কেন্দ্রে যাবার দাবি থাকবে। দূর থেকে আমাদের সেক্রেটারির উদ্দেশে নমস্কার জানালাম।

এই স্টেশনগুলির মধ্যে শিলং, পোর্টব্লেয়ার এবং কার্সিয়াং-এরও নাম ছিল। তিনটি ডিফিকাল্ট্ স্টেশনেই যে কাজ করেছি সেটা উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষের কাছে বদলির আবেদন করলাম। এ দিকে কলকাতা কেন্দ্রের ডিরেক্টর এক ব্যক্তিগত চিঠিতে আমায় কলকাতায়

আসবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন, কারণ তিনি কলকাতায় আমার বদলির জন্য ডি. জি.-র কাছে লিখেছেন। বদলির আদেশ এল আগস্ট মাসের ১লা তারিখে। একটি একটি করে সাত মাস পার হয়ে গেল, কিন্তু বদলির আদেশ কার্যকর করা হচ্ছে না, অর্থাৎ আমার জায়গায় যিনি আসবেন তাঁর মুরুব্বি আছে। তাই আমার কলকাতায় যাওয়াটাও আর হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে আমাকে মাদ্রাজে যেতে হল দ্বিতীয় কানের অপারেশনের জন্য। ফিরে যেদিন অফিসে গেলাম সেদিনই স্টেশন ডিরেক্টর ডেকে নিয়ে বললেন যে আজই মধ্যাহ্নের আগে আমাকে রিলিভ করা হবে। হেডক্লার্ককে ডেকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার কাগজপত্র আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন। হেডক্লার্ক চলে যাবার পর আমি তাড়াহুড়োর কারণটা জিজ্ঞাসা করলাম। হেসে স্টেশন ডিরেক্টর বললেন যে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ সাত মাস ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ গতকাল রাত্রে ডি. ডি. জি. অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন ট্রাঙ্ক কল করে পরদিনই আমায় রিলিভ করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্টেশন ডিরেক্টর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন উঁচু মহলের কারো সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কি না ছুটির সময়। বললাম যে আমি গিয়েছি দক্ষিণে আর দিল্লী ঠিক উত্তরে, অনেক দূরে।

৭

কলকাতায় ফিরে এলাম আবার পুরো পাঁচ বছর পর। কথিকা বিভাগে কাজ করছি। এক বিদুষী মহিলা আমার সহকর্মী। প্রডিউসার কবিতা সিংহের কবিখ্যাতি আগেই শুনেছি। এবার পেলাম সহকর্মীরূপে। সত্যিকারের প্রডিউসার। স্টুডিয়োতে রেকর্ডিং এডিটিং-এর কাজে দারুণ দক্ষতা। ওদিকে প্রোগ্রাম সম্পর্কেও কত নূতন চিন্তা। গদ্য রচনাও অনবদ্য। সমস্ত লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে আছে আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক। কাজে অসম্ভব নিষ্ঠা। মানুষটিও বড়ো মিশুকে। রেডিয়োর মতো প্রতিষ্ঠানে একটি অ্যাসেট। কথিকা বিভাগে আর-একজনের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করাতে আমাদের কাজটা কত সহজ হয়ে গেল। উপদেষ্টা পুলিনবিহারী সেন মশায় যে-কোনো ব্যাপারে সাহায্য করতে হাত বাড়িয়েই আছেন। ভালো পড়াশুনা আছে এবং রেডিয়োতে ভালো বলতে পারবেন এমন অনেক সুধীজনের নাম-ঠিকানা তিনি আমাদের দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার সঙ্গেই গভীর পরিচয় পুলিনবিহারী সেনের। একটা সুন্দর টীম-ওয়ার্ক কথিকা বিভাগে। কাজের সিংহভাগটাই অবশ্য কবিতা সিংহের উপর। কিন্তু কথিকা বিভাগে বেশিদিন রইলাম না। সংগীত বিভাগের দায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে দেওয়া হল।

মনে পড়ে কথিকার একটি সিরিজ বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শুনলাম কলকাতা কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন কার্যক্রম প্রবর্তিত হবে বিবিধ ভারতী সার্ভিসে। বিজ্ঞাপনের বিষয়ে একটা সিরিজ পরিকল্পনা করে আমরা তার নাম দিলাম 'বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞান'।

প্রতিযোগিতামূলক বিপণন ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের অসাধারণ ভূমিকার কথা আলোচনা করাই উদ্দেশ্য। ছয় বা সাতটি কথিকা থাকবে। বাটা কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিভাগের তখনকার কর্তা বিখ্যাত দিলীপ গুপ্ত থেকে শুরু করে ডানলপ কোম্পানির সনৎ লাহিড়ি, ক্ল্যারিয়ন মেক্‌গানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ মানুষটিকে ধরে নিয়ে এলাম বলবার জন্য। স্টেশন ডিরেক্টর বেশ সন্তুষ্ট হলেন এজন্য যে কথিকাগুলি খুবই সময়োপযোগী। কিছুদিন পরই কলকাতা কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন কার্যক্রম চালু হল। বিজ্ঞাপন জগতের মানুষেরা স্বাগত জানালেন বলাই বাহুল্য।

একটা জিনিস লক্ষ করেছি, অনেকে মনে করতেন যে রেডিয়ো সব সময়ে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়াটা এড়িয়ে যেতে চায়। একটি সরকারি রেডিয়োতে কিছুটা সতর্কতার প্রয়োজন আছে সত্য। অকারণে বিতর্কে গিয়ে লাভ কি? কিন্তু পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে উদাসীন হবার উপায় তো নেই রেডিয়োর মতো একটি মাধ্যমের। বিশেষত শিল্প-সাহিত্যে বিতর্কমূলক কোনো সৃষ্টি বা রচনা সম্পর্কে আলোচনায় রেডিয়ো পিছিয়ে যাবে কেন? একদিন মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ প্রকাশক সংস্থার সুমথনাথ ঘোষ ফোন করে জানালেন যে বহুবিতর্কিত আন্তর্জাতিক খ্যাতির লেখক নীরদ সি. চৌধুরীর একটি বই প্রকাশ করেছে এই সংস্থা। বইটির নাম বাঙালি জীবনে রমণী। রেডিয়োতে বইটি পর্যালোচনার জন্য অনুরোধ জানালেন সুমথবাবু। নীরদ সি. চৌধুরী বাংলায় বড়ো লেখেন না এবং ওঁর যে-কোনো লেখার উপর সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। আমরা রাজী হয়ে গেলাম বইটির পর্যালোচনার জন্য। ভেবেচিন্তে দেখলাম সন্তোষ-কুমার ঘোষের মতো সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং বলিষ্ঠ ও পক্ষপাতশূন্য সমালোচক এই দায়িত্বটা গ্রহণ করলে সব দিক দিয়ে ভালো হয়।

কবিতা সিংহ এবং আমি সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাবটি রাখলাম ওঁর কাছে। উনি রাজী হলেন একটি শর্তে যে স্ক্রিপ্টে হাত ছোঁয়াতে পারব না। বললাম যে এই প্রশ্নই ওঠে না। আমারও একটি শর্ত নিবেদন করলাম। সন্তোষবাবুর বলার মধ্যে গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকবে না। রাজী হলেন তিনি। আরো একটি বিশেষ সুবিধা দিতে আপত্তি নেই আমাদের জানালাম। সাধারণত একটি কথিকার জন্য সময় দেওয়া হয় দশ মিনিট। এই পুস্তক পর্যালোচনার জন্য পনেরো মিনিট সময় দেওয়া যাবে। খুশি হলেন সন্তোষবাবু। নীরদ সি. চৌধুরীর বই, সন্তোষকুমার ঘোষের সমালোচনা. শ্রোতার কাছে এর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় আর কি হতে পারে! অতি শালীন ভাষায় নিষ্ঠুর সমালোচনা করলেন বইটির মূল বক্তব্য-বিষয়ের উপর। ভাষার রূঢ়তা নেই, নেই লেখকের প্রতি অবজ্ঞা, উপহাস বা ব্যক্তিগত আক্রমণ। নীরদবাবুর পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করে নিয়েই নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন সুচিন্তিত যুক্তি ও তথ্যের উপর। সমালোচনার এথিক্স সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে দ্বিতীয় মত প্রকাশ করার একটা সুষ্ঠু নীতির দৃষ্টান্ত রাখলেন সন্তোষবাবু। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ না করে যুক্তিনির্ভর মতামত প্রকাশে রেডিয়োর পক্ষ থেকে আপত্তি তো থাকতে পারে না।

কথিকা বিভাগে থাকার সময় যে কথিকামালাটি আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছিল তার নাম 'কলকাতা আমার কলকাতা'। কবিতা সিংহের পরিকল্পনা। নেহরুর দুঃস্বপ্নের নগরী এবং কিপলিং-এর সিটি অব ড্রেডফুল নাইট— এই কলকাতায় আছে মিছিল, আছে দৈন্য, আবর্জনা। রাজভবনের সামনে, মনুমেন্টের নীচে, কার্জন পার্কে, লালদিঘির উত্তর পারে মুখ্যমন্ত্রীর নাকের নীচে আছে প্রাণঘাতী প্রস্রাবের দুর্গন্ধ, চৌরঙ্গীর উপর ময়দান বাজারের সামনে 'গন্ধেশ্বরী'

নালা। আছে পেভ্‌মেণ্টে ভিখিরির চিরস্থায়ী সংসার, বেকারের রক্‌বাজি। এ-সব সত্ত্বেও কলকাতায় যে প্রাণ আছে তা যেন ভারতের অন্য বড়ো শহরে নেই। মাটির বুকে কান পাতলে প্রাণস্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নাটকের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম ; ফুটবল, ক্রিকেট নিয়ে এমন মাতামাতি কোথায় আছে ? কোথায় আছে এমন গড়ের মাঠ, দখিনা বাতাস, সুনীল আকাশ ! মানুষের এমন কোমল হৃদয়ের স্পর্শই আর কোথায় ! তাই অভিশপ্ত হলেও এই নগরীকে আমি ভালোবাসি, কলকাতা তাই আমার কলকাতা— এই ভালোবাসার কথাই এক-একটি কথিকায় বলা। সবার মধ্যে এই ভালোবাসা জাগিয়ে দিলে সব নোংরামি দূর হয়ে যাবে। প্রবাসে থাকার কালে কলকাতার জন্য আমার মন কেঁদেছে। আবার ফিরে এসেছি কলকাতায় আমার সুইট হোমে। কিন্তু বেলজিয়মের সন্তান ফাদার ফাঁলো কয়েকটি বছর মাত্র কলকাতায় থেকেই কতই-না ভালোবেসে ফেললেন এই শহরটাকে, একটি কথিকায় সেই বিদেশীর মুখে সে কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মুখের কথা নয় শুধু, হৃদয়েরও কথা। কলকাতার বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যকে শ্রোতার সামনে তুলে ধরলেন বিভিন্ন বক্তা। এই মহানগরীকে সুস্থ দেহে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করলেন শ্রোতাকে।

রেডিয়োতে এক বিভাগ থেকে আর-এক বিভাগে বদলি হওয়াটা একটা অতি সাধারণ মামুলী ব্যাপার। মাঝে মাঝেই এরকম পরিবর্তন হয়ে থাকে। কিন্তু আমার আগে যিনি সংগীত বিভাগে ছিলেন তিনি খুব মনঃপীড়ায় ভুগলেন। কি কারণ থাকতে পারে ? এমন তো নয় যে রেলের মালবাবুর মতো আমাদের চাকরি, নজর থাকবে বিশেষ বিশেষ রেলস্টেশনের দিকে যেখানে বিপুল পরিমাণের পণ্যদ্রব্যের ওঠা-নামা হয়। বিভাগ পরিবর্তন রেডিয়োতে একটা নন-ইভেণ্ট। প্রত্যেক অফিসারকেই সব বিভাগে কাজ করার

তালিম দেওয়া থাকে। কিন্তু এই পরিবর্তনে আমার সেই সহকর্মী বলেই ফেললেন যে শিল্পীরা বিদ্রোহ করবেন। অথচ যেদিন সংগীত বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম সেদিনই শৈলজারঞ্জন মজুমদার নিজে এসে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। এলেন অসামান্য সুদর্শন সৌম্যমূর্তি এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। গায়ের রঙে ঘর আলো হয়ে গেল। আমি চিনতে পারি নি, দেখি নি এর আগে। নিজেই পরিচয় দিলেন সৌম্যেন ঠাকুর মশায়।

ভাবলাম শিল্পীবিদ্রোহ হবে কেন! সংগীত বিভাগে কে এল, কে বা চলে গেল সেখান থেকে তাতে শিল্পীর কি এসে যায়? আর কলকাতায় আগেও সংগীত বিভাগে আমি কাজ করে গিয়েছি। সবাই তো আমার পরিচিত। অনেকগুলি বছর দিল্লীতে কাজ করেছি। অসংখ্য শিল্পী গিয়েছেন রাজধানীতে নানা কাজে। তাঁদের সবাইকেই তো একটু ভালোবাসার চেষ্টা করেছি। শিল্পীরা অকারণ আমার প্রতি বিরূপ হবেন কেন? তবে একজন শিল্পীর কাছ থেকে একটু অসহযোগিতা পেলাম। স্টেশন ডিরেক্টর একটি কনসার্টের আয়োজন করতে নির্দেশ দিলেন। বেগম আখ্‌তার রাজী হয়েও আসতে পারলেন না। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে টেলিগ্রামে জানালেন লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের স্টেশন ডিরেক্টর। অনুষ্ঠানের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। অডিটরিয়মও বুক করা হয়েছে, আমন্ত্রণ-লিপিও সব ছাড়া হয়ে গেছে। এখন এই অনুষ্ঠান বাতিল করার উপায় নেই। কলকাতার এক মস্ত বড়ো শিল্পীর সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। বেগম আখ্‌তারের পরিবর্ত শিল্পী। কথাবার্তা ঠিক হল খোদ শিল্পীর সঙ্গে নয়। বড়ো ভাই শিল্পীর সেক্রেটারি, অনুষ্ঠান সম্পর্কে বড়ো ভাইই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলেন। তাঁর সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে চুক্তিপত্র পাঠিয়ে দিলাম। মাত্র দু দিন আগে তিনি জানালেন অনিবার্য কারণে শিল্পী আসতে পারবেন না। অন্য

কারুর প্রভাবে শিল্পীর অজ্ঞাতেই বড়ো ভাই এই সিদ্ধান্ত আমায় জানালেন এমন অনুমান করার কারণ আছে। তবে কলকাতায় ভালো শিল্পী আছেন অনেক। নির্ধারিত শিল্পীর পরিবর্তে গাইলেন মালবিকা কানন। খেয়াল গানে মালবিকা তখন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। সরোদ বাজালেন স্বনামধন্য রাধিকামোহন মৈত্র। সংগীত বিভাগে কাজ করতে গিয়ে আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেছি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি. জি. যোগ, গোপাল দাশগুপ্ত ছাড়াও অন্যান্য সব স্টাফ আর্টিস্ট সহকর্মীদের কাছ থেকে।

সংগীত বিভাগে দুটি প্রকাণ্ড সমস্যা। এক, শিল্পীর সংখ্যাধিক্য। দ্বিতীয়, উচ্চশ্রেণীভুক্ত শিল্পীর কণ্ঠের বার্ধক্য। শিল্পীর সংখ্যা তিন হাজারের উপর এবং প্রতিদিন আরো কয়েকজন অডিশন পাস করাতে সংখ্যাটা বেড়েই যাচ্ছে। কিন্তু ছাঁটাই-এর ব্যবস্থা নেই। ক্রমান্বয়ে খারাপ গাইলেও বাদ দেওয়া হল না কাউকেই, এমন-কি, অনুষ্ঠানের সংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া হল না সেই শিল্পীর। প্রত্যেকেরই দাবি ভালো সময়ে গাইবার। দুপুরে বা বিকেলের দিকে প্রোগ্রাম দেওয়া হলে শিল্পী অসন্তুষ্ট হন। দিন-রাত্রিতে সংগীতের জন্য একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করে রাখা আছে। সেটাকে অতিক্রম করে যাবার উপায় নেই। কিন্তু অডিশন হচ্ছে রোজই। পাস করবেন না কেউ এমন তো হতে পারে না। তা হলে নিত্য নূতন শিল্পী হিসেবে যাঁরা তালিকাভুক্ত হচ্ছেন তাঁদেরকে প্রোগ্রাম দেওয়া নিয়ে মহা সমস্যা। সমাধান কি হল না? নিশ্চয়ই হয়েছে। নীচের ধাপের শিল্পীরা মার খেতে শুরু করলেন। তাঁদের অনুষ্ঠান অনেক কমে গেল। রেডিয়োতে শিল্পীদের শ্রেণীবিন্যাস হল— টপ্, এ, বি-হাই, এবং বি। প্রথম তিন শ্রেণীর শিল্পীরা বছরে ক'টা প্রোগ্রাম পাবেন তার সংখ্যা ঠিক করা আছে। নূতন করে অডিশন দিয়ে বি-শ্রেণীভুক্ত কিছু সংখ্যক শিল্পী উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হলেন। সুতরাং উপরের তিন

শ্রেণীর শিল্পীদের বছরে নির্ধারিত সংখ্যার প্রোগ্রাম দিতে গেলে বি-শ্রেণীর শিল্পীরা মার খাবেন না? অথচ লক্ষ করে দেখেছি বি-শ্রেণীর বেশ কয়েকজন শিল্পী উচ্চশ্রেণীর শিল্পীদের অনেকের তুলনায় ভালো। শিল্পমানের বিচারে বি-শ্রেণীর সেই কয়েকজন ভালো শিল্পীর আরো একটু বেশি প্রোগ্রাম পাবার দাবিটা ন্যায্য। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানে এই ন্যায্য বিচারের অবকাশ কোথায়? এখানেই সংগীত বিভাগের সমস্যা। বি-শ্রেণীর শিল্পী অডিশন পাস করে উচ্চতর শ্রেণীতে নির্বাচিত না হলে বেশি প্রোগ্রাম পাবেন না। অনুষ্ঠান-রচয়িতার এখানেই বড়ো অসুবিধা। এতে আর্ট এবং আর্টিস্ট মার খাচ্ছে। বর্তমান অডিশন পদ্ধতিতে নূতন করে বি-শ্রেণীর শিল্পীর পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার আগে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। মস্ত লম্বা কিউ।

সংগীত বিভাগের দ্বিতীয় সমস্যা উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর নিচু মানের অনুষ্ঠান। আবহমান কাল থেকে উচ্চশ্রেণীতে রয়েছে একটা বিরাট সংখ্যা। কিন্তু অতীতের অসামান্য শিল্পী আজ স্থবিরতার কবলে। যমুনা উজান বয় না। বয়সের ধর্ম আছে। গাইবার শক্তি আজ কমেছে। ফিল্ম্ বা গ্রামোফোন কোম্পানি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু রেডিয়োতে শিল্পীদের সুপার-অ্যানুয়েশনের কোনো ব্যবস্থা নেই। উচ্চশ্রেণীতে থাকার সুবাদে আগের মতোই প্রোগ্রাম পেয়ে যাচ্ছেন। যোগ্য শিল্পীরা তার ফল ভোগ করছেন। একদা যাঁদের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে তাঁদের গান শোনা শ্রোতার কাছে এখন একটা বিড়ম্বনা। স্বাভাবিক কারণেই রেডিয়োতে সংগীতের মানও নেমে গেছে। রাজনীতি যাঁদের পেশা ভারতে তাঁরা অবসর গ্রহণ করেন না। শিল্পীরা সেটা অনুকরণ করবেন কেন? এই সমস্যার সমাধান কি করে হবে? হয়তো ধীরে ধীরে প্রোগ্রাম কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্তই রেডিয়োকে নিতে হবে। কিন্তু কাজটা সহজ হবে কি? ছাত্রছাত্রীরা

পিকেটিং করবে না ?

দশটা বাজতে দু-পাঁচ মিনিট বাকি। অফিসে আমার ঘরে এসে চেয়ারে মাত্র বসেছি এমন সময় একজন ঢুকলেন। মানুষটি মাথায় বেশ উঁচু, চুল-দাড়িতে অযত্ন সুস্পষ্ট। একটু নুয়ে-পড়া দেহ। পোশাক-আশাকেও অবহেলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে মানুষটির চেহারায়।

এগিয়ে এসে দুবার তুড়ি মারলেন এবং তার পর বললেন, 'ঐ-যে, কি জানি নামটা।'

এইটুকু বলেই বিড়িতে ঠোঁট লাগিয়ে টের পেলেন নিভে গেছে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে বিড়িতে আগুন দিলেন। মুখ থেকে দ্রব্যের খুশবু নির্গত হচ্ছে। খুব একটা বশে আছেন মনে হল না। তুড়ি মেরে কথা বলাতেই বিরক্ত হয়েছি একটু। কিন্তু তবু বসতে বললাম।

দাঁড়িয়ে থেকেই আবার বললেন, 'ঐ-যে, নামটা যেন কি, সকাল আটটায় গাইছিল মেয়েটা, নামটা এবং ঠিকানাটা শিগ্‌গির দিন।'

হেসে বললাম, 'আজই তো সকালে কিছুক্ষণ আগে গান শুনছিলেন শিল্পীর, এরই মধ্যেই নামটাই ভুলে গেলেন ? তবে অনুসন্ধান করে নামটা বলব, ঠিকানা বলব না। আর নামটার জন্যও একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'Don't you waste my time, I am a very busy man' বলে ঠিকানা না বলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কণ্ঠে একটু ক্রোধের ভাব।

জানালাম যে ঠিকানা দেবার নিয়ম নেই।

চোখ লাল করে আরো একটু এগিয়ে এসে বললেন মানুষটি, 'Do you know who I am ?'

এবার গম্ভীরভাবে গলার আওয়াজটা একটু কঠিন করে বললাম, ‘আমার অফিসে এসে নিজের পরিচয় দেবেন সেটাই তো সামাজিক ভব্যতা, সে কাজটাই করুন দয়া করে।’

ইতিমধ্যে পিওন প্রফুল্ল এসে দাঁড়িয়েছে লোকটির পেছনে। তেমন প্রয়োজন হলে দরজা দেখিয়ে দেবে। ওদিকে কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে আমার এক সহকর্মী বন্ধু ইঙ্গিতে জানাচ্ছেন লোকটিকে চলে যাবার আদেশ দিতে। সেটা করি কী ভাবে! সংগীত সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের কারবার। বেয়াদবি করলেও একজন ভিজিটরের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করব কী করে আমারই অফিসে! তাই আমি আবার পরিচয় জানতে চাইলাম এবং আবার বসতে অনুরোধ করলাম। একটু হকচকিয়ে গিয়ে মানুষটিও বিড়বিড় করে নিজের নামটি বললেন। তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম এবং জোর করেই চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চিনতে না পারার অপরাধ স্বীকার করলাম। এই ব্যক্তিটিকে চিনতে না পারাটা অপরাধই। কিন্তু কলকাতায় তো বেশিদিন কাজ করার সুযোগ পাই নি, বাইরে বাইরেই রইলাম।

প্রফুল্লকে কফি আনতে পাঠিয়ে বললাম, ‘আপনার মতো মানী গুণীজনের কাছে এই ব্যবহার কেন আশা করব? কেনই বা ভুলে যাবেন কত বড়ো মানুষ আপনি? বড়ো হওয়ার দায়িত্ব নেই?’

চুপ করে কফি পান করতে লাগলেন। এবার ঠিকানা না জানাবার কারণটা বললাম। অবাঞ্ছিত লোক আমাদের কাছে ঠিকানা সংগ্রহ করে শিল্পীকে উপদ্রব করতে পারে সেই আশঙ্কায় ঠিকানা আমরা দিই না। তবে ওঁর মতো লোককে ঠিকানা নিশ্চয়ই দেব। শিল্পীর নামে চিঠি এলে আমরা রি-ডাইরেক্ট করে দিই। কফি-পানের পর একটি বিড়ি ধরালেন। সিগারেট অফার করে-ছিলাম, নিলেন না।

উঠে এসে আমার হাত-দুটি নিজের হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'ক্ষমা করবেন, আমি একটা মাতাল। মনে থাকবে ঘাড় ধাক্কার পরিবর্তে কফি খেয়ে গেলাম', এই বলে চলে গেলেন।

নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম ঋত্বিক ঘটকের চলে যাওয়ার দিকে।

সরকার একবার চিন্তা করল যে প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ পদে প্রডিউসারদের শামিল করে দেবে। কিন্তু তার আগে একটা আলোচনায় বসতে হয়। সে উদ্দেশ্যে বেতার-মন্ত্রকের যুগ্মসচিব ওয়াই. এন. বর্মা এলেন কলকাতায়। প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ এবং প্রডিউসারদের একটা মিলিত সভা ডাকলেন। মিটিং-এ তিনি শুরু করলেন এই বলে যে প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা প্রডাকশনের কাজে অপটু।

সেক্রেটারি মশাইকে আর এগোতে দিলাম না, কারণ ওঁর মন্তব্যটাই মেনে নেওয়া যায় না। উঠে দাঁড়িয়ে অনুমতি নিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে তাঁর এই উক্তিটি তথ্যনির্ভর নয়। দাবি করলাম যে সমস্ত ভারতে এমন কোনো রেগুলার প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ থাকতে পারেন না যাঁরা একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তার সুষ্ঠু পরিচালনা, সম্পাদনা এবং প্রযোজনার ব্যাপারে ক্রিয়াসিদ্ধ নন। কারণ ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করেই ইউ. পি. এস. সি. তাঁদের মনোনীত করেছে। এবং নিয়োগের প্রথম দিনটি থেকেই এ কাজে শিক্ষানবীশি করে করে এঁরা পাকাপোক্ত হয়েছেন। সুতরাং সেক্রেটারি মহোদয়ের কথাটা এঁদের উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে বহুসংখ্যক নীচের ধাপের কর্মচারীকে নির্বিচারে এই পদে অ্যাড্-হক্ প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। কোনো বাছাই হয় নি। ডিপার্টমেণ্টাল প্রমোশন কমিটিও বসে নি। সেটা যদি না হয়ে থাকে তবে সরকার সে গাফিলতির

জন্য দায়ী। তেমন অ্যাড্-হক্ কোনো-এক প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ-এর কাজকর্মে ত্রুটি থাকলে তার জন্যও সরকার দায়ী। অযোগ্য সেই অফিসারকে উঁচু পদে থাকতে দেওয়াটাও অন্যায়। দীর্ঘদিন ডি. পি. সি. কেন বসে নি সে কথাও জানতে চাইলাম।

সেক্রেটারিমশায় সামান্য কোণঠাসা হয়েছেন দেখে আবার নিবেদন করলাম যে মধ্যষাটের আগে নিয়োগ করা প্রায় অধিকাংশ প্রডিউসারই স্বয়ং মন্ত্রীদ্বারা নিয়োজিত বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এক গোষ্ঠী। মধ্যাহ্নে বারোটার পর যে-কোনো এক সময়ে অফিসে আসার অধিকার আছে তাঁদের। কাজের হিসাবও কারো কাছে দেবার প্রয়োজন নেই। তেলেজলে যেমন মিশ খায় না তেমনি প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ পদেও তাঁরা মিশ খেয়ে যেতে পারবেন না।

এক প্রডিউসার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন যে নিজেদেরকে এত অবশ্যপ্রয়োজনীয় কেন মনে করি! তীব্র ব্যঙ্গ-মিশ্রিত প্রশ্ন। জবাবে জানলাম যে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি. জি. যোগ, গোপাল দাশগুপ্তের মতো গুণী প্রডিউসার পেয়ে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি। কিন্তু এঁরা কেউ বদলিতে যেতে রাজী হবেন পোর্টব্লেয়ারে? পাশিঘাটে? আইজলে? ইম্ফলে? কোহিমায়? যুদ্ধের সময় জাতীয় সংকটের দিনে অফিসে দিনের পর দিন রাত কাটাবেন কেউ? একটু থেমে আবার প্রশ্ন রাখলাম যে কোন্ প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভের এক্তিয়ার আছে দশটার পর অফিসে আসার বা পাঁচটার আগে বাড়ি ফিরে যাবার? হেডক্লার্ক অ্যাকাউন্টেন্ট-এরও বদলি হয়। কিন্তু প্রডিউসার বদলির আদেশ গ্রহণ করতে রাজী নন। একটি মাত্র কেন্দ্রে সারাটা জীবন মৌরুসীপাট্টা বজায় রেখে ফিলিং অব বিলংগিং আসে না। আর বাইরে প্রডিউসারদের বেশি রোজগার হওয়াতে রেডিয়োর প্রতি তাঁদের বিমাতার মতো আচরণ হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভরা রেডিয়ো-

পরিবারের লোক, আসমুদ্র হিমালয়, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বদলিতে যেতে বাধ্য। কাজেই প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভরা নিজেদের অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে করবেন না? আরো বললাম যে কলকাতা ছেড়ে অন্য কেন্দ্রের দিকে নজরটা ফেরালে দেখা যাবে যে অনেক প্রডিউসারই বার্ধক্যের দুয়ারে দাঁড়িয়ে। প্রোগ্রাম এগ্‌জি-কিউটিভে রূপান্তরিত হলে পরের দিনেই হয়তো সুপার-অ্যানুয়েশনের শিকার হবেন। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই এঁরা প্রোগ্রাম এগ্‌জি-কিউটিভ হতে রাজী হবেন না।

সেক্রেটারি মহোদয় কিছুই আর বললেন না। মিটিংও শেষ হয়ে গেল। পরদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর শ্রীমতী রজনী পানিকার আমায় ডেকে বললেন যে সেক্রেটারি মহোদয় মিটিং-এ আমার যুক্তিতে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন। আমার ধারণা ছিল তিনি হয়তো-বা বিরক্তই হয়েছিলেন।

একজন সংগীতশিল্পী যদি স্টেশন ডিরেক্টর হিসেবে আসেন তবে সংগীত বিভাগ উপকৃত হবে সন্দেহ কি? এমন একজন স্টেশন ডিরেক্টরকে আমরা পেলাম। তিনি দক্ষিণ ভারতের মানুষ। কিন্তু দক্ষিণী, হিন্দুস্থানী উভয় পদ্ধতির সংগীতকেই ভালোবাসেন। খুব কর্মঠ মানুষ পি. ভি. কৃষ্ণমূর্তি। নোট পাঠাবার পরিবর্তে নিজে এসেই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনায় বসে যান। নিজের ঘরে ঘন ঘন ডেকে পাঠান না। বড়ো অফিসারের গম্ভীর ভাব এবং দূরত্বটা বজায় রাখলেন না। তিনি আমার পূর্বপরিচিত। পাঁচটার পর প্রায় প্রতিদিনই ঘণ্টাখানেক আমার ঘরে কাটাতেন। এবং এই সময়ে অনেক জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতেন। আমার কাজটাও তাতে কিছুটা হালকা হত। সংগীত বিভাগের কাজটা খুবই পরিশ্রমের। ঝামেলা প্রায় লেগেই থাকে। আর কত শিল্পী আসছেন প্রতিদিন দেখা করতে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার জন্যও অনেকটা সময়

রাখতে হত। এ-সব অসুবিধার কথা জানতেন বলেই কৃষ্ণমূর্তির কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি যেটা সাধারণত পাওয়া যায় না।

মাঝে মাঝে সুন্দর আইডিয়া দিয়েছেন প্রোগ্রাম সম্পর্কে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্টুডিয়োতে গিয়ে রিহার্সাল এবং রেকর্ডিং-এর কাজ পরিদর্শন করতেন। যা-কিছু বলার হাসিমুখে বলতেন। হাসি-মুখে অনেক বেশি কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। দৃঢ়তাও দেখেছি। একবার রিহার্সালে দেরিতে আসার জন্য ভি. জি. যোগকে স্টুডিয়োতে রিহার্সালে অংশ গ্রহণ করতে দিলেন না। হাসিমুখেই বললেন, 'You are too early for tomorrow'। প্রোগ্রামের সম্পর্কে আমাদের লেখা একটি নোট দিল্লীতে কিছুটা কাটছাঁট করল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণমূর্তি লিখে জানালেন দিল্লীর কর্তাদের যে সংশোধন করতে গিয়ে ওঁরা ভুলের কবলে পড়লেন। আমাদের নোটই বিনা সংশোধনে ছেপে বের হল আকাশবাণী জ্যার্নলে।

কৃষ্ণমূর্তি সাহেব মস্ত বড়ো একটা প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করলেন। ভারতের দূর দূর অঞ্চলের গানের রেকর্ডিং চেয়ে আনালেন বিভিন্ন রেডিয়ো স্টেশন থেকে। শুনলেন বসে দু-তিন মাস সে-সব গান। সুরের নোটেশন করলেন। সেই ভৌগোলিক অঞ্চল এবং মানুষদের ইতিহাস পড়ে নিয়ে এখানকার কয়েকজন গীতিকারের কাছে ব্যাখ্যা করলেন। গীতিকাররা সেই অনুযায়ী গান লিখলেন। শ্রীমান অলক দের সহায়তায় নিজের সুর-করা সেই গানগুলি তুলে দিলেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কণ্ঠে। নাম দিলেন 'গীতভারতী'। কৃষ্ণ-মূর্তির ইচ্ছা হল কলকাতার বিশিষ্ট সংগীতরসিকদের এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি শোনাবার। আমন্ত্রিত শ্রোতাদের শোনানো হবে এক বিকেল পাঁচটায়। কথা ছিল গ্রন্থনা ইংরেজিতেই হবে। হঠাৎ চারটে নাগাদ আমায় এসে বললেন যে বাংলায হলেই ভালো। প্রায় বিশ মিনিটের ইংরেজি স্ক্রিপ্টের অনুবাদের সময় পাওয়া গেল

মাত্র একঘন্টা। তা সেই সময়টুকুর মধ্যেই অনবদ্য ভাষান্তর করে দিলেন কবিতা সিংহ। শ্রোতারা খুব সুখ্যাতি করলেন কৃষ্ণমূর্তির প্রোগ্রামের। আর আমি সাধুবাদ জানালাম কবিতা সিংহকে অল্প সময়ে ভালো অনুবাদের জন্য। কৃষ্ণমূর্তি সাহেবের এই অনুষ্ঠান পরে ন্যাশনল্ প্রোগ্রাম অব মিউজিক রূপে প্রচারিত হল।

হঠাৎ কাজ বেড়ে গেল। আকাশবাণী নামে সাপ্তাহিক প্রোগ্রামের ইংরেজি পত্রিকা দিল্লী থেকে ছেপে বের হয়। আগে নাম ছিল দি ইণ্ডিয়ান লিসনার। ভারতের সব স্টেশনের অনুষ্ঠান এই পত্রিকায় ছেপে বের হলেও এই পত্রিকার চাহিদা একেবারেই নেই। পত্রিকাটির আকর্ষণ বাড়াবার জন্য ভালো ভালো শিল্পীদের বিষয়ে এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পর্কে পাবলিসিটি নোট লিখে পাঠাতে বললেন দিল্লীর কর্তৃপক্ষ। সব স্টেশনের অনুষ্ঠানসূচীতে ভারাক্রান্ত যে পত্রিকার শরীরটি তাকে শুধু পাবলিসিটি নোটের আভরণে সাজিয়ে সুন্দর করা যায় না। সেটা বুঝলেন না কর্তারা। নোট লেখার কাজটায় খুব আনন্দ পেলাম। কিন্তু শিল্পীদের গান আরো একটু বেশি শোনার দরকার, কোনো কোনো বিষয়ে একটু পড়াশুনারও প্রয়োজন। আগের কাজ তো যা ছিল তাই আছে। যোগ হল নোট লেখার কাজ। দিনের কাজের শেষে বাড়ি ফিরতে রাত নটা বেজে যেত। একটু ক্লান্তিও বোধ করতাম। এক বন্ধুর পরামর্শে আমার স্ত্রী একটি উত্তম দ্রব্যের বড়ো বোতল কিনে আনালেন। শোবার আগে কয়েক ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে সেব্য। রাত্রে আহারের পর রেডিয়োতে গান শুনতে শুনতে নিদ্রা এসে যায়। দ্রব্যাধারের ছিপি আর খোলা হয় না। এই করে অনেক দিন পার হয়ে গেল। একদিন স্ত্রী বললেন যে শুধু শুধু জিনিসটা ঘরে থেকে নষ্ট হয়ে গেল। এতদিনে আর কি খারাপ না হয়ে যায়। তাই ফেলে দিয়েছেন। বন্ধুটি শুনে বললেন 'আওয়া', আহাম্মকের

সমতটে প্রচলিত অপভ্রংশ।

রেডিয়োর স্টাফ আর্টিস্ট যন্ত্রীরাও শিল্পী হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণী-ভুক্ত। বাইরের শিল্পীদের মতোই— টপ্, এ, বি-হাই, এবং বি। আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে যে গৌর গোস্বামী সকলের নীচের ধাপে। সিনিয়র মিউজিক কম্পোজারের রুটিন কাজ করেও নিজে বেশ ভালো বাঁশি বাজাচ্ছেন। শ্যামল বোস তবলিয়ারূপে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সর্বভারতে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু পড়ে রয়েছেন বি-হাই শ্রেণীতে। উস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর মতো তবলার শিল্পী সমগ্র দেশেই বিরল। ভি. জি. যোগ ভারতের প্রথম সারির শিল্পী। এঁরা দুজনেই আছেন 'এ' শ্রেণীতে। মনে হল স্টাফে আছেন বলেই বোধ হয় এঁদের কথা কর্তৃপক্ষ ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু নিজ নিজ শিল্পমান অনুযায়ী উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া উচিত।

মনস্থির করলাম দিল্লীতে সুপারিশ পাঠাব। কিন্তু তা আর করতে হল না। একই সঙ্গে কলকাতায় এলেন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পি. সি. চ্যাটার্জি এবং চীফ্ এড্ভাইসার অব মিউজক কে. সি. ডি. বৃহস্পতি। পদবীটা যেমন দেবগুরুর পাণ্ডিত্যও বিরাট। আবার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সীমাহীন বিপুল। চাকরিটাও মস্ত বড়ো। চীফ্ প্রডিউসারের চেয়েও অনেক বেশি মাইনে। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত এবং সংগীতেও গভীর জ্ঞান। মানুষটি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। কলকাতার সংগীতবিভাগের কাজকর্ম আলোচনার জন্য ভদ্রলোক আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। বড়ো এক শিল্পপতির গেস্ট-হাউসে তিনি উঠেছেন। বৃহস্পতিজির ধরমপত্নী সুলোচনা যজুর্বেদীর সঙ্গেও পরিচয় হল সেখানে। বিদুষী মহিলা, সংগীতের শিক্ষালাভ বৃহস্পতিজির কাছেই। আবার দিল্লীর এক কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা করেন। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে প্রসঙ্গত গৌর গোস্বামী, শ্যামল বোস, ভি. জি. যোগ, উস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর

বিষয়টাও উত্থাপন করলাম। এই শিল্পীদের বিচারে আমার মূল্যায়নটা গ্রহণ করলেন বৃহস্পতিজি। পরের দিন অফিসে ডি. ডি. জি.-র সঙ্গে আলোচনা করলাম বৃহস্পতিজির উপস্থিতিতে। ডি. ডি. জি অনুমোদন করলেন। সহজেই ব্যাপারটা হয়ে গেল।

বৃহস্পতিজির বলিষ্ঠ মতামত আছে দেখেছি বার বার। এবং সেটা নিজের বিচার-বিশ্লেষণ শক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই মতামতটা নির্ভীক এবং সংগীতের বিচারে ওঁকে প্রভাবান্বিতও করা যায় না। আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক কর্তা ব্যক্তি এক মহিলা শিল্পীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। কিন্তু সেটা জানা সত্ত্বেও বৃহস্পতিজি সেই শিল্পীর 'এ' শ্রেণী থেকে টপ্-শ্রেণীতে উন্নয়নের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন না। ঘটনাটা দিল্লীতে সংগীতমহলে অজানা নয়। আর-এক মহিলা প্রডিউসার টপ্ শ্রেণীতে উঠবার আবেদন পেশ করে ভাবলেন যে সহজেই হয়ে যাবে। কিন্তু সাফ্ না করে দিলেন বৃহস্পতিজি। সেই প্রডিউসার ক্রুদ্ধ হয়ে বৃহস্পতিজির ঘরে গিয়ে গাল দিয়ে গোষ্ঠী উদ্ধার করে দিলেন। বাইরের কয়েকজন লোকও ছিলেন ঘরে। বৃহস্পতিজির সংক্ষিপ্ত জবাব, 'ম্যয় কুছ নহী কহুঁগা, আপ নারী হ্যায়।' সেই প্রডিউসারের বিরুদ্ধে কোনো নোট লিখেও পাঠালেন না ডি. জি-র কাছে, কারণ সেই প্রডিউসার একজন নারী। নারী অবধ্য। বৃহস্পতিজি সব সময় হিন্দিতেই কথা বলতেন। অ-হিন্দি একটি শব্দও উচ্চারণ করতেন না। সংস্কৃতে কথা বলতে রাজী ছিলেন। কিন্তু বোঝবার লোক পাওয়া যাবে তবে তো বলবেন! এরকম মানুষের খুব একটা সুবিধা হয় রেডিয়োতে তা তো নয়। অনেকেই অখুশি ছিলেন ওঁর উপর, উনিও ছিলেন অনেকের উপর।

কলকাতার বাইরে এক ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে সরস্বতী পূজার উৎসব। অনেকদিন আগেরই কথা, ১৯৩৮-এর ফেব্রুআরির।

কলকাতা থেকে কণ্ঠশিল্পী আনালাম অনাথনাথ বোসকে। তিনি বিখ্যাত তবলিয়া শ্যামল বোস, গোবিন্দ বোসের পিতৃদেব। তিনি প্রথমে পুরুষ কণ্ঠে খেয়াল এবং পরে বামাকণ্ঠে ঠুংরি গাইলেন। অনাথবাবুর সঙ্গে আর-একজনও এলেন। তিনি অনাথবাবুর সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজালেন। কিন্তু আমরা কোন্‌টা শুনব! গান শুনব না হারমোনিয়ম? হারমোনিয়ম এমন কথা বলে— আগে তো শুনি নি! কণ্ঠশিল্পীর গলার প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে তো বাজালেনই, পর্দার উপর কোমল আঙুলের ছোঁয়ায় স্বরের আবেশও সৃষ্টি করলেন। কিন্তু আমরা এই শিল্পীকে দক্ষিণা দিয়ে আনাই নি। অনাথবাবু বুদ্ধিমান লোক। হারমোনিয়মের প্রতি অধিকতর আগ্রহ লক্ষ করে তিনি শ্রোতাদের সোলো হারমোনিয়ম বাজনা শুনতে অনুরোধ করলেন। তিনি নিজে নিলেন তবলা-বাঁয়া। একটি খেয়াল কম্পোজিশন বাজাবার পর হারমোনিয়মশিল্পী ঠুংরি পরিবেশন করলেন। কী অপূর্ব সংগীত! কী মৃদু, মোলায়েম করস্পর্শ, কী নৈপুণ্য, কী গভীর অনুভব! জীবনে তো কত গানই শুনেছি, কিন্তু ঠুংরির এমন আস্বাদ বেশি পাই নি। গান-বাজনার শেষে অনাথবাবু শিল্পীর নাম বললেন মুনেশ্বর দয়াল। বর্তমান কালের অনেক সুখ্যাত হারমোনিয়ম বাদকেরই গুরু।

অসাধারণ এই শিল্পী তিনদিন রইলেন হোস্টেলে আমারই কামরায়। তিনি কত যে বাজালেন আর সেইসঙ্গে সংগীত বিষয়েও বললেন কত কিছু। ঠুংরির 'ভাও' 'বোল' বানাবার কৌশলের কথা তিনি বোঝালেন। মনোনিবেশের অভাবে অনেক সময় গান নষ্ট হয় সে কথাও বললেন। গানের বাণীতে যেখানে রয়েছে প্রিয়াকে কাছে আসার আবাহন, শিল্পী নোটের কম্‌বিনেশনে যা করলেন তাতে ঠিক বিপরীত ভাবটাই প্রকাশ পেল। অর্থাৎ গানের বাণী এবং স্বরের বা শ্রুতিসমূহের গুণগত নান্দনিক রস যদি সুসমঞ্জসরূপে

মিলিত না হয় তবে গান হয় না। এই সত্যটাই বহুদিন পর আবার ভালো করে উপলব্ধি করলাম অসাধারণ তুই সুরকারের সঙ্গলাভে।

সলিল চৌধুরী এবং তাঁর শিল্পী স্ত্রী সবিতা চৌধুরী একদিন এলেন অফিসে। সবিতা আমার পূর্বপরিচিতা। যখন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিয়ের আগে তখন একস্‌ট্যারনল্ সার্ভিসে প্রোগ্রামের জন্য সবিতাকে বোম্বাই থেকে আনিয়েছিলাম। সুরকার সলিলবাবুর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। অফিসের কথাবার্তার শেষে বললাম যে এতবড়ো সুরকারের সঙ্গে একটা দিন যদি কাটাতে পারতাম কতই আনন্দ হত, তাঁর সাধনার জগৎটাকেও হয়তো একটু উঁকি দিয়ে দেখতে পেতাম। আমার কথার আন্তরিকতা শিল্পীমনকে হয়তো ছুঁয়ে গেল। তুজনেই রাজী হয়ে গেলেন। আমারই গৃহে একান্তে বসে শোনবার সৌভাগ্য হল সুরকারের নিজের সুর-দেওয়া গান সবিতার কণ্ঠে। সবিতা নিজেও খুব ভালো শিল্পী। গাইলেনও পর পর প্রায় পনেরোটি বাংলা গান। তন্ময় হয়ে শুনলাম। সবিতার গান থামলে ভয়ে ভয়ে বললাম যে সুরকারের নিজের কণ্ঠে যদি শোনা যেত একটি-তুটি গান তবে সেটা হত জীবনের একটা পরম সৌভাগ্য।

একটু ইতস্তত করে সলিল চৌধুরী হারমোনিয়মটি টেনে নিলেন। গাইলেন চার-পাঁচখানা গান। না, গলা অনুশীলিত নয়, গাইবার গলাও নয়। সূক্ষ্ম কারুকার্য সুস্পষ্ট স্ফুরিত হচ্ছে না কণ্ঠে। কিন্তু তুরূহ কম্‌বিনেশনের ইঙ্গিত পাচ্ছি। স্বর-সংঘাতের চিহ্ন, উচ্চারণ-ভঙ্গিতে বিশেষ অভিব্যক্তিসূচক বর্ণ, distinctive toucb, ধ্বনির ঝোঁক সেই গানে উদ্‌ভাসিত। হৃদয়ংগম করলাম কথার সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য, যা গানকে প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ করে। গান থামিয়ে সলিল-বাবু বললেন যে বোম্বাইয়ের বাড়িতে একটা দামী পিয়ানো ছিল। বলেই একটু আন্‌মনা হয়ে গেলেন। কোনো কিছু স্মরণে এসে গেল

হয়তো। কয়েক সেকেণ্ড পরই আবার বলতে শুরু করলেন। জানালেন যে যখনই সময় পেয়েছেন তিনি বাজিয়েছেন পিয়ানো। হঠাৎ কোনো শ্রুতিজোট ভালো লেগে গেলে তৎক্ষণাৎ নোট করে রেখেছেন খাতায়। দেশী-বিদেশী সংগীতের অসংখ্য রেকর্ড / টেপ্ বাড়িতে। শুনছেন অবিরাম। সমস্ত অস্তিত্বটাই সংগীতময়। এ যেন সংগীতে চিন্তা, সংগীতে ভাব-বিনিময়, সংগীতে স্বপ্ন দেখা। এমন পরিবেশ না হলে এমন মর্মস্পর্শী সুর-সৃষ্টিও সম্ভব নয়।

সহজাত শক্তি নিয়েই সলিল চৌধুরীর উদয়। কিন্তু সে শক্তি-বিকাশের অনুকূল পরিবেশ এবং সনিষ্ঠ সাধনাও যে চাই। সারাটি দিনই এই অসামান্য সুরকারের সঙ্গে কাটালাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে যে সুরকারকে জানতে হবে ভারতীয় সংগীতের ধারাকে, জানতে হবে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত এবং লোকসংগীত, শুনতে-বুঝতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন সংগীতের ধারাকে। আবার সেইসঙ্গে লিরিকের মুড এবং অন্তর্নিহিত ভাবটিকেও অনুধাবন করতে হবে সুরকারকে। প্রতিটি কথা চোখের সামনে যে ছবি তুলে ধরে তাকেও অনুধ্যান করে তার পর সেই কথাতে সুর বসিয়ে দিতে হবে। কথার সঙ্গে সুরের না যদি হয় রাজযোটক তা হলে তো গানের প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে না। সমস্ত প্রয়াসটাই ব্যর্থ হবে। সলিলবাবু নিজেও সৎ গীতিকার। লিরিক যদি গীতধর্মী না হয় তা হলে চলবে না। সুরকার হিসেবে এ বিষয়ে কোনো কম্প্র্যামাইজ তিনি গ্রহণ করবেন না। দিনান্তে শিল্পী-দম্পতি বিদায় নিলেন। সলিল-সবিতা জীবনের একটি স্মরণীয় দিন আমায় উপহার দিয়ে গেলেন।

এক রবিবারে রবীন্দ্র জৈনকে নিয়ে এলেন জয়শ্রী গুপ্ত এবং শিপ্রা বোস। স্বাস্থ্যবান তরুণ। আহা! দৃষ্টিশক্তি ঈষৎ ক্ষীণ। কিন্তু সুরে যাঁর মন ভরে আছে প্রকৃতির সামান্য নিষ্ঠুরতা তাঁর মন থেকে

আনন্দ কি করে কেড়ে নেবে? মানুষটিকে বড়ো ভালো লেগে গেল। সুর এবং অনুভবের আধিক্য হৃদয়ের দুই কুল ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। কথা বলার সময় নেই, চা-পান করার সময় নেই। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না হয়। তাড়াতাড়ি শিপ্রাকে বললেন গান ধরতে। অনুশীলিত পরিশীলিত কণ্ঠে শিপ্রা রবীন্দ্র জৈন-এর সুর-করা তিনখানা কি চারখানা বাংলা গান গাইলেন। গানের এমন রমণীয় সুরের মাধুরী তো বেশি শোনা যায় না। জয়শ্রী গুপ্ত, অলক, কমল গাঙ্গুলির বোন, বাল্য এবং কৈশোর কাটিয়েছেন আলিগড়ে। হিন্দি, উর্দু উচ্চারণ ত্রুটিহীন। জয়শ্রীর আপন কাকা যামিনী গাঙ্গুলি। সংগীতের একটা ঐতিহ্যের মধ্যেই জয়শ্রীর জন্ম। জয়শ্রীও শোনালেন চার-পাঁচখানা গান রবীন্দ্র জৈনেরই সুরে। বাংলা আধুনিক এবং ভজন। তার পর সুরকার নিজেই গাইতে শুরু করলেন। গাইলেন বাংলা আধুনিক, গীত, ভজন। মোলায়েম ভাবটি কম থাকলেও গলায় আছে স্বচ্ছন্দ গতি, দূরপাল্লার বিন্যাস এবং অজস্র সূক্ষ্ম কাজ। সুরকারের নিজের গান শুনেও কম বিস্মিত হলাম না। সব চেয়ে বেশি অবাক হলাম রচনার মুনশীয়ানায়। কি বাংলা গানে, কি ভজনে, গীতে যে-কথাটিতে যে সুরটি প্রয়োগ হলে ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ হয় ঠিক তাই যেন পেলাম। কথা এবং সুরের সুষম সংহতি। ফলে গানের একটা সুশোভন অবয়ব পরিস্ফুট হল।

গান শুনে হৃদয়ও ভরে গেল। জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না বাংলা গানের অর্থ এবং ভাব এত ভালো কি করে বুঝতে পারেন। পাশে-বসা মানুষটিকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্র জৈন বললেন এই ভবেশ গুপ্ত ওঁর অনেক গানের গীতিকার। গীতিকারকে সঙ্গে না নিয়ে কখনো সুর রচনা করতে বসেন না। লিরিকের মূল ভাব এবং প্রতিটি কথার অর্থ সম্যক্ বুঝে না নিতে পারলে সুর দেবেন কী করে? অবাঙালি এক সুরকার দ্বারা বাংলা গানের এমন সুঠাম

স্বরাবয়ব রচনা খুব বেশি তো শুনি নি। কিন্তু কই, এই সুরকারের কোনো গান তো গ্রামোফোন কোম্পানিগুলি গ্রহণ করে নি কলকাতায়। ফিলমের কোনো প্রযোজকও এই গুণী সুরকারকে ডাকেন নি। বোম্বাই-এর চিত্রজগতে এই সুরকার যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখনই বাংলার শিল্পীরা ছুটলেন ওঁর একটু অনুগ্রহ-লাভের আশায়। অথচ এই কিছুদিন মাত্র আগে রবীন্দ্র জৈন দু বছর কলকাতায় অনাদৃত অবজ্ঞাত হয়েই ছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে যে যখন অতি নিকৃষ্ট সুরকার এবং গীতিকার মিলে বাংলা গানের টুঁটি চেপে ধরেছিল সেই সময় কলকাতার শিল্পীরা পরশমণি চিনতে পারলেন না যার ছোঁয়ায় সোনা হওয়া যায়। বাংলা গানের অকাল মৃত্যুই দেখে গেলাম।

বিরাট দেশ আমার। সারা দেশে ছড়িয়ে আছে অনেকগুলি বেতার-কেন্দ্র। এবার যে আবার কলকাতা ছেড়ে যাবার পালা। চলা থেমে গেলে তো হবে না! কলকাতার কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা আমার আবার শুরু। এবার পূর্বঘাটের পশ্চিম প্রান্তে— across the Eastern Ghats।

৮

নাম জয়পুর। রাজাও আছেন। ভারতের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষের উপর বংশপরম্পরা রাজত্ব করে এসেছেন যে পাঁচশো পঁয়ষট্টিজন মহারাজা, নবাব এবং রাজা তাঁদেরই একজন রয়েছেন এখানে। রাজা থাকলে প্রাসাদও থাকে। তবে নশো-তিপান্ন জানলার হাওয়ামহল নেই এখানে, রাজস্থানের সেই অভিজাত জয়পুরও নয় এটা। ইংরেজি বানান Jeypore। উড়িষ্যা রাজ্যের কোরাপুট জেলার এক মহকুমা শহর। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিলম্বিত পূর্বঘাট পাহাড়ের সারি ক্রমে পশ্চিমে ঢালু হয়ে এসে সমতলে যেখানে মিশেছে সেখানে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়পুব। ব্রিটিশ-অনুগৃহীত এই স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী পাহাড়ের উপর না হয়ে নীচে কেন হল সে কারণ বুঝতে পারি নি। জয়পুরের পাশেই, মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর কোরাপুট শহরটি ছবির মতো সুন্দর। উচ্চতা তিন হাজার ফুট। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। পরিচ্ছন্ন ছিমছাম শহর কোরাপুট এই নামের জেলার সদর। কোরাপুট একটা বিউটি-স্পট। তুলনায় জয়পুর শ্রীহীন, ধূলিমলিন।

আদিবাসী, গিরিজনদের রাজা এই জয়পুর-রাজ। প্রাচীন এই রাজ-পরিবার সূর্যবংশীয় বলে দাবি করে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজা বীরবিক্রম দেও জয়পুর শহরের পত্তন করে রাজধানী এখানে নিয়ে আসেন নন্দীপুর নামে স্থান থেকে। রাজা, রাজ-পরিবার এবং রাজকর্মচারীদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ছোটো ছোটো

ব্যাবসা-বাণিজ্য। এল ভিড় করে ভাগ্যান্বেষী মানুষ দূর দেশ থেকে। এইভাবে একটি সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হল জয়পুর। রাজাদের রমরমাও কম ছিল না। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন অফিসার পর পর ম্যানেজার পদে কাজ করে গেছেন। একজন তো ছিলেন খাস ইংরেজ। পুরনো শহর জয়পুরের ঐতিহ্যের তুলনায় কোরাপুট অর্বাচীন। ইংরেজরা প্রথমে এখানে এসে একটু ঠাণ্ডা পরিবেশের সন্ধান করল। পাহাড়ের উপর কোরাপুট নামে গ্রামটিকে পছন্দ হয়ে গেল। খোলা আকাশ, নির্মল হাওয়া, দৃষ্টি চলে যায় সুদূর দিগন্তে। গরমও নেই প্রায়। এমন জায়গা পছন্দ না হয়ে যায় ইংরেজের! তাই জেলার সদর এখানেই করা হল ১৮৭০ সনে। ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিস সুপারের দপ্তর কোরাপুটে। কিন্তু জেলাজজের আদালত জয়পুরে। কোরাপুট লোকালয় থেকে দূরে। জয়পুরকে ঘিরে চারি দিকে আছে আদিবাসী গ্রাম। আর রেডিয়ো স্টেশন আদিবাসীদেরই জন্য। তাই জয়পুরেই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হল। আর-একটা কারণও বোধ হয় ছিল। স্থানীয় অ্যাড্‌ভোকেট জগন্নাথ রাও কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী হবার পর জয়পুরে রেডিয়ো স্টেশন স্থাপনের চেষ্টা করবেন সেটা তো স্বাভাবিক। সেই চেষ্টাই ফলবতী হয়েছিল বলে শুনেছি।

কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথ সরল সোজা নয়। সব চেয়ে কাছের রেলস্টেশন ভিজিয়ানাগ্রাম ১০৬ মাইল দূর। ভুল বললাম। জয়পুরেই রেলস্টেশন আছে। স্টেশনমাস্টার আছে, অন্যান্য কর্মচারী এবং তাদের সরকারি বাসগৃহও আছে। কিন্তু সে ট্রেনে মানুষ চলে না। ট্রেনের যাত্রী আকরিক লোহা। মধ্যপ্রদেশের বাইলাডিলা খনি থেকে ট্রেনে চেপে বিশাখাপটনম্ এবং সেখান থেকে জাহাজে জাপান। মানুষযাত্রীর সে ট্রেন চড়ার সৌভাগ্য হয় নি এখনো। অন্ধ্র রাজ্যের ভিজিয়ানাগ্রাম রেলস্টেশন থেকে ১০৬ মাইল সরকারি

বাসে। ট্রেন থেকে নেমে বাসের টিকিট পাওয়া যাবে তেমন নিশ্চয়তা নেই। আমি বসবার জায়গা পেয়ে গেলেও পাশে দাঁড়ানো দুর্ভাগা সহযাত্রীটি যে আমার মাথার উপর বমি করে দেবে না সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। প্রথম পঁয়ত্রিশ মাইল সমতল রাস্তা পার হলেই বাকিটা পাহাড়ের উপর আঁকাবাঁকা পথ। বাস-ভ্রমণে অনভ্যস্ত দাঁড়িয়ে থাকা সহযাত্রীটির গা গুলোবে, বমি হবে এবং মাথার উপর সে কাজটা করলেও তার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া অসম্ভব। কারণ পাহাড়ের উপর সর্পিল রাস্তায় অনেকেই বিবমিষার শিকার হয়।

সাত ঘণ্টার দুঃসহ বাসে চলার পর জয়পুরে পৌঁছলাম রাত ন'টায়। স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ, হেডক্লার্ক সবাই এসে পরিচয় দিলেন। নমস্কার বিনিময় করে বললাম যে শীতের এই পাহাড়ী মফস্বল শহরে রাত ন'টা তো বেশ রাত। কষ্ট করে সবার আসার কি দরকার ছিল। জায়গাটা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে একজন যে-কেউ এলেই হত। স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার ভাটিয়া সাহেব কানে কানে বললেন যে এখানে এটাই রেওয়াজ। কিন্তু আমাকে যে 'লজে' এনে ওঠালেন সেখানে যে একটি রাতও কাটানো মুশকিল। রাজা-সাহেবের গেস্ট হাউসে জায়গা পাওয়া গেল। পরদিন ১৯৫৭-এর ২রা নভেম্বর স্টেশনের ভার গ্রহণ করলাম।

জয়পুরের রাজার কাছারিবাড়ির একটা বড়ো অংশ ভাড়া নিয়ে রেডিয়োর অফিস করা হয়েছে। বেশ বড়ো বাড়ি। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। অফিস ছুটির পর ব্যাডমিন্টন এবং ভলিবল খেলার কোর্ট রয়েছে। কথা বলে দেখলাম স্টাফের লোক বড়ো একটা অখুশি নয় এখানে। সস্তা-গণ্ডার জায়গা, তার উপর একটা অ্যালাউন্স আছে।

এখানে আসার দু-তিন দিনের মধ্যেই কটক কেন্দ্রের স্টেশন ডিরেক্টর স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকার কাটিং পাঠিয়ে দিলেন। পড়ে দেখলাম যে উড়িষ্যার কোনো-এক রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জয়পুর রেডিয়োর সামনে পিকেটিং করবে কয়েকদিন পরেই। বেশ দুশ্চিন্তা হল। কারণ কয়েক মাস আগেই কটক স্টেশনে এমন একটি কাণ্ড ঘটে গিয়েছে যার ফলে সারাদিনের জন্য কটক কেন্দ্রের প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। অফিস এবং স্টুডিয়োর সামনে পিকেটিং করে কাউকে ঢুকতে দেয় নি। কয়েক মাইল দূরে ট্র্যান্‌স্‌মিটারের সামনেও পিকেটিং করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্টুডিয়ো আর ট্র্যান্‌স্‌মিটারের মধ্যে টেলিফোনের যোগাযোগও নষ্ট করে দেয়। এদিকে জেলার কর্তৃপক্ষ স্টেশন ডিরেক্টরের উপর এক নোটিশ জারি করে আইন ও শৃঙ্খলার স্বার্থে রেডিয়োর প্রচার বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেয়। এমন একটি ঘটনা ভারতে রেডিয়োর ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর ঘটে নি। উড়িষ্যায় কংগ্রেস-বিরোধী দলের হাতে তখন রাজ্যের শাসনভার। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার। এই রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল 'উড়িষ্যা বন্ধ'-এর ডাক দেয়। কটকের বেতার-কেন্দ্র সেই 'বন্ধ'-এর শিকার হল।

কটকের স্টেশন ডিরেক্টরের চিঠি পেয়ে আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হল। পিকেটিং যদি হয় তবে অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা স্টেশন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নিলাম। স্টুডিয়ো এবং ট্র্যান্‌স্‌মিটারে আগে থেকেই লোক রাখা হবে। জয়পুরে স্টুডিয়ো এবং ট্র্যান্‌স্‌মিটার একই বাড়িতে থাকার জন্য কিছুটা সুবিধা হল। স্টেশন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে আমি নিজেও ট্র্যান্‌স্‌মিটারে থাকব ঠিক করলাম। সাবডিভিশন্যাল অফিসার এবং পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছেও চিঠি দিলাম উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ঠিক করে নিয়ে

কোরাপুটে গেলাম ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে।

বাঙালি ডেপুটি কমিশনার, নাম সুবোধকুমার বসু। হয়তো বাঙালি দেখেই কিছুটা ভরসা হল। পেপার কাটিং দেখালাম এবং স্টুডিয়ো ও ট্র্যান্স্‌মিটারে সিকিউরিটি ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানালাম। ভদ্রলোক একটু হালকা ভাবেই বললেন যে পিকেটিং হলে তো ভালোই, দুয়েকটা দিন কাজ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আমিও হেসে জবাব দিলাম যে একবার রেডিয়ো স্টেশন খোলা হয়ে গেলে অনন্তকাল রেডিয়ো চালু থাকবে। ঝড়ে জলে বন্ধ হবে না, কোনো ছুটির দিন নেই, এমন-কি, পিকেটিং হলেও বন্ধ হবে না। একটু গম্ভীর হয়ে ডেপুটি কমিশনার জানতে চাইলেন যে জোর পিকেটিং হলে আমরা কি করে স্টুডিয়োতে যাব। জানালাম যে প্রোগ্রাম চালাবার মতো স্টাফ সব সময় স্টুডিয়োতে থাকে, পরের শিফ্‌টের কর্মীরা না পৌঁছলে যাঁরা রয়েছেন তাঁরাই চালিয়ে যাবেন। রেডিয়ো বন্ধ হতে পারে না বলেই এই সতর্কতা। একটু থেমে সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে পিকেটিং যাতে না হতে পারে সেটাই তো জেলাশাসককে দেখতে হবে। তিনি বললেন যে হাঙ্গামার ভয় থাকলে কর্তৃপক্ষ রেডিয়ো বন্ধ রাখতে বলতে পারে। আমি হেসে বললাম যে না, পারে না। এমন নির্দেশ দেবার অধিকার থাকতে পারে না স্থানীয় শাসকের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে সকল জনের কল্যাণের এবং সুখের জন্য রেডিয়ো প্রচার চলছে। যতক্ষণ-না সে প্রচার অপপ্রচারে পরিণত হচ্ছে ততক্ষণ সে প্রচার বন্ধ করার অধিকার নেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের। বরঞ্চ সে প্রচার অব্যাহত রাখতে সর্ব প্রকার ব্যবস্থা এবং সহযোগিতার দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর। রেডিয়ো তো সরকারেরই একটি প্রতিষ্ঠান। আরো বললাম, জাতিটা যে বেঁচে আছে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে রেডিয়ো থেকে। সে রেডিয়োকে কি করে বন্ধ

রাখতে বলবে স্থানীয় প্রশাসন? এবার একটু হেসে খুব আস্তে আস্তে বললাম যে আমার উপর যদি রেডিয়ো বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেয় প্রশাসন তবে তৎক্ষণাৎ চীফ সেক্রেটারির কাছে টেলিগ্রামে এর প্রতিকার চাইব এবং তাতেও যদি কিছু না হয় তবে দেশের সব চেয়ে বড়ো কাউন্সেলকে নিযুক্ত করে উচ্চ আদালতে আবেদন করব।

এই আলোচনায় কোনো তিক্ততা ছিল না। ঘরোয়া পরিবেশে হালকা ভাবেই আমাদের কথাবার্তা চলছিল। আমি জানালাম যে কটকের ব্যাপারের পর কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ এসেছে আমার কাছে। ডেপুটি কমিশনার হেসে বললেন এতটা কিছুই হয়তো করতে হবে না। এই জেলায় কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নেই। তিনি আশ্বাস দিলেন যে সবরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই করা হবে। ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে রেডিয়ো বন্ধ হলে কেন্দ্রীয় সরকার আমায় দায়ী করবে, চার্জশিট দেবে। কটকের স্টেশন ডিরেক্টরের বিরুদ্ধেও তাই করা হয়েছে। জনসংযোগের এমন একটি মাধ্যমকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টাকে কোনো দেশের সরকারই বরদাস্ত করতে পারে না। শুধু শুধু কটকের স্টেশন ডিরেক্টরকে বিব্রত করল দায়িত্বহীন অবিবেচক একদল লোক। এখন কোথাকার জল কোথায় গড়ায় কে জানে! মনে হল আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করলেন ডেপুটি কমিশনার। অবশ্য আমাদের অফিসে বা স্টুডিয়োতে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য কেউ এল না। কিন্তু সিকিউরিটি স্টাফ পাহারায় রইল। এই সহৃদয় ডেপুটি কমিশনার সুবোধকুমার বসুর কাছ থেকে নানাভাবে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি।

দিল্লী গিয়েছিলাম একটা সেমিনারে যোগ দিতে। দিন দশেক বাদে জয়পুরে ফিরে এলাম। আমার বাস সন্ধের দিকে শহরে ঢুকল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে অনেক পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। লোকজনের ভিড় প্রচণ্ড। গাড়ি চলাচলও বেশি। আগামী কাল

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসছেন এখানে। দিল্লীতেই শুনে এসেছি। বাড়িতে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বেজে উঠল। জরুরি প্রয়োজনে স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার আসছেন। এলেন খুব ব্যস্ত-সমস্তভাবে। ঘরে ঢুকেই বললেন যে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে রেডিয়োর প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ। জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের রেকর্ডিং-এর জন্য কে কে যাবেন রেকর্ডিং ইউনিট নিয়ে সে-সব ঠিক করা হয়ে গেছে। কিন্তু পুলিসের পারমিশন এখনো এসে পৌঁছায় নি। আমি যখন এসে গেছি তখন ওঁর আর কোনো দায়িত্ব রইল না। এখন যা করণীয় আমাকেই ঠিক করতে হবে। সারাদিন ট্রেনে এবং বাসে চড়ে এসেছি, বেশ ক্লান্ত আমি। তাই প্রথমেই চা খাওয়া উচিত ; তার পর এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাবে এই কথা বলে চায়ের জন্য আবেদন করলাম স্ত্রীর কাছে।

চা খেতে খেতে দিল্লীর সেমিনারে কি কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তা বললাম। যে ক'দিন ছিলাম না এখানে সব-কিছু ঠিক মতো চলেছে কি না জেনে নিলাম। তার পর বললাম যে প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে আমাদের কিছুই করতে হবে না। কারণটা বুঝিয়ে বললাম। প্রধানমন্ত্রী বের হয়েছেন নির্বাচনী সফরে। নিজের দলের প্রার্থী হরিশচন্দ্র বক্সীপাত্রের নির্বাচনী সভায় জনগণের কাছে তিনি ভোটের জন্য আবেদন জানাবেন। সুতরাং তিনি দলনেত্রী হিসেবে আসছেন এবং প্রধানমন্ত্রী হলেও সরকারি কোনো কাজে আসছেন না। এ ক্ষেত্রে রেডিয়োর কোনো দায়িত্বই নেই ওঁর ভাষণ রেকর্ড করার। তবে নিউজ ডিপার্টমেন্ট থাকলে সামান্য কভারেজ দেওয়া হত। আমরা দুজনেই এ বিষয়ে ভারত সরকারের যথার্থ গণতান্ত্রিক নীতির কথা আলোচনা করলাম শ্রদ্ধার সঙ্গে। নিশ্চিন্ত মনে স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার বাড়ি ফিরে গেলেন।

শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু এই জনসভায় উপস্থিত হতে পারলেন না

পরদিন। তাঁর প্লেন যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে নেমে পড়ল জয়পুর থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে রায়গড়া নামে এক জায়গায়। পাহাড়ী রাস্তায় ওখান থেকে এতটা দূর কি করে আসা যায়? আগে থেকে গাড়ির ব্যবস্থাও তো ছিল না। হাজার হাজার আদিবাসী নরনারী অনেক দূর থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিল শ্রীমতী গান্ধীকে দেখতে। তিনি আসতে পারলেন না, মিটিং হল না। সবাই নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। ফলে সেই নির্বাচনে বক্সীপাত্র হেরে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী গান্ধী এলেন কিছুকাল পর। এটা সরকারি কাজে আগমন। তখন রেকর্ডিং ইউনিট নিয়ে আমাদের দৌড়াদৌড়ির অন্ত রইল না। জনসভার ভাষণ রেকর্ড করে এক কপি প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি অফিসারের হাতে দিয়ে দিতে হল। অন্য আর-একটি কপি সাতদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল ডি. জি.-র দপ্তরে। রেকর্ডিং শুনে পুরো ভাষণটির স্ক্রিপ্ট্ও তৈরি করে পাঠাতে হল। ১৯৫৭-এর জুন মাসে দেশে যখন জরুরি অবস্থা জারি করা হল তখন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে যে-সব গণতান্ত্রিক নীতি প্রচলিত ছিল তা সব নাকচ হয়ে গেল। পার্টির কাজে এলেও প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত ভাষণ রেকর্ড করতে হল রেডিয়োকে।

জয়পুর কেন্দ্র প্রধানত সেখানকার আদিবাসীজনদের জন্যই খোলা হয়েছিল। শুরুতে আদিবাসী শ্রোতাদের জন্য আধঘণ্টার অনুষ্ঠান। আদিবাসীজনের ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম, তাদের সামাজিক আচার-আচরণ এবং দৈনন্দিন জীবনের কথা যেমন ছিল এই অনুষ্ঠানে, সমগ্র দেশের কোথায় কি হচ্ছে তার বিষয়েও বলা হত এই শ্রোতাদের কাছে। পরে রেডিয়ো ফার্ম ফোরাম প্রোগ্রামও প্রবর্তিত হল। আধুনিক চাষাবাদে উন্নত সারের প্রয়োগ এবং অধিক ফলনের জন্য কৃষিবিজ্ঞানের নানা কথা আলোচনা করা হত।

কাছের গ্রামগুলিতে রেডিয়ো শোনার আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছিল লক্ষ করেছি। অনেক দূরের গ্রামেও রেকর্ডিং ইউনিট পাঠিয়ে দেওয়া হত। আশেপাশের গ্রামের লোকেরা এসে যেত সেখানে। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা হত। গান-বাজনাও রেকর্ড করে এনে রেডিয়োতে প্রচার করা হত। কিন্তু দূরের পাহাড়ের উপর বা ঘন অরণ্যের ভেতর যে-সব গ্রাম সেখানে রাস্তাঘাটের অভাবে আমাদের রেকর্ডিং ইউনিট পাঠানো সম্ভব হত না। সে-সব গ্রামে একটি গ্রাহকযন্ত্রও ছিল কি না আমার সন্দেহ হয়েছে।

শহরের কাছের গ্রামগুলির আদিবাসীরা ভারতের যে-কোনো গ্রামের মানুষের মতোই। ধর্মকর্ম বেশভূষা এদের অবশ্যই আলাদা। এরা শহরে আসে ম্যাটিনি শো-তে সিনেমা দেখতে এবং দিনান্তে বাজার করে বাড়ি ফিরে যায় গান গাইতে গাইতে। মনটা প্রায় সব সময় খুশিতে ডগমগ। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে কয়েকটি তরুণী রাস্তার মাঝেই হাত ধরাধরি করে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাচের মেজাজ খুব সহজেই এসে যায়। মঞ্চের প্রয়োজন নেই, পোশাক-আশাকেরও না। হাটে-মাঠে-বাটে মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে গেলেই হল। ঢোল বা মাদল সঙ্গে না থাকলেই বা কি, হাতে তালি বাজিয়েই নাচ শুরু হয়ে গেল। আমি ভিন্‌দেশী পথিক পথের কিনারে দাঁড়িয়ে তরুণীদের নাচ দেখলাম অবাক বিস্ময়ে। পথের দুই ধারে ঘন সবুজের সমারোহ। রাঙা মাটির পথ চলে আঁকাবাঁকা বহু দূর। নাচের এমন মনোরম প্রাকৃতিক পটভূমি আর কি হতে পারে! নাচ শেষ হল তুমুল হাসির রোলে। হাসির দমকে সুখস্বপ্ন ভেঙে যায়। কতক্ষণ চলেছিল নাচ!

আমি থাকি একটি আদিবাসী গ্রামে, শহরের উপান্তে। গ্রামটি পরজা নামে আদিবাসীদের। জয়পুরকে ঘিরে সবই আদিবাসী গ্রাম। ছুটির দিনে পাশের গ্রামগুলিতে বেড়াতে গিয়েছি পায়ে

হেঁটে। আট-দশ মাইলের মধ্যে এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে যাই নি। পরজাদের জীবনযাত্রাটা খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে। এই গ্রামগুলি সাঁওতাল গাঁয়ের মতো পরিচ্ছন্ন নয়। ঘর-দোর তেমন ছিমছাম গোছানো নয়, উঠোনে ঝাঁট পড়ে না অনেক দিন। বাড়িগুলি শ্রীহীন, গাঁয়ের রাস্তা ঘাটে আবর্জনা।

একটি কিশোরী মেয়ে, ময়না তার নাম, আমার স্ত্রীর ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করে। সলজ্জ মিষ্টি হাসি লেগে আছে এই কিশোরীর পাতলা ঠোঁটে। চোখছুটি সামান্য গোলাকৃতি। কালো মেয়ের কালো চোখে ভাষা আছে। নাকও মোটামুটি চোখা। মাথায় খুব উঁচু নয়, বেঁটের দিকে। একহারা চেহারা। ময়না হঠাৎ এল না একদিন। ভাবলাম বোধ হয় অসুখ-বিসুখ। কিন্তু পাশের বাড়ির প্রতিবেশীনী রামা এসে আমার স্ত্রীকে বলে গেল যে ময়নাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্‌বিগ্ন হয়ে আমার স্ত্রী পুলিসে খবর দিতে বললেন। বাঁকা চোখে লাজুক হেসে জিবে কামড় দিয়ে রামা জানাল যে পাড়ার একটি তরুণ ছেলেও যে নিরুদ্দেশ। তাই পুলিসে খবর দেবার প্রশ্ন ওঠে না। ছুদিন পর জানতে পারলাম যে অদূরে জঙ্গলে ময়নাকে এই ছেলের সঙ্গেই খুঁজে পেয়েছে গ্রামের অন্য যুবকরা। ছুই জনকেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। ছেলের বাপ কন্যার বাপকে এক কুড়ি টাকা দিল এবং গাঁয়ের মাতব্বরদের ডেকে পান-মিষ্টি খাইয়ে দিল। মুরুব্বিদের অনুমতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিয়েটাও হয়ে গেল। এইভাবেই পরজাদের বিয়ে হয়। বরপণের পরিবর্তে কন্যার পিতাই পণ পায়।

গাঁয়ের এক বৃদ্ধ মারা গেল। আমারই প্রতিবেশী। কান্না, চিৎকার, আর্তনাদ, হাহাকার শুনতে পেলাম না। জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই মৃত্যুকে গ্রহণ করে নেয় এরা। তাই মৃত্যুকে ভয় নেই। কি জানি, জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করে নববস্ত্র পরিধান করবে

আত্মা মৃত্যুর পর— এমন কোনো ধারণা আছে কি এদের! তবে মৃতের অন্তিম যাত্রায় ঢাক, ঢোল, সানাই বাজিয়েই বিদায় অভিবাদন জানানো হল। একটি শিশুর জন্মকেও বাজনা বাজিয়েই আবাহন জানায়। জন্মের হার খুব বেশি মনে হল না। অন্তত কলকাতার কোনো কোনো অঞ্চলে আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি যেমন দেখতে পাই তেমনটা নিশ্চয়ই না।

ধান কাটার পর ঘরে ফসল উঠলে নাচ-গানের মহলা শুরু হয়ে যায়। অবশ্য খুব কমই নিজের ঘরে ফসল ওঠে। জমির মালিক তো আর নিজেরা নয়, একটু চড়া দাম পেয়ে বেচে দিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত টাকাটা ফুর্তি করে উড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল। তাই মধ্যপঞ্চাশে রাজ্যসরকার আইন করে আদিবাসী জমি বাইরের লোকের কাছে বিক্রি করা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তার আগেই যে সমস্ত জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান লোক আইনের ফাঁক বের করে নিতে পারে এবং আমার সময়েও জমির হস্তান্তর কিছু কিছু দেখতে পেয়েছি। তবে ফসল কাটার সময় সবাই কাজ পেয়েছে, মেয়ে পুরুষ সবাই। হাতে টাকা আছে, এবার নাচ গান, আনন্দ উৎসব।

অনেকটা আমাদের যাত্রাগানের মতন অভিনয় দেখলাম। ওরা বলে নাট। গাঁয়েরই একটা খোলা জায়গায় একটি কাঠের চৌকি পেতে মঞ্চ করা হল। চার দিক খোলা, উপরেও আবরণ নেই কোনো। মঞ্চের উপর দুটি চেয়ার, অর্থাৎ সিংহাসন। অভিনয়ের শুরুতে রাজা-রানী দৌড়ে এসে সিংহাসনের উপর উপবেশন করলেন। রংবাহারি পোশাক, মুখে খড়িমাটির ঘন প্রলেপের মেক-আপ। হাত-পায়ের রঙ মৌলিকই রয়ে গেল। সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা-রানীর ডায়লগ চলছে অতি দ্রুত গতিতে। আসরের দর্শক শ্রোতারা ভূমি-আসনে বসে তন্ময় হয়ে শুনছে এবং ঘন ঘন হাততালি দিয়ে

অভিনয়ের তারিফ করছে। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজামশায় হাততালিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং রানীর পরিবর্তে শ্রোতাদের উদ্দেশে নিজের সংলাপ বলতে লাগলেন। মুহুর্মুহু হাততালি। এই তালির মধ্যেই তীর ধনুক হাতে লাফ দিয়ে এসে দাঁড়ালেন এক বীর এবং অডিটরিয়মেরই দিকে তাকিয়ে ডায়লগ ছুঁড়তে লাগলেন। এবার দেখতে পেলাম দূর থেকে ডিগবাজি খেতে খেতে স্টেজে লাফ দিয়ে পড়ল বীর হনুমান। লম্বা লাঙ্গুলের আঘাতে মঞ্চের পাশে রাখা হ্যাজাক বাতি উল্টে গেল। মঞ্চ অন্ধকার। প্রথম দৃশ্যেরও বোধ হয় এখানেই শেষ ছিল। অন্ধকারের অন্তরালে কুশীলবের মঞ্চ থেকে প্রস্থান। মনে হল রামায়ণেরই কোনো অংশের অভিনয় হচ্ছিল। আমাদের ঘোষালের দল, নট্ট কোম্পানির মতো এদেরও পেশাদার নাটের দল আছে যারা গ্রামে গ্রামে খেপ মেরে বেড়ায় শীতের মাসগুলিতে। মেয়ের ভূমিকা ছেলেরাই করে, যদিও এদের মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

পরজাদের মধ্যে নাচটা প্রায় মেয়েদেরই একচেটিয়া অধিকারে। গ্রামের যুবতী বউ-ঝিরা নিজ নিজ উচ্চতা অনুসারে সার বেঁধে দাঁড়ায়। প্রথমার ডান হাতটি দ্বিতীয়ার পিঠের উপর দিয়ে এগিয়ে তৃতীয়ার বাম কনুইতে ধরবে। এভাবে ক্রমশ ঢালু হয়ে আসা সারির শেষে থাকবে সব চেয়ে মাথায় খাটো মেয়েটি। দলনেত্রী দাঁড়াল সারির প্রথমে। বাম হাতে তার ময়ূর পালকের চামর। দুজন যুবক ছোটো ছোটো মাদল নিয়ে নাচের বোল বাজাতে আরম্ভ করল। গান ধরল আর-এক যুবক। বাজনার তালে তালে চামর দুলিয়ে দলনেত্রী শুরু করল নাচ। সমস্ত সারিটি তালে তালে কয়েক পা এগবে, আবার যাবে পিছিয়ে। লাইন আগুপিছু হবে না কোথাও। সামনে নুয়ে, পিছনে বেঁকিয়ে ছন্দের হিল্লোল তুলছে। আবার গোল হয়ে একটি মালা হয়ে গেল। কখনো বা ছোটো

ছোটো দলে ভাগ হয়ে চার দিক প্রদক্ষিণ করে আবার ফিরে এল সবাই সেই আগেকার সমবেত সারিতে। অপূর্ব সুশৃঙ্খল সংহতি। এবার বাজনার ছন্দ ক্রমে দ্রুত হচ্ছে। নিতম্বের হিন্দোলও বামে দক্ষিণে, সামনে পেছনে দ্রুততর হচ্ছে। বীক্ষমাণের সামনে সমস্ত জগৎটা দুলছে। একটা মোহময় আবেশজড়িত দৃশ্য। হঠাৎ ছন্দ-পতন। তরুণ গায়ক দুষ্টুমি করে গানের মাঝে কোনো ব্যক্তিগত অনুরাগের ইঙ্গিত করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ের পায়ের তাল কেটে গেল। শুরু হল তার হাসি, যোগ দিল অন্যরা, হাসির ফোয়ারায় থেমে গেল নাচ। এমন নাচ ফসল কাটার পরে যদিও বেশি চোখে পড়ে, অন্য ঋতুতে যে হয় না তা নয়। এরা মনের আনন্দে যখন খুশি নাচে। যেন দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া-ঘুমানোর মতোই একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। দেহে ভারী একটি নারীও চোখে পড়ল না। তা হলে কোনো অন্তর্বাস-বিহীন একটিমাত্র শাড়ির শালীনতায় যৌবনদীপ্ত দেহকে আবৃত রাখা যেত না। একটা অসাধারণ শাড়ি পরার আর্ট রয়েছে এই আদিবাসী রমণীদের মধ্যে। পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপায় কয়েকটি বনফুল একটা শুচিস্নিগ্ধ রমণীয়তা দান করেছে এই আদিবাসীবালাদের। কিন্তু বিজয়াদশমী রাতের কুহেলী জ্যোৎস্নায় যে নাচ দেখেছি তাতে আছে অবাধ উদ্দাম যৌনলীলার লাস্য। জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থ এবং পরবর্তী কালিকাপুরাণে বর্ণিত দুর্গাপূজার দশমী তিথির শাবরোৎ-সবের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথি। এ দিনটাও বড়ো আনন্দের। আজ আদিবাসীদের ‘হলাপদি’ উৎসব। সবাই পরল নূতন বসন। আহারেও বিশেষ আয়োজন। প্রতি গৃহে আজ ‘কন্দুল’ আহার। কন্দুল হল অড়হর ডাল। দরিদ্র এই মানুষগুলির কাছে অড়হর ডালই উপাদেয় একটি উৎসবের খাদ্য। আজ রাতের আকাশে

রাকাশশী। দখিনার মৃদু সমীরণ মনে জাগায় শিহরন। গানে, গুঞ্জনে, হাস্যে, লাস্যে, উদ্‌যাপিত হবে এই বসন্তযামিনী। উন্মুক্ত প্রান্তরে গ্রামের বাইরে আজ রাতে বহ্ন্যুৎসব। যুবক-যুবতী কিশোর-কিশোরী আগুনের চার ধারে নেচে-গেয়ে হাসির হিল্লোলে কাটিয়ে দেবে সারাটা রাত। এ রাত তো ঘরে ফেরার রাত নয়। নীল আকাশের অসীম ছেয়ে চাঁদের আলো গেছে ছড়িয়ে, বনের ওপারে ঐ পাহাড়ের গায়ে লুটিয়ে পড়েছে চাঁদের মায়া, এমন মরমী রাতে ঘরে থাকা কি যায়? এ রাতের ডাকে আমিও বের হয়ে পড়লাম। সহযাত্রী লক্ষ্মীধর শাহু, আমার অফিসের সহকর্মী। তাঁর হাতে ছোটো টেপ্‌ রেকর্ডার। যাব কুসুমি গাঁয়ে। সে গাঁয়ে নাচ-গান ছাড়াও বিশেষ বহ্ন্যুৎসবের আকর্ষণ।

উড়িষ্যা রাজ্যের প্রান্তসীমায় মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার জগদলপুরের পথে এই কুসুমি গ্রাম। আশেপাশের সকল গাঁয়ের আদিবাসী নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সবাই এই কুসুমি গাঁয়ের উৎসবে এসেছে যোগ দিতে। জয়পুর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে এই ছোটো গ্রাম। অতীতে হয়তো পুরোপুরি আদিবাসী গ্রামই ছিল। কিন্তু এখন বিজলি বাতি আছে, পোস্ট অফিস আছে। বোধ হয় বর্তমান জমিদার বিষয়ী পরিবারের চেষ্টাতেই এ-সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। উৎসব-প্রাঙ্গন শিব-মন্দিরের সামনের চাতাল। বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি একটির উপর একটি পর পর নিপুণভাবে সাজিয়ে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু মঞ্চ করা হয়েছে। গভীর রাতে পুরোহিত ঠাকুর মন্দির থেকে জ্বলন্ত মশাল এনে সেই মঞ্চের নীচে অগ্নিসংযোগ করলেন। প্রবাদ যে পুরোহিতের মশালটি মন্দিরে দেবতার কাছে প্রার্থনা করার পর আপনিই জ্বলে ওঠে। দেশলাই জ্বালিয়ে বা বারুদ ঘষে জ্বালাতে হয় নি। মঞ্চের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ভিন্ন ভিন্ন দলে আদিবাসীদের নাচও শুরু হয়ে গেল। একটু দূরে আর-

এক দলের যাত্রাভিনয় আরম্ভ হল। দেখলাম নায়ক রঙিন চশমা পরে তলোয়ার হাতে অডিয়েন্সের দিকে ডায়লগ বলছেন। খোঁজ নিয়ে জেনেছি কন্‌জাংটিভাইটিস্ নয় লোকটির। রঙিন চশমা আছে, রাতে পরতেই বা আপত্তি কি? কত দোকানপাটও বসে গেছে—মনিহারী, জামা-কাপড়, তেলেভাজার— ঘুরে ঘুরে দেখছি সব। আমার সহকর্মী রেকর্ড করে নিচ্ছেন গান, নাট-এর অংশ, মেলার বিচিত্র শব্দ।

অনেকক্ষণ ধরে চার দিক ঘুরে দেখলাম। আলোর আড়ালে, গাছের নীচের আবছা অন্ধকারে আলিঙ্গন-বদ্ধ যুগলমূর্তিও দেখেছি একবার-দুবার। আজকের এই উৎসবমুখর মোহিনী রজনীতে কিছুটা স্বাধীনতা তো আছেই! আর কৃষ্ণ ছায়া-পরিলেখে মানুষ দুটিকে চিনে নেবারও উপায় নেই, সে চেষ্টাও করবে না কেউ আজ রাতে। আজ রাতে সকল হৃদয় ঈর্ষাহীন উদার। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীধর অনেক কিছু রেকর্ড করে নিলেন। এক জায়গায় নিরিবিলিতে বসে রেকর্ডিং শুনে নিচ্ছিলাম। ভালো সংগ্রহ হয়েছে। কিন্তু আমাদের চার দিকে ভিড় জমে গেল। গান, নাট এবং নানা শব্দের রেকর্ডিং শুনে আদিবাসী নারী-পুরুষের খুব কৌতূহল হয়েছে। লক্ষ্মীধর এদের জানিয়ে দিলেন যে কুসুমি গ্রামের আজ রাতের সমস্ত অনুষ্ঠানের উপর একটি প্রোগ্রাম তৈরি করে রেডিয়োতে প্রচার করা হবে। দিনক্ষণও বলে দেওয়া হল।

ওদিকে অসামান্য আর-একটা ব্যাপার এখনই ঘটতে যাচ্ছে। আগুনের উপর হাঁটা এবার আরম্ভ হবে। আগুনের উপর হাঁটা—শুনেই মনে যুগপৎ ত্রাস এবং রোমাঞ্চ জাগল। এমন ঘটনার কথা তো কই আগে কখনো শুনি নি। পর পর বড়ো বড়ো কাঠ দিয়ে তৈরি যে বিরাট এবং উঁচু স্তূপের মধ্যে মন্ত্রদীপ্ত অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল সে কাঠগুলি ক'ঘণ্টা ধরে জ্বলার পর এখন জ্বলন্ত অঙ্গারে

পরিণত হয়েছে। লম্বা বাঁশের সাহায্যে সেগুলিকে ঢেলে একটি জ্বলন্ত গালিচা সাজানো হল। লম্বায় ত্রিশ এবং চওড়ায় বিশ ফুট এবং প্রায় দেড় ফুট পুরু। আমরা দুজনে এসে দাঁড়ালাম একটু দূরে। কাছে কি যাওয়া যায়! গরম হল্‌কা এসে লাগছে গায়ে। পুরোহিত-মশায় দুই হাত মাথার উপর তুলে মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে অনায়াসে ধীরগতিতে হেঁটে পার হয়ে গেলেন ত্রিশ ফুট আগুনের গালিচা। হ্যাঁ, একেবারে খালি পায়ে। এর পর আর-একজন, আবার একজন, এভাবে লাইন করে একের পর এক লোকগুলি পার হয়ে গেল। কেউ বা এপার-ওপার করল। তাজ্জব ব্যাপার! দৌড়ে বা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাবার চেষ্টা কেউ করল না। তা হলে পুণ্য অর্জন করা হবে না।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছি ওদের মুখের দিকে। কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা কাতরতার চিহ্ন নেই মুখে। যেন ইন্দ্রজালের খেলা দেখছি সম্মোহিত হয়ে। বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু আমার চোখের সামনেই তো ব্যাপারটা ঘটছে। মানুষেরই পা! নিয়মিত অনুশীলনেও আয়ত্ত হয় নি এই অতি কঠিন সহনশীলতা। বছরে একটি মাত্র দিনেই এই আগুনের উপর চলা। চড়কপূজা উপলক্ষে বঁড়শিতে ঝুলন্ত মানুষের কথা শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করি নি। এই জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়ে ত্রিশ ফুট অনায়াসে খালি পায়ে হেঁটে পার হয়ে যাবার কথাও শুনলে কখনো বিশ্বাস করতাম না নিজের চোখে না দেখলে। এখনো কত কিছু অঘটন যে ঘটছে, না দেখলে কি করে জানব! কুসুমি গাঁয়ের অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা নিজের চোখে দেখে এলাম। চোখের সামনেই ঘটছে তাই সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হলাম। অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

আমার ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে ভারতকে তিনবার বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন হতে দেখেছি। পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে প্রথম

বারের সংঘর্ষের সময় কোনো প্রস্তুতি ছিল মনেই হয় নি। রেডিয়োর মতো একটি প্রচার-যন্ত্র যুদ্ধের কালে কি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেটাই যেন বুঝতে পারে নি কর্তৃপক্ষ। চোর পালাবার পর যেমন বুদ্ধি বাড়ে ঠিক সেই রকমটাই হয়েছিল রেডিয়োর ক্ষেত্রে। চীনারা সদয় হয়ে নিজেরাই যখন মার বন্ধ করল তার পর শুরু হল রেডিয়োর তৎপরতা। ততদিনে অনিষ্ট যা হবার হয়ে গিয়েছে। জাতির শিরদাঁড়াই ভেঙে গেল। তিন বছর পর ১৯৫৭ সনের সেপ্টেম্বরে পুব-পশ্চিমের প্রতিবেশীর আক্রমণের আগে কিছুটা প্রস্তুতি অবশ্য ছিল। দিল্লীর লালকিল্লায় পনেরো আগস্ট সকালে প্রধান-মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ভাষণ থেকে মোটামুটি ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। কিন্তু তেমন দাবি ছিল না সরকারের রেডিয়োর কাছে।

১৯৫৭ সনের তিন থেকে ষোল ডিসেম্বর পুবে পশ্চিমে যে সাফল্য অর্জন করল আমাদের সামরিক বাহিনী এবং তার পেছনে অসামরিক সংস্থাগুলিরও যে সহযোগিতা ছিল তার নেতৃত্বটা পুরোপুরি প্রফেশন্যাল। মনে হল চাণক্যনীতি এবং রণকৌশলের সম্পূর্ণ পাঠ গ্রহণ করে নেত্রীরূপে অবতীর্ণ হলেন ইন্দিরা গান্ধী। আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া হল বেডিয়োকে কী বিশিষ্ট দায়িত্ব নিতে হবে প্রচার এবং জনসংযোগের কাজে। পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ। শুধু তাই নয়, মিডিয়ম ওয়েভ ট্র্যান্স্‌মিটার থেকে বিদেশী রোমারু বিমানের সংকেত পাওয়ার সম্ভাবনাটা জানিয়ে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হল এবং বিমান আক্রমণের কালে কী করণীয় তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ এল। না, ওখানেই শেষ নয়। অনেক এগিয়েও ভেবেছিল সরকার। শত্রুর আক্রমণে স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাবার ভয় আছে। এমনটা হলে রেডিয়োকে অসাধারণ একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যোগাযোগ রক্ষার কাজে। আর সেজন্য প্রতিটি কেন্দ্রের অধিকর্তাকে অতি গোপন সংকেতভাষায়

প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বনের অনুপুঙ্খ নির্দেশও ছিল। এ-সব আদেশ নির্ভুলভাবে যাতে প্রতিপালিত হয় তার উপরও নজর ছিল। এমন দক্ষ এবং সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা আগে দেখি নি। যে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হল রেডিয়োর উপর, অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সেটা পালন করল রেডিয়ো। সীমান্তের ওপারে রেডিয়োর তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী প্রচার যুদ্ধজয়ে অনেকটা যে সাহায্য করেছিল সে স্বীকৃতি সরকার দিয়েছে কলকাতা কেন্দ্রের অধিকর্তা এবং এক সংবাদপাঠককে পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত করে।

যুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু আমাদের উপর আর-একটা কাজের ভার চাপিয়ে দেওয়া হল। টাকা তুলতে হবে নিহত জোয়ানদের পরিবারের সাহায্যার্থে। অতিশয় সৎ, কল্যাণজনক কাজের আহ্বান, কিন্তু দরিদ্র আদিবাসী অঞ্চলে রেডিয়ো স্টেশন। কি করে টাকা তুলব! দিল্লী থেকে পর পর তিনবার অনুরোধ এল সামান্য যা হোক টাকা তুলে দিতে। বিপন্ন বোধ করলাম খুব। কিন্তু উপায় একটা বের করতেই হবে। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। গান এবং নাচের এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে টিকিট বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। জয়পুরের আকাশবাণী ক্লাব এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। সরকারি প্রতিষ্ঠান রেডিয়োর পক্ষে টিকিট বিক্রি করে এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ঠিক হবে না। তাই ক্লাবের নামেই করা হল। খুব বড়ো শিল্পীর জন্যই হাত বাড়ালাম। ওড়িশি নৃত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সংযুক্তা পানিগ্রাহী এবং গানের জন্য রঘুনাথ পানিগ্রাহী ও অক্ষয় মহান্তির জন্য চেষ্টা করলাম। ফোনে কথা বললাম কটকের স্টেশন ডিরেক্টর রণেন দাশের সঙ্গে। কর্মজীবনে এমন বিশাল হৃদয়ের মানুষ কমই দেখেছি। শিল্পীদের রাজী করিয়ে পরদিন আমায় সুখবরটি দিলেন দাশসাহেব।

দিন স্থির করা হল পনেরো মার্চ, ১৯৫৭। কিন্তু একটি মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যাবে কোথায়? জয়পুরে ভালো মঞ্চ নেই। সোনাবেড়ার হিন্দুস্থান এয়্যারোনটিক লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাঁদের মঞ্চ আমাদের দিতে রাজী হলেন। অসাধারণ সে মঞ্চ, অতি আধুনিক ব্যবস্থা এবং মস্ত বড়ো অডিটরিয়ম। কিন্তু চব্বিশ মাইল দূরে। এতটা দূরে অনুষ্ঠান পরিবেশন করার অসুবিধা আছে, বিশেষত টিকিট বিক্রি করে টাকা তোলা যার উদ্দেশ্য। তাই প্রোগ্রাম জয়পুরেই করতে হবে। সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন স্থানীয় এক বিরাট সিনেমা হলের মালিক। হলটি দেখে এলাম। প্রায় এক হাজার আসন রয়েছে। কিন্তু মূল জিনিসটি কোথায়? কলকাতার কোনো কোনো সিনেমা হলের পর্দার পেছনে মঞ্চ আছে। কিন্তু জয়পুরের এই হলে কোনো মঞ্চ নেই। একেবারে নূতন করে তৈরি করে নিতে হবে। মহৎ কাজে সহযোগিতার অভাব হয় না দেখতে পেলাম। হলের মালিক স্টেজ বাঁধার জন্য পুরো একটা রাত এবং একটি দিন দিতে রাজী হলেন। অর্থাৎ আগের দিনের তৃতীয় 'শো' শেষ হবে রাত সাড়ে দশটায়। তখন থেকে আমরা স্টেজ বাঁধার সময় পাব। হলের মালিক তিনটি শো— ম্যাটিনি, ইভনিং এবং নাইট-এর স্বার্থ ত্যাগ করলেন।

এদিকে আমার পরমবন্ধু হরিশচন্দ্র পাণ্ডা এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই স্টেজ বেঁধে দেবার দায়িত্ব নিলেন। পাণ্ডাবাবু নিজে একজন ইঞ্জিনিয়ার। প্রয়োজনীয় কাঠ, তক্তা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বিনি-পয়সায় সংগ্রহ করে আনলেন। মঞ্চ সাজাবার ভার গ্রহণ করলেন আমার সহকর্মী কুঞ্জবিহারী নন্দ। কুঞ্জবিহারী অভিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর মঞ্চ এবং বেতার শিল্পী। আমাদের ঘোষক। পাণ্ডাবাবু প্রায় পঞ্চাশজন শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সমস্ত রাত কাজ চলল। উৎকণ্ঠায় ভুগছি মঞ্চ তৈরি শেষ হবে কি না এই অল্প সময়ের

মধ্যে সেই দুর্ভাবনায়। রাত প্রায় বারোটার সময় কটকের স্টেশন ডিরেক্টর টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন যে শিল্পীরা সবাই রওয়ানা হয়ে গেছেন। যন্ত্রে যাঁরা সহযোগিতা করবেন ওঁরাও তো আসবেন কটক থেকেই। একই ট্রেনে আসছেন সবাই। ট্রেন সকাল সাড়ে ছ'টায় পৌঁছাবে ভিজিয়ানাগ্রামে।

রাত্রি প্রভাত হতেই আর-এক উদ্‌বেগ— ট্রেন পৌঁছাল কি না সময় মতো। এই শিল্পীরা যদি কোনো অনিবার্য কারণে এসে পৌঁছাতে না পারেন তবে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না। জয়পুরের দুশো মাইলের মধ্যে কোনো শিল্পী নেই। ঠিক সাতটার সময় আমার সহকর্মী বন্ধু যোশী টেলিফোন করলেন ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে। সুখবর দিলেন যে শিল্পীরা সবাই এসে গেছেন। যোশীকে পাঠানো হয়েছিল আগের দিন বিকেলে শিল্পীদের অভ্যর্থনা করে এগিয়ে আনতে। বাকি রইল আরো একশো ছ'মাইল রাস্তা পূর্বঘাট পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। মোটরের পথে অনেক চড়াই উৎরাই, আছে অসংখ্য বিপজ্জনক বাঁক। খুব সাবধানে যেন গাড়ি চালায় ড্রাইভার, গতি নিয়ন্ত্রণে রাখে সেই উপদেশ দিলাম যোশীকে। কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। পথে আর কোনো বিঘ্ন না ঘটলে এঁরা পৌঁছে যাবেন এগারোটার মধ্যে। ঠিক পৌনে দশটার সময় ফোন পেলাম সোনাবেড়া থেকে যে, শিল্পীদের গাড়ি সোনাবেড়া ছেড়েছে। এটা এইচ. এ. এল.-এর চীফ সিকিউরিটি অফিসারের সৌজন্যে। আর বেশি বাকি নেই, চব্বিশ মাইল মাত্র। সোয়া দশটা নাগাদ খবর পেলাম ফোনে কোরাপুট থেকে যে, শিল্পীদের নিয়ে গাড়ি কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়পুরে পৌঁছে যাবে। শুধু এই রিলে টেলিফোনের ব্যবস্থাই নয়, আমাদের এই ফাংশানে এইচ. এ. এল.-এর সুরেশ দে এবং জেলাধিপতি সুবোধকুমার বসু কত যে সাহায্য করলেন সে কথা স্মরণ করি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। এঁদের সক্রিয় আন্তরিক সাহায্য পেয়ে

অনেক কিছু সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

ঠিক এগারোটায় সংযুক্তা পানিগ্রাহী, রঘুনাথ পানিগ্রাহী, অক্ষয় মহান্তি এবং সব যন্ত্রশিল্পীরা এসে গেলেন অফিসে। রঘুনাথ মানুষটা এত ভালো যে আমায় বললেন স্টেজের জন্য যেন দুশ্চিন্তা না করি একদম। দুপুরের স্নান-খাওয়ার পর নিজেও স্টেজের কাজে লেগে যাবেন এই আশ্বাস আমায় দিলেন। সংযুক্তাও আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন যে স্টেজ যতই খারাপ হোক উনি সে অসুবিধার মধ্যেই ম্যানেজ করে নেবেন। রঘুনাথের বড়ো ভাইও রঘুনাথকে মঞ্চের কাজে অনেক সাহায্য করলেন।

দারুণ ভালো ভাবে উতরে গেল আমাদের অনুষ্ঠান। দর্শক-শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাওয়া গেল। এত ভালো নাচ এবং গান জয়পুরের মানুষ ইতিপূর্বে দেখবার শোনবার সুযোগ পায় নি। আর টাকাও উঠল ভালোই। তৃতীয় শ্রেণীর পথ-খরচা ছাড়া শিল্পীরাও নিলেন না কিছু। এমন উদারতা যেখানে সেখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও সংকোচ বোধ হয়। পাণ্ডাবাবু, সিনেমা হলের মালিক, মিশ্রসাহেব এবং আরো অনেকে কত যে সাহায্য করলেন! অফিসের প্রতিটি সহকর্মী, পিওন, মালী, ড্রাইভার এদের অক্লান্ত নিষ্ঠা দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। এই রেডিয়ো পরিবারের মতো সুন্দর সুখী পরিবার আমি অন্য কেন্দ্রে দেখি নি।

যে ছোটো শহরে আমার বাল্য কৈশোর যৌবন কেটেছে সেই শহরকে লোকে বলত সিটি অব ট্যাঙ্কস্। চারটি দীঘি— একটি এত বড়ো লম্বায় ও চওড়ায় যে এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের মানুষকে অতি ছোটো দেখায়। ধর্মসাগরের সাগর নামটা সার্থক। লেকের মতোই বড়ো। অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই ধর্মসাগরকে নিয়ে। বহুকাল পর ধর্মসাগরের সমান এক দীঘি দেখতে পেয়ে দারুণ ভালো লেগে গেল। জয়পুরের জগন্নাথসাগর উত্তরে-দক্ষিণে এক মাইল

লম্বা। পুবে পশ্চিমে আধ মাইল। গ্রীষ্মকালে জয়পুরের অনেক কুয়ো শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই সাগর খুবই গভীর, জল শুকোয় না নিদারুণ গ্রীষ্মেও। সাগরের পশ্চিম পারে দাঁড়িয়ে সূর্য ওঠার দৃশ্য ভারি সুন্দর। পূর্ণিমার চাঁদ ওঠার দৃশ্যও তেমনি সুন্দর। আমার নিজের বাড়িটা এখানে হলে কত-না খুশি হতাম। জায়গাটা ভীষণ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তাই রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ নিজের বাড়ি করার জন্য জমি কিনবে বলে যখন ঠিক করল তখন জগন্নাথসাগরের পশ্চিম পারের কথাই আমি বললাম। কলকাতা থেকে রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ার এসে সব দেখেশুনে আমার পছন্দ-করা জায়গাটাই মঞ্জুর করলেন। তিন একর জমি এক লক্ষ সাতাশি হাজার টাকায় কেনা হল উড়িষ্যা সরকারের কাছ থেকে। চেকটি নিজে গিয়ে দিয়ে এলাম ডেপুটি কমিশনারের হাতে। দলিলও ভারত সরকারের পক্ষে আমিই সই করলাম। আমার কালে জয়পুর রেডিয়োর নিজের বাড়ি তৈরি হয় নি। অনেক পরে হয়েছে। তবু জয়পুর রেডিয়োর জন্য একটা মমত্ববোধ জেগে আছে আমার মনে।

ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে শুরু করে একটা জাতীয় সড়ক পূর্বঘাট পাহাড়ের উপর দিয়ে সোনাবেড়া, কোরাপুট শহর পার হয়ে জয়পুরের বুক চিরে উত্তরে চলেছে মধ্যপ্রদেশের দিকে। জয়পুর শহর থেকে আড়াই মাইল উত্তরে এই জাতীয় সড়কের উপর আমাদের ট্র্যান্‌স্‌-মিটার-এর বাড়ি। এই বাড়িতেই স্টুডিয়ো। নিজেদের বাড়ি। পরে স্টুডিয়ো স্থানান্তরিত করা হয় জগন্নাথসাগরের পারে নূতন বাড়িতে। ট্র্যান্‌স্‌মিটার থেকে আরো দেড় মাইল উত্তরে এই সড়কেরই উপর রিসিভিং সেন্টার। মাঝে মাঝে আমাকে যেতে হয়েছে এই দু জায়গাতেই। যেতে যেতে পূর্ববঙ্গের বাঙালি রেফিউজিদের ছোটো ছোটো বাড়িগুলি দেখতে পেয়েছি জাতীয় সড়কের দু ধারে। দুটি কামরা, টিনের চাল, পাকা দেওয়াল। চাষের জন্য সামান্য জমিও

দেওয়া হয়েছে। লাউ, কুমড়ো, বেগুন এই-সব সবজির বাগান প্রতি বাড়ির সামনে। রেফিউজিদের কেউ কেউ চা-বিস্কুট, পানবিড়ি সিগারেটের দোকান খুলে বসেছে। একটি মিষ্টির দোকানও আছে, সন্দেশ, রসগোল্লা পাওয়া যায়। ছুটির দিনে হেঁটে গিয়েছি সেখানে। চা মিষ্টি খেতে খেতে দোকানের মালিকের সঙ্গে গল্প করেছি, শুনতে পেয়েছি তাদের সুখদুঃখের কথা।

কোমল নরম মাটির দেশের মানুষ এরা সবাই বলেছে যে এখানকার মাটিতে রস নেই। বর্ষার বৃষ্টি পর্যাপ্ত নয়, আবার বৃষ্টির অমৃতধারাকে খুব তাড়াতাড়ি শুষে নেয় এখানকার মাটি। নদীনালা নেই কাছে। কুয়োর জলে তো আর চাষাবাদ হয় না। তাই বছরে একটি মাত্র ফসল ওঠে। তাতে দুবেলা মুখে অন্ন জোটে না বছরের সব দিনগুলিতে। পুরনো দিনের স্মৃতি এখনো মুছে ফেলতে পারে নি মন থেকে। জায়গাটাকে ভালো লাগে নি, মন বসে নি। মনের গভীরে একটা অসন্তোষের ভাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অর্থাৎ দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেণ্ট অথরিটির উপর। প্রতিবেশী আদিবাসীজনেরাও আপন ভাবে নি ওদের। কাছেই অম্বাগুড়া ওয়ার্কশপের বাবুরা আছেন বলেই কিছু বিক্রিবাটা হয় দোকানে।

দণ্ডকারণ্য নামে পুনর্বাসনের অঞ্চলটার শতকরা আশি ভাগ এই কোরাপুট জেলায়। পুনর্বাসনের সদর দপ্তর কোরাপুটে। এই অঞ্চলে সব চেয়ে বেশি মানুষের বসতি হয়েছে মালকানগিরি নামে বনাঞ্চলে। কিন্তু ওখানেও সেই জলেরই ব্যবস্থা নেই। খাল-বিল-নদী-নালা-ডোবা-পুকুরের দেশের মানুষগুলিকে নিয়ে এসে ফেলে দেওয়া হয়েছে একেবারে জল নেই এমন দেশে। এখানকার আকাশ, বাতাস, মাটি, ভাষা ও মানুষ সবই অজানা এই সর্বহারা মানুষগুলির। এরা খুশি নয় এখানে থেকে সেটা মনে হয়েছে বার বার। দেশ-বিভাগের ফলে যে নেতারা লাভবান হয়েছিলেন তাঁরা এই ছিন্নমূল

মানুষগুলির কোনো খোঁজ-খবর কদাপি নিয়েছেন বলে তো শুনি নি। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একবার এসেছিলেন অনেককাল আগে জানি। ওমরকোটের কাছে একটা বড়ো দীঘির নাম বিধানসাগর। জয়পুর থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তরে। এই দীঘির পাশে বেশি ঘরবাড়ি দেখলাম না।

একজন পুব বাংলার মানুষের সঙ্গে কথা হল। নির্জন নির্বান্ধব এই দেশে মনটা সর্বদা বিষণ্ণ থাকে তাই জানালো। এই জায়গাটা হাট-বাজার থেকেও অনেক দূরে। এদের কথা নেতারা যেমন ভুলে গেছেন, রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সংঘও শোনে নি এদের কথা। কোনো সন্ন্যাসীকে আমি ঐ অঞ্চলে দেখতে পাই নি। এত যে বড়ো বড়ো মাইনের কর্মচারী এই দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটির, এঁরা কেউ বুঝতে চান নি, চেষ্টাও করেন নি এই হতভাগ্য মানুষগুলিকে, এমনটা আমার মনে হয়েছে। খুবই অসহায় ভাব এদের মনে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য নেতাদের দায়ী করে একটা অক্ষম ক্রোধের মনোভাবও দেখতে পেয়েছি এদের মনে। অস্বাভাবিক কিছু না। এমন ক্রোধের ভাব এখনো দেখতে পাই কলকাতাতেই— যাদবপুর, বাঘাযতীন, নেতাজী নগরে। প্রাণের ভয়ে ঘরপালানো এখানকার মানুষগুলির মানসিক পুনর্বাসনের কোনো চেষ্টা হয়েছে সরকার বা সমাজের তরফ থেকে এমন কোনো নিদর্শন আমি দেখতে পাই নি। অতি কাছের একটি রেডিয়ো স্টেশনে তাদের জন্য কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নি। ডি. ডি. এ. এ-বিষয়ে কিছু ভেবেছেন বলেও আমি জানি না। এই মানুষগুলির মধ্যে নৈতিক বা মানসিক বলিষ্ঠতা আমি দেখি নি। আশাও করি নি। পুব বাংলারও এরা অবহেলিত শ্রেণীরই লোক ছিল। এমন শিক্ষা, চারিত্রিক দার্ঢ্য এদের নেই যার বলে ভালো ভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে পারে। এদের বা এদের বাপ-ঠাকুরদার

কোনো পাপের ফলে এদের এখানে আসতে হয় নি। আসতে হয়েছে নেতাদের কুচক্রের ফলে। সেই নেতারাই তাদের ভুলেছে। আর নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি ওদের নেই, সেই শক্তি ওদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও নেই সমাজের। পার্শিরা এদেশে এসে হাজার বছর পরও পার্শি রয়ে গেছে। কিন্তু পুব বাংলার এই দুর্ভাগা মানুষগুলির সে শক্তি নেই। এরা বেঁচে থাকতে পারলেও বাঙালি থাকবে না।

জয়পুর কেন্দ্রটি রেডিয়োর একটা ডিফিকাল্ট স্টেশন। থাকবার মেয়াদ মাত্র দু বছর। সেটা আমার অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। বদলির নির্দেশ এসে গেল, বোম্বাই থেকে এক সহকর্মী আসবেন এখানে আমার জায়গায়। তিনি এলে আমি ছাড়া পাব। কিন্তু বোম্বাই ছেড়ে কেউ কি আসতে চাইবেন জয়পুরে? ভদ্রলোকটির অসুখ হয়ে গেল। জয়পুরের নামে অসুখ হতেই পারে বোম্বাই-থাকা মানুষের। বোম্বাই-এর কমার্শিয়াল সার্ভিসে কাজ করেন এই অফিসার। সেখানকার স্টেশন ডিরেক্টর আমায় জানালেন দয়া করে যে ওঁর ওখানে আর-একজন না পাওয়া পর্যন্ত এই অফিসারকে জয়পুরের জন্য ছেড়ে দিতে পারবেন না তিনি। বদলির নির্দেশে তেমন কিছু ছিল না। আমার সে তর্কে গিয়ে লাভ কি? এখানকার স্টেশন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে দিল্লীতে কর্তৃপক্ষের কাছে টেলিগ্রাম করলাম। কর্তৃপক্ষ আমায় জানালেন যে বোম্বাই কমার্শিয়াল সার্ভিসের ঐ পদটিই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। কাজেই ঐ অফিসারটিকে আসতেই হবে। এলেনও। এরই মধ্যে দু বছরের উপর আরো সাতটি মাস কেটে গেল। ছেড়ে চললাম জয়পুর। কিন্তু জায়গাটাকে, মানুষগুলিকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

৯

ফিরে এলাম আবার কলকাতায়। ১৯৫৭ সনের ২৯ মে কাজে যোগ দিলাম। কয়েকদিন পর কেন্দ্র-অধিকর্তা একটি নোট পাঠালেন এই বছরের মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি একেবারে নূতন করে সাজাতে। পুরনোটিকে ফেলে দিতে হবে। বলিষ্ঠ পরিকল্পনা। নূতনই তো বৈচিত্র্য আনবে আমাদের প্রোগ্রামে। কাজটা কিন্তু সহজ নয়, সরলও নয়। বাণীকুমারের লেখা, পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুর, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গ্রন্থনা ও স্তোত্রপাঠ এ-সব কিছুই থাকবে না। চল্লিশ বছর ধরে যে অনুষ্ঠানটি চলে আসছে তাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে আগের টিমের চেয়েও উপযুক্ত লেখক, সুরকার এবং স্তোত্র পাঠ করার মানুষটিকে অনুসন্ধান করে বের করতে হবে। আগের প্রোগ্রামটিকেও আমারই কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে গঙ্গায় নিরঞ্জনের জন্য। এখন জুন মাস চলছে, পুরো তিন মাসও সময় পাওয়া যাবে না। বেশ ভাবিয়ে তুলল আমায় ব্যাপারটা।

এপিক্‌ধর্মী এই মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানের লেখকের থাকতে হবে সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান, পুরাণে পাণ্ডিত্য এবং বাংলা ভাষার উপর বিশেষ অধিকার। গীত-রচনার শক্তিও চাই। অন্যের লেখা গান জুড়ে দিলে অসংগতি হবে না? রেডিয়ো মাধ্যমটিকেও জানতে হবে অন্তরঙ্গভাবে। এমন মানুষটিকে পেতে অনেক খুঁজতে হবে। এদিকে পঙ্কজকুমার মল্লিকের পরিবর্ত সুরকার ঠিক এই অনুষ্ঠানের জন্য পাওয়াও মুশকিল। বাংলা সংগীতের শরীরে আকছার বিদেশী স্বর-জোটের অনুপ্রবেশ ঘটছে। বর্তমান সুরকর্তারা সেই দিকে

মোহগ্রস্তভাবে আকৃষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু এ-সব জিনিস তো চলবে না আমাদের এই প্রোগ্রামে। তাই উপযুক্ত সুরকারের জন্যও অনেক ভাবতে হবে। আর গলায় সুর আছে এবং সংস্কৃত উচ্চারণ সাধু, বীরেন ভদ্রকে ছেড়ে দ্বিতীয় এমন মানুষটির অন্বেষণে ত্রিভুবন ঘুরতে হবে। কাজেই এই অনুষ্ঠানের আমূল পরিবর্তনের জন্য ভাবনাটার শুরু হওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই। কেন্দ্র-অধিকর্তার নোটের জবাব দিতে পারছি না। কেবল ভাবছি। একদিন দুপুরের আহারের পর তিনিই এলেন আমার ঘরে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য। বিনীত ভাবে সব বুঝিয়ে নিবেদন করলাম যে তাড়াহুড়োর কি দরকার, আগামী বছর একটু সময় হাতে নিয়েই নামব। প্রথমে একটু বিরক্ত হলেও সব দিক বিবেচনা করে আমার প্রস্তাবেই রাজী হলেন।

কেন্দ্র-অধিকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তনে আমার আপত্তির আর-একটা কারণও ছিল। এখানে কাজে যোগে দিয়েই বুঝতে পারলাম শীঘ্রই একটা ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে। দিল্লীর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে দশ বছর বা তার উপর যে শিল্পীগণ 'বি' শ্রেণীতেই রয়েছেন তাঁদের আবার নূতন করে অডিশন পাস করতে হবে। দিল্লীর নির্দেশ শিল্পীদের জানানো হয়েছে। একটা অসন্তোষ তো হবেই শিল্পীদের মধ্যে। বিক্ষুব্ধ শিল্পীরা সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছেন এই খবরটা কলকাতা এসেই জানতে পারলাম। এখন শিল্পী বিক্ষোভের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এর উপর আবার মহিষাসুর-মর্দিনী অনুষ্ঠানটি নূতন করে ঢেলে সাজাবার দায়িত্ব নেওয়া উচিত হবে না। প্রস্তাবিত এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধেও শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। অধিক সংখ্যক শ্রোতাও হয়তো এই পরিবর্তনটা চাইবেন না হঠাৎ করে। আমার এই আশঙ্কাটা সত্যে পরিণত হয়েছিল ১৯৭৬ সনে যখন 'দেবীং দুর্গতি নাশিনীম্' নামে নূতন অনুষ্ঠান উপহার দেওয়া হল শ্রোতাদের কাছে।

'বি'-শ্রেণীর শিল্পীদের নূতন করে অডিশন নেবার সিদ্ধান্তটা আমার কাছে খুব যুক্তিসংগত মনে হয় নি। শুধু 'বি'-শ্রেণীর শিল্পীরা কি অপরাধ করলেন? উপরের শ্রেণীগুলিতেও বেশ কিছু শিল্পী রয়েছেন যাঁরা গান গেয়ে শ্রোতার মনোরঞ্জন করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। উপরের শিল্পীদের দক্ষিণা অনেক বেশি এবং তাঁদের অনুষ্ঠানের সময়ও বেশি। সরকারের টাকাও অনেক বেশি খরচ হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর সেই শিল্পীদের জন্য। ওদিকে দীর্ঘ সময়ের অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের শ্রবণও উৎপীড়িত হচ্ছে। অথচ কর্তারা ধরলেন নিরীহ বি-শ্রেণীর শিল্পীদের যাঁরা বছরে একটার বেশি প্রোগ্রাম পাচ্ছেন না। অডিশন ছাড়া অন্য পথও ছিল। আস্তে আস্তে প্রোগ্রাম কমিয়ে দেওয়া যেত। উপরে যখন ছাঁটাই করা যাচ্ছে না তখন নীচের শিল্পীদের ছাঁটাই করার যুক্তি কোথায়? কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার আগে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ কোনো কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে নি। এখন আমাদের আর করার কিছু নেই।

এদিকে রেডিয়োর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য শিল্পী-সংঘ গঠিত হয়ে গেছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্ট এবং দুজন জেনারেল সেক্রেটারি হলেন সলিল চৌধুরী এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। রেডিয়োর সামনে পিকেটিং হতে পারে এমন একটা উড়ো খবরও পেলাম। দু-একজন শিল্পী আইনের সাহায্য নেবেন বলেও হুমকি দিলেন। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল: এই শিল্পীদের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটালাম। কত সহযোগিতা, ভালোবাসা পেয়েছি ওঁদের কাছ থেকে যা জীবনের অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে আছে। আজ তাঁদেরই প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াতে হবে। প্রতিটি শিল্পীই অতি কাছের মানুষ। বয়সে বড়োরা তুমি বলে নাম ধরে ডাকেন। ছোটোরা মিস্টার বলে না, দাদা বলে সম্বোধন করে। এই সম্পর্কটার মধ্যে একটা তিক্ততা এসে যাবে। রেডিয়োর মতো একটি প্রতিষ্ঠানের

সামনে ১৯৪৬-এর আগস্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া যেতে পারে না। হেমন্তবাবু, সলিলবাবু, চিন্ময়বাবু আমার বিশেষ বন্ধু। স্টেশন ডিরেক্টরের অনুমতি নিয়ে চিন্ময়বাবুকে সঙ্গে করে গেলাম হেমন্তবাবুর বাড়ি। সলিলবাবু কলকাতায় ছিলেন না। আমি সরকারের কর্মচারী। সরকারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলার অধিকার নেই। শুধু নিবেদন করলাম যে গ্রামোফোন কোম্পানিগুলি যখন শিষ্টাচারহীনভাবে একজন শিল্পীকে বিদায় জানায় তখন শিল্পী-সংঘের কী করার থাকে? জানতে চাইলাম সংগীতকে বাঁচিয়ে রাখতে অনুপযুক্ত শিল্পীকে বাদ না দিয়ে উপায় কী? এটা তার্কিকের কথা। আমার হৃদয়ের কথা নয় সেটা বলি কি করে? হেমন্তবাবু খোলা-খুলিই বললেন যে সমস্যাটা জটিল। তবে কলকাতা রেডিয়োতে অনেক বন্ধুজন, সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে চলতে হবে। হেমন্তবাবুরা বুঝতে পেরেছিলেন যে পরিস্থিতিটা কলকাতা কেন্দ্রদ্বারা সৃষ্ট নয়। পিকেটিং হল না। অডিশন শুরু হয়ে গেল।

এই অডিশনটা পরিচালিত হল অতিশয় নিরপেক্ষভাবে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। কলকাতার শিল্পীদের মূল্যায়নের জন্য একজন স্থানীয় সংগীতজ্ঞকেও ডাকা হল না। বিচারকমণ্ডলীর প্রতিজন সভ্যকে আনানো হল বাইরে থেকে। বোম্বাই-এর শিল্পীদের মূল্যায়নের জন্য নিয়োগ করা হল কলকাতার কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে। সুন্দর ব্যবস্থা। স্থানীয় শিল্পীর মাস্টারমশায় বা মামা, কাকা বা স্নেহপরায়ণ কোনো দাদা নন। এই অডিশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলেন চীফ প্রডিউসার অব লাইট মিউজিক অনিল বিশ্বাস এবং চীফ অ্যাডভাইসার অব মিউজিক কে. সি. ডি. বৃহস্পতি। দ্বিতীয়জন আমার পূর্ব পরিচিত।

অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় এই অডিশনের সূত্রে, যদিও একদা চিত্রজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসেবে তাঁর

খ্যাতিটা আমার অজানা ছিল না। দারুণ প্রাণবন্ত মানুষটি, দেহ ও মন সজীব এবং হৃদয়ের মোলায়েম উষ্ণতা সহজেই টের পাওয়া যায়। উইট এবং হিউমার -এর মিলনে একটি আনন্দের খনি। বড়ো ভালো লেগে গেল এই মানুষটিকে। উদারতার মনোভাব নিয়েই বিশ্বাস মশায় এবং বৃহস্পতিজি অডিশন পরিচালনা করলেন। তবু আমার মনে হয়েছে এর প্রয়োজনীয়তা ছিল না। প্রশাসনের প্রতি স্তরে কত দুর্নীতি এবং দক্ষতার অভাব। সে-সবের কথা ভাবল না সরকার। পার্জিংটা হল শুধু রেডিয়োর বি-শ্রেণীভুক্ত শিল্পীদের। তবে এই অডিশনের একটা ভালো দিকও ছিল। বাদ যেমন পড়ে গেলেন অনেকে, কয়েকজন আবার উচ্চতর শ্রেণীতেও উন্নীত হলেন। দু-একজন সরাসরি 'এ'-শ্রেণীতেও উঠে গেলেন।

এই অডিশনের সমস্ত দায়িত্বটাই ছিল দিল্লীর কর্তৃপক্ষের। আমাদের উপর ভার ছিল নির্দিষ্ট দিনে শিল্পীদের ডেকে দেওয়া, স্টুডিয়ো এবং সংগতের ব্যবস্থা করা। উচ্চাঙ্গ সংগীতের অডিশন হল তিন কিস্তিতে এবং লঘুসংগীতের ক্ষেত্রেও তাই। শিল্পী-সংখ্যা অনেক ছিল তো। একবার কিন্তু কোথায় একটা সমন্বয়ের ত্রুটি ঘটে গেল! বৃহস্পতিজি দিল্লী থেকে, প্রফেসর দেওধর বোম্বাই থেকে এবং রামচতুর মল্লিক পাটনা থেকে হঠাৎ এসে হাজির হলেন অডিশন নিতে। বললাম যে এ বিষয়ে কোনো খবর পাই নি দিল্লী থেকে আগে। সেজন্য শিল্পীদেরও ডাকা হয় নি অডিশনে উপস্থিত হতে। বৃহস্পতিজি এবং দিল্লী থেকে আগত সংশ্লিষ্ট এক সহায়ক মিস্টার কাপুর বজ্রাহত হয়ে গেলেন। হবারই কথা। মিস্টার কাপুর আমাকে জানালেন যে প্রায় দেড়মাস আগে রেজিস্ট্রি পোস্টে চিঠি পাঠানো হয়েছে কোন্ তারিখে অডিশন হবে সেটা জানিয়ে। মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। কিন্তু এখন এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত সেজন্য টেলিফোন করলাম দিল্লীতে।

ডিরেক্টর অব প্রোগ্রাম ভি. এস. শাস্ত্রী নির্দেশ দিলেন যে ইদানীংকালে টেপ্-করা উচ্চাঙ্গ সংগীত অডিশন কমিটির সভ্যদের শুনিয়ে দিতে। আগরতলা এবং শিলিগুড়ি কেন্দ্রের জন্য রেকর্ডিং পাঠাতে হয় বলে কলকাতার শিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রায় দশ-বারো দিন আগেই রেকর্ড করে নেওয়া হয়। এ-সব রেকর্ডিং শোনানো হল অডিশন কমিটির সভ্যদের। এর ফলে কয়েকজন শিল্পী উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত হলেন। কয়েকজনকে ছাঁটাই করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। এই ছাঁটাই-এর তালিকায় উচ্চ শ্রেণীর কজন নামী শিল্পীও ছিলেন। এতে আমার ধারণাটাই সমর্থিত হল যে উপরেও ছাঁটাই-এর প্রয়োজনীয়তা ছিল। হঠাৎ আমি চলে গেলাম অন্য এক কেন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। মনে হয় ছাঁটাই-এর নির্দেশ কার্যকর করা হয় নি। ঐ শিল্পীদের গান তো পরেও শোনা গিয়েছে। পরে কি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল ?

যে শিল্পীদের সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল বি-শ্রেণীর শিল্পীদের অডিশনের প্রতিবাদে সেটা কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। কিছুদিন পর তার অস্তিত্বই রইল না মনে হল। এমন একটা প্রতিষ্ঠানের যে বড়ো প্রয়োজন সাধারণ শিল্পীদের কল্যাণে। অন্যায় অবিচারের শিকার হন সাধারণ শিল্পীরা সেটা প্রায়ই দেখতে পাই, এই রেডিয়োর অডিশনের ফলেই বেশ কিছু সংখ্যক শিল্পী বলি হলেন। উচ্চ শ্রেণীর শিল্পীদের ক্ষেত্রেও যে সে ছাঁটাই-এর প্রয়োজন আছে বা ১৯৫৭ সনের পর কেনই বা অনুরূপ অডিশন আর করা হল না, এ-সব প্রশ্ন তুলে ধরতে পারে শিল্পীগোষ্ঠী একটা সংগঠন থাকলেই। আর সব চেয়ে বড়ো কথা সংগীতের অবক্ষয় বন্ধ করার প্রয়াস চালাতে পারে একটি সংগঠনই। শিল্পীদের কাছে আমার আবেদন বাংলা গান আবার আমায় ফিরিয়ে দিন। সংগঠন না থাকলে সে আবেদনের সাড়া কি করে পাব !

অসাধারণ একটি মানুষের দেখা পেলাম প্রায় ত্রিশ বছর পর। ছেচল্লিশের আগস্ট-এর পর এই মানুষটির অস্তিত্ব কলকাতার সংগীত-জীবন থেকে কি করে মুছে যায় সে ইতিহাস আমার জানা নেই। কিন্তু গ্রামোফোন এবং চিত্রজগতের অসামান্য এই সুরকার কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন? কেমন করেই বা? একদা সুরের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন সারা কলকাতাকে। অজস্র বাংলা গান এবং ভজনের সার্থক সুরকারটির কথা কলকাতাও ভুলে গিয়েছিল। শুধু মাঝে মাঝে প্রণব রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তিনি এই সুরকারের কথা তুলেছেন। শিল্পী নিজেই অতীতের পরিচয় দিয়ে বললেন যে এখন তিনি বিদেশী। বুকটা আমার হাহাকারে ভরে গেল। বসলেন অনেকক্ষণ, বললেন অতি সামান্য। শরীরটা ভালো নেই মনে হল। মানুষটিও স্বল্পবাক। যতই আমি চেষ্টা করি অতীতের নানা কথার উত্থাপনে তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে চান। নামটাও বদলে ফেলেছেন কিনা জানতে চাইলে ম্লান হেসেছিলেন। প্রতিবেশী পুব দেশের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে খুব যে একটা সক্রিয় জীবন যাপন করছেন না সেটা জানালেন। তবে যুক্তরাজ্য ঘুরে দেখে এসেছেন। একা, না সঙ্গী হিসেবে, বললেন না। আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন এখন আর গানে সুর দিচ্ছেন না। লিখছেন কিনা নিজেরই জীবনের অমর প্রেম কাহিনী? জবাবে পেলাম শুধু একটু হাসি। বহুকাল পরে কলকাতায় ফিরে এসে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন নি। মনে হল মানুষটি নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছেন। অতিপরিচিতা এক শিল্পীর নাম উল্লেখ করলাম। সেই শিল্পী ওঁরই সুরে কত গান গেয়েছেন। কিন্তু না, কিছুই বলাতে পারলাম না। একটু দীর্ঘ নিশ্বাস কি পড়ল! শুধু বললেন তাঁর জীবনে অতীতটা সম্পূর্ণ মুছে গেছে। আমরা কথা বলছিলাম কফি পান করতে করতে। স্টুডিয়ো থেকে রেকর্ডিং-শেষে উপরে উঠে এলেন ফিরোজা

বেগম এবং কফিপানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কফি পানান্তে নমস্কার জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন কমল দাশগুপ্ত এবং ফিরোজা বেগম।

এঁদের যাবার পানে তাকিয়ে থেকে মনটা আমার উদাস হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল বিশাল এক শিল্পীর অনুরাগের কাহিনী। নিজের মুখেই বলেছেন ছবছর বয়সে এক আত্মীয়ার কল্যাণে প্রেমের হাতেখড়ি হল। চোদ্দ বছরে 'সজ্ঞান কাণ্ড'। তার পর দেশে বিদেশে কত নারী-সহবাসের কাহিনী। এগুলিকে কি অনুরাগের শিরোনামের নীচে ফেলা যায়? ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের জীবনে এমন লোথারিও-সুলভ কান্তা-প্রেমের সংখ্যাটা অনেক বেশি। লেখার ও বলার সার্থকতাও কোথায়? যে প্রেম সম্মুখপানে চালিয়ে নিতে পারে না, যে প্রেম অমৃতে উত্তরণে সক্ষম নয়— তার রসঘন বর্ণনার কোনো মূল্য নেই, প্রয়োজন তো নেইই। কিন্তু যে প্রেম একটা জীবনকে সঞ্জীবিত করল, কমল-ফিরোজার সে প্রিয়সাধনার কথা না বলাই রয়ে গেল।

বাহাদুর খাঁ সাহেবের সরোদ বাজনাটা যেমন মিষ্টি, মানুষটিও তেমনি মধুর স্বভাবের। আমাকে দাদা বলে যে ডাকেন সে সম্বোধনটা পোশাকি নয়। পাশাপাশি গাঁয়ের মানুষ আমরা। তাঁর পিতৃদেব আয়েত আলি খাঁ সাহেবের আমি যদি কাকা হই তা হলে বাহাদুর খাঁ আমাকে দাদাই ডাকবেন। আমাদের দেশে গাঁয়ে-ঘরে এইরকম সম্বোধনের রেওয়াজ ছিল। বাহাদুর খাঁ সাহেব আমার বড়ো প্রিয় শিল্পী। তাঁর বাজনার গুণে তিনি সমগ্র দেশে আদৃত। আন্তরিকতা সহৃদয়তার জন্য সবারই আপন জন। দেশে যে তাঁর একটি ছোটো ভাই লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হয়েছেন এবং বাংলাদেশ বেতারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার সে খবর আমি রাখতাম না। চুয়াল্লিশের পর পুব বাংলায় যাওয়াও হয় নি আর। বাহাদুর খাঁ সাহেবও বোধ

হয় ভাই-এর কথা আমাকে জানাবার সুযোগ পান নি।

একদিন সেই ছোটো ভাই এবং ছোটো ভাই-এর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাহাদুর খাঁ এলেন। ছোটো ভাইটি সুদর্শন, সাতাশ-আঠাশ বছরের উজ্জ্বল তরুণ। বউমারও কল্যাণীশ্রী। শুনলাম ভালো গাইতে পারেন এবং ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের শিল্পী। এই পরিবারে কণ্ঠসংগীতের চর্চা নেই। বউমাটি সেই কণ্ঠসংগীত প্রবর্তন করলে তো সোনায় সোহাগার মিলন। বাহাদুর খাঁ ভাইয়ের স্ত্রীকে কলকাতা কেন্দ্রে একটি প্রোগ্রাম দিতে অনুরোধ করলেন। তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। সংগীত বিভাগে টেলিফোন করে তাড়াতাড়ি একটা রেকর্ডিং-এর তারিখ এবং সময় জানাতে বললাম। সংগীত বিভাগের প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ্ নিজেই এসে গেলেন। পরদিন এবং তার পরদিন রেডিয়ো সংগীত সম্মেলনের অধিবেশন আছে কলকাতায়। তিনটি সিটিং— দুটি হিন্দুস্থানী সংগীতের এবং একটি দক্ষিণী সংগীতের। কাজেই এই দুদিন নূতন কোনো রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আরো একটা অসুবিধার কথা জানালেন সংগীত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ক'দিন আগে 'কলকাতা বন্ধ'-এর ফলে গত সপ্তাহের সেই দিনে কোনো শিল্পী রেকর্ডিং-এর জন্য আসতে পারেন নি। সুতরাং ঐ-সব শিল্পীদের রেকর্ডিং প্রতিদিন কয়েকজন কয়েকজন করে আগামী তিন-চার দিনের ভিতর শেষ করে নিতে হবে। এগুলি পূর্ব নির্ধারিত দৈনিক রেকর্ডিং তালিকার অধিকন্তু। তাই তিন-চারদিনের আগে আর রেকর্ডিং তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না। সংগীত বিভাগের সমস্যাটা খুবই বাস্তব। এদিকে বাহাদুর খাঁ সাহেবের ভাই এবং ভ্রাতৃবধূ আরো তিন-চারদিন এখানে থাকতে পারছেন না। দুদিকেরই সমস্যা। বললাম যে এর পরের বার একটু আগে জানিয়ে রাখলে রেকর্ডিং করে নিতে অসুবিধা হবে না।

ছোটো ভাই হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'তা হলে we

shall retaliate'। কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না। বাহাদুর খাঁ সাহেবও বুঝলেন কিনা জানি না। খুবই দুঃখের বিষয় যে রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে আমাদের যথার্থ অসুবিধার কথাটা বাহাদুর খাঁ সাহেবও উপলব্ধি করলেন না। রেগে গিয়ে বললেন যে তা হলে তিনি বোম্বাইয়ে গিয়ে সংগীত সম্মেলনেব অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না। পরিস্থিতিটা অপ্রীতিকর হল। দুদিন পরেই আমন্ত্রিত শ্রোতার সামনে বোম্বাই-এর অধিবেশন। ওদের জানাতে হবে এখনই যে বাহাদুব খাঁ সাহেব যেতে পারবেন না। আমাদের টেলিফোন অপারেটারকে বোম্বাই কেন্দ্রে লাইটনিং ট্রাঙ্ককল করতে বললাম।

ক্যান্টিনকে চা পাঠাতে নির্দেশ দিলাম। চা খেতে খেতে বাহাদুর খাঁ সাহেবের ছোটো ভাইকে বললাম, ঢাকা ফিবে গিয়ে বাহায়ুদ্দিন চৌধুরীকে আমার নমস্কার জানাতে। বাহায়ুদ্দিন চৌধুরীর নাম বলতেই ছোটো ভাই সচকিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। কারণ আছে। বাহায়ুদ্দিন চৌধুরী বাংলা দেশ সরকারের তথ্য ও বেতাব মন্ত্রকের সেক্রেটারি। কথায় কথায় জানালাম যে তিনি খুবই অন্তরঙ্গ আমার। হয়ে গেল বোম্বাই কেন্দ্রের সঙ্গে ফোনের সংযোগ। বাহাদুর খাঁ উঠে এসে টেলিফোনের মাউথপিসের উপর হাত চাপা দিয়ে বললেন যে আজ রাত্রেই তিনি বোম্বাই রওয়ানা হচ্ছেন প্রোগ্রাম করতে। আমি তখন বোম্বাই কেন্দ্রেব সঙ্গে অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বললাম এবং বাহাদুর খাঁ সাহেব কোন্ ট্রেনে যাচ্ছেন তা জানিয়ে রেল স্টেশনে গাড়ি রাখতে অনুরোধ করলাম। টেলিফোনে কথা শেষ করে একটু হেসে ছোটো ভাইকে বললাম যে তাঁব retaliate কথাটার মানে বুঝতে পারি নি। কিন্তু তিনি যে উত্তেজিত হয়েছেন সেটা বুঝতে পেরেছি। বললাম যে অভিজ্ঞ লোক ক্রোধ এবং উত্তেজনাকে বিদেশে গিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ পর খাঁ সাহেব, ভাই এবং ভ্রাতৃবধূ চলে যাবার

জন্য উঠলেন। দাঁড়িয়ে আদাব জানালাম এবং রেকর্ডিং করার অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

ঘটনাটি ১৯৫৭ সনের নভেম্বরের। ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর থেকে মাত্র দু বছর পরের ঘটনা। মুজিবনগরের স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচার যাঁরা শুনেছেন এবং যাঁরা মুজিবনগরের ইতিহাস জানেন তাঁদের কাছে ঘটনাটি অস্বাভাবিকই মনে হবে।

১৯৫৭ সনের ১২-১৩ ফেব্রুআরির মধ্যরাত্রি। কলকাতা মহানগরীর কোলাহল থেমেছে। যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। রবীন্দ্রসরোবরের দিকটা তো ঘুমন্ত পুরী। এই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে নূতন একটা অ্যাম্‌ব্যাস্যাডার গাড়ি রসা রোড থেকে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে ঢুকল। খোলা সড়ক, অন্য কোনো গাড়ি নেই, নেই কোনো পথযাত্রী। গাড়ির গতি দ্রুত হওয়া স্বাভাবিক। পেছনের সীটে ডান দিক ঘেঁষে বসে আছেন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী অসামান্য এক জ্যোতিষ্মান পুরুষ। বামে মধ্যবয়সী নারী। সামনে চালকের পাশে গাড়ির মালিক। অতি দ্রুত গাড়ি চলছে পশ্চিম থেকে পুবে জনহীন যানবাহনশূন্য রাস্তায়। ওদিকে শরৎ বোস রোড দিয়ে দক্ষিণমুখী দ্রুতগামী আর-একটা গাড়ি সবেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে পুব দিকে ধাবমান গাড়িটির পেছনে। সেই সংঘর্ষের ভয়ংকর শব্দে এবং আরোহীদের আর্ত চিৎকারে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আশেপাশের গৃহবাসীরাও জেগে উঠল। চকিতেই ঘটে গেল অঘটন। পুবমুখী গাড়ি সেই প্রচণ্ড আঘাতে উলটো দিকে ঘুরে পশ্চিমমুখী হয়ে গেল। পেছনের দুটি দরজাই এই ভীষণ সংঘর্ষে যুগপৎ খুলে গেল। ছিটকে বেরিয়ে গেল সেই পুরুষের দেহ। রাস্তার কোণের একটি ইলেক্‌ট্রিক মিটার-বক্‌সের উপর মাথাটি সবেগে পড়ে চৌচির হয়ে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের মাথাটিও গেল। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ

আর কেউ নন, স্বয়ং উস্তাদ আমির খাঁ, খেয়াল গানের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

সংগীতের আজন্ম তপস্বী ক্ষণমাত্র আগেও জানতে পারেন নি শমন এসে নিষ্ঠুর আততায়ীর বেশে অলক্ষে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার মোড়ে। সংগীতের শান্তরসের সমাহিত শিল্পীর এই অপঘাত-মৃত্যুর দেবতাকে কি শ্যাম সমান ভাবা যায়? গাড়ির পেছনের সীটের দ্বিতীয় আরোহী শিষ্যা পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রাণে বেঁচে গেলেন, যদিও তিনি ছিটকে বেরিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন রাস্তার উপর। মাথার খুলিতে চার চারটি সেলাই এই আঘাতের সাক্ষ্য বহন করেছিল অনেকদিন। এই নিদারুণ ট্র্যাজেডির কথা পরদিন প্রভাতে মহানগরীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ, বাংলা-ইংরেজি কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল না। না, রেডিয়োর সকালের কোনো বুলেটিনেও নয়। যে-সব এজেন্সী সংবাদ সরবরাহ করে রেডিয়োকে তাদের কাছ থেকে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় নি। দুপুর একটার সর্ব-ভারতীয় রেডিয়োর ইংরেজি বুলেটিনে এই দুঃসংবাদ প্রথম প্রচারিত হল।

একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল সংগীতের। অকালেই থেমে গেল উস্তাদ আমির খাঁর কণ্ঠ। অনেক গুণের একত্র মিলনে সম্ভব হয়েছিল সংগীতের এই আমিরি। মহৎ এক শিল্পীর আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘ প্রস্তুতি। নিয়ামত খাঁ প্রবর্তিত খেয়াল গান দীর্ঘ দিনের সাধনার পথ পার হয়ে পেয়েছিল যোগ্যতম উত্তর-সাধকদের, আমারই কালে। উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ, উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ— সংগীতের একটা স্বর্ণযুগ। এঁদেরই মধ্যে স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন উস্তাদ আমির খাঁ অনুপম এক শৈলীর স্রষ্টারূপে।

খেয়ালী অর্থাৎ কল্পনাপ্রবণ না হলে রোমান্টিক খেয়াল গান

গাওয়া যায় না। সৃজনী কবিমানসের সঙ্গে মিলন ঘটেছে বিন্যাসের নৈপুণ্য, পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা এবং বিরল পরিমিতিবোধ আমির খাঁর আর্টে। বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা, আর গভীর রসবোধ— মস্তিষ্ক এবং হৃদয়, একই সঙ্গে সক্রিয় আমির খাঁর গানে। ধ্যানমগ্ন শিল্পীর সংগীতে গম্ভীর প্রশান্তি। শান্ত সমাহিত শিল্পীর রসঘন আত্মনিবেদন। রাগ আলপনার পরিধিটা সীমাহীন। স্বরবিন্যাসে চিকন সূচীকার্য, সুচারু নক্‌শা। ছোটো ছোটো স্বরবন্ধনীতেই বিচিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা। ধীর অনায়াস সঞ্চরণে স্বরগুলি রাগমূর্তিকে ফুটিয়ে তুলছে। এই গানে ছুটোছুটি নেই, অস্থিরতা নেই, স্বরের লাফালাফি নেই। বিজ্ঞাপনী প্রাণহীন কৌশলের চাতুরী নেই আমির খাঁর গানে! এমন মহান আর্টের বাহন অর্থাৎ কণ্ঠও চাই উপযুক্ত। দীর্ঘ অনু-শীলনের ফলে আওয়াজে আছে রসাল গভীরতা।

উপরে নীচে কোথাও ধ্বনিবৈশিষ্ট্য হারায় না। অতি দ্রুত তানেও শ্রুতি-বিচ্যুতি নেই। আর এই তানেও কত ঐশ্বর্য! অনেক দূর দূরান্তের স্বরগুলির মধ্যেও মৈত্রীবন্ধন। 'রে' যদি মধ্য সপ্তকের তবে 'গা' হতে পারে তার সপ্তকের। কিন্তু তানের পরিক্রমা এতই সহজ যে এই দুটি স্বরকে মনে হবে নিকট প্রতিবেশী। আর খেয়ালের বন্দিশের মধ্যেও কত মুনশীয়ানা। স্থায়ী বলাটাই যেন গীতিময়। খুব সহজে রপ্ত করা যায় না। ভিন্নকণ্ঠে যেন তত ভালোও লাগে নি। আর তারানাগুলিও রচনার সৌকর্যে ও লালিত্যে একেবারে ভিন্ন স্বাদের। যা শুনে এসেছি এতকাল সেই শ্রেণীরই নয়। অনেক তারানার মধ্যে সুচারুভাবে আমির খসরুর ফার্সী লিরিকও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে উস্তাদ আমির খাঁর সংগীত এমন একটা শিল্পরীতি যা আধুনিক কালে সব চেয়ে গুরুত্ব অর্জন করেছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ঘরাণার প্রত্যক্ষ প্রবহমান প্রভাব থাকলেও আমির খাঁর শৈলীকে পাশ কাটিয়ে সংগীতের শিক্ষা

সম্পূর্ণ হবে মনে হয় না। উস্তাদ আমির খাঁর শিল্পশৈলী এবং সাধনা সম্পর্কে আগ্রহ এবং জিজ্ঞাসা ছাড়া সমকালের কোনো শিল্পীর পরীক্ষানিরীক্ষা সার্থক হতে পারে তাও মনে হয় না। আমির খাঁর সংগীতচিন্তা অনুপ্রাণিত করবে বহুকে এবং এই স্টাইলটাই হবে সমকালের বহু শিল্পীর অন্বিষ্ট, যদিও সহজে অনুকরণীয় নয়।

ঠিক এক সপ্তাহ পরই পাহাড়ীদাও চলে গেলেন। পাহাড়ী সান্যাল মশায় রেডিয়োতে কখনো গান গেয়েছেন মনে পড়ে না। কিন্তু তিনি ছিলেন রেডিয়োর এক পরমবন্ধু। সেজন্য আমাদের যোগাযোগটা ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। এদিকে গানেরও মস্ত বোদ্ধা একজন শ্রোতা। তাঁর উপস্থিতিটাই শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করত। যেমন উপভোগ করতে জানতেন সংগীত তেমনি শিল্পীকেও সমুচিত মর্যাদা জানাতেন অকুণ্ঠিত প্রশংসায়। আমাদের সব বিশেষ অনুষ্ঠানেই পাহাড়ীদার কাছে সাদর আমন্ত্রণ পাঠাতাম। তিনি এসেছেনও। পাহাড়ীদার আন্তরিক তারিফ, 'বাহ্', 'কেয়াবাত', অনেক সময়ই ধরা পড়ে যেত আমাদের রেকর্ডিং-এ। আপত্তি করব কেন? আমন্ত্রিত শ্রোতার তারিফে পরিবেশনার সুষ্ঠুতা ব্যাহত হয় না। গানের আসরে এমন মজলিসী মানুষটিকে আর দেখতে পাব না। সমকালের শিল্পীরাও পাহাড়ীদাকে কতখানি ভালোবাসতেন, অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন এই যথার্থ শিল্পীকে, শ্রদ্ধাঞ্জলিতেই প্রকাশ পেল সেটা। বলতে গিয়ে পঙ্কজকুমার মল্লিকের কণ্ঠ ভেঙে পড়ল রুদ্ধ কান্নায়। অনেক কষ্টে পঙ্কজবাবুর রেকর্ডিং করা গেল। গভীর বেদনায় বুকের ভিতর যেন নিশ্বাস আটকে যাচ্ছিল বার বার। পাহাড়ীদার প্রতি কানন দেবীরও কি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা তাও অনুভব করলাম। কানন দেবীর বাড়িতেই গিয়েছি কবিতা সিংহ এবং আমি। পাহাড়ীদার মতো সত্যিকারের একজন শিল্পীর প্রতি সমাজের একটা বিরাট কর্তব্য আছে। দীর্ঘদিন যে শিল্পী গানে, অভিনয়ে, মধুর

বচনে লক্ষ লক্ষ প্রাণে আনন্দ পরিবেশন করেছেন, শেষের দিনের সেই শিল্পীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা সমাজের, দেশের সরকারের দেখা উচিত ছিল— সে কথা বলতে বলতে কানন দেবীর চোখ অশ্রুসজল হয়েছিল। তার পর অনেক পরবর্তী কালের, দেশের সেরা সুরকার সলিল চৌধুরী বললেন কাছের মানুষ পাহাড়ী সান্যালের কথা। বিদার নেবার কাল কি হয়েছিল পাহাড়ীদার!

হিন্দিতে বলে বৃন্দগান, বাংলায় মিলিতকণ্ঠে বা সমবেত কণ্ঠে অর্থাৎ ইংরেজির কোরাস গান। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে পাঁচ-সাত জন ছেলেমেয়ের ঐকতান সংগীত অনেক কেন্দ্রেই কমবেশি প্রচার হয়ে থাকে এবং অনেক কাল আগে থেকেই। কিন্তু এ বিষয়ে একটা সুসম্বদ্ধ প্রয়াস, বহু স্ত্রী-পুরুষের একসঙ্গে গান করার চেষ্টা রেডিয়োতে বড়ো একটা হয় নি। দীর্ঘদিন আমি দিল্লীতে থেকেছি। সেখানেও ঐ পাঁচ-সাত জন বা বড়োজোর আট-দশ জনের বেশি শিল্পীর একসঙ্গে গাওয়া দেখি নি। ভারতীয় সংগীতের যে ট্র্যাডিশন তাতে শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতা গাইবার সময়। কোরাস গানের মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত সেই স্বাধীনতা কোথায়? কিন্তু বহুকণ্ঠের একত্র মিলনে যদি নোটেশনে বাঁধা গান গাওয়া হয় তারও একটা আবেদন থাকবে নিশ্চয়ই। শুনেছি, অতীতে একদা আই. পি. টি. এ.-র এই প্রচেষ্টা ছিল। আমার সে গান শোনার সৌভাগ্য হয় নি।

ইদানীং কালে রুমা গুহঠাকুরতার নেতৃত্বে ক্যালকাটা ইউথ ক্যোঅ্যার মঞ্চে ত্রিশ-চল্লিশ বা আরো বেশি শিল্পীর মিলিত গান পরিবেশন করছে। এরকম একটা প্রোগ্রাম শুনেই আমাদের মন্ত্রী আই. কে. গুজরালের মাথায় আইডিয়াটা এল। তিনি নির্দেশ দিলেন কলকাতা কেন্দ্রে রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায় একটা কোরাল গ্রুপ তৈরি করে নিতে। রুমার সঙ্গে আলোচনা করে প্রায় চল্লিশজন ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটা গ্রুপ গঠন করা হল।

রিহ্যার্সালও শুরু হল। দেখলাম রুমার বলিষ্ঠ লিডারশিপ, দক্ষ পরিচালনা এবং অতি আন্তরিক নিষ্ঠা। শিল্পীদের যেমন ভালোবাসেন তাঁদের খাটিয়েও নিচ্ছেন তেমনি, কোনো ফাঁকি নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই চারখানা গান তৈরি হয়ে গেল। রেকর্ড করতে গিয়ে একটা অসুবিধা দেখা দিল।

কলকাতার স্টুডিয়োতে তিনটির বেশি মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা করা গেল না। কিন্তু রুমা চাইছেন সাতটি মাইক্রোফোন। আমি স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনিবাস এবং তাঁর উপরের ইঞ্জিনিয়ার-ইন্-চার্জ জে. এম. রায়ের শরণাপন্ন হলাম। কিন্তু তাঁরাই বা কি করবেন! সাতটা মাইক্রোফোন অসম্ভব। ইতিমধ্যে সরকারি কাজে গুজরাল সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন। রুমার কোরাস গানের রিহ্যার্সাল শুনে খুশি হলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্টুডিয়োর মাইক্রোফোনের অভাবের কথা উল্লেখ করলেন রুমা। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলে মন্ত্রীমশায় অন্য উপায় না দেখে এইচ. এম. ভি.-র স্টুডিয়ো ভাড়া নিতে অনুমতি দিলেন আমাদের। ঘণ্টায় দেড়শো টাকা রেটে তিন ঘণ্টার জন্য ভাড়া নেওয়া হল দমদমে এইচ. এম. ভি.-র স্টুডিয়ো। কলকাতার রেডিয়োর ইতিহাসে এটাও একটা নতুন ঘটনা। আমি নিজে ইঞ্জিনিয়ার নই, তিনটির বেশি মাইক্রোফোন কখনো প্রোগ্রামের কাজে ব্যবহার করি নি। সাতটি মাইকের যুগপৎ ক্রিয়াশীলতা দেখাবার জন্য স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ার-ইন্-চার্জকে নিয়ে গেলাম এইচ. এম. ভি.-র স্টুডিয়োতে। সাতটি মাইকই নিলেন রুমা গুহঠাকুরতা। যন্ত্র এবং কণ্ঠের সুন্দর সংহতি। রেকর্ড করলেন এইচ. এম. ভি.-র নিজের ইঞ্জিনিয়ার। দেখলেন আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা। আমাদের স্টুডিয়োতে সেইরকম সাজ-সরঞ্জাম নেই। আর কিছু কিছু আছে মিউজিঅ্যামে পাঠাবার উপযুক্ত।

১০

আবার আমার ডাক এসে গেল বেরিয়ে পড়ার। ক'দিনই বা রইলাম কলকাতায় এবার! একটি বছরও পোরে নি। নূতন দেশ দেখব, মানুষের বিচিত্র রূপ দেখব অজানা পরিবেশে, না গিয়ে কি পারি! রাত্রিশেষে দমদম বিমান বন্দরের পথে কাঁকুরগাছিতে পৌঁছে আমার গাড়ি থেমে গেল। অঝোর ঝরছে বৃষ্টি। আমার বয়স্ক গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়েছে। রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। আর-একটি গাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই এই জায়গায়। ভাবলাম প্লেন আর ধরা হল না আজ। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন। একটি জীপগাড়ি এসে দাঁড়াল পাশে। সজ্জন আরোহী জীপে উঠে আসতে অনুরোধ করলেন। একাই যাচ্ছেন তিনি, গন্তব্যস্থল বিমানবন্দর। পথ চলতে কত যে সহৃদয়তা পেয়েছি জীবনে!

এয়ারপোর্টে পৌঁছনোর আগেই বৃষ্টি থেমেছে। একটু দেরি করেই ছাড়ল বলে প্লেন ধরতে পারলাম। আকাশে উড়ল হাওয়াই জাহাজ। স্পীকারে ধ্বনিত হল শুভ প্রভাত যাত্রীদের উদ্দেশে। ঘোষণায় বলা হল কাপ্তেন ব্যানার্জি এই প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কোমরের বেল্ট্ খুলে আরাম করে বসতেও অনুরোধ জানানো হল। জানলার ধারে বসেছি। আকাশে রোদ-মেঘের খেলা, নীচের বাড়ি-ঘর গাছপালা, খোলা সবুজ মাঠ দেখতে দেখতে কখন একটু তন্দ্রা এসেছে চোখে।

হঠাৎ মনে হল পাশের খালি আসনটিতে কেউ এসে বসলেন। চোখে মেলে দেখি প্রায় জঙ্গী পোশাকে এক তরুণ আমার দিকে

তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

সেই তরুণ বললেন, 'এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন?'

গায়ের গন্ধটা মেয়েলি, গলার আওয়াজটাও সেরকমই। চেনা মনে হচ্ছে না।

কিন্তু আবার কোমল কণ্ঠেই বললেন, 'দেরি দেখে ভেবেছিলাম আসতেই পারলেন না বোধ হয় বৃষ্টির জন্য।'

এত পরিচিতের মতো কথা বলছেন কে তিনি। আমিও একটু হেসে মাথার টুপিটা খুলে নিতে বললাম। না হলে মানুষটিকে চিনতে পারছি না যে।

টুপিটা এবং চোখের কালো চশমাটা সরিয়ে নিতেই আশ্চর্য হয়ে বললাম 'মিস ব্যানার্জি, আপনি?'

উত্তরে জানালেন মাইকের ঘোষণাতেই বলা হয়েছে তিনিই প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

বললাম, 'না, ঘোষণায় সেটা বোঝা যায় নি। বলা হয়েছে কাপ্তেন ব্যানার্জি পাইলট। মিস্ ব্যানার্জি বললেই তো বুঝে নিতাম সহজে।'

এই মেয়েটি ছাড়া আর তো দ্বিতীয় মহিলা পাইলট নেই এয়ার লাইন্‌সে।

জিজ্ঞাসা করলাম কি করে তিনি জানলেন যে এই প্লেনের আমিও একজন যাত্রী।

তিনি জানালেন যে দিদির কাছে শুনেছেন।

পাইলট কাপ্তেন মিস্ দূর্বা ব্যানার্জি আমার প্রিয়বান্ধবীর ছোটো বোন।

ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঘোষণায় মিস্ ব্যানার্জি বলা হয় নি কেন?'

'একটি মেয়ে প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন জানলে কি যাত্রীরা

নিরাপদ বোধ করতেন ?'

এই কথা বলে মিস্ ব্যানার্জি বেশ গলা খুলেই হেসে উঠে কক্‌পিটের দিকে চলে গেলেন। ব্রেকফাস্টের পর এক এয়ার হোস্টেস্ আমায় নিয়ে গেলেন কক্‌পিটে। যেই ঢুকেছি তক্ষুনি মনে হল ইঞ্জিনটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মেরে একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করছে। প্রচণ্ড শব্দ। এখনই মৃত্যু ভেবে চোখ বুজে ফেললাম।

'কেমন লাগছে।' মিস্ ব্যানার্জির এই আহ্বানে সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

প্লেনটা মেঘের পাহাড ভেদ করে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু এই শব্দ নিতে পারছে না আমার কান। বের হয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। এক ঝলকই দেখেছি কক্‌পিট। এত ছোটো জায়গায় বসেছেন পাইলট এবং কো-পাইলট দুজনে। কত যে যন্ত্রপাতি এর ভিতরে! মনে হয়েছিল প্লেনের বাইরে হাওয়ার উপর দুজন মানুষ। সামনে সমস্ত জগৎটাই খোলা। কয়েক মিনিট বসলেই তো কানের বারোটা বেজে যাবে। কক্‌পিটে বসে প্লেন চালানোটা সহজ কর্ম নয়। এ জন্যই প্রতি ছ'মাস অন্তর পাইলটদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার নিয়ম।

আমার প্লেন নীচে নামল। উদার উন্মুক্ত আকাশ, চার দিকে অনুচ্চ পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। মনোরম দৃশ্য। এয়ারপোর্ট এলাকাটার নাম কুম্ভীরগ্রাম। আমার গন্তব্য শিলচর শহর প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। গাড়িতে বসে স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার পার্থসারথি সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় স্টেশন সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া পেলাম। এখন অফিস একটি ছোটো ভাড়াটে বাড়িতে। নিজেদের স্টুডিয়ো এবং অফিস-গৃহ তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। স্টাফ কোয়ার্টার তৈরির কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে। আর যে জমি কেনা হয়েছিল স্টুডিয়ো এবং অফিস-গৃহের জন্য তার ভিতরেই একটা পুরনো বাংলো ছিল। সেই বাংলোটিকেই সংস্কার করে নিয়ে

সাময়িক কাজ চালাবার মতো স্টুডিয়োতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পার্থসারথিকে বুদ্ধিমান এবং পরিচ্ছন্ন মানুষ মনে হল। প্রথম দর্শনেই মানুষটি সম্পর্কে যে ধারণা হল তা আর বদলাতে হয় নি। বিচক্ষণ অফিসার ; সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়েছি, আন্তরিক সহযোগিতাও পেয়েছি এই মানুষটির কাছ থেকে সর্বদা।

যথাসময়ে অফিসে গেলাম। হায় কপাল! বাড়িটার দীন-দরিদ্র চেহারা দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। অতি সামান্য ছোটো একটি টিনের চালের ঘর। তাতেই পায়রার খোপের মতো কয়েকটি কামরা। এত নিকৃষ্ট অফিস-বাড়ি হতে পারে সেটা কল্পনাও করতে পারি নি। কেন্দ্রীয় সরকারের চারজন এ-গ্রেড অফিসার, ছ'সাতজন বি-গ্রেড গেজেটেড্ অফিসার, তার উপর হেড ক্লার্ক, অ্যাকাউন্টেন্ট, ক্যাশিয়ার, প্রোগ্রাম সেক্রেটারি, স্টেনোগ্রাফার এবং রয়েছেন করণিক-গণ। বাড়িটাতে তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনের কামরার মতো ভিড়। ট্র্যান্স্‌মিশন এগ্‌জিকিউটিভ, ইঞ্জিনিয়ার, ঘোষক, স্টাফ আর্টিস্ট যন্ত্রীগণ স্টুডিয়োতেই থাকেন। কিন্তু অফিস বাড়িতে কোনো প্রয়োজনে এঁরা সকলে এসে গেলে দাঁড়াবার জায়গাই হবে না। পরিবেশটাও কি নোংরা! সামনে একটি পচা ডোবা কচুরিপানায় ভরতি। স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার বললেন যে এই ডোবার স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে সাপ, ব্যাঙ ছাড়া অসংখ্য ছিনেজোঁকও আছে। গ্রীষ্মকাল, আমার পায়ে খোলা জুতো। একটু কণ্ডুয়নের ইচ্ছা হল। পায়ে হাত দিয়ে নরম কিছু ঠেকল। নীচে নুয়ে তাকিয়ে দেখি একটি ছিনেজোঁক পায়ে প্রণতি জানাচ্ছে নতুন অতিথিকে। ভয় পাই নি, পুব বাংলার মানুষ আমি। জোঁকের অভিজ্ঞতা আছে। ভেবে পেলাম না এমন একটা বাড়ি রেডিয়োর জন্য ভাড়া নেওয়া হল কেন। দু বছর আগে স্টেশন খোলা হয়েছে। একটি বড়ো বাড়ি পাওয়া গেল না? আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে বসবার পর সবাই দেখা করতে

আসছেন। কিন্তু আমার এই কামরায় সকলে একসঙ্গে ঢুকবেন কি করে! বললাম যে আমিই প্রত্যেকের কামরায় গিয়ে পরিচয় করে আসব। ঘুরে ঘুরে সবগুলি ঘর দেখলাম। এখানে বসে কোনো কর্মী ভালোভাবে কাজ করবে আশা করতে পারি না। এতে সরকারেরই ক্ষতি হচ্ছে।

স্টুডিয়ো দেখে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। অফিস থেকে প্রায় এক মাইল দূরে স্টুডিয়ো। তিনটি অধিবেশনে যে বেতারকেন্দ্র দীর্ঘ সময় অনুষ্ঠান প্রচার করে সেখানে ছেলেখেলার মতো সমস্ত ব্যবস্থা। কথিকা, সংগীত, নাটকের জন্য একই স্টুডিয়ো। এমন-কি, ঘোষকেরা এই স্টুডিয়োতে বসেই ঘোষণা করেন এবং গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ এই স্টুডিয়ো থেকেই বাজান। সাকুল্যে একটি মাত্র স্টুডিয়ো। অস্বাভাবিক ব্যাপার। দু বছরের উপর চলেছে এই অদ্ভুত অবস্থা। এটা রণক্ষেত্র নয়, যুদ্ধও চলছে না যে যেন-তেন প্রকারেণ অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে হবে। জানি, আমাকে উপরঅলা কেউ বলবেন যে নূতন স্টুডিয়ো তো তৈরি হয়েই যাচ্ছে। আর কদিনই বা লাগবে। কিন্তু এমনটা একদিনও চলতে দেওয়া উচিত ছিল না। বিস্মিত হলাম ভেবে যে ডিরেক্টর জেনারেল কিংবা চীফ ইঞ্জিনিয়ার এরকম একটি ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন। হয়তো রাজনৈতিক চাপ ছিল যার ফলে বেতার মন্ত্রক রাতারাতি রেডিয়ো স্টেশন খুলতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু স্টুডিয়ো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠান চালানো যায় না সে কথা উপরঅলাকে বললে চাকরিতে ক্ষতি হবার কোনো ভয় থাকে না। আর থাকলেও বলতে হবে, না হলে অসাধুতা হবে। যা সম্ভব নয় সেটা মন্ত্রক বুঝবে না কেন? শুধু গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে যাওয়া যেত স্টুডিয়ো সম্পূর্ণ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত।

আমরা কর্মচারী, সরকারি আদেশকে মাথা পেতে নিতে বাধ্য। কিন্তু একটা সরকারি নীতি বা আদেশের অযৌক্তিকতা যদি না বলি

তা হলে কর্তব্যের ত্রুটি হবে না? বলাটার মধ্যে আন্তরিকতা এবং আনুগত্যের ভাব অবশ্য থাকতেই হবে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সেক্রেটারি, যুগ্মসেক্রেটারিদের সামনে বিনীতভাবে একদা আমি নিবেদন করেছি যে জরুরি অবস্থাকালীন রেডিয়োকে প্রচারযন্ত্রে পরিণত করা হলে পরিণামে অনিষ্টই হবে। সে প্রচারে শ্রোতাসাধারণ কর্ণপাত করবে না, বরঞ্চ উলটো ফল হবে। প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হওয়া দূরে থাকুক সাধারণ মানুষের আস্থা ভেঙে যাবে এবং সরকারবিরোধী হবে লোকের মন। আমি অতি নগণ্য কর্মচারী। আমার বলাটা অরণ্যে রোদনই হয়েছিল। কিন্তু সেই বলাটা বিধৃত রয়েছে ১৯৫৭-এর সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত স্টেশন ডিরেক্টরদের বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণীতে। ক্ষতি আমার হয় নি। এই কেন্দ্রে স্টুডিয়োর এমন শোচনীয় দুরবস্থায় তিন তিনটি অধিবেশনও চালু করা উচিত হয় নি।

তাজ্জবের আরো বাকি ছিল। এই কেন্দ্রে ঘোষকগণ দিন-মজুরিতে কাজ করে যাচ্ছেন। একটি রেডিয়ো স্টেশনকে চালু রাখতে হলে সকলের আগে প্রয়োজন হল ঘোষকের। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী এখানে কাউকে নির্বাচিত করা হয় নি। দু বছর দৈনিক চুক্তিতে কাজ করে যাচ্ছেন ঘোষকগণ। প্রডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্টরাও এইভাবেই কাজ করছেন। এমন একটা অরাজকতার মধ্যে আমি কাজ করব কিভাবে ভেবে পেলাম না। নির্ধারিত হারে মাইনে পাচ্ছেন না এঁরা, ছুটি নেই। একদিন কাজ না করলে সেদিনের মাইনেও পাবেন না। এমন অবস্থায় এঁদের কাছ থেকে নিষ্ঠা বা আনুগত্য কী ভাবে আশা করা যায়? এঁরা না এলে রেডিয়ো চলবে কিভাবে! এই-সমস্ত প্রশাসনিক ত্রুটির কথা জানিয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেলের কাছে দিল্লীতে চিঠি লিখলাম। আমার কর্তব্য আমি করলাম। শিগগিরই আমায় দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন ডি. ডি. জি। দিল্লীতে যখন পৌঁছলাম তখন তিনি ডিরেক্টর জেনারেল পদে উন্নীত হয়ে গেছেন।

আমার কাজটা সহজ হয়ে গেল। সমস্যাগুলি ডি. জি. পি. সি. চ্যাটার্জির কাছে নিবেদন করলাম। দৈনিক চুক্তিতে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের সবাইকে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে নিযুক্ত করার আদেশ হয়ে গেল। স্টুডিয়ো তৈরির কাজও ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হল।

এই নূতন জায়গায় এসে শুরুতে রেল ধর্মঘটের বিভ্রাটেও পড়তে হয়েছিল। ১৯৫৭ সনের আট মে তারিখে আরম্ভ হয়ে লাগাতার সাতাশে মে পর্যন্ত চলেছিল সে ধর্মঘট। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নিউজ এডিটরকে বললাম যে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভালোভাবে যোগাযোগ রাখতে। গাড়ি কোথাও যদি চলে সে খবর রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিতভাবে না পেলে প্রচার করা হবে না এবং বলতে হবে যে রেলকর্তৃপক্ষ এ খবর জানিয়েছেন। মোট কথা স্থানীয় কোনো পত্রিকায় এমন কথা লেখবার সুযোগ যেন না দেওয়া হয় যে রেডিয়ো স্টেশনের গেটে রেলের টাইম্‌টেবল্‌ টাঙানো আছে যদিও রেল-স্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। তবে ট্রেন না চলার ফলে অপূরণীয় ক্ষতি যদি ঘটে গেল কারো ; দূর অঞ্চলে অসহায় অবস্থায় যদি কেউ আটক পড়ে গিয়ে থাকেন, বিয়ে যদি ভেঙে গেল ; ইণ্টারভিউ দিতে যেতে পারলেন না নির্দিষ্ট দিনে কোনো প্রার্থী—জনসাধারণের সে-সব দুর্গতির কাহিনী নিশ্চয় বলতে হবে। তবে খুব সতর্কতার সঙ্গে এ সব ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে হবে। দেশের মানুষ তো বুঝতেই পেরেছিল এই গরিব দেশের কি অসামান্য আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেল ধর্মঘটের ফলে। সুতরাং জনমত তৈরি করার খুব বেশি চেষ্টা করতে হয় নি আমাদের। ইতিমধ্যে রাজস্থানের পোখরনে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবার ফলে ভারত অভিজাত নিউক্লিয়ার ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের ইমেজটাও অনেক বড়ো হয়ে গেল। ক'দিন পর রেল ধর্মঘটও শেষ হল।

এ শহরটিকে ঘুরে দেখলাম। রোজই বেরিয়ে পড়ি বেড়াতে ভোরে বিকেলে। নদী আছে, কাছে পাহাড়ও আছে এমন একটা সুন্দর শহর বড়ো তো দেখা যায় না। বরাক নামে নদীটি দক্ষিণ-পুব-উত্তরে ঘিরে রয়েছে শহরকে। এয়ারপোর্টের পথে বেশ লম্বা বরাকের পুলের উপর দাঁড়িয়ে সূর্য ওঠা আর সূর্য ডোবার কি অপূর্ব দৃশ্য! সেতু পার হয়ে গেলেই তো রাস্তার দুধারে সবুজ ধানের খেত। একটু এগিয়ে পায়ে-চলা পথে কত গাঁয়ে গিয়েছি, পরিচয় হয়েছে সরল মানুষগুলির সঙ্গে, শুনেছি তাদের সুখদুঃখের কথা। গ্রাম দেখি নি দীর্ঘকাল। এখানে এসে আমার মধ্যে গাঁয়ের মানুষটিকে আবিষ্কার করলাম। আর হাত বাড়ালেই তো পাহাড়, পাহাড়ের ঢালুতে চা-বাগিচা। যোগাযোগের দিক থেকেও কত গুরুত্ব এই ছোটো শহরটির। মিজোরামে যেতে হবে এই শহরের উপর দিয়েই। মোটরে, বাসে বা প্লেনে আর কোনো পথ নেই এই প্রত্যন্ত রাজ্যে যাবার। প্রতিদিন বাস যাচ্ছে মিজোরামের আইজলে, মেঘালয়ের শিলং-এ, এ রাজ্যের রাজধানী গৌহাটিতেও। এই শহরের পাশ দিয়েই ত্রিপুরার প্রধান শহর আগরতলা যাবার সড়ক। আবার মণিপুর রাজ্যের ইম্ফলের দিকেও বাস ছুটছে প্রতি সকালে।

মানুষও কত বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর। তাই একটা কাল্‌চারাল্ মোজেইক দেখতে পেলাম এখানে। বাঙালি, অসমীয়া, কছাড়ি, ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মণিপুরী— মিতেই, বিষ্ণুপ্রিয়া, মোঘলাই মণিপুরী— সবারই একসঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবাস। এক প্রৌঢ় মুসলমান অ্যাড-ভোকেট নিজে মোঘলাই মণিপুরী বলে দাবি করেন। তিনি একদিন কুলপঞ্জীর পাতা মেলে ধরলেন আমার সামনে। এক মুঘল সেনা-বাহিনী মণিপুর রাজ্যে অভিযান চালিয়েছিল। একটি দল মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফেরার রাস্তা অজানা। রয়েই গেল সে দলটি সুদূর এই মণিপুর রাজ্যে। নিরুপায় হয়ে অস্ত্র

পরিত্যাগ করে রাজার কাছে থাকবার অনুমতি চাইল। অনুমতি লাভের পর ঘর বাঁধল, ঘরণীও পেল। এই ভাবেই মোঘলাই মণিপুরী গোষ্ঠীর উদ্ভব। এই সম্প্রদায়েরই বেশ কিছু লোক বসতি পেতেছে এই শহরে এবং আশেপাশে। মনে পড়ে পার্লামেন্টের এক সদস্য এসেছিলেন মণিপুরী অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করতে। তিনিও কি মোঘলাই মণিপুরী? না হলে মণিপুরী অনুষ্ঠানের বিষয়ে এই আগ্রহ কেন?

এক সন্ধ্যায় শহরের পথে হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেলাম এক বাড়ির সামনে। লতায় পাতায় বিচিত্র রঙের আলোকে সাজানো গেটের উপর বড়ো বড়ো করে লেখা 'কন্যাদান'। বুঝতে পারলাম এই বাড়ির মেয়ের বিয়ে। পরদিন শহরের আর-এক প্রান্তে বেড়াতে বেড়াতে সুন্দর করে সাজানো আলোকমালায় উজ্জ্বল আর-এক বাড়ির সামনে দেখতে পেলাম 'বধূবরণ' কথাটি। কুলবধূকে বরণ করে নেবার অনুষ্ঠান। কি জানি আগের দিনের সেই কন্যাকেই কুললক্ষ্মী রূপে বরণ করে নিচ্ছে কিনা এই গৃহে! আমি সমতটে, বরেন্দ্রভূমে রাঢ় অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। কখনো কোথাও কি এমন সুষমামণ্ডিত ভাষায় কন্যাদান, বধূবরণ লেখা দেখেছি? কি গভীর ভাব, কত মধুর প্রকাশ। কন্যাসম্প্রদানের করুণবেদনা আর নববধূ আবাহনের হার্দ্য উষ্ণতা কি অসামান্য ভাষায় রূপ পেল। মেয়ের বিয়ে ছেলের বিয়েকে যাঁরা কন্যাদান, বধূবরণ বলেন কৃষ্টির দিক থেকে তাঁরা আমার কয়েক ধাপ উপরে মেনে নিলাম।

আরো যে সুন্দর কিছু দেখেছি এই বিয়েরই ব্যাপারে। আমায় নিমন্ত্রণ করলেন রাম ভটচার্য ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম গৃহস্বামীর বিনীত অনুরোধ অভ্যাগতদের প্রতি— 'উপহার দিবেন না, গ্রহণ করতে পারব না, শুধু আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি।' কোনো উপহার নিলেন না। আমার সমাজে বিয়ের

চিঠিতে লেখা দেখেছি লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। কিন্তু উপহার না পেলে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হতেও দেখেছি। খাতা পেন্‌সিল নিয়ে কে কি দিল লিস্ট করতে বসে গেল কেউ, তুলনায় আমার উপহারটি অকিঞ্চিৎকর বলে সংকোচ বোধ করেছি। কিন্তু কি করব, আমার যে সামর্থ্য নেই। উৎসবে যোগদানের বাসনা আমার আন্তরিক। অথচ নিমন্ত্রণের চিঠি পেলেই আতঙ্ক জাগে মনে। এই রাম ভটচার্যের পরিবারেই অনেক কাল আগে লোপ পেয়ে যাওয়া আর-একটি জিনিস দেখতে পেলাম। সাত-আট ভাই-বোনের একটি যৌথ একান্নবর্তী পরিবার। সবাই আলাদা আলাদা উপার্জন করছেন, অবিবাহিত বোনেরাও। কিন্তু থাকা-খাওয়া এক সঙ্গে। এমনটা ইদানিং আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এই শহরে সাহিত্য সংগীতের চর্চা আছে। নাটকের অভিনয় হয় ঘন ঘন। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের দিক থেকে খুবই প্রগতিসম্পন্ন এই শহর একটি জেলার সদর। মনে হয় একটি ছোটো রাজ্যেরই প্রধান নগর। শিক্ষার এমন সুব্যবস্থা কোনো ডিস্ট্রিক্ট টাউনেই আর দেখি নি। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ল' কলেজ, বি. টি. কলেজ আছে এখানে। এমনি আরো চার চারটি কলেজ তো আছেই জেনারেল এডুকেশনের জন্য, মেয়েদের জন্য উইমেন্‌স্ কলেজও রয়েছে। খেলাধুলাতেও পিছিয়ে নেই। ফুটবলের দল রাজ্যের অগ্রণী। মাঠে কলকাতার কয়েকটি ফুটবল দলকেও প্রতি বছর দেখা যায়। এমন শহরের একটি রেডিয়ো স্টেশনের দাবি থাকতে পারে। কথিকার জন্য উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব নেই। অভাব নেই গান গাইবার শিল্পীর। উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা পেলে মাধুরী ভট্টাচার্য, ছলনাময়ী দত্তর মতো শিল্পী সহজেই সর্বভারতীয় মানে পৌঁছে যেতে পারেন। অডিশনে মাধুরীর গান শুনে কলকাতা কেন্দ্রের সুখ্যাত মিউজিক প্রডিউসার অসীমা ভট্টাচার্য

আমায় বলেছিলেন যে মাধুরীর মতো শিল্পী কলকাতাতেই বা ক'জন পাওয়া যায়। রেডিয়োর ভালো সংগঠন থাকলে এবং শহরবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা পেলে একটি আদর্শ কেন্দ্র হতে পারে। এখানে গ্রামে-শহরে মিতালি। এত কাছে গাঁয়ের মানুষ, অতি সহজে যোগাযোগ করা যায়। পল্লী উন্নয়নের কার্যক্রম খুব সার্থকভাবে চলতে পারে এই কেন্দ্র থেকে। খুব বড়ো শহরে সে সুযোগ কোথায়? বড়ো শহর যে গ্রামগুলিকে গ্রাস করে নিচ্ছে নিজের শরীরটি তাজা রাখবার জন্য।

হঠাৎ একদিন দিল্লী থেকে জরুরি নির্দেশ এল আইজলে যেতে। মিজোরাম সরকারের একটি দপ্তর আছে এখানে। পথ্য পদবীর এক অফিসার এই অফিসের প্রধান। এই বাঙালি পদবীটি এর আগে আর শুনি নি। গাড়ি, ড্রাইভার এবং আমার পারমিট নিতে হল সেই দপ্তর থেকে। শুধু অনুমতিপত্র নিতে হয় মিজোরামে যাবার জন্য, অন্য কোনো বাধানিষেধ নেই। প্রায় সোয়াশো মাইলের পথ। নূতন সড়ক তৈরি হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। ব্রিটিশ আমলে এমন সরাসরি রাস্তা ছিল না। যেতে হত নৌকোয় পাহাড়ী নদী-পথে। সাত-আট দিন তো লাগতই। এখন সাত-আট ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। প্রতিদিন মিজোরাম সরকারের বাস যাওয়া-আসা করে এই সড়কে। এটাই এখন মিজোরামে যাবার একমাত্র ন্যাশনল্ হাইওয়ে। কলকাতা থেকে এই শহর হয়ে একটা সাপ্তাহিক ডাকোটা প্লেন-সার্ভিসও আইজল পর্যন্ত চালু করা হয়েছে এক বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে। আমার গাড়ি সকাল ছটায় ছাড়ল। যাত্রার আগে দুর্গানাম জপ করতে করতে ঘর থেকে পা বাড়ালাম। রাস্তাটা তো খুব নিরাপদ নয়। কিছুদিন আগেই এই সড়কে বাঙালি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের গাড়ি বিদ্রোহী মিজোদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। আহত অবস্থায় কলকাতায় এসে হাসপাতালে সুস্থ হবার

পর সেই গভর্নর বাহাদুর চাকরিই ছেড়ে দিলেন। এত বড়ো চাকরি! কিন্তু আইজলে ফিরে যেতে সাহস পেলেন না।

আমি চলছি সেই সড়কেই। প্রথমে দক্ষিণে মাইল কুড়ি চলার পর গাড়ি মোড় নিল পশ্চিমে। দশ মাইল পশ্চিমমুখী গিয়ে পাহাড়ে ওঠার মুখে চেক্‌পোস্ট। পথে সেনাবাহিনীর জীপ আর ট্রাক ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি চোখে পড়ল না। চেক্‌পোস্ট পার হয়ে চললাম পাহাড়ের উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণে। উচ্চতা তিন হাজার ফুটের মতো। একেবারে নির্জন রাস্তা, গাড়ি-চলাচল নেই প্রায়। আট-দশ মাইল পর পর সেনাবাহিনীর ছোটো ছোটো ছাউনি। একটি গ্রামও চোখে পড়ল না পথের দু পাশে। প্রতি চার-পাঁচ মাইলের মাথায় বর্ডার রোড টাস্‌ক্ ফোর্সের আস্তানা দেখতে পেলাম। সংক্ষেপে বলে বি. আর. টি. এফ.। সীমান্তে পাহাড়ী অঞ্চলের রাস্তা তৈরি এবং মেরামতির কাজে এরা নিযুক্ত। ধস নামে ঘন ঘন, বর্ষায় তো বটেই, অন্য সময়েও রাস্তা ভেঙে পড়ে। কী কঠিন দায়িত্ব এই লোকদের উপর। মনুষ্যবসতির অনেক দূরে, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং বিপদসংকুল পরিবেশে এই বন্ধুর পথকে এরা চালু রাখছে নিরন্তর অক্লান্ত পরিশ্রমে। দেশের জন্য এই সেবা, এই শ্রম লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই মানুষগুলিকে কিন্তু বেশ হাসিখুশি দেখলাম। এদের এক এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শুনেছি এরা সব অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীরই লোক। তাই এদের মধ্যে আছে চমৎকার ডিসিপ্লিন। আর দুর্গম স্থানে কাজ করার জন্য মাইনেও পায় ভালো। মিজোরামের এই দুর্গম সড়ক ঐ রাজ্যের লাইফ-লাইন। এ পথ চালু না থাকলে মিজোরামবাসীদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বি. আর. টি. এফ. অবিরত কাজ করে চলেছে এই রাস্তায়। বি. আর. টি. এফ.-এর লোকদের দেখেছি শিলং-করিমগঞ্জ-শিলচরের অতি দুর্গম পথে, দেখেছি গ্যাংটকের

রাস্তায়। এরা রয়েছে তেজপুর-বমডিলা-টাওয়াং-এর রাস্তায়ও। ভয়ংকর কঠিন এদের কাজ।

বেলা সাড়ে নটায় আমার গাড়ি এসে পৌঁছাল কোলাশিবে। আইজলের রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় এই কোলাশিব বাজার। রাস্তার দুধারে দোকানপাট। বাড়িগুলি কাঠের। দোকানের মালিক সব মিজোরামবাসী। রাস্তায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। মেয়েরা কর্মতৎপর, সজীব। শিলং-এর মেয়েদের চেয়ে স্বাস্থ্য অনেক ভালো। গায়ের রঙে হলদেটে ভাবটা এক পোঁচ বেশি। মুখের ভাব গম্ভীর দৃঢ়তাব্যঞ্জক। দৃষ্টি সামনে। গাড়ির দিকে কিংবা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ। চোখে কি বিদেশীর প্রতি বিরাগ ভাব দেখলাম? আমারই হয়তো ভুল। গাড়িতে বসেই লোকজনের যাতায়াত দেখছিলাম। অনুমতি নিয়ে ড্রাইভার গিয়েছে চা খেতে। তার একটু বিশ্রামেরও হয়তো দরকার ছিল। এই পথ শিলং-গৌহাটি, সিলেট-শিলং, শিলিগুড়ি-দার্জিলিং, দেরাদুন-মুসৌরির মতো চওড়া নয়। তাই গাড়ি চালাতে মনোযোগ লাগে বেশি। দোকানগুলিতে অনেক কমলালেবু সাজানো রয়েছে দেখলাম। ভালো কমলালেবু ফলে এখানে। রসালো এবং মিষ্টি। আধ ঘণ্টা থামার পর কোলাশিব ছেড়ে একটানা পুবমুখী চলে আমার গাড়ি আইজলে এসে গেল। দু-এক জায়গায় খুব খাড়া চড়াই। আমার পুরনো গাড়ি অতি কষ্টে উঠে এল। আইজলের প্রথম চেক্‌পোস্টের প্রহরী ড্রাইভারকে বলল যে সি. আর. পি.-র অতিথি-গৃহে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। পথের নির্দেশও দিয়ে দিল ড্রাইভারকে। প্রহরীর গাড়িটি চিনতে তো ভুল হতে পারে না। সামনে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর মস্ত বড়ো প্লেট ঝুলছে।

গেস্ট হাউসে সুন্দর ব্যবস্থা। খাওয়া-দাওয়ারও সুবন্দোবস্ত। এক মেজর সাহেব খাবার সময় সযত্নে আমায় সঙ্গ দিলেন। তিনি

খেলেন না, বাড়িতে স্ত্রী আছেন, দুপুরের খাওয়া বাড়িতেই সেরেছেন একটু আগে। আহারের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে রেডিয়ো স্টেশনে যাবার জন্য গাড়িতে উঠতে গিয়ে চক্ষুস্থির। দুই রাইফেলধারী গাড়ির পেছনের সীটের ডান-বাঁয়ের জানলায় রাইফেলের নল বের করে বসে আছে। মেজর সাহেবের কাছে এই ব্যবস্থার জন্য আমি আপত্তি জানালাম। তিনি বললেন আমার নিরাপত্তাটা এখন ওঁদের হাতে। গাড়িটি সি. আর. পি.-র গেস্ট হাউসে ঢুকে চিহ্নিত হয়ে গেছে। সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া এই গাড়ি আর নিরাপদ নয় আই-জলের রাস্তায়। আমার কোনো আপত্তিই মেজর সাহেব শুনলেন না। দুদিন ছিলাম আইজলে। যখন যেখানে গিয়েছি দুজন রাইফেলধারী পেছনের সীটে সর্বক্ষণ। এমন-কি, ফেরার পথে আমার বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত দুজন সিকিউরিটি গার্ড ছিল।

নিজের স্টেশনের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই আইজল কেন্দ্রের বাড়ি দেখে শক্‌ড্ হলাম না। বাড়িটি আরো ছোটো এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার, একই বাড়িতে অফিস, ট্র্যান্‌স্‌মিটার এবং রিসিভিং সেণ্টার এবং তদুপরি স্টুডিয়ো। ট্র্যান্‌স্‌মিটার না বলে মিনি-ট্র্যান্‌স্‌মিটার বলা উচিত। এই ট্র্যান্‌স্‌মিটার থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান পাঁচ-সাত মাইলের বেশি দূর থেকে শোনা যাবার কোনো কারণ নেই। প্রায় ন' বছর আগে খোলা হয়েছে এই কেন্দ্র। এই ক্ষীণশক্তির বেতার-কেন্দ্র দ্বারা কতটুকুই বা লাভ হয়। শুধু শহরের লোককে শোনাবার জন্যই বোধ হয়। কিন্তু দেশের দূর-দূরান্তের অফিসারদের এখানে এনে কাজে লাগানো হয়েছে। তামিলনাড়ু, কেরল, লক্ষ্ণৌ-এর ছেলেদের দেখতে পেলাম এখানে। অফিসে একটিমাত্র টয়লেট। তাও আবার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টরের কামরার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টর এল. আর. সাইলোর এটা পছন্দ না হওয়া স্বাভাবিক। এই নিয়ে একটা অসন্তোষ দানা

বেঁধে উঠেছে। আই. আই. টি. কানপুর থেকে সত্ত-পাস-করা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ইঞ্জিনিয়ারই বা এটা মেনে নেবেন কেন? সাইলো আইজলেরই ছেলে। তাঁকে বোঝালাম যে এই অফিসারগণ প্রিয়জন ঘরবাড়ি ছেড়ে এই দূর দেশে এসেছেন। নিজের ভাষায় কথা বলবার কেউ নেই, অভ্যস্ত খাবার খেতে পাচ্ছেন না এঁরা, এবং জলবায়ু সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাইলোকে বললাম এই পরবাসী অফিসাররা তাঁর দেশের অতিথি এবং এঁদের সুখ-দুঃখের কথা ভাববার দায়িত্ব আছে ওঁর। মেনে নিলেন আমার কথা সাইলো। আপস হয়ে গেল।

এল. আর. সাইলো আর-একটি সমস্যার কথা বললেন। আর্মির এক কাপ্তেন ডাক্তার একজন ঘোষিকার সঙ্গে প্রেম করছেন। এই ব্যাপারটা একটা সমস্যা কেন হল জিজ্ঞাসা করলাম। ঘোষিকার চরিত্র-সংশোধনের কোনো দায়িত্ব নেই দপ্তরপ্রধানের। এবার সাইলো ব্যক্ত করে বললেন যে সেই কাপ্তেন স্টুডিয়োর ভেতরে ঘোষিকার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্প করেন। নিরীহ ডিউটি অফিসার আর্মির অফিসারকে কিছু বলতে সাহস পান না। আমি যোগ করলাম যে ভীতু অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন ডিরেক্টরও কিছু বলতে সাহস পান না, তাই না? এবার গলার আওয়াজটা একটু উঁচুতে তুলে বললাম যে রেডিয়ো স্টেশন 'প্রটেক্টেড্ এয়্যারিয়া' এবং এই আইনটি আর্মির কাপ্তেনের উপরও সমভাবে প্রযোজ্য। বললাম ডিউটি অফিসারকে নির্দেশ দিতে যে রাত্রে এই কাপ্তেন সাহেব আসবামাত্র আমায় যেন ফোন করে। একে অ্যারেস্ট করাবার ব্যবস্থা করব। আমার জোরে বলার উদ্দেশ্য ছিল যে ঐ ঘোষিকাও যাতে আমার কথাগুলি শুনতে পান পাশের কামরা থেকে। এই সময় কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের পি. আর. ও. কর্নেল রিখিও আইজলে ছিলেন। তাঁকেও বলেছিলাম ব্যাপারটা। আহা, কর্নেল রিখি কিছুদিন পরই রেড রোডে স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে মারা যান।

সাইলোর সেই সমস্যাটার সহজেই সমাধান হয়ে গেল।

রেডিয়োর যে-সমস্ত অফিসারদের আইজলে বদলি করা হত বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাঁদের জন্য এই দূরদেশে স্টাফ কোয়ার্টারের ব্যবস্থা ছিল না। এখানে বাড়িভাড়া পাওয়া একেবারে অসম্ভব। আমি এই অফিসারদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ্‌— এঁরা তিন-চারজন মিলে এক-একটা মেস্‌ বাড়িতে থাকেন। খুব ছোটো বাড়ি, সংলগ্ন টয়লেট নেই, রাত-বিরেতে ঘর থেকে বের হওয়া একেবারেই নিরাপদ নয়। সুতরাং ঘরের কোণে প্রত্যেকের একটি বোতল আছে, পাশে ফিনাইলের বোতলও। কিন্তু 'বড়ো বাইরে' যাবার প্রয়োজন হলে সমূহ বিপদ। পঞ্চাশ-ষাটটি সিঁড়ি বেয়ে রেডিয়ো স্টেশনের টয়লেটে যেতে হবে। জলের কোনো ব্যবস্থাই নেই। অনেক দূর থেকে জল আনাতে হয়। অনেক সময় জল আনাবার বা ঘরের কাজকর্ম করবার লোকও পাওয়া যায় না। রান্নাবাড়াটা নিজেদেরই করে নিতে হয়। দেখলাম দারুণ একটা অসুবিধার মধ্যে এই অফিসারদের থাকতে হচ্ছে। এল. আর. সাইলোকে নিয়ে আমি মিজোরামের চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম। ভদ্রলোক উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের সিনিয়র আই.এ.এস.। রেডিয়োর কর্মীদের থাকার জন্য তিন-চারটি বাড়ির ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি সবিনয়ে জানালেন যে তিন-চারটি দূরে থাকুক একটি খালি বাড়িও নেই এই শহরে। তিনি বললেন নিজেদের অফিসারদের সবার থাকার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। বাড়ি পাওয়া মহা সমস্যা। কোনো খালি বাড়ি নেই।

বাড়ি পাওয়া যায় না সেজন্য আমাদের কোনো অফিসার নিজ পরিবারকে নিয়ে আসতে পারছেন না। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার যে মানসিক উদ্‌বেগ, আর্থিক অসুবিধা আছে সেটা দিল্লীর

কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার আধুনিক সরঞ্জাম-বিশিষ্ট সরকারি গৃহে সপরিবারে বাস করে কি করে অনুভব করবেন? একটা জৈব প্রয়োজনীয়তাও নিহিত আছে বিবাহিত অফিসারদের ক্ষেত্রে। তা ছাড়া এখানে বদলি হয়ে এসে ক'বছর থাকতে হবে তারও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই আইজল কেন্দ্র চালু হবার আট-ন' বছরের মধ্যে এ-সব সমস্যার দিকটা কেউ ভেবে দেখলেন না। আইজলে থাকার, খাবার, চলাফেরার খুঁটিনাটি অসুবিধার কথা বর্ণনা করে, সকরুণ চিত্র এঁকে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম ডিরেক্টর জেনারেল পি. সি. চ্যাটার্জির কাছে। অফিসের কাজে কোথাও বাইরে গেলে তার একটা রুটিন রিপোর্ট পাঠাতেই হয় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী। বর্তমান ডি. জি. কিন্তু মামুলী রিপোর্ট হিসেবে নিলেন না তাই দেখলাম।

এল. আর. সাইলোকে সঙ্গে নিয়ে আইজল শহরটা ঘুরে বেড়ালাম দুদিন। পাহাড়ের ঢালুতে ছড়িয়ে আছে এই শহর। অনেকটা কার্সিয়াং-এর মতো। তত বড়ো নয় অবশ্য। এবং গাছ-গাছলা সবুজ ভাবটা অনেক কম। শিলং-এর মতো সমতল ভূমি নেই। ঘনবসতিও নেই। সবাই খ্রীস্টান। বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাইলোর কাছে শুনলাম যে শহরবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্য নেই। রেশনের ময়দা আটা চিনি চালের দাম কম। পুরুষেরা সবাই পরিশ্রম করে, রোজগার করে। আর-একটা কথাও শুনলাম যে এখানে সুরাপান প্রায় বন্ধ হয়েই গেছে। সরকারি প্রচেষ্টায় নয়, প্রহিবিশনটা কার্যকর করেছে বিদ্রোহী মিজো ন্যাশনল্ ফ্রন্ট। পাহাড় এলাকায় গিরিজনদের মধ্যে মদ্যপানের খরচাটা খুব বেশি। দারিদ্র্যেরও অন্যতম কারণ এটা। যা রোজগার করে তার বেশিটাই চলে যায় মদে। এম. এন. এফ.-এর প্রতি কি সাধারণ মানুষের খুব আনুগত্য আছে? না হলে মদ পান করাটা বন্ধ হল কি করে? অতি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে প্রতিটি মিজো সরকারি কর্মচারী তাঁর বেতনের

একটা অংশ এম. এন. এফ.-এর ফাণ্ডে জমা করে দেন। ভয়ে না স্বেচ্ছায় বলা শক্ত। তবে এম. এন. এফ.-এর প্রভাব খুব সক্রিয়। এই শহরে শিক্ষার জন্য স্কুল আছে, কলেজ আছে, সবই সরকারি। ছেলেমেয়েরা সকলেই স্কুলে কলেজে যায়। ট্যুইশন ফি কম। মাস্টারমশায়রা নানা রাজ্য থেকে এসেছেন। আমাদের এক বাঙালি ঘোষকও চাকরি ছেড়ে দিয়ে মিজোরামের এক কলেজে লেক্‌চারারের পদ গ্রহণ করেছেন। সাহস আছে।

তরুণতরুণীরা বিকেলে ডাউনটাউনে বেরিয়ে পড়ে। এটা বাজার অঞ্চল। অবাধ মেলামেশা। পোশাকে চলাফেরায় সম্পূর্ণ 'মড্'। শিক্ষিতা মেয়েরা রাস্তাঘাটে স্ল্যাক্‌স্ পরে বেরোয়। নির্ভীক স্বচ্ছন্দ চলায় মেয়েরা ছেলেদের হারিয়ে দেয়। মনে হবে কলকাতার কফি-হাউসের মেয়েরা বা দিল্লীর কনট্‌প্লেসের মেয়েরা আইজলের মেয়েদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে আধুনিকতায়। শিলং-এর রাস্তায় স্ল্যাক্‌স্-পরা খাসি মেয়ে এই সেদিনও তো দেখি নি। আইজলের মেয়েদের ফিগার স্লিম্ রাখার সযত্ন প্রয়াস দেখেছি। একজনকেও স্থূলাঙ্গী দেখলাম না। মেয়েদের মুখে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। একদা অন্য রাজ্যের পুরুষের দিকে স্মিত হেসে তাকিয়েছে শুনেছি। ভিন্ রাজ্যের পুরুষ চোখের ভাষার অর্থ খুঁজে মরেছে। আজ সব বদলে গেছে। মুখে মিষ্টি হাসি তো নেইই, দৃষ্টিতে বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ মিজো পুরুষের মধ্যেও দেখেছি।

আইজল ছেড়ে আসার আগে সি. আর. পি.-র কর্তাকে জিজ্ঞাসা করেছি কেন এই সতর্কতা ফেরার পথেও আমার জন্য। উত্তরে সি. আর. পি.-র প্রধান জানালেন যে তাঁদের কাছে বর্তমানে যে গোপন খবর আছে তাতে মিজোরামের বাইরের প্রতিটি মানুষ বিদ্রোহীদের চোখে সন্দেহজনক। ছাপানো হ্যাণ্ডবিলে বিদেশীদের মিজোরাম পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এম. এন. এফ.-

এর তরফ থেকে। সুতরাং যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করাই উচিত। তাই আমার গাড়ির পেছনের সীটে দুজন রাইফেলধারী।

নির্বিঘ্নে ফিরে এলাম মিজোরাম থেকে। কিন্তু কয়েকদিন পরই নিদারুণ দুঃসংবাদ পেলাম। দিন-দুপুরে বিদ্রোহীদের কয়েকজন মিজোরামের পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের দপ্তরে প্রবেশ করে আই. জি., ডি. আই. জি. এবং এস. পি.-কে নির্মমভাবে গুলি ক'রে হত্যা করে। এঁরা তখন একটা মিটিং করছিলেন। শুনে শিউরে উঠলাম। কিছুদিন পর আইজলের সি. আর. পি.-র কর্তা ছুটিতে দেশে ফেরার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার গাড়িতে সিকিউরিটি গার্ড দেওয়াটা উচিত হয়েছিল কিনা। উপলব্ধি করলাম মিজোরামের পুলিসের চেয়ে সি. আর. পি.-র খবর সংগ্রহের মাধ্যমটি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং পাকাপোক্ত ছিল।

মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আমার জন্য একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন। আমার সঙ্গে ফোনে কোনো আলোচনা না করেই একটি রেকর্ড-করা ভাষণ পাঠিয়ে দিলেন আমাদের কেন্দ্র থেকে প্রচারের জন্য। অবশ্য রেকর্ডিং করা হয়েছিল আইজলের স্টুডিয়োতেই। এল. আর. সাইলোকে ফোনে জিজ্ঞাসা করে কোনো সদুত্তর পেলাম না। বুঝতে পারলাম যে পাছে মুখ্যমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়ে যান সে ভয়ে সাইলো আপত্তি করতে সাহস পান নি। কিন্তু একটা প্রোটোকল আছে। কোনো মুখ্যমন্ত্রী ভিন্ন রাজ্যের রেডিয়ো থেকে বেতার ভাষণ দেবার আবদার করেন না। তবে কোনো জরুরি প্রয়োজনে, দুই রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক স্বাভাবিক সম্পর্ক যদি কোনো কারণে বিঘ্নিত হয় এবং দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই যদি সিদ্ধান্ত নেন যে একে অন্য রাজ্যের বেতার-কেন্দ্র থেকে জনগণের কাছে আবেদন জানাবেন, সেক্ষেত্রে রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ সে প্রচারের ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো

আলোচনাই করলেন না মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী। অথচ তিনি অনুরোধ করলেন অবিলম্বে যেন এই ভাষণ প্রচার করা হয়। এদিকে স্ক্রিপ্‌টে আমাদের জেলার আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে একটি মন্তব্যের সামান্য পরিবর্তনও প্রয়োজন। অনেক চেষ্টা করেও দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না ফোনে এ বিষয়ে নির্দেশ নিতে। ডেপুটি কমিশনার জে. এন হাজারিকার সঙ্গে আলোচনা করে ওঁর বাড়ি থেকে মিজোরামের চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে হট লাইনে কথা বলে সামান্য পরিবর্তন করে নিলাম স্ক্রিপ্‌টে। মনে হল আমার সঙ্গে কথা বলার পর চীফ সেক্রেটারি বুঝতে পারলেন যে এই ভাষণটির প্রচারের ব্যাপারে আমার সঙ্গে আগে আলোচনা করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল। ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে উদ্দেশ্যটা মহৎ এবং দুই রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আবেদন আছে বলেই এই ভাষণ প্রচার করা হবে। সে রাত্রেই প্রচারের ব্যবস্থা করলাম। দিল্লীর কর্তৃপক্ষ আমার এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করল পরে।

দেশের সুদূর অঞ্চল থেকে একজন বড়ো শিল্পীকে প্রোগ্রামের জন্য আনাতে অনেক খরচা পড়ে যায় এবং স্বাভাবিক কারণেই এমন শিল্পী বেশি আনানো সম্ভব হয় না। তাই দিল্লী থেকে ঠিক করে দেওয়া হল কয়েকটি স্টেশনের মধ্যে চেন্ বুকিং-এর মাধ্যমে ভালো ভালো শিল্পী আনাতে। তা হলে খরচাটা ভাগাভাগি হয়ে যায়। সুন্দর ব্যবস্থা। আমাদের স্টেশনে বাইরে থেকে এলেন মণিমঞ্জুষা মজুমদার, মণিলাল নাগ, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, শঙ্কর ঘোষ, পূরবী মুখোপাধ্যায়, জয়া বিশ্বাস, মহাপুরুষ মিশ্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, রমা সেন, বিমল মুখোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। এঁদের অনুষ্ঠান শুনে শ্রোতারা খুশি, আমিও খুশি।

কেন জানি না কলকাতার শিল্পী কলকাতার বাইরে অনেক ভালো গাইতে বাজাতে পারেন। এটা কি মুক্ত আকাশ খোলা বাতাসের

প্রভাব? হয়তো বা। মানুষটিকেও যেন অনেক কাছের, অনেক আপনার মনে হয়। শিল্পী নিজের বিরাট প্রতিষ্ঠার কথা ভুলে গিয়ে হৃদয়কে মেলে ধরেন আমার কাছে। আমি আমারই মতো আর-একটি মানুষকে খুঁজে পাই। অনুরাগ বিরাগ উদারতা সংকীর্ণতার মিশ্রণে একজন সহজ মানুষ। তাঁর হৃদয়ের অলিগলিতেও নজর চলে যায়। হিউমার স্নেহ মায়ামমতার দিকটাও চোখে পড়ে। কলকাতায় বা নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসে জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে হৃদয়ের কপাট আবার যায় বন্ধ হয়ে। আমাদের এক ঘোষক একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন। তাঁর অতি বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে এক মহিলা শিল্পী তাঁকে ছোটো ভাই বলে সম্বোধন করলেন, বড়ো বোনের আন্তরিক স্নেহ প্রীতি থেকেও বঞ্চিত করলেন না ওঁকে। সেই ঘোষকের ভারি ভালো লেগে গেল তাঁর শিল্পী বোনকে। নিজের গাড়িতে ঘুরিয়ে দেখালেন সমস্ত শহর, আশপাশের সুন্দর জায়গাগুলি। বাড়িতে নিয়ে এসে পরিবারের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বড়ো গাঢ় প্রীতির জন্ম হল। ফিরে যাবার আগে প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেলেন শিল্পীবোন যে ভাই যদি কখনো বোনের দেশে যান তা হলে বোনের সঙ্গে নিশ্চয়ই যেন যোগাযোগ করেন। পরে বোনের দেশে কর্মব্যাপদেশে গিয়ে আমাদের ঘোষক যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু কোথায় এলেন! বোনটি তো সম্পূর্ণ অন্য মানুষ নিজ গৃহে। ঘোষকের সমস্ত মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে বাঁচলেন।

বিমল মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এঁদের প্রতি আছে আমার বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব। এত উচ্চপদে কাজ করে, প্রশাসনিক গুরু-দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও এঁরা সংগীতের সাধনায় সমর্পিতপ্রাণ। পুরো সময় সংগীতের সাধনায় নিয়োজিত করতে পারলে শিল্পী হিসেবে কোথায় পৌঁছে যেতেন সেটা আমার ধারণার বাইরে। এখনো তো

অগ্রণীদের মধ্যে সর্বভারতীয় মানের। আর-এক দিক থেকেও এঁরা আমার নমস্য। অতি অভিজাত ঘরের উচ্চশিক্ষিত সন্তানেরা, যাঁরা ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়ার সঙ্গে সংগীতের চর্চাটাকেও রেখেছেন, তাঁদের সবাইকে আমি প্রণাম জানাই। কাজটা তো খুব সহজ নয়। অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েরা আসাতে সংগীতের জগতের পরিবেশটা অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে। ভাস্কর্যে, চিত্রাঙ্কনে, সাহিত্যে যে সুসংস্কৃত পরিবেশ, এমন-কি, রবীন্দ্রসংগীতেও যে রুচিসম্পন্ন সুভদ্র পরিবেশ দেখতে পাই সেটা উচ্চাঙ্গ সংগীতে অতীতে ছিল না-ই বলা যায়। নিজস্ব আর্টটি ছাড়া আরো যে বিভিন্ন আর্টফর্ম রয়েছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পী সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন এমনটা মনে হয় না। অস্বাস্থ্যকর নানা অনুষঙ্গও ছিল সংগীতের সঙ্গে জড়িয়ে। বিমলবাবু, বুদ্ধদেব-এর মতো বাঙালির ছেলেরা সংগীতকে গণ্ডি মুক্ত করে সেই জগতটাকে রুচিসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। অশোভন অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত হয়েছে সংগীত। এঁরা পাইয়োনিয়ার নন, কিন্তু এঁদের অবদানও কম নয়।

নূতন অফিস গৃহ সম্পূর্ণ তৈরি হতে সামান্য বাকি তখনো। কিন্তু অফিস স্থানান্তরিত করে নিলাম নূতন বাড়িতে। সবাই খুশি স্টাফের। শহরের সব চেয়ে সুন্দর জায়গায় বাড়িটি। সামনে বিরাট মাঠ। শহরের খেলাধুলা, ফুটবল ক্রিকেট এই মাঠেই হয়। শীতের একমাস ব্যাপী গান্ধীমেলাও জমে এই মাঠে। আর পেছনের দিকে পশ্চিমমুখী বয়ে যাচ্ছে বরাক নদী। এই অফিসবাড়ির পাশে রাজ্য সরকারের অন্যান্য বাড়িগুলি নেহাতই নগণ্য দেখায়। পথ চলতে চলতে কিছুক্ষণ থেমে বাড়িটা দেখে নিচ্ছে সবাই। রেডিয়োর অনুষ্ঠান পুরনো স্টুডিয়ো থেকেই চলতে থাকল। নূতন স্টুডিয়ো তৈরির কাজ যদিও পুরোদমে চলছে তবু শেষ হতে অনেক বাকি। এই বাড়িতে আসার পর অফিসের উপযুক্ত পরিবেশ স্থাপিত হল।

স্টুডিয়ো পাশেই থাকাতে কাজের শৃঙ্খলাও বেড়ে গেল। প্রোগ্রামের ব্যাপারে ডেস্কের কাজ থেকে স্টুডিয়োর কাজ অনেক বেশি সময় নেয়। লক্ষ করলাম যে প্রোগ্রাম এগ্জিকিউটিভ এবং প্রডিউসারদের উৎসাহ এবং কর্মতৎপরতা অনেক বেশি এই নূতন বাড়িতে এসে। স্টুডিয়ো এবং অফিসের কাজে সমন্বয় সৃষ্টি হল। যেখানে বসে কাজ করি তার পরিবেশটা যদি ভালো না হয় তবে অল্পেতেই ক্লান্তি আসে, কাজেও মন লাগে না। যদি এ বাড়িতে আসতে না পারতাম তবে ইমার্জেন্সির ফলে কাজের যে চাপ সৃষ্টি হল তা সামলানো মুশকিল হত।

ইমার্জেন্সি উপলক্ষে যে-সব অনুষ্ঠান তৈরি করতে হল তাতে প্রাণ থাকতে পারে না। এ তো ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক নয়। বিশ দফার কথা জাতি ভুলে গেছে। পাবলিক মেমরি ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু রেডিয়োর কর্মচারী বিশ দফার কথা কী করে ভুলবে। সরকারি নির্দেশে বিশ দফার উপর বিচিত্র সব অনুষ্ঠান প্রস্তুত করতে হল। কিন্তু শুনবে কে? শ্রোতারা শুনলে তবে তো আমাদের উৎসাহ বাড়ে। কেউ শুনছে না প্রোগ্রাম। বিশ দফাতেই আমাদের দফা রফা করে ছাড়ল। তার উপর আরো পাঁচ দফা বাড়ল, হল পঁচিশ দফা। এই পাঁচ দফার উদ্ভাবক রাজা নয়, উজির নয়, কোটাল নয়! ভারতের মতো বিশাল দেশে প্রাজ্ঞজনের অভাব ছিল না সেদিন। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করলেন না, 'সে কে রে?' শিশুর প্রোগ্রামেও এই পঁচিশ দফা ঢুকিয়ে দিতে হবে। দিল্লী থেকে ডিরেক্টর অব প্রোগ্রাম জানালেন যে একটি কেন্দ্র থেকে শিশুদের প্রোগ্রামে পঁচিশ দফার উপর ক্যুইজ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে এবং দিল্লীর কর্তাব্যক্তিগণ সেই অভিনব আইডিয়ার তারিফ করেছেন। দূর থেকে আমিও সেলাম জানালাম সেই ক্যুইজ-প্রবর্তকের প্রতিভার উদ্দেশে। আমার বিশ্বাস যে-শিশুটি পরিবার পরিকল্পনা কত দফায় আছে বলতে পেরেছে তাকে বিশেষ পুরস্কার

দেওয়া হয়েছিল।

তবে আমরাও খুব পিছিয়ে পড়ি নি। বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানের কথা ভাবা হল এবং প্রচারিত হল। নাটক, কথিকা, গল্প, গান, আরো কত কি! একটা বিষয়ে আমরা অবশ্য নিশ্চিন্ত ছিলাম। কোনো শ্রোতা তো ছিল না, তাই সমালোচনার ভয়ও ছিল না। আর পত্রপত্রিকায়ও সরকারবিরোধী মন্তব্যের কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হয়েছিল। নির্ভয়ে আমরা অর্থহীন প্রোগ্রাম চালাতে লাগলাম। প্রোগ্রাম স্টাফের প্রায় সকলেই কিছু-না-কিছু করলেন এই পঁচিশ দফার উপর। স্টেট্‌মেন্ট পাঠাতে হবে, পঁচিশ দফার উপর অনুষ্ঠানের সংখ্যাটা বেশি হওয়া চাই। সপ্তাহ-শেষে এই-সব অনুষ্ঠানের ফর্দ তৈরি করে, কোন্‌টি কোন্ দফার অন্তর্গত সেটি চিহ্নিত করে, দিল্লীতে পাঠাতে হত। বুদ্ধি খাটিয়ে তালিকাটি বড়ো করার চেষ্টা। এমনও হয়েছে যে একটি ছোটো কথিকার মধ্যে আমরা আট-দশটি দফার উপস্থিতি আবিষ্কার করে ফেলতাম। প্রতিদিন দিল্লী থেকেও অনেক অনুষ্ঠান রিলে করতে হত। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি সংবাদের উপর দিল্লী থেকে রিলে-করা নানা অনুষ্ঠানের ভিড়ে আমাদের সান্ধ্য অধিবেশন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত। তবে এ-সব রিলে থেকেও কিছু ফায়দা ওঠাবার সন্ধানে থেকেছি। সবই তো সরকারি প্রচার। এগুলি থেকেও আমরা পঁচিশ দফার বেশ কয়েকটিকে খুঁজে বের করে সাপ্তাহিক স্টেটমেন্টের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছি। একবার তো কলকাতা কেন্দ্র একটি মাত্র প্রোগ্রামেই প্রায় পঁচিশটি দফাই জুগিয়ে দিল।

কলকাতার স্টেশন ডিরেক্টর ফোনে আমায় অনুরোধ করলেন তাঁদের সান্ধ্য অধিবেশনের একটি অনুষ্ঠান রিলে করতে। সঞ্জয় গান্ধী শহিদ মিনারের নীচে কলকাতার জনগণকে জ্ঞান বিতরণ করবেন। সেই ভাষণের রেকর্ডিং কলকাতা কেন্দ্র থেকে রাত্রে প্রচার করা হবে।

অনুষ্ঠানটি এই। আমাদের কেন্দ্র ভিন্ন রাজ্যে। কলকাতার প্রোগ্রাম তো আমরা রিলে করতে পারি না। তা ছাড়া এই অনুষ্ঠানেরই বা কি মূল্য? সে কথা বললাম কলকাতার স্টেশন ডিরেক্টরকে। কিন্তু এবার তিনি জানালেন যে উপরের নির্দেশ। অগত্যা বাধ্য হয়ে সঞ্জয় গান্ধীর মনুমেন্টের নীচের ভাষণ আমরা রিলে করলাম কলকাতা থেকে। সঞ্জয়ঃ উবাচ, কি বললেন শুনতে সাহস পাই নি। শুনেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও সঞ্জয় গান্ধী এক বক্তৃতায় উদ্‌বুদ্ধ করলেন। হে মোর দুর্ভাগা দেশ! তবে ঐ যে আগে বলেছি, এ রিলে থেকে আমাদের স্টেটমেন্টের জন্য পঁচিশ দফার সবগুলি পয়েন্টই পাওয়া গেল। আমাদের স্টেশনের একটি মাত্রই চ্যানেল। দিল্লীর রিলে এবং হাবিজাবি প্রোগ্রামে ভরতি। শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করতে পারে এমন প্রচারমুক্ত অনুষ্ঠানের জন্য বাকি থাকে কতটুকু সময়? ভালো একটি প্রোগ্রামের কথা চিন্তা করতেই বা সময় পাচ্ছি কোথায় আমরা? রেডিয়ো যে বিভিন্ন আর্টফর্ম রূপায়ণের এক বিশিষ্ট মাধ্যম সে কথা ভুলতে বসেছি। এই-সব প্রাণশূন্য পঁচিশ দফার অনুষ্ঠানের রূপায়ণে প্রোগ্রাম এগ্‌জিকিউটিভ, প্রডিউসার ছাড়াও ট্রান্‌স্‌মিশন এগ্‌জিকিউটিভ, ঘোষক-ঘোষিকারাও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। যে অনুষ্ঠান একেবারেই শিল্পগুণবর্জিত তার পেছনে খাটুনিতে ক্লান্তি আসে তাড়াতাড়ি। এই ক্লান্তি উপেক্ষা করেই অসীম অধ্যবসায়ে কাজ করেছেন আমার সহকর্মী বন্ধুগণ। ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগিতাও কম ছিল না। প্রডাক্‌শন অ্যাসিস্ট্যান্টদের খাটুনিটাও ছিল অসম্ভব।

আকাশবাণী ভবনের সামনের লেখাটার দিকে তাকিয়ে বার বার আমি ভেবেছি আদর্শ ছিল কত মহৎ এই প্রতিষ্ঠানটির। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়— দীর্ঘকাল এই নীতিই প্রেরণা জাগিয়েছে মনে, চালিত করেছে সত্যের পথে। আজ সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ব্যক্তি

বা দলের প্রচার-যন্ত্রে পরিণত হলে তো রেডিয়ো স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হবেই। পক্ষপাতশূন্য উদারনীতির রূপায়ণ সরকারি জোয়াল কাঁধে নিয়ে সম্ভব নয়, এই কথাই উপলব্ধি করেছি। রেডিয়োকে সরকারের কবল থেকে মুক্ত করে দেবার সুপারিশ করেছিল চন্দ-কমিটি। মঞ্জুর হল না। সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হলে প্রগতির পথে এগিয়ে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি এই অনগ্রসর দেশের সত্যিকারের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারত। সেটা সম্ভব হল না আমার কালে। জরুরি অবস্থার অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাণেরই দায়ে জীবনের এই প্রান্তবেলায় মনের এই গ্লানিকে মেনে নিতে হল আর ক'টা দিনের জন্য। অসহায় বার্ধক্যের রুটির চিন্তা রয়েছে যে। তবে বাঁধন ছাড়ার ক্ষণও এগিয়ে আসছে। বিদায়ের বাঁশি শুনতে পাচ্ছি।

আজ কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হল। খোলা হাওয়ায় শ্বাস নেবার আনন্দ। বাধানিষেধের বেড়াজাল ছিঁড়ে খাঁচা থেকে মুক্ত পাখির মতো মনটা আমার উড়ে চলবে দিকে দিগন্তে। কথা আমার ফুরলো। কিন্তু তবু মনে হয় বাকি রয়ে গেল কিছু। এমন একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি যাকে মনে হয়েছে তীর্থক্ষেত্র। সারাটা কর্মজীবনে তীর্থবাসের শান্তি, সেটা জীবনের পরম পাওয়া। টাকা, আনা, পাই-এর হিসাবে প্রতিষ্ঠা নাই বা পেলাম। দীর্ঘ কর্মজীবন কাটালাম একটা সংগীতময় কাব্যময় পরিবেশে। প্রথম যখন রেডিয়োতে এলাম মনে হল একটা অজানা বিশ্বের দুয়ার আমার কাছে খুলে গেল। এখানে চাঁদির ঝন্ঝন্ শোনা যায় না। চোর-জুয়াচোরের কোনো সুবিধে নেই, শয়তান-মামলাবাজের আগমন হয় না। আর শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কারবার বলে রাজ-নীতির প্রবেশও ঘটে নি। আমার কালে কোনো ধর্মঘট দেখি নি রেডিয়োতে। যাঁদের নিয়ে রেডিয়োর প্রতিদিনের কাজ তাঁরা যে

সব অসাধারণ মানুষ— শিল্পী, সাহিত্যিক, বিদ্বান সুধীজন। কত কাছ থেকে এই-সব অসামান্য মানুষদের দেখতে পেয়েছি। সারাটা জীবন এঁদের সান্নিধ্য লাভ করে জীবনের হিসেবনিকেশটাই যে অন্যভাবে করতে শিখলাম। এটাও তো কম বড়ো পাওয়া নয়।

রেডিয়োকে আমি কি দিতে পেরেছি? কিন্তু পেয়েছি কত। রেডিয়ো আমায় শেখাল কর্মক্ষেত্রকে মাতৃভূমির মতো ভালোবাসতে। রেডিয়ো আমায় শেখাল এই প্রতিষ্ঠানটি ভয়েস অব দি নেশন্, নিজের অবহেলায় একে বোবা করে দেবার অধিকার আমার নেই। তাই একবার আকাশে চালু হলে অনন্তকাল ধরে চলমান থাকবে সূর্যের মতো নিয়মনিষ্ঠতায়। দাঙ্গায় বন্ধ হয় না, ছেচল্লিশের আগস্টে কলকাতায় বন্ধ হয় নি ; যুদ্ধের কালে বোমার মধ্যেও চলবে, চলেছিল জলন্ধরে, অমৃতসরে পঁয়ষট্টির সেপ্টেম্বরেও ; যদিও বিদেশী লাহোর কেন্দ্র সাময়িক বন্ধ ছিল। একাত্তরের ডিসেম্বরে সীমান্ত অঞ্চলের কোনো রেডিয়ো স্টেশনই বন্ধ হয় নি। বাষট্টির আক্রমণে সেরকম পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয় নি। হাঁটুজলের বৃষ্টিতে একটি রেডিয়ো কেন্দ্র বন্ধ থাকবে অবিশ্বাস্য কথা। হাঁটুজল কেন, পাটনার গলাজলেও রেডিয়ো বন্ধ হয় নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় অন্যান্য দপ্তর বা রাজ্য সরকারের সব দপ্তরই অচল হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম পরবর্তীকালে যে দুদিন বৃষ্টির ফলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্ধ হয়ে গেল দুদিনের জন্য। রাইটার্স বিল্ডিং জনশূন্য— মন্ত্রী নেই, সেক্রেটারি নেই, অন্য কর্মী থাকবে সেটা আশাই করা যায় না। রেডিয়োরই মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করলেন নিজ কর্মচারীদের কাছে কাজে যোগ দিতে। রেডিয়োর কাছেই আমি শিক্ষালাভ করলাম যে একটি সেকেণ্ডকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। শুধু ঘণ্টা মিনিটকেই গুনতে হবে তা নয়, প্রতিটি সেকেণ্ডও মূল্যবান। সে-কারণে রেডিয়োতে কাজের সময়ের এক মিনিটও নষ্ট হয় না

বছরে। আর যাকে বলে পাবলিক রিলেশন, মানুষের সঙ্গে সুভদ্র আচরণ, সেটা একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুশীলিত হয় এখানে কাজ না করলে বিশ্বাস করতাম না। আমার কালের কথাই বলছি।

এ কাহিনীর শুরু ৩০ জুলাই ১৯৪৬। কর্মজীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘুরেছি কত দেশে। গিয়েছি নূতন জনপদে, দেখেছি বিচিত্র মানুষের মেলা, বিচিত্র রূপ, বিচিত্র পোশাক, বিচিত্র মনের রঙ। দেখে দেখে বুক ভরে উঠেছে আমার। হৃদয়ের মণিকোঠায় জমা পড়ল বহু মানুষের উষ্ণ হৃদয়ের সুখস্পর্শ, কিন্তু আমাকে নিয়ে বুক ভরেছে কার! কতটুকু দিতে পেরেছি আমি! অনেকদিন যাঁরা ছিলেন সহকর্মী ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিবেশী তাঁদের দিয়েছি যত পেয়েছি অনেক বেশি। গ্রহণ করে ঋণী হয়েছি বারে বারে। তাঁদের সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে বলে যাই, হে বন্ধু বিদায়!

—

নির্দেশিকা